বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মাদ রূহুল আমীন

মুদীর, দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ
আল-মারকাযুল ইসলামী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০১৬
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১৩

- বেশি-বেশি যিকির করা /২৪
- কবুলিয়াতের ফিকির /৮০
- জীবিকার বণ্টন /১২৪
- দাওয়াত ও তাবলীগের দশটি সোনালি মূলনীতি /১৭৮
- মাহরাম পুরুষদের সংশোধন /২০৮
- বরকতময় জুমার ফযীলত /২৩২

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১৪

- আল্লাহর সাথে উন্মাতাল সম্পর্ক /২৬০
- সমগ্র জগতের প্রেমাস্পদ /৩০২
- ঈমানি জীবনের দাবি /৩৩৪
- মঙ্গলময় ও বরকতময় আমল /৩৫৭
- নেক কাজ ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলাফল /৩৮২
- দুনিয়ার স্বরূপ /৪৩২
- তাকওয়ার ফলাফল /৪৫৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১৩

বেশি-বেশি যিকির করা /২৪

মুমিনের প্রতি বেশি-বেশি যিকিরের আদেশ /২৪
যিকিরে আধিক্যের প্রভাব /২৫
মুরাকাবা এন্টিবায়োটিকের মতো /২৮
যিকির দ্বারা সত্তার মহব্বত বৃদ্ধি পায় /২৯
অন্তরের মুঠোফোন /২৯
লম্বা মুরাকাবা /৩০
অন্তরের জন্য বেকিং টাইম (পরিপক্ব হওয়ার সময়) /৩২
মনোপ্রবৃত্তির স্ট্রেচ তথা আকর্ষণ কিভাবে দূর হবে /৩২
বে-তলবির সীমানা /৩৩
ফয়েজ স্থানান্তরের তিনটি শর্ত /৩৪
আধ্যাত্মিক জগতে বাহ্যিক দূরত্বের গুরুত্ব /৩৭
প্রাপ্তগণ এভাবেই পেয়ে থাকে /৩৮
কব্জ (সংযোগ বিচ্ছিন্নতা) অবস্থায় বড় পরীক্ষা হয় /৩৯
শরীর নরম হওয়া এবং অন্তর নরম হওয়া /৪১
আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার গোপন দরজা /৪২
সরাসরি সম্বোধনে স্বাদ /৪৪
সর্বাবস্থায় যিকির করার তরিকা কুরআন মাজীদের আলোকে /৪৫
যিকিরের আধিক্য দ্বারা দুটি নেয়ামত লাভ /৪৯
একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ /৫০
এক ছাত্রের সফলতা /৫০
দীনি ময়দানে সফলতা /৫১
দাম্পত্ব জীবনে সফলতা /৫২
সবর ও ধৈর্যশক্তি /৫৫
সংকল্পশক্তি বৃদ্ধিকারী একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা /৫৬
আল্লাহওয়ালাদের দৃঢ় সংকল্প /৫৮
শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার ফলাফল /৫৯
বড়-বড় পাথর ভাঙা /৬০
এক বৃদ্ধের মহিষের সাথে লড়াই /৬০

হেপ্‌নাটিজম (সম্মোহন বিদ্যা)-এর একটি প্রদর্শনি /৬২
বস; এটাই আমার প্রদর্শনি /৬৪
টিভির পর্দায় একটি প্রদর্শনি /৬৫
গুনাহগারদের ওপর আল্লাহওয়ালাদের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব /৬৫
আমাদের নামাযের অবস্থা /৬৬
একটি কুরআনী সিদ্ধান্ত /৬৮
গাইরুল্লাহ-এর ধ্যান-খেয়ালমুক্ত নামায পড়ার ঘটনা /৬৮
বিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার শক্তি /৭০
হযরত ওমর (রাযি.)-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা /৭০
ইউনানি চিকিৎসা বিলুপ্ত হওয়ার কারণসমূহ /৭১
একটি কৃত্রিম চাঁদ /৭৩
একটি বিস্ময়কর ঘটনা /৭৩
চিকিৎসকদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ফলাফল /৭৪
স্পেশালিষ্ট (বিশেষজ্ঞ) হওয়ার পদ্ধতি /৪
ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত
করার ফলাফল /৭৫

কবুলিয়াতের ফিকির /৮০

ক্বাবেলিয়াত ও কবুলিয়াত (যোগ্যতা ও কবুল হওয়া)-এর তাৎপর্য /৮০
যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কবুল না হওয়ার ঘটনাবলি
ইবলীস আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়া /৮১
ফেরাউনের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া /৮২
ওমর ইবনে হিশামের ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া /৮৩
ওয়ালীদের অহংকার তাকে নিয়ে ডুবেছে /৮৪
আবুল ফযল ও ফয়েজির বঞ্চনা /৮৫
একটি ব্যাপক উদাহরণ /৮৬
কবুল হওয়ার সৌভাগ্য লাভকারীদের দৃষ্টান্ত /৮৭
সায়্যিদুনা ইবরাহীম (আ.)-এর কবুল হওয়া /৮৭
বিবি মারয়াম (আ.)-এর কবুলিয়াত /৮৯
বোখারি শরীফের কবুলিয়াত /৮৯
দারুল উলূম দেওবন্দের কবুলিয়াত /৯১
মহান জবেহ-এর কবুলিয়াত /৯২
সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর কবুলিয়াত /৯৩
একটা পিপীলিকার কবুলিয়াত /৯৪
ক্ষুধায় ধৈর্যধারণের ওপর কবুলিয়াত /৯৪

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর কবুলিয়াত /৯৫
শাতেবিয়্যাহ রিসালার কবুলিয়াত /৯৬
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর কবুলিয়াত /৯৬
রাবেয়া বসরির কবুলিয়াত /৯৭
ফিকহে হানাফীর কবুলিয়াত /৯৭
এক নববধূর কবুলিয়াত ভাবনা /৯৮
কবুলিয়াত লাভের জন্য সদা চিন্তাশীল থাকবেন /৯৯
ক্ষমা প্রার্থনা শিক্ষাদান /১০১
আমল কবুল হওয়ার জন্য তাকওয়া জরুরি /১০৬
সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় /১০৭
সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় /১০৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও আল্লাহর ভয় /১১২
নিজের যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখা যাবে না /১১৩
একটি আকর্ষণীয় ঘটনা /১১৪
ব্যাকুলতা সৃষ্টিকারী আয়াত /১১৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১১৮
কবুলিয়াত লাভের মূল্যবান ব্যবস্থাপত্র /১১৯
একটি চমৎকার দু'আ /১২০
আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–
অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ভয় করা জরুরি /১২১

জীবিকার বণ্টন /১২৪

পার্থিব জীবনে সম্পদের গুরুত্ব /১২৪
সম্পদ কল্যাণেরও কারণ, অকল্যাণেরও কারণ /১২৭
আর্থিক পেরেশানি /১২৮
পেরেশানির সমাধান /১২৮
একজন জেনারেল ম্যানেজারের অবস্থা /১২৯
এক শ্রমিকের তৃপ্তিদায়ক ঘুম /১৩০
ধ্বংসের গন্ধ ও কুফরের গন্ধ /১৩০
খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)-এর আত্মবিমুখতা /১৩১
সম্পদের ক্ষেত্রে কঠিন সর্তকতা /১৩২
ধনদৌলতের পূজা থেকে পরিত্রাণের দু'আ /১৩৩
পাঁচটি বস্তু আবশ্যিকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত /১৩৪

তাওয়াক্কুলকারী ও দুনিয়াবিমুখ কে? /১৩৫
বিচক্ষণ ব্যক্তি কে? /১৩৫
ফকীহ্ কাকে বলে? /১৩৬
কৃপণ কাকে বলে? /১৩৬
ধনী কাকে বলে? /১৩৬
শিক্ষণীয় উপদেশমালা /১৩৭
ভাগ্যে লেখা রিযিক নিশ্চিত লাভ হয় /১৩৮
কুকুর তার রিযিক পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছল? /১৩৮
যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন /১৩৯
মোরগের রিযিক /১৪১
খাজা বায়েজিদ বুস্তামি (রহ.)-এর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা /১৪২
অদৃশ্য জগৎ থেকে খানার ব্যবস্থা /১৪২
গুনাহ্ সত্ত্বেও চারটি নেয়ামত অব্যাহত থাকে /১৪৪
আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী কার্যকলাপ /১৪৪
রিযিকের মধ্যে দুই ধরনের অনুগ্রহ /১৪৬
রিযিক লাভের উপকরণ /১৪৬
জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জীবনের জরুরত /১৪৮
রিযিক পাওয়ার পথ দুটি /১৪৯
চলমান যুগে রিযিক অর্জনে সহজতা /১৪৯
রিযিকের ব্যাপারে মানুষের পেরেশানি /১৫০
কাকের বাচ্চার লালনপালন /১৫১
মৌলভী হয়ে খাবে কোথা থেকে? /১৫১
হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা /১৫৩
উপকরণ ছাড়া রিযিক এবং উপকরণের মাধ্যমে রিযিক /১৫৪
আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান রেখেছেন /১৫৬
মেহমান এলে মন ছোট না করা /১৫৭
মিসকিনদের রিযিক /১৫৭
বাজেট রজনী /১৫৮
চমৎকার একটি দু'আ /১৫৯
জনৈক বয়স্ক ব্যক্তির আকর্ষণীয় প্রশ্ন /১৫৯
প্রত্যেক দু'আ কবুল হয় /১৬০
দুটি বিশেষ নেয়ামত /১৬২
পরীক্ষিত তিনটি বিষয় /১৬২

রিযিক বৃদ্ধি করার কতিপয় আমল /১৬৩
ছাত্রদের জন্য দুটি উপহার /১৬৪
দাম্পত্য জীবনের সফলতার জন্য অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র /১৬৫
ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তাও প্রার্থনা করবে /১৬৭
আল্লাহ বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি /১৬৭
সকল আসমায়ে হুসনা আল্লাহর রহমতের অর্থবোধক /১৬৮
ক্ষমার ঘোষণা /১৭১
দুই গুনাহগারের ক্ষমা /১৭২
সকল পেরেশানি আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করো /১৭২
পনেরো শা'বান থেকে সাতাশে রমযান পর্যন্ত /১৭৩
আল্লাহর রহমতের সূর্য /১৭৪
একটি বিস্ময়কর ঘটনা /১৭৪

দাওয়াত ও তাবলীগের দশটি সোনালি মূলনীতি /১৭৮

বিশ্বজগত পরিচালনার বিন্যাস /১৭৮
আমানত সোপর্দ করা /১৭৯
ওস্তাদকে হাদিয়া প্রদানের পদ্ধতি /১৮১
ছাত্রীদের পরিশ্রমের ক্ষেত্র /১৮২
দাওয়াতের কাজ না করার ওপর অনুশোচনা /১৮৩
দাওয়াত ও তাবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি /১৮৪
তাবলীগের সর্বোত্তম পদ্ধতি /১৮৫
দাওয়াত ও তাবলীগে অভ্যন্তরীণ নূরের গুরুত্ব /১৮৭
কুরআন মাজীদের আলোকে মুবাল্লিগের কতিপয় গুণ /১৮৭
ছাত্রীদের কাজ করার দুটি পদ্ধতি /১৯৬
মুাবাল্লিগের কাজে আল্লাহ তা'আলার পৃষ্ঠপোষকতা /২০০
আল্লাহর কাছে দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামের কবুলিয়াত /২০৩
একটি চমৎকার দু'আ /২০৪
এই উদ্যান সমৃদ্ধ হবে তাওহীদের স্বরমাধুর্য দ্বারা /২০৫

মাহরাম পুরুষদের সংশোধন /২০৮

বিরাট এক কাজের দাওয়াত /২০৮
মহিলারা চার প্রকার ভালোবাসা পেয়ে থাকেন /২১০
সন্তানের অন্তরে মায়ের ভালোবাসা /২১০
জিহাদের স্পৃহা সৃষ্টির বিরল পদ্ধতি /২১৩

আসমা বিনতে আবীবকর (রাযি.)কর্তৃক স্বীয় ছেলেকে নসীহত /২১৩
মাতাপিতার মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকবে /২১৫
স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর অবস্থান /২১৬
হযরত আবূতালহা (রাযি.) কীভাবে মুসলমান হলেন? /২১৮
হযরত ইকরামা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ /২১৯
ইয়ারমুক যুদ্ধে নারীদের অবদান /২২০
ভাইদের দৃষ্টিতে বোনদের অবস্থান ও মর্যাদা /২২১
দুধবোনের প্রতি ভক্তি-সম্মান /২২২
ভাইদের ওপর নেক কাজের তালীমের প্রভাব /২২৩
পিতার দৃষ্টিতে কন্যার অবস্থান /২২৩
কন্যাদের দায়িত্ব-কর্তব্য /২২৫

বরকতময় জুমার ফযীলত /২৩২
পৃথিবীর সৃষ্টি /২৩২
মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রকৃতিতে পার্থক্য /২৩৩
অমুসলিম বিশ্ব ও জুমার দিন /২৩৪
মুসলিম বিশ্ব ও জুমার দিন /২৩৪
জুমার দিনের নামকরণের হেতু /২৪০
জুমার প্রতি গুরুত্বারোপের ফযীলত /২৪১
কবুলের মুহূর্ত /২৪২
জুমার বিশেষ পোশাক /২৪২
জুমার নামাযের পর ব্যবসায় বরকত /২৪৩
জুমার নামাযপড়ুয়াদের নাম অন্তর্ভুক্তি /২৪৩
অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ার হুকুম /২৪৪
জুমা ও জুমার রাতের বরকত /২৪৫
জুমার দিন সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াতের ফযীলত /২৪৫
জুমার খুতবার ফযীলত /২৪৬
জুমার খুতবার সারনির্যাস /২৪৬
খতীবের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার মূল্যবান পুরস্কার /২৪৭
আল্লাহর দিদার ২৫০
বড় ময়দানে উপস্থিতি /২৫০
দিদার লাভের সময়কার অবস্থা /২৫১
আল্লাহর দিদারের পরিচিতি /২৫২
মাঅরাউন্নাহার এলাকার ওলামায়ে কেরামের আমলি অভ্যাস /২৫৪

খুতুবাতে যুলফিকার-১৪

আল্লাহর সাথে উন্মাতাল সম্পর্ক /২৬০

মহব্বতের বীজ /২৬০
মহব্বত কীভাবে হয়? /২৬০
মহব্বতের স্বভাবজাত আবেগ /২৬১
মহব্বত আর অপকর্ম /২৬৩
মনোবিজ্ঞানীদের জীবন দর্শন /২৬৪
কার্লমার্কসের দর্শন /২৬৪
আলফ্রেড এ্যাডলরের দৃষ্টিভঙ্গি /২৬৪
ফ্রাইড-এর দৃষ্টিভঙ্গি /২৬৫
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি /২৬৫
বিজ্ঞানীদের ধোঁকায় পড়া /২৬৬
সত্য কী?
মহব্বতের হাকীকত /২৬৭
আল্লাহর মহব্বতের মিষ্টি /২৬৯
ইশক-মহব্বতের দোকান ও ইশক-মহব্বতের পুরিয়া /২৬৯
ঈমানের শর্ত /২৭০
অন্তর ও মস্তিষ্কের পার্থক্য /২৭১
সাত ভাষায় কবিতা /২৭১
অন্তরের ভাষা /২৭৪
অন্তরের কাজ /২৭৬
অঙ্গসমূহের স্বাদ /২৭৬
চোখের স্বাদ /২৭৬
নাকের স্বাদ /২৭৭
জিহ্বার স্বাদ /২৭৭
গোপনাঙ্গের স্বাদ /২৭৮
অন্তরের স্বাদ /২৭৮
আইনানুগ সম্পর্ক /২৭৯
উন্মত্ত সম্পর্ক /২৮০
বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা /২৮০
আল্লাহ তা'আলার সাথে উন্মত্ত সম্পর্ক কাম্য /২৮১
প্রেমাস্পদের প্রতিটি বস্তু ও কাজ ভালো লাগে /২৮৩

আল্লাহর যিকির দ্বারা মুমিনের অন্তর আন্দোলিত হয় /২৮৩
জনৈক মহব্বতের রোগীর ঘটনা /২৮৪
আল্লাহর যিকির দ্বারা মুমিনের শিরা দ্রুত চলমান হয়ে যায় /২৮৫
তেলাওয়াতে কুরআন আল্লাহর সাথে কথোপকথন /২৮৫
নামায আল্লাহ তা'আলার সাথে মুলাকাত /২৮৭
মৃত্যু মুমিনের সওগাত /২৮৮
দিদারের মাহফিল /২৮৯
আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অর্জন /২৯০
আকর্ষণকারী মহব্বত /২৯৪
আল্লাহর মহব্বতের পরিধি /২৯৫
আল্লাহর মহব্বত জীবন নামক গাড়ির পেট্রোল /২৯৫
আল্লাহর মহব্বতের মর্যাদা ও মূল্য /২৯৬
আল্লাহর মহব্বতের জন্য মুনাজাত /২৭৯

সমগ্র জগতের প্রেমাস্পদ /৩০২

একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব /৩০২
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর পাত্র /৩০৩
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় নির্বাচনে হেকমত /৩০৪
পারস্য রাজপ্রাসাদের গম্বুজ ধসে পড়ার রহস্য /৩০৪
সম্মানিত পিতার মৃত্যুতে হেকমত /৩০৫
গর্ভের সময় বহু বরকত প্রকাশ /৩০৬
হালীমা সা'দিয়ার অঙ্গনে রহমতের প্রাচুর্য /৩০৬
হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.)-এর চিত্তাকর্ষক গান /৩০৮
অন্তর সওদাকারী /৩১০
আরবের চাঁদ /৩১১
নবীজির দিদার লাভে ব্যাকুলতা /৩১২
তাঁর প্রত্যাশীগণ এরূপও ছিলেন /৩১২
হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অনন্ত মহব্বত /৩১৩
রাসূলের সৌন্দর্যের প্রশংসায় রাসূলের কবি /৩১৪
ইমাম বোমিরি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে নবীজির সৌন্দর্য /৩১৫
জড় জগতের প্রিয়জন /৩১৫
উদ্ভিদ জগতের প্রিয়জন /৩১৬
জীব-জানোয়ারের প্রিয়জন /৩১৭
মানবজাতির প্রিয়জন /৩১৭
জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা /৩১৮

নবীজির অনুরূপ হওয়ার অভিলাষ /৩১৮
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে
আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের মহব্বত /৩১৯
হযরত আসমা (রাযি.)-এর অন্তরে নবীজির মহব্বত /৩২৬
এক মহিলা সাহাবীর মহব্বত /৩২৮
একটি ঘটনা যা সাহাবায়ে কেরামকে (রাযি.) নাড়া দিয়েছিল /৩২৮
আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মহব্বতে ভরপুর দু'আ /৩৩০

ঈমানি জীবনের দাবি /৩৩৪

মুমিনদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ /৩৩৪
অন্তর দ্বারা বিশ্বাস ও সত্যায়নের মর্ম /৩৩৫
আমল অন্তরগত অবস্থার আয়না /৩৩৭
কৃত্রিম ভয় /৩৩৭
মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য /৩৩৮
মানুষের মূল্য ও মর্যাদা /৩৪০
প্রতিপালকের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব /৩৪১
মানুষের অবস্থা /৩৪১
মুমিন আল্লাহর বন্ধু /৩৪২
মানবজাতি আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশস্থল /৩৪২
মানুষ নবোদ্‌গত উদ্ভিদের মতো /৩৪২
মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া মন্দ বিষয়াবলি /৩৪৩
পদ ও কর্তৃত্বের অহংকার /৩৪৩
সম্পদের সাথে কৃপণতা /৩৪৪
ইল্‌মের সাথে হিংসা ও অহংকার /৩৪৫
খ্যাতির সাথে লৌকিকতা /৩৪৫
রূপ-সৌন্দর্যের সাথে প্রদর্শনি /৩৪৫
মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য /৩৪৬
মানবজীবনের দুটি দিক /৩৪৬
পৃথিবীতে পরিশেষে বিলীন হতেই হবে /৩৪৭
যতক্ষণ না নিজেকে মিটাবে, ততক্ষণ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে না /৩৪৭
জিনের শক্তির চেয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি বেশি /৩৪৮
মানুষের বড় ভুল /৩৪৯
জাহান্নামের আমল দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ /৩৫১
মৃত্যুকে স্মরণ রাখবেন /৩৫২
আমলের চাবি /৩৫২

জান্নাতের চাবি /৩৫২
নামাযের চাবি /৩৫২
সৎকাজের চাবি সত্য বলা /৩৫২
ইল্‌মের চাবি উত্তম পন্থায় জিজ্ঞাসা /৩৫৩
আল্লাহর সাহায্য লাভের চাবি সবর /৩৫৩
একটি সূক্ষ্ম বিষয় /৩৫৪
আল্লাহর নেয়ামত লাভের চাবি শোকর /৩৫৫
আল্লাহর নৈকট্য লাভের চাবি যিকির /৩৫৫
সফলতার চাবি তাকওয়া /৩৫৬
রিযিকের চাবি ইখলাস ও আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা /৩৫৭

মঙ্গলময় ও বরকতময় আমল /৩৫৭

উজুতে হায়াতের বরকত /৩৫৭
সালামের মধ্যে ঘরের বরকত /৩৫৭
আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক /৩৫৮
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব /৩৫৮
পাঁচ ব্যক্তির যিম্মাদারি /৩৫৮
পাঁচটি চোখের ওপর জাহান্নাম হারাম /৩৬১
পাঁচ কাজ দ্রুত সম্পাদন করো /৩৬২
পাখির খাঁচা অথবা পশুর আস্তাবল /৩৬৩
তাসাওউফ ও তরীকতের মেহনতের উদ্দেশ্য /৩৬৪
আকাবিরগণের উক্তির আলোকে তাসাওউফ /৩৬৪
বেলায়াতি (আল্লাহর অলি হওয়া) নূরের নিদর্শন /৩৬৬
মানছুর হাল্লাজ ও ফেরাউনের মাঝে পার্থক্য /৩৭১
জীবনধারা সোজা করা চাই /৩৭২
এজতেমার জন্য দিকনির্দেশনা /৩৭৩
কতিপয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন /৩৭৫
আল্লাহ কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করেন না /৩৭৫
কবুলিয়াত (কবুল হওয়া) বড় নেয়ামত /৩৭৬
কবুলিয়াতের জন্য দু'আ করবেন /৩৭৭

নেক কাজ ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলাফল /৩৮২

মানুষের কামনা /৩৮২
আমলের ক্রিয়া /৩৮২
নামায ও সফলতা /৩৮৩
যিকির ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ /৩৮৩

রোযা ও তাকওয়া /৩৮৩
হজ ও ক্ষমা /৩৮৪
আমলী শক্তির বিশ্বাস /৩৮৫
সঠিক আমল এবং বিকৃত আমলের ফল /৩৮৫
আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার ফল /৩৮৬
যথাযথ আমল করার ওপর দুটি সুসংবাদ /৩৮৭
আমল বিনষ্ট করার ওপর দুটি আযাব /৩৮৮
নিজের ওপর পরিশ্রম করার প্রয়োজনীয়তা /৩৮৯
অন্যের ব্যাপারে সুধারণা, নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া /৩৯০
সৎ ও অসৎ ব্যক্তিদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য /৩৯১
দরজা খোলা আর বরকত খুলে দেওয়া /৩৯২
মুমিন ও ফাসেক উভয়ের ওপর পরীক্ষা /৩৯৩
ইবাদাতে অবহেলার ফল /৩৯৪
বিসমিল্লাহর বরকতে শয়তানি ক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ /৩৯৫
পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা /৩৯৫
বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করা /৩৯৫
বিসমিল্লাহ বলে টয়লেটে যাওয়া /৩৯৬
শরীর থেকে কাপড় খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলা /৩৯৬
বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করুন /৩৯৮
হাশরের দিন আমল কাজে আসবে /৩৯৮
ভালোভাবে উজু করা কাজে আসবে /৩৯৮
যিকির কাজে আসবে /৪০০
নামায কাজে আসবে /৪০০
রোযা কাজে আসবে /৪০০
হজ ও ওমরা কাজে আসবে /৪০১
আত্মীয়তা বজায় রাখা কাজে আসবে /৪০১
দান-সদকা কাজে আসবে /৪০১
আল্লাহর ভয় কাজে আসবে /৪০২
দরূদ শরীফ কাজে আসবে /৪০২
কালেমা কাজে আসবে /৪০২
উত্তম চরিত্র কাজে আসবে /৪০২
ঈমানে মুফাস্‌সাল একটি ওয়াদা, একটি অঙ্গীকার /৪০৩
আল্লাহর ওপর ঈমানের হাকীকত /৪০৩
প্রথম মু'জিযার উদ্দেশ্য /৪০৪
দ্বিতীয় মু'জিযার উদ্দেশ্য /৪০৫
রিযিক আল্লাহর হাতে /৪০৬

কামনা-বাসনা কেবল আল্লাহর কাছে /৪০৭
শিশুর দৃষ্টান্ত /৪০৭
চাওয়া অন্যের কাছে, অভিযোগ আল্লাহর কাছে! /৪০৮
ফেরেশ্‌তাদের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য /৪০৮
কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য /৪০৯
রাসূলগণের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য /৪০৯
কেয়ামত দিবসের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য /৪১০
তাকদিরের ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য /৪১১
মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য /৪১১
আজ ঈমান বানানো জরুরি /৪১২
ভূপৃষ্ঠে ঈমানদারদের হুকুম কার্যকর হয় /৪১২
অন্য উম্মতের ওপর উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব /৪১৪
নিজের ওপর মেহনত করা জরুরি /৪২০
তিনটি কথা লোহার বেড়া /৪২১
আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাসমূহের প্রতি বিশ্বাস /৪২২
নেওয়ার মানসিকতা /৪২২
দেওয়ার মানসিকতা /৪২৩
খাঁটি তাওবার কারিশ্‌মা /৪২৪
ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় /৪২৫
তাওবার সর্বব্যাপী দু'আ /৪২৭
চারটি পুরস্কার /৪২৮
মাস্টার পিস কীভাবে হয়? /৪৩০

দুনিয়ার স্বরূপ /৪৩২

পরকালীন সফরের মুসাফির /৪৩২
দুনিয়া পরীক্ষার হল /৪৩২
দুই প্রকার গুনাহ /৪৩৩
অহঙ্কার এটম গুনাহ /৪৩৩
নফসকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য /৪৩৩
দুনিয়ার জীবন একটা খেল-তামাশা /৪৩৩
দুনিয়াটা কী? /৪৩৩
দুনিয়া অন্বেষণকারীরা কুকুর /৪৩৬
কুকুরের সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার হেতু /৪৩৬
পরকাল ইহকালের ওপর অগ্রগণ্য /৪৩৭
দুনিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য /৪৩৮
লালসার বন্ধু /৪৩৮

দুনিয়ার স্বরূপ /৪৩৯
ফকিরির স্বাদ বাদশাহিতে নেই /৪৩৯
আল্লাহওয়ালাদের খাদেম /৪৩৯
আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব /৪৪০
উত্তম সবর ও উত্তম বর্জন /৪৪০
দুনিয়ার সাংঘর্ষিক দুই বস্তুর সমষ্টি /৪৪১
মৃত্যুর সময় সীমাহীন কঠিন সময় /৪৪১
হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি /৪৪২
মানুষের মধ্যে হক-বাতিলের গোপন যুদ্ধ /৪৪২
মাটির সাথে হৃদ্যতা /৪৪৩
ধনীদের ওপর গরিবদের শ্রেষ্ঠত্ব /৪৪৩
গরিবদের সাথে বন্ধুত্বের উপকারিতা /৪৪৪
শীতল শ্বাস শত বছর ইবাদাতের সমান /৪৪৫
এক গুনাহগার আর এক ইবাদাতগুজার ব্যক্তির পরিণতি /৪৪৫
গরীবের উহ্-আহ্কে ভয় করো /৪৪৬
বড় ও ভারী বোঝাওয়ালা মানুষ /৪৪৭
মালদার, নাকি মালের পাহারাদার /৪৪৮
সম্মানিত কে? /৪৪৮
আল্লাহ তা'আলা ইখলাস দেখেন /৪৪৮
ইখলাসের ঘাটতিতে প্রতিদানে ঘাটতি /৪৪৯
আমল ওজনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা /৪৪৯
এজতেমার মূল উদ্দেশ্য /৪৫১
এজতেমায় কীভাবে সময় কাটাবেন /৪৫২
নির্বাচিত লোকদের সমাবেশ /৪৫৩
নিজের সময়কে মূলবান বানান /৪৫৪
চিরশত্রু থেকে সাবধান! /৪৫৫

তাকওয়ার ফলাফল /৪৫৮
সন্দেহজনক বস্তু বর্জনের নির্দেশ /৪৫৮
বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালকের কঠোর নির্দেশ! /৪৫৮
আল্লাহর বন্ধুত্বের স্তর /৪৬০
তাকওয়া বড়দের দৃষ্টিতে /৪৬০
কুরআনের দৃষ্টিতে তাকওয়া /৪৬৩

তাকওয়ার উপকারিতা ও ফলাফল /৪৬৪
ভূমিষ্টের পূর্বে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ /৪৬৮
স্বপ্ন না শুনেই তাবির /৪৬৮
কুদৃষ্টির তাৎক্ষণিক জ্ঞান /৪৬৯
মুমিনের নিরীক্ষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মর্ম /৪৬৯
তোমাদের ঘরে সুদ কীভাবে! /৪৭০
চল্লিশ দিনে নেসবত (সম্পর্ক) স্থাপন /৪৭১
আঙুর থেকে মৃতের দুর্গন্ধ /৪৭১
এটি গায়েবের ইল্‌ম নয় /৪৭২
হিংসুকদের মোকাবেলায় খোদায়ি সাহায্য /৪৭২
প্রতিকূল অবস্থায় মুক্তির পথ /৪৭৫
নোটে ভরা সুটক্যাস /৪৭৭
ইঁদুরের মাধ্যমে রিযিকের ব্যবস্থা /৪৭৮
মাতাপিতার খেদমতের পুরস্কার /৪৭৯
আল্লাহর বাহিনীর প্রহরা /৪৮৫
রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শত্রুদের চক্রান্ত /৪৮৫
গুনাহ দুর্বলতার প্রধান ফটক /৪৮৮
চড়ুই দ্বারা বাজ দমন /৪৮৯
উপকরণবিহীন বিজয় ও সফলতা /৪৮৯
একটা সর্প প্রতিষেধকের আকারে /৪৯১
পরকালীন সফলতা /৪৯১
বরকত হারিয়ে যাওয়া /৪৯৩
ফিকহে হানাফীর কবুলিয়াত ও এর রহস্য /৪৯৪
বোখারি শরীফ সর্বতোভাবে কবুল হওয়ার রহস্য /৪৯৭
দাঁতভাঙা জবাব /৪৯৭
কুরআনের খেদমতের পুরস্কার /৪৯৮
প্রিয় হওয়ার মাধ্যম /৪৯৯
সর্বোত্তম ঘটনা ও তার রহস্য /৫০০
বর্তমানে উম্মত আশ্রয়হীন; কিন্তু ... /৫০৫
সতর্কতা অবলম্বন তো এটাও; কিন্তু /৫০৭
দুনিয়ার চেকপোস্টে লুকায়িত একটি শিক্ষা /৫০৮

খুতুবাতে যুলফিকার

ত্রয়োদশ খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

বেশি-বেশি যিকির করা

'ভালোভাবে বুঝে নাও, আল্লাহর অধিক যিকির থেকেই আমাদের উপকার হবে। যেসব বুযুর্গানে দীন কিছু পেয়েছেন, তাঁরা যিকিরই বেশি-বেশি করেছেন। আমাকে এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারবেন, যিনি মিনিটের হিসাবে যিকিরে অভ্যস্ত; আর তিনি বেলায়াতের দরজা লাভ করেছেন? এই অধমের জীবনের চল্লিশটি বছর তাসাওউফ ও সুলুকের লাইনে কেটেছে। আমার জীবনে এমন কাউকে আমি দেখিনি, যিনি পাঁচ-দশ মিনিট যিকির করেন; আর তিনি বেলায়াতের দরজা লাভ করেছেন। সঠিক ও বাস্তব কথা হলো, এর জন্য বহু ঘন্টা ব্যয় করতে হয়।'

বেশি-বেশি যিকির করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ. وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ

মুমিনের প্রতি বেশি-বেশি যিকিরের আদেশ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বেশি-বেশি যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো।'[১]

আল্লাহ তাঁর যিকির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে-সাথে বলেছেন, অধিক পরিমাণে যিকির করো। আল্লাহ কোথাও কোনো ইবাদাত অধিক পরিমাণে করার হুকুম দেননি। কিন্তু যেখানে যিকিরের আলোচনা এসেছে, সেখানে আধিক্যকরণের নির্দেশ করেছেন। লক্ষ করুন, যখন যিকিরের কথা বলেছেন, আধিক্যের কথা বলেছেন; কিন্তু যখন আমলের কথা বলেছেন, আমলের আধিক্যের কথা বলেননি; বরং আমল সুন্দরকরণের কথা বলেছেন।

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের কার আমল বেশি সুন্দর।'[২]

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

২. সূরা মুল্‌ক : আয়াত ২

এখানে اَكْثَرُ عَمَلاً (সর্বাধিক আমলকারী) বলেননি। اَحْسَنُ عَمَلاً (সর্বাপেক্ষা উত্তম আমলকারী) বলেছেন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমলের কোয়ালিটি তথা গুণগত মান চান যে, যে-আমলই কর পূর্ণ ইখলাসের সাথে করো। সঠিক পদ্ধতিতে আমল করো। তবে যিকিরের ক্ষেত্রে আধিক্যের কথা বলেছেন।

এমনিতে তো প্রতিটি কালেমাগো মানুষ যিকির করে। কালেমা তাইয়্যিবা পড়াও যিকির, নামায পড়াও যিকির, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করাও যিকির এবং যিকির করাও যিকির। এভাবে প্রতিটি কালেমাগো ব্যক্তিই যিকির করছে; কিন্তু অধিক পরিমাণে করছে না। এজন্য তার উপকার হচ্ছে না। তাই উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সাথে-সাথে নির্দেশনা দিয়ে দিলেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো। এর মধ্যে উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[৩]

সুতরাং লক্ষ করুন, যেখানেই যিকিরের হুকুম এসেছে, সেখানেই আধিক্যের হুকুমও এসেছে। একস্থানে বেশি-বেশি যিকিরকারী নারী-পুরুষের প্রশংসা করত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

'আর অধিক পরিমাণে যিকিরকারী পুরুষগণ এবং অধিক পরিমাণে যিকিরকারী মহিলারা; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'[৪]

এর দ্বারা প্রতীয়মাণ হয়, যিকিরের মধ্যে আধিক্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

যিকিরে আধিক্যের প্রভাব

যিকিরের সাথে আধিক্যের শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে যে, অনেক সময় বস্তুর পরিমাণ তার প্রভাবে ভূমিকা রাখে। উদাহরণত লবণ আমরা সকলেই

---

৩. সূরা জুমু'আ : আয়াত ১০

৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫

খাই। এতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। লবণ খুব বেশী চিকন করে নিলে ওষুধ হয়ে যায়। হোমিওপ্যাথিক একটি ওষুধ, যা সাধারণত সর্দি-কাশি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় শুধু লবণ দ্বারা তৈরি হয়। সর্দি-কাশি নেই এমন কেউ যদি এই ওষুধের এক ডোজ সেবন করে, তাহলে তার সর্দি-কাশি হয়ে যাবে। কেউ এর পরীক্ষা করতে চাইলে সেই ওষুধের কয়েক ডোজ সেবন করুন আর এক দিন পর নিজের অবস্থা দেখুন। কত বিস্ময়কর বিষয় যে, আমরা একই জিনিস চামচ ভরে-ভরে তারকারিতে দিয়ে থাকি; তাতে আমাদের কিছু হয় না আর এ বস্তুই পরিমাণে অনেক কম সেবন করলেও একজন ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা হয়ে যায়। এমনিভাবে একটি বস্তু পরিমাণে কম ব্যবহার করলে তা উপকারী হয় না। আবার সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করলে উপকারী হয়। যে ট্যাবলেট আমরা খাই, তন্মধ্যে কোনোটি ব্যথার, কোনোটি জ্বর ইত্যাদির ওষুধ। সকল ট্যাবলেট ওষুধি সামগ্রীর নির্দিষ্ট একটা পরিমাণের ওপর প্রস্তুতকৃত। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে আপনি সেবন না করলে আরোগ্য হয় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার তাকে নির্দিষ্ট করে একুশটি ট্যাবলেট দিলেন আর বললেন, এটি এন্টিবায়োটিক। সকাল, দুপুর, রাত প্রত্যহ তিনটি করে সাত দিন পর্যন্ত খাবেন। সাত দিনের কোর্স পূর্ণ করার পর আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। এখন ওষুধ খাওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে। তিনি যদি ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক ওষুধ সেবন করেন, তাহলে সুস্থ হয়ে যাবেন। আর যদি মনে করেন, আমার ছেলের ফার্মেসী আছে। কাজেই আমি তো সাতদিনের স্থলে বেশি দিনও ওষুধ খেতে পারি। কিন্তু আমি প্রত্যহ একটা করে ট্যাবলেট খাব। বাস্তবেও যদি তিনি প্রতিদিন একটা করে ট্যাবলেট খান আর এভাবে পঞ্চাশটা ট্যাবলেটও খেয়ে ফেলেন, তাহলে তার জ্বর উপশম হবে না। এবার তিনি যদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেন, আমি পঞ্চাশটি ট্যাবলেট খেলাম, তবুও আমার জ্বর উপশম হলো না, তাহলে ডাক্তার বলবেন, জনাব! আপনি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী কাজ না করে আমার নির্দেশনা অনুযায়ী ট্যাবলেট খেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যেতেন।

এখন চিন্তা করুন! তিনি ট্যাবলেট সঠিকই খেলেন, এর তৈরিও সঠিকই ছিল; কিন্তু পরিমাণ পূর্ণ না করার কারণে তার উপকার হয়নি। এতে বোঝা যায়, বস্তুর ক্রিয়ায় তার পরিমাণের ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ যে হুকুম করেছেন, 'আল্লাহর যিকির করো', এখানে সাথে এর পরিমাণও বলে দিয়েছেন। বলেছেন ذِكْرًا كَثِيرًا তথা অধিক পরিমাণে যিকির করো।

এর উদ্দেশ্য হলো, যে অধিক পরিমাণে যিকির করবে না, সে উপকৃত হবে না। এজন্যই উদাসীন ও দুনিয়াদার লোকদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ঘোষণা করছে–

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

'এবং তারা খুব কমই যিকির করে।'[৫]

তারা যিকির তো করে, কিন্তু পরিমাণে কম করে। আর অল্প যিকিরকারী লোকেরা জানোয়ারের মতো নিজেদের মনোবাসনা পূরণে ছুটে বেড়ায়। অল্প যিকিরকারী লোকেরা নফসের গোলামিতে লিপ্ত থাকে। অল্প যিকিরকারী লোকজন

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ

'দোদুল্যমান অবস্থায় মাঝখানে ঝুলন্ত থাকে; এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।'[৬]

অল্প যিকিরের মাধ্যমে মানুষে ভেতরে সেই গুণাগুণ সৃষ্টি হয় না, যা অধিক পরিমাণে যিকির করার মাধ্যমে হয়। অনেক সময় সালেক নিজেও (তরীকতের জগতে প্রথম স্তরের ব্যক্তি) নিজের সংশোধনে একনিষ্ঠ হয় এবং শাইখও তার অবস্থা অনুযায়ী সঠিক পন্থা নির্বাচন করেন। তথাপি তার উপকার হয় না। কেননা, সে যিকির কম করে। স্বল্প যিকিরকারীগণ মন্দ ধারণার শিকার হয়ে যায়। কখনও তো সে নিজ শাইখের ব্যাপারেও মন্দ ধারণা পোষণকারী হয়ে যায়। সে বায়েজিদ বোস্তামি আর জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর তালাশে বেশী লেগে থাকে। আপনি একাগ্রতার সাথে আমলের পাবন্দি করে যান এবং সম্পর্ক বজায় রাখুন; আল্লাহ তা'আলা কাউকে না কাউকে আপনার ক্ষেত্রে বায়েজিদ বোস্তামি আর জুনায়েদ বাগদাদি বানিয়ে দেবেন। কেননা, এই নেসবত কেয়ামত পর্যন্ত চলমান।

যেসব লোক অধিক পরিমাণে যিকির করে না, তারা উপকৃত হয় না। এমন অনেক বন্ধু আছেন, যারা বেশি-বেশি যিকির করেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি রহমতের এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, বহু বছরের জন্য তাদের কাজ হয়ে যায়। কিছুসংখ্যক তো এরূপ যে, তারা যিকির করে না, আবার বলে উন্নতি হচ্ছে না। এটা তো এমন, যেমন এক ব্যক্তি ওষুধ খায় না; আবার বলে সুস্থ হচ্ছে না। এতে ডাক্তারের তো কোনো ত্রুটি নেই।

---

৫. সূরা নিসা : আয়াত ১৪২
৬. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৩

বর্তমানে তো এমন যুগ এসে গেছে, ডাক্তারের ভুলচুক ধরা হয়; বলা হয় ডাক্তার সঠিক নয়। অথচ বাস্তবতা হলো, ডাক্তার তো ওষুধ বলে দিলেন, অর্থাৎ– সবক শিখিয়ে দিয়েছেন। তারপর যদি আপনি সেই সবক মেনে চলেন এবং নিজ অবস্থা ব্যক্ত করে তাঁর কাছে এখন করণীয় জিজ্ঞেস করেন আর তিনি কিছু না করেন, তাহলে তিনি অবহেলাকারী। ডাক্তার আপনাকে পূর্ণ পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। এবার করা না করা আপনার ইচ্ছা। কাউকে যদি ডাক্তার বলেন, আপনি এই ওষুধ সেবন করুন, আপনার জ্বর উপশম হয়ে যাবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি ওষুধ পকেটে রেখে দেন আর কিছুদিন পর বলেন, ডাক্তার সাহেব! আমার তো কোনো উপকার হয়নি? ডাক্তার জিজ্ঞেস করবেন, আপনি ওষুধ খেয়েছিলেন কি? জবাবে তিনি বলবেন, জি, সেই ওষুধ আমি পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। তখন ডাক্তার বলবেন, ওহে জ্ঞানান্ধ! ওষুধ পেটে ঢুকানোর কথা ছিল। পকেটে ঢোকালে উপকার হওয়ার তো কথা ছিল না। বরঞ্চ পেটে ঢোকালে উপকার হওয়ার ছিল। ঠিক তদ্রূপ আমরা মামুলাত ইত্যাদি পূর্ণ করি না আবার শাইখের শানে অভিযোগ করে ফিরি।

মুরাকাবা এন্টিবায়োটিকের মতো

অনেক দোস্তকে শয়তান এই পয়েন্টে আটকে দেয় যে, তাকে মুরাকাবা ত্যাগ করিয়ে ছাড়ে। তেলাওয়াতও নিয়মিত করে, নামাযও যথাযথভাবে আদায় করে, দরূদ শরীফও পড়ে, এস্তেগফারও পড়ে; কিন্তু বলে মুরাকাবা হয় না। এই মামুলাত তথা আমলগুলোর দৃষ্টান্ত এমন যেমন ডাক্তার এন্টিবায়োটিকও দিলেন আবার সাথে ব্যথানাশক এবং ভিটামিন ট্যাবলেটও দিলেন। এর মধ্যে মুরাকাবা এন্টিবায়োটিকের এত, যা গুনাহের জ্বর উপশমের মূল ওষুধ। যেমনিভাবে জ্বরাক্রান্ত রোগী নিজের ওষুধ থেকে এন্টিবায়োটিক ছেড়ে দিয়ে বাকি ওষুধ পুরোপুরি সেবন করলেও সুস্থ হবে না; ঠিক তেমনিভাবে মুরাকাবা বর্জন করে বাকি মামুলাত পরিপূর্ণরূপে আদায় করলেও পরিপূর্ণ আত্মিক সুস্থতা অর্জিত হবে না। এজন্য আপনি দেখবেন, বেশিরভাগ সালেকীনের পক্ষ থেকে একই অভিযোগ পাওয়া যাবে যে, আমার উন্নতি হচ্ছে না। আবার যখন তাদের কাছে বিস্তারিত জানতে চাবেন, তখন উত্তরও একই হবে যে, হ্যাঁ, মুরাকাবা হয় না। কতক লোক এমন আছে, যারা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে পরনিন্দা আর দুনিয়াবি আলোচনা করে যাচ্ছে। এই দুই ঘন্টা বসে কি মুরাকাবা করা যায় না? স্মরণ রাখবেন, যে সালেক (তরীকতের লাইনে প্রথম স্তরের ব্যক্তি) মুরাকাবা করে না, আবার উন্নতি না হওয়ার

অভিযোগ করে, এর মধ্যে তার নিজেরই ত্রুটি রয়েছে। অবশ্য কেউ-কেউ তো এক-দুই ঘন্টা মুরাকাবা করে। তারপরও বলে, তার উন্নতি হচ্ছে না। তাদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে, মুরাকাবার ক্রিয়া তাদের অন্তরে কেন শিকড় ধরছে না? তারপর পরবর্তী ধাপ আসবে।

যিকির দ্বারা সত্তার মহব্বত বৃদ্ধি পায়

একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন, যিকির তথা আলোচনা দ্বারা সত্তার মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আপনি কোথাও আনারস ফল অথবা কাশ্মিরি চায়ের কিছু আলোচনা শুনুন, তাহলে আপনার অন্তরে এসব বস্তু লাভ করার কামনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। একবার আমি এক বালকের সামনে জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহের আলোচনা করলে তৎক্ষণাৎ সে বলতে লাগল, আমি এখনই জান্নাতে যেতে প্রস্তুত। শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য দেখুন, শরীয়ত মহিলাকে নিজ স্বামীর সামনে অন্য কোনো মহিলার রূপ-লাবণ্য নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করেছে। এর কারণ হলো, যদি আলোচনা করে, তাহলে সেই পরনারীর মহব্বত তার স্বামীর অন্তরে সৃষ্টি হবে। তাছাড়া মহিলা নিজেও গুনাহগার হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর যিকির দ্বারা আল্লাহর সত্তার মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেই যিকির মুরাকাবার পদ্ধতিতে হোক, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জবানি যিকিরের মাধ্যমে হোক কিংবা আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে হোক। যিকিরকারী জীবিতের মতো আর গাফেল মৃতের মতো। মৃতের মতো হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, সে সতর্কবাণী ও সুসংবাদ তো শুনবে; কিন্তু তার ওপর এর কোনো ক্রিয়া হবে না।

অন্তরের মুঠোফোন

আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিমাণে যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা কি অধিক পরিমাণে যিকির করছি? অধিক শব্দটি অর্ধাংশের চেয়ে বেশির জন্য ব্যবহৃত হয়। কম শব্দটি অর্ধাংশের চেয়ে কমের জন্য ব্যবহার হয়। আমরা কি পঞ্চাশ শতাংশের বেশি সময় আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যয় করি? যদি না করি, তাহলে আমরা অধিক যিকির করছি না। আমাদের জন্য নিজেদের রোগের চিকিৎসা বোঝা খুবই সহজ; কঠিন নয়। সাহসিকতার সাথে কাজ করে এবং মুরাকাবার পাবন্দি করে দেখুন। তারপর এর বরকত নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। যেব্যক্তি মুরাকাবা করে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন মুঠোফোন তথা মোবাইলে কথা বলা হয়; কিন্তু ব্যাটারি চার্জ

করা হয় না। এর ফল এই দাঁড়ায় যায় যে, ব্যাটারি এক-দুই দিন চলে। তৃতীয় দিন কথা চলাবস্থায় মাঝখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনার কথোপকথন চলছিল; হঠাৎ তা বন্ধু হয়ে গেল কেন? তখন সে জবাবে বলে, ব্যাটারি কাজ করছে না। অপরজন জিজ্ঞেস করে, ব্যাটারি কেন কাজ করছে না? সে বলে, আমি সেটা চার্জ করিনি। এতে ত্রুটি নিজের। ব্যাটারি প্রতিদিন চার্জ করতে হয়। মুঠোফোন ব্যবহারকারীগণ এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। তারা দিনে ফোনে কথা বলে, রাতে চার্জ করে। অন্তরের মুঠোফোনেরও একই অবস্থা। দিনে একে কাজে লাগাও; আর রাতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চার্জ করো। দুনিয়ার মুঠোফোন বিদ্যুতের সাহায্যে চার্জ হয়। আর অন্তরের মুঠোফোন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নূর, বরকত, রহমত ও সকিনার সাহায্যে চার্জ হয়। মুঠোফোনের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে যেমনিভাবে একপ্রকার ঘন্টা বাজে, তেমনিভাবে যখন অন্তরের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়, তখন কলবি যিকিরের ঘন্টাও ঠকঠক বাজতে থাকে। তারপর অনুগ্রহের আল্লাহ আল্লাহ ঘন্টা বাজতে থাকে। এছাড়া অন্য কিছুই শোনা যায় না।

এ বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝে নিন যে, অধিক যিকির দ্বারাই আমাদের উপকার হবে। যেসমস্ত বুযুর্গানে দীন কিছু পেয়েছেন, তাঁরা সকলেই অধিক পরিমাণে যিকির করেছেন। আপনারা আমাকে এমন একজন লোকও কি দেখাতে পারবেন, যিনি মিনিট হিসেব করে যিকির করতে অভ্যস্ত আর তিনি বেলায়াতের দরজা লাভ করেছেন? এই অধমের জীবনের চল্লিশ বছর তাসাওউফ ও সুলূকের লাইনে ব্যয় হয়েছে। আমি আমার জীবনে এমন কাউকে দেখিনি, যিনি পাচঁ-দশ মিনিট যিকির করেন আবার বেলায়াতের দরজাও লাভ করে ফেলেছেন। বাস্তব ও সঠিক কথা হলো, এর জন্য ঘন্টার-পর-ঘন্টা ব্যয় করতে হয়। তারপর লক্ষ্য অর্জিত হয়।

লম্বা মুরাকাবা

আমাদের শাইখ সকাল-সন্ধ্যা দীর্ঘ মুরাকাবা করতেন। হযরত সাইয়্যিদ শাহ যাওয়ার হুসাইন একবার বলেন, একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন হযরত হুসাইন আলী (রহ.)। তিনি একজন বড় মুফাস্সিরে কুরআন ছিলেন। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম তাঁর ফয়েজ লাভ করেছেন। বলেন, লোকজন যখন তাঁর খানকায় যেত, তখন ঈশার নামাযের পর তিনি মুরাকাবা করাতেন। সেই মুরাকাবার সমাপ্তিতে দু'আও হতো না। এর অর্থ হলো,

সেখানে নিয়মই ছিল ঈশার পর হযরতের সাথে মুরকাবায় মাথা নত করা। সালেকদের জন্য পূর্ণ অনুমতি ছিল, যে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, সে চলে যাবে; যার নিদ্রা আসবে, সেও চলে যাবে। এভাবে একজন চলে যেত, দুজন চলে যেত, তিনজন চলে যেত। এমনকি হযরত (রহ.) যখন মুরাকাবা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তিনি দেখতেন, সকলেই চলে গেছে। হযরত মুরাকাবা থেকে উঠতেন এবং তাহাজ্জুদের নিয়তে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবেই পূর্ণ রাত আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর খলীফাগণও অধিক পরিমাণে যিকির করতেন। সাইয়্যিদ যাওয়ার হুসাইন (রহ.) এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, আমরা তাঁর একজন খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। সাথে হযরত শাহ (রহ.) এবং হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ গোহানুভী (রহ.)ও ছিলেন। বড়দের সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই।

তিনি বলেন, আমার ডিউটিতেও যাওয়ার জরুরত ছিল। আমরা যখন ফজরের পর গেলাম, তখন আমাদের হাতে তিন ঘন্টা সময় ছিল। আমরা ভাবলাম, তিনি যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে আমাদের পৌঁছতে লাগবে পাঁচ মিনিট আবার সেখান থেকে ফিরতে লাগবে পাঁচ মিনিট। মাঝখানে এক ঘন্টার মতো সেথায় অবস্থান করব। এর মধ্যে তাঁর সাথে আমাদের বৈঠক হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন হযরত বললেন, আসুন, আমরা মুরাকাবা করি। আমরা দুজন ছিলাম। সাথে আরও একজন মুরাকাবাকারী ছিলেন। সমাবেশ থেকে উঠে চলে যাওয়া সহজ; কিন্তু যখন আমরা শুধু দুই শাগরেদ বসা, তখন উঠে চলে যাওয়া কঠিন। আমরা তো ছিলামও প্রাইভেট কক্ষে; সুতরাং যাওয়া কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা মাথা অবনত করার পর কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হলাম। আমাদের গর্দান দুর্বল হয়ে গেল। কিন্তু হযরতের কিছুই হচ্ছিল না। আমাদের অনুভূত হচ্ছিল, এখনই গরদান ভেঙে পড়বে। কখনও এপাশ, কখনও ওপাশ করে-করে আমরা নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। অপরদিকে তিনি মুরাকাবায় আরামের সাথে বসে আছেন।

এভাবে যখন আড়াই ঘন্টা অতিবাহিত হয়, তখন আমরা সময় দেখি। এবার পেরেশান হয়ে গেলাম, আমাকে তো ডিউটিতে যেতে হবে। আমাদের মন বলছিল উঠে চলে যেতে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, এটা আদবের পরিপন্থী। আমরা বসা তো ছিলাম; কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে যুদ্ধ চলছিল। যখন পোনে তিন ঘন্টা পূর্ণ হলো, তখন হযরত দু'আ করলেন। কাশফের

সাহায্যে তিনি অবস্থা জেনে ফেলেছেন। তাই দু'আর পর বললেন, যখন আসবেন মুরাকাবার জন্য সময় নিয়েই আসবেন। আল্লাহু আকবার! উত্তরে হযরতই বলে দিলেন, খুব ভালো! আমরা ভবিষ্যতে যখন আসব, তখন সময় নিয়ে আসব।

হযরত মাওলানা সাঈদ গোহানুভী (রহ.) হযরতের কাছে আরজ করলেন, আমাদের ইচ্ছে হলো, আপনি আমাদের মেধার প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করুন। তিনি পাঞ্জাবি ভাষা বলতেন। তাই তিনি পাঞ্জাবিতে বললেন,

تازہ دہن تازہ رہسن

অর্থাৎ– তোমাদের মেধা তাজা আছে এবং তাজাই থাকবে।

আল্লাহু আকবার, যিনি অধিক পরিমাণে যিকির করেন, তিনি এ-ও বলতে পারেন যে, মেধা তাজা এবং তাজাই থাকবে।

অন্তরের জন্য বেকিং টাইম (পরিপক্ব হওয়ার সময়)

যেসব লোক ভালো মিষ্টি, বিস্কিট ইত্যাদি তৈরি করে, তারা প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে বেকিং টাইম তথা পরিপক্ব হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়। আপনি পাশ করায় বন্ধুদের দাওয়াত খাওয়াতে যখন তাদের কাছে কেক-এর অর্ডার দেবেন, তখন তারা আপনার কাছে সাইজ জিজ্ঞেস করবে। তারপর কেক তৈরি করে চুলার ভেতরে রেখে দেবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেখানে রাখবে। যদি কেকটি নির্দিষ্ট পূর্ণ সময় সেখানে রাখা হয়, তাহলে খুব ভালোভাবে পরিপক্ব হয়। এর কম সময়েও পরিপক্ব হয় না, আবার বেশি সময়েও না। এরচেয়ে কম সময়ে সেখান থেকে তুলে ফেললে কেক অপরিপক্ব থাকবে; আবার নির্দিষ্ট সময়ের বেশি রাখলে পুড়ে যাবে। সুতরাং প্রতিটি বস্তু পরিপক্ব হওয়ার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমরা মুরাকাবা করে নিজেদের অন্তরের কেককে পরিপক্ব হওয়ার সময় দেই না। আমরা অন্তরকে মুরাকাবার চুলায় সোপর্দ করি বটে; কিন্তু মিনিটদুয়েক পরেই বের করে ফেলি। অথচ ঘন্টার পর ঘন্টা হিসেবে পরিপক্ব হওয়ার সময় প্রয়োজন।

মনোপ্রবৃত্তির স্ট্রেচ তথা আকর্ষণ কিভাবে দূর হবে

লোহার মেশিনারি তৈর করার সময় এর ভেতরে স্ট্রেচ তথা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ এর ভেতরে যেসব যন্ত্রাংশ থাকে, সেগুলোতে আকর্ষণ সৃষ্টি

হয়। মেশিনারি প্রস্তুতের জন্য এই আকর্ষণ দূর করা জরুরি। এ লক্ষ্যে তিন থেকে আট ঘন্টা একে বিশেষ তাপমাত্রায় রাখতে হয়। জেনারেটরের মতো নাজুক যন্ত্রও এভাবেই তৈরি হয়। প্রথমে সাধারণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়। তারপর বিশেষ তাপমাত্রায় রেখে তার আকর্ষণ দূর করা হয়। অতএব, যেখানে এই মেশিন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আট ঘন্টা রাখলে ঠিক হবে, সেখানে যদি আমরা আট মিনিট রেখে বের করে আনি, তারপর সন্ধায় আবার আট মিনিট রেখে বের করে ফেলি, প্রতিদিনই এরূপ করতে থাকি, তাহলে এক বছর পর্যন্ত এমন করলেও এর আকর্ষণ দূর হবে না। আপনি যদি বলেন, আমি তো আট আট মিনিট করে আট ঘন্টা রেখেছি, তাহলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলবেন, এই আকর্ষণ দূর করার একটা নিদিষ্ট সময় আছে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাপমাত্রা থেকে বের করে ফেললে এর আকর্ষণ কখনওই দূর হবে না।

এমনিভাবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে মনোপ্রবৃত্তির আকর্ষণ রয়েছে। এই আকর্ষণ দূর করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা মুরাকাবা করতে হয়। তারপর সেটা দূর হয়। যেহেতু আমাদের অবস্থা হলো, আমরা মুরাকাবাই করি না, সুতরাং আমরা চাই, পীর সাহেবের খানকায় আল্লাহর রঙয়ের একটি জলাধার থাকা উচিত। আমরা যাব আর পীর সাহেব আমাদের সেই জলাধারে চুবিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। কেননা, আমাদেরকে দ্রুত বাসায় ফিরতে হয়।

বে-তলবির সীমানা

বর্তমানের সালেকগণ এসেই কয়েকটি কথা বলে থাকে–

১. প্রথম কথা এই বলে যে, হযরত! আমি বড়-বড় মাশায়েখ দেখেছি। তবুও আপনার হাতে বাই'আত হলাম। এর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, আপনার প্রতি আমার ইহসান যে, এত শাইখ দেখা সত্ত্বেও আমি আপনার হাতে বাই'আত হয়েছি।

২. দ্বিতীয় কথা এই বলে যে, হযরত! মুরকাবার জন্য তো সময় নেই; আপনিই কিছু তাওয়াজ্জুহ করে দিন। তাছাড়া আমাকে দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে।

৩. তৃতীয় কথা এই বলে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না। কাজেই পড়ার জন্য কিছু বলে দিন। আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে।

৪. চতুর্থ কথা এই বলে যে, হযরত! সন্তানরাও আজকাল কিছুটা অবাধ্য প্রকৃতির। পড়াশোনায় মনোযোগী হচ্ছে না। না মেয়েরা পড়ছে, না ছেলেরা পড়ছে। অনেক বোঝাচ্ছি, কিন্তু তারা বুঝতেই চায় না। তাদের জন্যও কিছু বলে দিন। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে।

৫. পঞ্চম কথা এই বলে যে, হযরত! আমি নিজের পক্ষ থেকে তো আপ্রাণ চেষ্টা করি যেন বাসার পরিবেশ ভালো থাকে। কিন্তু আমার স্ত্রী কথা শোনে না। সব সময় চেঁচামেচি, রাগারাগি করে। তার রাগ খুব বেশি। হযরত! তার জন্যও এমন কিছু পড়তে দিন, যাতে সে আমার মুরীদ বনে যায়। অন্তরে সেই একই বিষয় কাজ করে যে, হযরত! ওর জন্যও কিছু বলে দিন। আমাকে দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে।

এবার আপনি বলুন, যেলোক এসে এসব কথা বলে, সে আত্মশুদ্ধির জন্য কী কষ্টটা করল? ভাই! আত্মশুদ্ধি পৃথক একটি কাজ, যার জন্য সময় বের করা জরুরি। দিনের বেশিরভাগ সময় অফিসে ব্যয় করবেন, বাকি সময় স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে কাটাবেন, মুরকাবা করবেন না; তারপরও পীর সাহেবের প্রতি অভিযোগ করবেন, পীর সাহেব আমাদের সময় দেন না; এটা কোথাকার বুদ্ধিমত্তা! ওহে আল্লাহর বান্দারা! পীর সাহেব তো প্রতিদিন তাহাজ্জুদে এবং অন্যান্য নিভৃত সময়ে যখন বসেন, তখন সমগ্র দুনিয়ার সালেকদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিয়ে থাকেন। ফয়েজ তো বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে থাকে। এটা কী করে সম্ভব যে, অন্যান্য গাছ বৃষ্টির পানি পান করে নিল আর আপনার পান করার সুযোগ হলো না?

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں

ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

ইশকের চোট তো পড়ে সকলের ওপরই সমান

পাত্রের পার্থক্যে আওয়াজ হয়ে যায় পরিবর্তন।

ফয়েজ স্থানান্তরের তিনটি শর্ত

একটি বিষয় মনে রাখবেন। ট্র্যান্সমিটার একটি প্রেরণযন্ত্র। এর সাহায্যে আবদুল বাসিত সাহেবের কণ্ঠে তেলাওয়াত অথবা খবর ইত্যাদি সঞ্চারিত হয়ে থাকে আর আমরা তা বেতারযন্ত্রের সাহায্যে শুনে থাকি। বিবিসির সংবাদের উদাহরণই ধরুন। বিবিসি থেকে সংবাদ শুনতে হলে তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরি।

১. প্রথমত সেখান থেকে সংবাদ প্রচার হতে হবে। তাহলেই না শোনা যেতে পারে। যদি বিবিসির সংবাদের সময় না হয় আর কেউ রেডিওতে সংবাদ চালু করতে চেষ্টা করে, তাহলে কেবল শো-শো শোনা যাবে। এখন যদি কেউ আমাকে বলেন, বিবিসি সংবাদ চালু করুন; আমার তো কোনো ধারনাই নেই কিভাবে এবং কোথায় সংবাদ চলে। আমি তো এরূপই একজন ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার; আমার টেপরেকর্ডার চালানোরও কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহর শান দেখুন, অথচ যারা এসব শোনে, তারা এ-ব্যাপারে খুবই পারদর্শী। তারা সুইচ চালু করে একটু ঘুরিয়ে দেয়, আওয়াজ আসতে থাকে যে, আপনারা বিবিসি লন্ডন শুনতে পাচ্ছেন। আবার বিবিসির স্টেশন থেকে যদি শো-শো আওয়াজ শোনা যায়, তাহলে তারা বলে দেবে, এখনও সংবাদের সময় হয়নি। অর্থাৎ– এখন সেখান থেকে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে না।

২. দ্বিতীয় শর্ত হলো, রেডিওর সুইচও চালু করতে হবে এবং মেডিয়ামওয়েওর এন্টিনাও সেটিং করতে হবে। যদি রেডিও ঠিক থাকে, কিন্তু চালুই না করা যায়; এর সুইচ বা বাটন ভেতরে ঢুকে পড়ে, তাহলেও সংবাদ শোনা যাবে না। সুতরাং সুইচও চালু করা জরুরি এবং এন্টিনা সেটিং করাও জরুরি।

৩. তৃতীয় শর্ত হলো, আবহাওয়াও ভালো হতে হবে। আবহাওয়া যখন খারাপ থাকে, ওদিক থেকে সংবাদ আসে, এদিককার লোকজন শুনতে প্রস্তুতি নিয়ে বসেও থাকে; কিন্তু মধ্যবর্তী আবহাওয়ার গোলযোগের কারণে বাধার সৃষ্টি হয়। কোনো দেশের সরকার যখন চায়, আমাদের দেশের লোকজন এই সংবাদ শুনতে না পাক, তখন তারা মাঝখানে তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ বাধাগ্রস্ত করে। আমার স্মরণ আছে, যখন খতমে নবুওয়তের আন্দোলন চলছিল, তখনকার কথা। সেই দিনগুলোতে সব শহরে কারফিউ এবং বিশৃঙ্খলা ছিল। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আমিও বিবিসির সংবাদ শুনতাম। কেননা, স্থানীয় সংবাদে তো বলা হতো, এসব কিছুই নয়, সামান্য কিছু বিশৃঙ্খলা। যখন বিবিসি রিপোর্ট করত, তখন আঁচ করা যেত, দেশে কী হয়েছে। পাকিস্তান রেডিও স্টেশনে তখন কর্মরত ছিলেন এমন একজন ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, আমাদেরকে সরকার নির্দেশ দিল, তোমরা এ-সময় এখান থেকে এমন তরঙ্গ পাঠাবে, যাতে লোকজন সংবাদ শুনতে না পায়। সুতরাং বিবিসি সেখান থেকে সংবাদ সঞ্চার করতে শুরু করত আর এদিকে এখান থেকে কিছু তরঙ্গ পাঠানো হতো। ফলে এখানকার লোকজন বিবিসির সংবাদ শুনতেই পেত না।

যিকিরের ক্ষেত্রেও হুবহু এই উপমা প্রযোজ্য। এর জন্যও তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. প্রথম শর্ত হলো, শাইখ তাওয়াজ্জুহ দেবেন। মনে রাখবেন, শাইখের তাওয়াজ্জুহ সব সময় হয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন মুরাকাবা করানো হয়। আর এ-সময় শুধু সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের ওপরই তাওয়াজ্জুহ করা হয় না; বরং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মুতা'আল্লিকীনের সব কলবকে এক কলব মনে করা হয়। তারপর এই কলবে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এই তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে যে যেখানেই থাকে, সেখানেই তাকে এর ফয়েজ পৌঁছে দেন। সুতরাং কোনো সালেক এটা কিভাবে বলতে পারে যে, আমি তো তাওয়াজ্জুহ পাচ্ছি না? শাইখ যখন দিনে দশবার মুরাকাবা করান, তিনি নিজেও করেন এবং তাওয়াজ্জুহ দেন, তার অর্থ হলো, তাঁর পক্ষ থেকে ট্র্যান্সমিশন তথা প্রেরণ হচ্ছে।

২. দ্বিতীয় শর্ত হলো সালেক মুরাকাবায় বসে রিসিভার তথা অন্তরের বাটন বা সুইচ চালু করবে। মুরাকাবায় যখন বসে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সে এই সুইচ চালু করে। মুরাকাবায় বসার পর তার জন্য এটাও জরুরি যে, তাওয়াজ্জুহের কাঁটাকে অন্তরে জমিয়ে রাখবে। এরূপ যেন না হয় যে, মুরাকাবায় বসেছে তো এদিক-সেদিক অর্থহীন ধ্যান-ধারণা শুরু হয়ে গেছে। এর অর্থ হবে, রেডিও তো চালু করেছে, কিন্তু একাগ্রতার এন্টিনা সেটিং করেনি। অথচ মুরাকাবায় বসাও জরুরি এবং একাগ্রতার এন্টিনা সেটিং করাও জরুরি।

৩. তৃতীয় শর্ত হলো শয়তান মধ্যবর্তী সরকার। সে কুমন্ত্রণার তরঙ্গ ছেড়ে ফয়েজ রুখে দেয়; কলবে পৌঁছতে দেয় না। এ কারণেই আমরা যখন মাথা অবনত করি, তখন নফসানি ও শয়তানি চিন্তাভাবনা অন্তরে উদয় হতে শুরু করে। অথচ সাধারণ অবস্থায় বসলে এসব চিন্তাভাবনার উদয় হয় না। কিন্তু সামান্য সময় চোখ বন্ধু করলে এবং একাগ্রতায় মগ্ন হলে তৎক্ষণাৎ কোনো-না-কোনো শয়তানি ধ্যান-খেয়াল মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে শুরু করে। এর কারণ এই যে, মাঝখানে শয়তান চায় না, মানুষ ফয়েজ লাভ করুক। শয়তানের পিছু নেওয়া বন্ধ করার পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং তাঁরই সামনে আহাজারি করতে হবে যে, হে মালিক! আমি আপনার সামনে উপবিষ্ট। কিন্তু আমি তাওয়াজ্জুহ পাচ্ছি না। আয় আল্লাহ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন!

کریم مجھ پر رحم کر بڑے عذاب میں ہوں

کہ بیٹھا ہوں تیرے سامنے مگر حجاب میں ہوں

পরম করুণাময় করুণা করুন আমার প্রতি বড় বিপদে আছি

বসে আপনার সামনে কিন্তু পর্দায় আবৃত আছি।

যখন আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এভাবে সাহায্য প্রার্থনা করবেন, তখন দেখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা মধ্যবর্তী সেই বদমাশটাকে কিভাবে সোজা করেন।

মনে রাখবেন, মুরাকাবা ও এর ফয়েজ একটা জোড়া বস্তু। এটি কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কোটি মানুষ এ পদ্ধতিতে ফয়েজ লাভ করেছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে লাখো মাশায়েখ তাদের ফয়েজ পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং মুরাকাবা করা সীমাহীন জরুরি। যদি মুরকাবা করার মাধ্যমেও উপকার না হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হলো, শয়তান মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। এরূপ করবেন না যে, সংযোগ স্থাপন না হওয়ার কারণে রেডিওই ভেঙে ফেলবেন এবং মুরাকাবা-ই ছেড়ে দেবেন। কিছু লোক চিন্তা করে, ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেছি। এতদিন হয়ে গেল; তারপরও আমার কোনো উপকারই হচ্ছে না। কাজেই এখন আমি সম্পর্কই ছিন্ন করছি। শয়তান তো এটাই চায়, যাঁর সাথে তার ইসলাহী মহব্বতের সম্পর্ক আছে একবার সেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তারপর সম্পর্ক আর কারও সাথে হতে দেবে না। এটাও মনে রাখবেন যে, একজন লোকের তবিয়ত সকলের সাথে মিলে না। তাই এই সম্পর্ক দৃঢ় থেকে আরও দৃঢ় করার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যহ যিকিরও করবেন, আল্লাহর কাছে সাহায্যও প্রার্থনা করবেন। যদি এসব বিষয় খেয়াল রাখেন, তাহলে অবশ্যই আপনি ফয়েজ প্রাপ্ত হবেন। ফয়েজ না পাওয়ার কোনো কারণই নেই।

আধ্যাত্মিক জগতে বাহ্যিক দূরত্বের গুরুত্ব

রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতার এ ধারা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বিশ্বে জারি রাখবেন। যদি কোনো ব্যক্তি শাইখের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আর পরবর্তী কালে বাহ্যত দূরে অবস্থানের কারণে শাইখের সাথে ঘন-ঘন সাক্ষাৎ করতে না পারে, তাহলে কি সে সেখানে বসে থাকার কারণে আধ্যাত্মিকতার ফয়েজ থেকে বঞ্চিত থাকবে? এখানে বিদ্যুতের সুইচ টিপলে পৃথিবীর অপর

প্রান্তে এক সেকেন্ডের আগে বাল্ব আলোকিত হয়ে যাবে। যেখানে বিদ্যুত এত দ্রুত গতিতে চলে দূরের বাল্ব আলোকিত করতে পারে, সেখানে এটা তো আল্লাহর নূর; বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে। অতএব, স্মৃতিতে বদ্ধমূল করে নিন যে, একদিকে সালেক নিজ মুরাকাবায় একাগ্রতার এন্টিনা সেট করছে, অপরদিকে শাইখ তার প্রতি তাওয়াজ্জুহের তরঙ্গ ছাড়ছেন। সুতরাং শাইখ তাওয়াজ্জুহের নিয়ত করছেন আর সাথে-সাথে সালেকের অন্তর পর্যন্ত তা পৌঁছে যাচ্ছে। এই বস্তুগত দূরত্ব আধ্যাত্মিক জগতে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এজন্যই কোনো সালেক পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে অবস্থান করলে সে ফয়েজ পেয়ে যায়।

যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি শাইখের সাথে উঠাবসার সুযোগ পাই না, তাহলে তো মহিলারা কখনওই উন্নতি করতে সক্ষম হতো না। কেননা, শাইখের সাথে উঠাবসার সুযোগ তো শুধু পুরুষদের হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিকতার জগতে মহিলারা কখনও আল্লাহর ওলি হতে পারবেন না। অথচ মহিলাও ওলি হচ্ছে। এবার প্রশ্ন জাগে, তারা না পীরের সামনে বসে, না পীরের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নিজ-নিজ বাসাবাড়িতে জীবন যাপন করে, নিজ দেশে বসবাস করে, তারপরও তারা বাই'আত হওয়ার পর কিভাবে ফয়েজ লাভ করে? এর উত্তর হলো, তারা যদি পাবন্দির সাথে মামুলাত আদায় করতে থাকে, তাহলে শাইখকে দেখা ছাড়াই এবং শাইখের মজলিসে বসা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে নূর পৌঁছাতে থাকেন। এভাবেই মহিলারাও বেলায়াতের নূর লাভ করে থাকেন। সুতরাং এটাই হাকীকত বা বাস্তবতা। যারা করছে, তারা পাচ্ছে। আর যারা করছে না, তারা যেমনটি ছিল তেমনটি-ই আছে।

প্রাপ্তগণ এভাবেই পেয়ে থাকে

আপনাদের মধ্যে এ মহূর্তে কেউ আছেন অন্তরের নেক কাজে, কেউ আত্মার নেক কাজে, কেউ সূক্ষ্ম বা অতি সূক্ষ্ম নেক কাজে, কেউ মুরাকাবা মুশারাবায়। পাশাপাশি বর্তমানে আমাদের এই জামাতে–

এমন দোস্তও আছেন, যারা প্রতিদিন নিয়মিত তিন ঘন্টা মুরাকাবা করেন।

এমন অনেক মহিলাও আছেন, যারা প্রতিদিন তিন ঘন্টা মুরাকাবা করেন।

এরূপ লোকও আছেন, যারা কালেমা তাইয়্যিবার অজিফা প্রত্যহ তিন হাজারবার পড়েন।

এরূপ লোক আছেন, যারা এই অজিফা পাঁচ হাজারবার পড়েন।

কেউ-কেউ সাত হাজারবার প্রতিদিন পড়েন।

কতিপয় ব্যক্তি এমনও আছেন, যারা দশ হাজারবার কালেমার জবানি যিকির করেন।

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর শোকর, আমাদের জামাতে এমন লোকও আছেন, যার্রা প্রতিদিন চল্লিশ হাজারবার কালেমা তাইয়্যিবা পড়েন।

এ যুগেও যুবকরা পত্র লেখে, হযরত! দুই বছর থেকে তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি।

এ-সময়ও আমার কাছে পত্র আসে, হযরত! কোনো মাস-ই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত থেকে খালি থাকে না।

একজন এমন ব্যক্তিত্বও আছেন, যিনি নিজের অবস্থা আমাকে শোনাতে গিয়ে বলেছেন, হযরত! হাদীছ শরীফের হেফয, ইল্‌ম ও মহব্বতের কারণে আমার জীবনের একটি সপ্তাহও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতবিহীন গত হয়নি।

প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এভাবেই পাচ্ছেন। অপরদিকে একজন বলছেন, আমার কিছুই অর্জন হচ্ছে না। ভাই! আপনিও মুখলিস এবং শাইখও আপনাকে উপকার পৌঁছাতে চাচ্ছেন। তিনিও তাওয়াজ্জুহ প্রদান করছেন। হতে পারে, শয়তান কুমন্ত্রণার তরঙ্গের মাধ্যমে ফয়েজের সঞ্চারণ বাধাগ্রস্ত করছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে চাও! কেননা, এই কব্‌জের অবস্থা তথা শয়তানের অনুপ্রবেশ বড়দের ক্ষেত্রেও হয়ে যায়।

কব্‌জ (সংযোগ বিচ্ছিন্নতা) অবস্থায় বড় পরীক্ষা হয়

মনে রাখবেন, কব্‌জের অবস্থায় বান্দাকে বড় পরীক্ষা করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ–

একবার কিছু দিনের জন্য আল্লাহর মাহবূব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী আসা বন্ধ থাকে। এতেও আল্লাহর হেকমত ছিল। মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করছিলেন ওহী আসুক। কিন্তু পরওয়ারদেগারে আলম ওহী প্রেরণে বিলম্ব করলেন। তিনি বাদশাহদের বাদশাহ– রাজাধিরাজ। এতেও কোনো হেকমত ছিল। সবক

দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহর মাহবূব রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওহী আসা বন্ধ হওয়ার কষ্ট বরদাশত করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সেই দিনগুলোতে নবীজির অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, তিনি বলছিলেন, আমার মন চাচ্ছিল, পাহাড়ে আরোহণ করে নিচে লাফ দেই। আল্লাহু আকবার!

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দি বোখারি (রহ.)-এর ওপর একবার এরূপ কব্‌জ (সংযোগ বিচ্ছিন্নতা) অবস্থা আসে যে, কয়েক মাস অভ্যন্তরে কিছুই অনুভূত হচ্ছিল না। নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করার পর অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, জায়নামায ছেড়ে আমিও লোকদের মতো বাজারে গিয়ে কাজ করি, যাতে আমিও ধনসম্পদ উপার্জন করতে পারি এবং স্ত্রী-সন্তানকে খুব ভালো ভরণপোষণ করতে পারি। এখানে দিনভর বসে থাকব, বিনিময়ে কিছুই পাব না; তার চেয়ে গিয়ে কোনো কাজ করি। এই ইচ্ছে করে তিনি নিজ আসন ত্যাগ করে চলতে শুরু করলেন। রাস্তায় একটি মসজিদের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তিনি চিন্তা করলেন, নামাযের সময় আবার চলে যায়, কাজেই এখানেই নামায পড়ে নিই। মসজিদে প্রবেশ করলে সেখানে লেখা একটি ছন্দের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। যখনই তিনি ফারসিতে লেখা ছন্দটি পড়লেন, সাথে-সাথে অন্তরে এমন ধাক্কা লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা তার অভ্যন্তরকে দ্বিতীয়বার আলোকিত করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ! তারপর তার তবিয়ত এত উন্মুক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর নকশবন্দি সম্পর্কের এমন ফয়েজ ঢেলে দিলেন, যার ফলে এই ঘটনার পরে এই সেলসেলা 'নকশবন্দি সেলসেলা' নামে পরিচিত হয়ে যায়।

হযরত খাজা আবদুল্লাহ দেহলবী (রহ.) বলেন, আমার অন্তরের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। 'বাস্‌ত' (উন্মুক্ততা)-এর অবস্থা ছিল। আমি এক দাওয়াতে গেলাম। সেখানে যে খানা পরিবেশন করা হলো, তা সন্দেহপূর্ণ ছিল। সরাসরি হারাম ছিল না; বরং সন্দেহ ছিল। সম্ভবত তাতে সুদের মিশ্রণ ঘটেছে। এই খানা খাওয়ার পর আমার অন্তরের সেই অবস্থা শেষ হয়ে গেল। আমি আমার শাইখ মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.)-এর কাছে এসে বলি, হযরত! এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। হযরত বললেন, এখন থেকে তুমি আমার সামনে এসে নিয়মিত বসবে; আমি তাওয়াজ্জুহ দেব, যেন সন্দেহজনক খাদ্যের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। হযরত আমার প্রতি এমন তাওয়াজ্জুহ প্রদান করতেন, যদি তা পর্বতের ওপর দিতেন, তাহলে তাতে

কম্পন সৃষ্টি হয়ে যেত। লাগাতার চল্লিশ দিন তাওয়াজ্জুহ দেওয়ার পর সন্দেহজনক খাদ্যের ক্রিয়া আমার ভেতরে থেকে দূরীভূত হলো।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বান্দাকে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা কখনও 'বাস্ত'-এর অবস্থা দিয়ে করেন আবার কখনও 'কব্জ'-এর অবস্থা দিয়ে করেন। আমরা পরীক্ষার উপযুক্ত নই বিধায় আমাদের উচিত, আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। এটা এমন এক পথ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মারেফতের নেয়ামত অর্জন হয়। এই রাস্তা থেকে পিছু হটা যাবে না। লেগে থাকা চাই। যদি কোনো অবস্থারই সৃষ্টি না হয়, তাহলে শাইখকে আপনার অবস্থার কথা বলবেন। তারপর শাইখ যা-যা করতে আদেশ করবেন, সেগুলো যত্নসহকারে করতে থাকবেন। যেসব কাজ থেকে নিষেধ করবেন, সেসব থেকে বিরত থাকবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের অনুপম দৃশ্য দেখতে পাবেন। এটি অভ্যন্তর পরিচ্ছন্নকারী স্থায়ী ওষুধ।

আজকাল আমরা যে বিষয়টি অনুভব করছি, সেটি হলো, দোস্ত-আহবাবগণ মুরাকাবা অধিক পরিমাণে করে না। আর এই দুই কাজ না হওয়ার কারণেই তারা রূহানিভাবে দুর্বল হতে চলছে।

শরীর নরম হওয়া এবং অন্তর নরম হওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

'তারপর তাদের তন ও মন নরম হয়ে আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হয়ে যায়।'[৭]

এই 'শরীরের অঙ্গ নরম হয়ে যাওয়া' প্রথমে অর্জিত হয়। আর 'অন্তর নরম হয়ে যাওয়া' পরবর্তী কালে অর্জিত হয়।

শরীর নরম হওয়ার উদাহরণ এই যে, আমরা তো জমিনের ওপর আরামে বসে যাই। কেননা, মসজিদের কাতারে বসতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু পশ্চিমা লোকজন জমিনের ওপর বসতে পারে না। কয়েকবার এ বিষয়টির পরীক্ষা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের প্যান্ট টাইট হয়ে থাকে বলে তারা বসতে পারে না। বরং তাদের দেহ জমিনে বসতে অভ্যস্তই হয় না।

---

৭. সূরা যুমার : আয়াত ২৩

বেনামাযীদেরও এ-ই অবস্থা হয়ে থাকে। একলোক কালেমা পড়েছে। আমরা তাকে নামায শিক্ষা দিলে সে রুকু-সেজদা করার সময় কখনও এক ফুট পেছনে আবার কখনও এক ফুট সামনে চলে যেত।

আত্তাহিয়্যাতুর আকৃতিতে বসার অভ্যাস করে নিলে এ-ধরনের বসা কঠিন কিছু না। এর কারণ এই যে, এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শরীরের ওজন পায়ের গোড়ালির ওপর এসে যায় এবং গোড়ালির রক্তচলাচল বন্ধু হয়ে যায়, যার ফলে সূক্ষ্ম শিরা বড় হতে শুরু করে। এমনকি এটি পৃথক একটি রক্তপ্রাবাহী বাইপাসের আকৃতি ধারণ করে। এটিই কারণ যে, আকুড়াখটকের শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক (রহ.) দু-তিন ঘন্টা বোখারি শরীফের দরস দিতেন আত্তাহিয়্যাতুর সুরতে বসে। তাতে তিনি পার্শ্বও পরিবর্তন করতেন না। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর শরীর নরম করে দিয়েছিলেন।

হিন্দু যোগী আর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যখন এভাবে বসে, তখন বহু মাস এভাইে বসে থাকে। যারা এভাবে বসতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য অন্যভাবে বসা কঠিন। ইংরেজরা এভাবে-সেভাবে বসতে পারে না। হয়তো তারা দাঁড়িয়ে থাকে নতুবা অন্য কোনো বস্তুর ওপর বসে। কিছু লোকের জন্য মুরাকাবায় গর্দান ঝুঁকানো কষ্টসাধ্য। এমনকি একটা সময় এমন আসে, মনে হয় যেন গর্দান ভেঙে পড়বে। হ্যাঁ ভাই! আল্লাহর স্মরণে সেটা ভাঙতে চায়, তো ভাঙতে দিন। অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর গর্দান ঝুঁকানো সহজ হয়ে যায়।

তারপর আসে দ্বিতীয় স্তর অন্তর নরম হওয়ার পর্যায়।

এই পর্যায়ে মানব অন্তর বিগলিত হয়ে যায় এবং অন্তরে অন্যান্য চিন্ত াভাবনার উদ্ভব হয় না। এখনও আমরা শরীর নরম হওয়ার মারহালায় পৌঁছিনি। এমতাবস্থায় অন্তর নরম হওয়ার আলোচনা কী করব। অথচ এমন বুযুর্গও ছিলেন, যাদের না নামাযে কুচিন্তা আসত, না নামাযের বাইরে। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা চাই, তিনি যেন আমাদেরকে এই উভয় নেয়ামত দান করেন। আমীন।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার গোপন দরজা

কিছু লোক এমন আছে, যারা অফিস-আদালতে চাকরি করে। সন্তানাদি অনেক। বাসা-বাড়িতে কাজ করার মতো অন্য কেউ নেই। তাদের কোনো সুযোগই মিলে না। তাই প্রশ্ন জাগে, যাদের কাছে তিন ঘন্টা সময়ই নেই,

তারা মুসল্লায় তিন ঘন্টা কেমন করে বসবে। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, যাদের সময়স্বল্পতার অপারগতা রয়েছে, তারা যদি 'উকূফে কালবী'-এর ইহ্তিমাম করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা মুরাকাবা করায় যে ফয়েজ দান করেন, সেই ফয়েজ 'উকূফে কালবী'-এর ওপর দিয়ে দেবেন। এবার 'উকূফে কালবী' করতে তো কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

আপনি স্কুলে যান, সেখানেও উকূফে কালবী করতে পারেন।

দোকানে যান, সেখানেও উকূফে কালবী করতে পারেন।

অফিসে যান, সেখানেও উকূফে কালবী করতে পারেন।

এমনকি আপনি স্ত্রীর সাথে একান্ত নির্জনবাস করছেন, সে-সময়ও 'উকূফে কালবী' করতে পারেন।

মুরাকাবা করার ক্ষেত্রে লোকজন এ-ও বলতে পারে যে, আমি বৃদ্ধ, দীর্ঘ সময় বসে থাকতে পারি না। কিন্তু উকূফে কালবীর জন্য তো বসাও জরুরি নয়। আপনি বসা আছেন, শুয়ে আছেন, দণ্ডায়মান আছেন– যে হালতেই আছেন আপনি সাথে-সাথে উকূফে কালবীও করতে পারছেন। উকূফে কালবীর মধ্যে আপনাকে কেবল অন্তরের ধ্যান-খেয়াল আল্লাহর দিকে রাখতে হবে। একাজ পুরুষরাও করতে সক্ষম, মহিলারাও করতে সক্ষম, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও করতে সক্ষম, বালকরাও করতে সক্ষম, সুস্থরাও করতে সক্ষম, অসুস্থরাও করতে সক্ষম। উকূফে কালবীর ক্ষেত্রে কোনো অপারগতা পেশ করার সুযোগ নেই। তথাপি যদি কারও কাছে অপারগতা আছে বলে মনে হয়, তাহলে সেটা নিজ নফসের মন্দাচার ও উদাসীনতা। আমাদের শাইখ বলেছেন, উকূফে কালবী আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার গোপন দ্বার।

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর ছেলে মুহাম্মাদ মা'সূম (রহ.) বলতেন, শাহে নকশবন্দিয়া (রহ.) বলেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন এক তরিকা চেয়েছি, যা নিশ্চিত পৌঁছানেওয়ালা। কী অর্থ এর? অর্থ হলো, যেব্যক্তি নকশবন্দিয়া তরিকার সবকসমূহের ওপর চলবেন, তিনি নিশ্চিত আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন। তিনি আরেকটি কথা বলতেন, এই তারীকায় সালেকের নিজের অলসতা ব্যতীত আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তি নিজে উকূফে কালবীতে অবহেলা না করলে এই রাস্তায় আল্লাহকে পেতে কোনো বাধা নেই। প্রত্যেক বান্দারই উন্নতি হয়। এজন্য আপনি নিজের অন্তরে নিয়্যত ও মজবুত ইচ্ছা করে নিন যে, আজ থেকে আমি অধিক পরিমাণে যিকির করব। চাই

মুরাকাবার পদ্ধতিতে হোক, চাই উকূফে কালবীর পদ্ধতিতে হোক। যেভাবেই হোক দিনের অধিকাংশ সময় অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করব।

সরাসরি সম্বোধনে স্বাদ

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সরাসরি সম্বোধন করা অনেক বড় বিষয়। এর দৃষ্টান্ত মনে করুন এরূপ যে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক কোনো পিওনকে ডেকে নিজে তার সাথে কথা বলে, তাহলে এটা তার জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের সম্পর্ক এর চেয়েও নিম্নস্তরে। আমাদের তো সেই অবস্থানও নেই, যা একজন পিওনের প্রধান পরিচালকের সাথে থাকে। কেননা, সে তো একজন কর্মচারী। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তার মালিকানায়। মালিক নিজেদের মালিকানাধীন বস্তুতে অনেক বেশি কর্তৃত্বের অধিকারী হন। সুতরাং যদি আমাদের মতো বান্দাদের সাথে আল্লাহ সরাসারি কোনো কথা বলেন, তাহলে এটা অনেক বড় বিষয়। একবার আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে বনী ইসরাইলকে লক্ষ করে সরাসরি কথা বললে তারা এত প্রফুল্ল হয়েছিল যে, বলতে শুরু করেছিল-

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآءُهٗ

'আমরা আল্লাহর ছেলে এবং অনেক পছন্দনীয় বান্দা।'[৮]

বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা একবার সরাসরি সম্বোধন করলেন। এতেই তারা এত প্রফুল্ল হলো যে, এধরনের কথা বলতে লাগল। আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন! কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আটাশিবার يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মুমিনদের সরাসরি সম্বোধন করেছেন। এটি এই উম্মতের জন্য গৌরবের বিষয়। উম্মতের ওপর আল্লাহর রহমত। আমাদের মতো ফকিরদের প্রতি এটি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুকম্পা। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলতেন, যখনই কোনো বান্দা কুরআন মাজীদে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তেলাওয়াত করবে, তখন সে যেন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বসে। কেননা, তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর হুকুম শোনাচ্ছেন। কাজেই কুরআনে কারীমের এই আয়াতগুলো

---

৮. সূরা যুমার : আয়াত ২৩

তেলাওয়াত করার সময় আমাদেরও খুব মনোনিবেশ করা চাই যে, আমাদের মালিক আমাদের কী আদেশ করছেন। যেসব স্থানে অধিক পরিমাণে যিকির করার নির্দেশ রয়েছে, সেখানেও শুরুতে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا এসেছে। সুতরাং এখানেও আমাদের মনোযোগের সাথে চিন্তা করা উচিত, আমাদের মালিক আমাদের থেকে কী চাচ্ছেন।

সর্বাবস্থায় যিকির করার তরিকা কুরআন মাজীদের আলোকে

অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার দ্বারা আল্লাহর স্মরণ উপস্থিত রাখাও মানুষের নসিব হয়। অধিক সেই কাজকে বলা হয়, যা বেশিরভাগ অংশে হয়। অর্থাৎ– যেব্যক্তি দৈনন্দিন অর্ধেকের চেয়ে বেশি সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ব্যয় করবে, সে অধিক যিকিরকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি দৈনন্দিন অর্ধেকের চেয়ে কম সময় যিকির করে, তাহলে কম যিকিরকারী গণ্য হবে। এবার দেখুন, আমরা দিনের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি সময় না মসজিদে বসতে পারি, না নিজের একান্ত মুসল্লায় বসতে পারি। এজন্য আমরা বলতে পারি, হে আল্লাহ! এই কাজ তো আমাদের জন্য কঠিন। আমাদের পক্ষে এই হুকুম পালনযোগ্য নয়। পালনযোগ্য তো সেই কাজ, যা বান্দা করতে সক্ষম। এ অবস্থায় সংসার কিভাবে পরিচালিত হবে? অফিস কিভাবে পরিচালিত হবে? সুতরাং বোঝা গেল, উক্ত আদেশ থেকে উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মুসল্লায় বসে শুধু তাসবীহ পড়তে থাকি। বরং উদ্দেশ্য হলো, আমাদের হাত কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে আর অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্মরণে নিমগ্ন হবে। একেই বলা হয়, 'হাত থাকবে কাজে আর অন্তর থাকবে বন্ধুর সাথে।' অর্থাৎ– বান্দা হাতের সাহায্যে তো কাজকর্ম করছে; আর অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতকে স্মরণ করছে। যদি অধিক পরিমাণে যিকিরের এই ব্যাখ্যা হয়, তাহলে বিষয়টি বোধগম্য। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এক জায়গায় ইরশাদ ফরমান, যারা আমার নেক বান্দা, তাদের পরিচয় হলো–

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ

'আমার সেইসব বান্দা, ব্যবসাবাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের আমার স্মরণ থেকে বেখবর করে না।'[৯]

---

৯. সূরা নূর : আয়াত ৩৭

ব্যবসার মধ্যে তো মানুষের হাত ব্যস্ত হয়, দেমাগও ব্যস্ত হয় এবং শ্রবণশক্তিও ব্যস্ত হয়ে যায়। অন্তরের যিকির এমন যিকির, যা ব্যবসাবাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় চলাকালীনও করা যায়। অবশ্য এরূপ অবস্থায় মৌখিক যিকির সম্ভব নয়। কেননা, ধরে নিন, কারও কাপড়ের দোকান আছে। কোনো গ্রাহক কাপড় ক্রয় করতে এল। গ্রহক এসে বলল, আপনি কাপড় বিক্রি করবেন কি? জবাবে সে বলল, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– আমার এমন বান্দাও আছে, যারা ব্যবসার সময়ও আল্লাহকে ভোলে না; কাজেই আমি তো আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছি। গ্রাহক আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কাপড় বিক্রি করবেন কি? আর সে বলল, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। গ্রাহক জিজ্ঞেস করল, কত মূল্যে বিক্রি করবেন? সে বলল, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। গ্রাহক জিজ্ঞেস করল, এ-ধরনের আরও আছে কি? সে বলল, আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। এভাবে প্রত্যেক কথার জবাবে আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ শুনে গ্রাহক ফিরে চলে যাবে।

অতএব প্রতীয়মান হলো, 'যিকরে কাছীর' দ্বারা উদ্দেশ্য মৌখিক যিকির নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, আমরা মুখে কথা বলব; সাথে-সাথে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরকে এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সেটা একই সময়ে দুই কাজ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ছাত্রের কলেজে ভর্তির অনুমতিপত্র এসে যায়, তাহলে চব্বিশ ঘন্টা তার ধ্যান থাকে, আমি ভর্তির অনুমতি পেয়েছি। অথচ সে খানাপিনা করছে, অন্যদের সাথে কথোপকথনও করছে। কিন্তু সাথে-সাথে তার এই খেয়াল জাগ্রত থাকে যে, আমি কলেজে ভর্তির অনুমতি পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্মরণশক্তিতে এই ক্ষমতা রেখেছেন যে, সে কাজকর্ম করা অবস্থায়ও কোনো-না-কোনো বিষয় চিন্তা করতে থাকে এবং যে বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি তার স্মৃতিতে বারবার আসে।

একব্যক্তি গাড়িতে সফর করছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্সিডেন্ট হলো। গাড়ি ধাক্কা খেলে লোকটি আহত হলো এবং কিছু হারানো গেল। সে দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখেছে। এখন এই দৃশ্য তার স্মৃতিপটে পূর্ণ নোট হয়ে গেল। তারপর যদিও সে ড্রাইভিং করে নিজ বাসার দিকে যাচ্ছে; কিন্তু এক্সিডেন্ট নিয়ে তার ভাবনা চলছেই। যখন বাসায় পৌঁছল, স্ত্রী-সন্তানদের কাছে এক্সিডেন্টের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে। খানা খাওয়ার সময়ও এই এক্সিডেন্টের কথা মনে পড়ছে। পরবর্তী দিন অফিসে গেলে, নিজ অফিস প্রধানের কাছেও এক্সিডেন্টের বর্ণনা দিচ্ছে। এমনকি কোনো অফিসমেটের সাথে দেখা হলে

তাকেও এক্সিডেন্টের কথা জানাচ্ছে। সে অফিসে কাজও করছে আবার এক্সিডেন্টের কথাও মনে-মনে আওড়াচ্ছে। রাতে খানা খেতে বসেছে তো বলছে আমি কী করব, আমি তো এক্সিডেন্টের কথা ভুলতে পারছি না। কোনো বিষয় স্মরণ রাখার এই পদ্ধতিকে যিকরে কলবী বলা হয়। অর্থাৎ– বান্দার হাত তো কাজকর্মে ব্যস্ত, অপরদিকে তার অন্তর আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত। এভাবে আমরা চব্বিশটা ঘন্টা আল্লাহর যিকির করতে পারি। যার অন্তরে কোনো ব্যক্তির প্রবৃত্তিগত ও শয়তানি মহব্বত থাকে, সে এরূপই বলে যে, আমি তো আপনাকে ভুলিই না। বরং তার অবস্থা এই হয় যে, ভুলতে চাইলেও একে অপরকে ভুলতে পারে না। এজন্য-ই তো কবি বলেছেন–

روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں

روز یہ بات بھول جاتا ہوں

প্রতিদিন বলি ভুলে যাব তাকে

প্রতিদিন এ কথা ভুলে যাই।

আল্লাহ তা'আলাও এটাই চান যে, আমার বান্দার অন্তরে আমার কথা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাক। তারা দুনিয়াতে পানাহার, নিদ্রা, শোওয়া-বসা যেকোনো কাজকর্ম করে করুক, কিন্তু তার অন্তরে যেন আমার স্মরণ থাকে। এটি এমন একটি কাজ, যা মানুষ খুব সহজেই করতে পারে। আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিবেদন করি, হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে স্মরণ তো করতে চাই; কিন্তু কোন অবস্থায় স্মরণ করব? আল্লাহ তা'আলা এর উত্তর এরূপ দিয়েছেন-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'সেসব বান্দা যারা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোওয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১০]

এখন দেখুন! একজন মানুষের কটি অবস্থা হতে পারে? হয়তো দাঁড়ানো থাকবে অথবা বসা থাকবে অথবা শোওয়া থাকবে। এই তিন অবস্থা-ই হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি মার্শাল আর্টস হয়, তাহলে সে চতুর্থ কোনো অবস্থায়ও হয়তো দাঁড়াতে পারে। সাধারণ মানুষ তো এই তিন অবস্থায়-ই থাকতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'যারা তিন অবস্থাতেই আমাকে স্মরণ করে'

---

১০. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

এর উদ্দেশ্য এই দাঁড়াল, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে, আমার বান্দা সর্বাবস্থায় আমাকে স্মরণ করুক। অন্য একস্থানে তিনি ইরশাদ করেন–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ

'তুমি তোমার প্রভুর যিকির করো স্বীয় অন্তরে।'[১১]

নিজ অন্তরে, নিজ মনে, নিজ চিন্তা-চেতনায়, নিজ ধ্যান-খেয়ালে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করো। যিকিরের এই পদ্ধতি খুবই সহজ। কেননা, এতে জবান ব্যবহৃত হয় না। চোখের কাজ অবলোকন করা, জবানের কাজ বলা, কানের কাজ শ্রবণ করা, মস্তিষ্কের কাজ চিন্তাভাবনা করা এবং অন্তরের কাজ স্মরণ করা। এজন্য অন্তর এই কাজ সর্বক্ষণ করতে পারে। অর্থাৎ– করার মতো কাজ। প্রথমে এর জন্য চর্চা করতে হয়। চর্চা করে নিলে মানুষ খুব স্বাচ্ছন্দে যিকির করতে পারে। যেহেতু এই যিকির করা সবার জন্য সম্ভব, তাই আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, যে রূহ গাফেল, সেই রূহ কাফের। যেন যে মুহূর্তটুকু আল্লাহ তা'আলা থেকে বেখবর অবস্থায় গত হলো, সেটা এরূপ-ই যেমন কুফরের অবস্থায় গত হলো। আমাদের মাশায়েখদের যিকিরের মধ্যে সেই অবস্থা হয়েছে যে, তাঁরা একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভুলতেন না।

گو میں رہا رہیں ستم ہائے روزگار
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

যতই আমি থাকি যামানার দুঃখ-কষ্টে
তথাপি তোমার ধ্যান-খেয়াল থেকে বেখবর থাকিনি।

এরূপ বান্দাদের জীবন কতই-না পবিত্র হয়, যাঁরা চব্বিশ ঘন্টা স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করে। হ্যাঁ, যদি নিদ্রা যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। বরঞ্চ, তারা নিদ্রাও যায় আল্লাহর স্মরণ নিয়ে এবং জাগ্রত হলেও আল্লাহর স্মরণ নিয়ে জাগ্রত হয়।

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے
بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں

---

১১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫

تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی

راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

আমার না আছে নিজের অনুভূতি, না দুনিয়ার অনুভূতি
তোমার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে আমি বসে থাকি।
তারার কাছে জিজ্ঞেস করে নাও আমার জীবনবৃত্তান্ত
তোমার খেয়ালে আমি রাতে থাকি জাগ্রত।

তারপর তাহাজ্জুদ পড়তে আর কষ্ট হয় না; বরং চোখ নিজে নিজেই খুলে যায়।

যিকিরের আধিক্য দ্বারা দুটি নেয়ামত লাভ

প্রতিটি কাজ বা বস্তুর একটা ক্রিয়া আছে। অধিক পরিমাণে যিকির করার মধ্যে ক্রিয়া হয়। আমাদের মাশায়েখগণ লিখেছেন, অধিক পরিমাণে যিকির করার দ্বারা মানুষের দুটি নেয়ামত নসিব হয়।

১. দৃঢ় সংকল্পশক্তি (DeteQination Power)

২.আপনশক্তিকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করা (Power of Concentration)

(১) দৃঢ় সংকল্প এবং তার ফলাফল : যেব্যক্তি অধিক পরিমাণে যিকির করে, তার ভেতরে দৃঢ় সংকল্পশক্তি বেড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে এটি একটি বড় নেয়ামত। দৃঢ় সংকল্পশক্তি মানুষের ভেতরের এমন একটি সামর্থ্য, যা তাকে কাজ আঞ্জাম দিতে সাহস জোগায়। এর সাহায্যে মানুষ দীন ও দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে সফলতা পায়। পক্ষান্তরে যার ভেতরে দৃঢ় সংকল্পশক্তি থাকে না, সে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সফলতা পায় না। তার ভেতরে কোনো কাজ করার সাহসই থাকে না।

ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں،

کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے

সংকল্প করি, চিন্তা করি, সংকল্প ত্যাগ করি
কোথাও এমন না হয়ে যায়, কোথাও তেমন না হয়ে যায়।

যেসব ছাত্রের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পশক্তি নেই, তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

যে ব্যবসায়ীর মধ্যে দৃঢ় সংকল্পশক্তি নেই, সে ব্যবসায় সাফল্য পায় না। যে-বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ় সংকল্পশক্তি নেই, সে দাম্পত্ব জীবনে ব্যর্থ হয়ে যায়। দৃঢ় সংকল্পশক্তি এমন স্পৃহাকে বলা হয়, যার দ্বারা মানুষ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে। অন্য শব্দে দৃঢ় সংকল্পশক্তি হলো, সেই চালিকাশক্তি, যা একজন লোককে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। তাই তো জনৈক ব্যক্তি ছন্দাকারে বলেছেন–

لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے

تا بہ منزل صرف دیوانے گئے

ফিরে এল জ্ঞানবলে যারা ময়দান অতিক্রম করতে গেল

পাগল যারা তারাই কেবল লক্ষ্যস্থল পানে ছুটে চলল।

'ফারযানা' বলা হয়, যে আকলের জোরে দূরত্ব অতিক্রম করে। এরা রাস্তা থেকে উল্টোপায়ে ফিরে আসে। কিন্তু পাগল হয়ে যারা লক্ষ্যপানে সফর করে, তারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেই যায়। অন্যরা চিন্তার মধ্যেই আটকে থাকে।

একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ

একজন মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ গত হয়েছেন। নাম ছিল ফ্রাইড। ১৯৩৪ সনে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি তার সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন হিউম্যান সাইকোলোজিতে গবেষণা করে। তাকে সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ গণ্য করা হয়। তিনি মৃত্যুর আগমুহূর্তে একটি কথা লিখে গেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে সর্বোত্তম নেয়ামত হলো দৃঢ় সংকল্পশক্তি। তারপর তিনি লিখেছেন, 'দৃঢ় সংকল্পশক্তিই সেই শক্তি, যার সাহায্যে মানুষ ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করে।

অর্থাৎ–

নিজের পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তর করে ফেলে।

প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূল করে ফেলে।

ঘৃণাকে ভালোবাসায় বদলে দেয়।

দুঃখ-পেরেশানিকে আনন্দে ভাসিয়ে দেয়।

এক ছাত্রের সফলতা

যে-ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় আজ ক্রন্দন করছে, সে যদি তার দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে কাজে লাগায় এবং আগামী বছর পড়ালেখা করে, তাহলে

পূর্ণ কলেজে ফাস্টও হতে পারে। আমার কাছে এক ছাত্র এল। তার পিতা সুগারমিলের পরিচালক ছিলেন। তিনি আমার অনেক দয়ালু দোস্ত ছিলেন। সেই ছাত্রের ক্রিকেট ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ ছিল। লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়নি বিধায় সে অকৃতকার্য হলো। তার পিতা বড় পেরেশান ছিল। তিনি বলেন, আমি পরিচালক; যখন আমি লোকদের কাছে বলি, আমার সন্তান ফেল হয়েছে, তখন আমার মন চায় আমি জমিনে দেবে যাই। এধরনের পদমর্যাশীলদের অনুভূতিও বেশি হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করব এখন? আমি বললাম, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

যখন আমি সেই ছাত্রকে দেখলাম, তখন আমার দৃষ্টিতে তাকে খুবই মেধাবী মনে হলো। যেহেতু উদাসীন ছিল, তাই সে লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়নি; ফলে ধরা খেয়েছে। আমি তাকে এক-দুই দিন আমার কাছে রাখলাম। তাকে বোঝালাম এবং উৎসাহ জোগালাম। আমি বললাম, অকৃতকার্য হলে মানুষের মাথা নত হয়ে যায়। তুমি যদি কৃতকার্য হতে, তাহলে তোমাকে খুশির মালা পরানো হতো। তুমি কৃতকার্য হলে মুবারকবাদের সম্ভাষণ শুনতে। অথচ এখন তুমি তিরস্কার আর ভর্ৎসনার শব্দ শুনছ। এভাবে যখন তাকে বিষয়টি বোঝালাম, তখন সে বলতে লাগল, জি, এখন থেকে আমি পড়ব। যাক আমি তাকে পড়ার পদ্ধতিও বুঝিয়ে দিলাম। আল্লাহর শান দেখুন! পরবর্তী বছর পরীক্ষায় সে সমগ্র কলেজে প্রথম হয়েছে। একেই বলে ব্যর্থতাকে সফলতায় পরিণত করা। বাসার লোকজনও তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছিল। আর এক বছর পরই কলেজের সকল শিক্ষক-ছাত্র খুশিতে তার সাথে মিলিত হচ্ছে এবং তার গলায় ফুলের মালা দিচ্ছে।

দীনি ময়দানে সফলতা

কেউ যদি দীনের ময়দানে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ– তার দৃষ্টি, তার নিয়ন্ত্রণে না থাকে, জবান নিয়ন্ত্রণে না থাকে, বদনযরিও করে, মিথ্যেও বলে, লোকদের সাথে প্রতারণাও করে, আমানতের খেয়ানতও করে, সে মদ্যপও এবং ব্যভিচারীও, মোটকথা হেন এমন কাজ নেই, যা সে করে না, তাহলে সে দীনের ময়দানে ব্যর্থ অবস্থায় আছে। সে যদি নিজের দৃঢ় সংকল্পশক্তি প্রয়োগ করে এবং খাঁটি তাওবা করত নেকির রাস্তায় চলে, তাহলে এত মন্দ প্রকৃতির লোকও ভবিষ্যতের অলি হয়ে যেতে পারে। ফুযাইল (রহ.) ডাকাতদের সরদার ছিলেন। যখন তিনি জীবনের গতি পরিবর্তন করলেন, তখন নেক

কাজের প্রতি এত অগ্রসর হলেন যে, তাঁর সময়কার বড়-বড় অলিদের মধ্যে তিনি গণ্য হতেন। যিনি ডাকাতদের প্রধান ছিলেন, তিনি দৃঢ় সংকল্পশক্তির মাধ্যমে পরবর্তী কালে অলিদের প্রধান হয়ে গেলেন। যেন তিনি নিজের ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপান্তর করে দেখিয়ে দিলেন।

দাম্পত্ব জীবনে সফলতা

কারও যদি দাম্পত্ব জীবনে নিজ সংসারের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, অন্য মহিলাদের প্রতি অন্তরে আকর্ষণ বোধ হয়, রাগ হয় খুব প্রচণ্ড এমনকি তালাক হওয়ার উপক্রম, সেও যদি চিন্তা করে, আমাকে আমার সংসার চালাতে হবে, তাহলে ভালোভাবে চালাতে পারবে। একবার করাচিতে আমার কাছে এক দম্পতি এল। উভয়ই শিক্ষিত এবং বাই'আত ছিল। তারা বলতে শুরু করল, হযরত! আমরা আমাদের দাম্পত্ব জীবনের ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করতে চাই। আমি বললাম, বলুন। তারা বলতে লাগল, আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি। কিন্তু আমরা ভেবেছি, আমাদের পিতামাতাকে বলার আগে আপনাকে বলব। কেননা, আপনি আমাদের রূহানি শাইখ। তারা বলল, অনেক ভেবেচিন্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। স্বামী তালাক দিতে প্রস্তুত, স্ত্রীও তালাক গ্রহণে একমত।

আমি তাদের বললাম, আমার পরামর্শ হলো, আপনারা এই সিদ্ধান্ত ছয় মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করুন এবং আমি আপনাদের যেভাবে গাইড করব, সেভাবে এই ছয় মাস জীবন যাপন করুন। এর মধ্যে যদি আপনাদের পরস্পরে বনিবনা হয়ে যায়, তাহলে আলহামদু লিল্লাহ। নতুবা পরে পিতামাতাকে বলবেন। তারা আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন।

তারপর আমি যখন তাদের সাথে কথাবার্তা বলি, তখন আমি বুঝে গেলাম তাদের এই পেরেশানির মূল কারণ কী? রোগী তো বলে, আমি রোগী, এখানে ব্যথা। ডাক্তারকে বুঝতে হয় মূল রোগটা কী? আধ্যাত্মিক জগতেও বিষয়টি এমনই। আগন্তুক তো তার বিবরণ পেশ করে যায়। সেখানে লাইনের মধ্যবর্তী লেখা পড়তে হয় মাসআলা বা সমস্যার মূল রহস্য উদঘাটন করতে। এই দুর্বল বান্দা মূল রহস্য উন্মোচন করল যে, সেসময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মন্দা ছিল। দেশে হরতাল চলছিল। সরকার ট্যাক্স উসূল করতে বলছিল। ব্যবসায়ীগণ বলছিল, আমরা ট্যাক্স ফরম জমা করব না। সম্ভবত এক মাস পর্যন্ত দোকানদারগণ নিজেদের দোকান বন্ধ রাখল।

এ-সময় তারও এই অবস্থা ছিল। তার ব্যবসা এমন ছিল যে, তাকে বিল পরিশোধ করতে হচ্ছিল অনেক। দোকান বন্ধু থাকছিল। অপরদিকে বিলপ্রাপকগণ ফোনের পর ফোন করছিল।

তিনি দোকানে দিনভর পেরেশানিতে থাকার পর যখন বাসায় আসতেন, তখন বাসায়ও পেরেশান থাকতেন। তারা দুজন নিজেদের বড় বাসায় একা থাকতেন। তিনি বাসায় আসার দুই ঘন্টা আগেই স্ত্রী খানা প্রস্তুত করে স্বামীর আগমন অপেক্ষায় বসে থাকত। স্বামী আসবে আর তার সাথে মিলে একত্রে খানা খাবে। কিন্তু স্বামী নিভে যাওয়া প্রদীপের মতো বাসায় আসত। যেখানে স্ত্রীর কামনা স্বামী আনন্দচিত্তে বাসায় আসবে। স্ত্রী তাকে তেমন আন্তরিক দেখতে চাইত, যেমনটি নিজে থাকত। কিন্তু এখানে সব ছিল উল্টো। না সে আনন্দচিত্তে খানা খেত, না স্ত্রীর সাথে বসে কথা বলত। এ থেকে স্ত্রী এই ফলাফল বের করল যে, আমাকে তার পছন্দ হয়নি। এ কারণেই সে আমার সাথে কথাও বলে না, আমাকে সময়ও দেয় না। যখন স্ত্রীর খেয়াল হতো, সে আমাকে পছন্দ করে না, তৎক্ষণাৎ তার মধ্যে আরেকটি খেয়াল জাগত যে, সে বাইরে কাউকে পছন্দ করে থাকবে। তাই তার মধ্যে স্বামীর প্রতি ক্রোধ সৃষ্টি হতো এবং কথায়-কথায় তার সাথে ঝগড়া করত। দুজনই যুবক ছিল। সমস্তটা রাত তাদের তর্কবিতর্কে শেষ হয়ে যেত। তাদের চিন্তাচেতনা পরস্পরে লড়াই করছিল। যখন কয়েক মাস এভাবে অতিক্রম হলো, তখন স্ত্রী চিন্তা করল, এখন এই বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার মধ্যে শান্তি। স্বামীও ভাবল, যখনই বাসায় আসি, আমাকে পেরেশান হতে হয়। এসব চিন্ত াভাবনার ভিত্তিতে তারা দুজনই তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

আমি তাদের বললাম, ছয় মাস পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করুন। আমি আপনাদের যে পরামর্শ দেব সে মোতাবেক চলুন। তারা বললেন, ঠিক আছে। এবার আমি তাদের জন্য একটি অসাধারণ চিকিৎসা বের করলাম। আমি এই যুবককে বোঝালাম, আপনার জীবন যাপনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নত অনুপস্থিত। আপনি সেই সুন্নাতের ওপর আমল করছেন না। এই সুন্নত বর্জনের কারণে আপনার জীবন বরকতময় নয়। তিনি বললেন, আপনি আমাকে বলে দিন। আমি বললাম, হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে তাশরীফ আনতেন, তখন প্রশস্ত চেহারায় মুচকি হাসির সাথে প্রবেশ করতেন

এবং ঘরের লোকদের সালাম দিতেন। এই সুন্নত আপনাদের মধ্যে নেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কখনও এরূপ করিনি। আমি তাকে বললাম, আপনার ব্যবসাসংক্রান্ত যত বিষয় আছে সব দোকানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। বাসায় আসার সময় সতেজ ও প্রফুল্লচিত্তে বাসায় প্রবেশ করবেন। আপনার ব্যবসা মন্দা, এতে স্ত্রীর কী অপরাধ? আমি সেই যুবককে বোঝালাম, আপনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করে যান। ব্যবসায় উঠানামা হয়েই থাকে। এটা তো ভালো কাজ নয় যে, ব্যবসায় লস হলে পরিবারের লোকদের মাঝে দুর্দশা চলে আসবে। আপনি বাসায় আনন্দময় জীবন যাপন করুন এবং দৃঢ় সংক্ষল্পশক্তি সঞ্চার করুন। লজ্জাবতীর ঘাস হবেন না।

আমাদের এলাকায় এক প্রকার ঘাস হয়। এর নাম Touch me not (আমাকে স্পর্শ করবেন না)। নামকরণকারীও যথাযথ নামকরণ করেছেন। কেউ যদি তাতে স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ এর পাতা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত এটি Sensitive তথা সংবেদনশীল ঘাস। কারও স্পর্শে যখন তাতে উত্তাপ লাগে, তখন এর সমস্ত পাতা বন্ধ হয়ে যায়। যেন সে কমনীয়। এজন্যই এর নামকরণ করা হয়েছে, 'Touch me not' 'আমাকে স্পর্শ করো না'।

যুবক বলল, আপনার পরামর্শ মোতাবেক অবশ্যই আমল করব। তারপর আমি বললাম, এর সাথে-সাথে আপনার জন্য একটা ওষুধও আছে। তিনি বললেন, ওষুধটা কী? আমি বললাম, ওষুধটা হলো, যখন আপনি বাসায় আসবেন, তখন স্ত্রীকে সালাম করে তার চুমুও নিয়ে নিবেন। তিনি এর মর্ম বুঝতে পারেননি। তথাপি যেহেতু আমি বলেছি, তাই তিনি বললেন, জি হযরত! আমল করব।

তারপর তার স্ত্রীকে বোঝালাম, যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণ খুশি হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁরা যেখানেই বসা থাকতেন, সামনে অগ্রসর হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁরা আল্লাহর মাহবূবকে প্রফুল্লচিত্তে এবং মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখতেন। সুতরাং আপনার স্বামী যখন বাসায় আসবে, তখন আপনিও তাকে ভালোবাসা ও মায়া-মমতার দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনিও বললেন, ঠিক আছে।

তারা দুজন এই পরামর্শ নিয়ে চলে গেলেন। আমি তাদের ছয় মাসের কথা বলেছিলাম। কিন্তু ত্রিশ দিন পরেই তাদের ফোন এলো, হযরত! আমাদের মনে হচ্ছে, এই ত্রিশ দিন আমরা হানিমুনে কাটিয়েছি। ভাই! যখন

স্বামী মুচকি হাসির সাথে স্ত্রীকে দেখবে, স্ত্রীর চুমোও নেবে এবং স্ত্রীও ইতিবাচক ভঙ্গিতে থাকবে, তখন সময় এমন আনন্দঘন কেন কাটবে না। তাদের পূর্বেকার ঝগড়া-বিবাদের ইতি ঘটল এবং প্রেম-ভালোবাসার জীবন আরম্ভ হয়ে গেল। যে-দম্পতি বলছিল, আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে প্রস্তুত, চল্লিশ দিন পর তারা-ই বলছে, যত আমোদ-প্রমোদে আমরা দিন কাটাচ্ছি, সমগ্র বিশ্বে অন্য কোনো দম্পতি এত আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাচ্ছে কিনা সন্দেহ। অতএব, দৃঢ় সংকল্পশক্তি এমন নেয়ামত, যা মানুষের ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপান্তর করে দেয়।

সবর ও ধৈর্যশক্তি

দৃঢ় সংকল্পশক্তিই মানুষকে সবর ও সহনশীলতা শিক্ষা দেয়। যখন দৃঢ় সংকল্পশক্তি থাকে না, তখন বান্দার মধ্যে সহনশীলতাই থাকে না। গাড়ির ব্রেক না থাকলে যেমন অন্য গাড়ি বা বস্তুর সাথে সংঘর্ষ বাঁধে, তেমনি যার মধ্যে সবর ও ধৈর্য নেই, অন্য লোকের সাথে তার ঝগড়া বাঁধে। কখনও স্ত্রীর সাথে বাঁধে, কখনও বসের সাথে বাঁধে, কখনও প্রতিবেশীর সাথে বাঁধে, কখনও বাতাসের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে।

একটি উদাহরণ মনোযোগের সাথে শুনুন! একটি গাছ ফল, ফুল, পাতায় ভরপুর। সবুজ-সতেজও। দেখলে অন্তর জুড়িয়ে যায়। যখন হেমন্তকাল আসে, তখন তাতে ফলও থাকে না, ফুলও শেষ হয়ে যায়, পাতাও ঝরে যায়। দেখতে শাখা-প্রশাখাবিহীন লাকড়ীর মতো দেখায়। পরে কালে শীতকাল শুরু হবে। অতিশয় ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাবে। ঝড়-তুফান হবে। কিন্তু সেই গাছ সবরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। তার জানা আছে, আমার ওপর যেহেতু বসন্তকাল স্থায়ী হলো না, কাজেই এই হেমন্তকালও স্থায়ী হবে না। সুতরাং আমাকে সবরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এই ভেবে গাছ শুকনা লাকড়ির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। এর ওপর বরফ পড়তে থাকে। অতিশয় ঠান্ডা বাতাস বয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড ঝড়-তুফান চলতে থাকে। তবুও সবরের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছের কয়েক মাসের সবর আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দ হয়ে যায় এবং তিনি শীতকালকে দ্বিতীয়বার বসন্তকালে পরিণত করে দেন। ক্রমান্বয়ে এই লাকড়িসদৃশ গাছের ভেতরে থেকে পল্লব বেরুতে শুরু করে। তারপর তাতে পাতা, ফুল, ফল সবই এসে যায়। এভাবে দ্বিতীয়বার সবুজ-সতেজ গাছে পরিণত হয়ে যায়। যেখানে গাছের মধ্যে এত সবর, সেখানে কি মানুষ এরূপ সবর করতে পারে না?

আমাদেরও যদি কখনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে সবরের সাথে থাকা চাই। আমরা তো সবর করি না। এ ওকে আঘাত করে, সে তাকে আঘাত করে। একজন এদিকে আক্রমণ করে, আরেকজন ওদিকে আক্রমণ করে। যেমন কাঁটাতার– মানুষ এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। আমাদেরও এই অবস্থা। লোকজন আমাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। না আমরা বসার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলি, না কথা বলার ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখি, না মু'আমালা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করি। আমরা আল্লাহর বান্দাদের জন্য জানি বিপদের কারণ হয়ে থাকি। মা সন্তুষ্ট নয়, পিতা সন্তুষ্ট নয়, স্ত্রীও সন্তুষ্ট নয়, সন্তানাদি সন্তুষ্ট নয়, বন্ধু-বান্ধবও সন্তুষ্ট নন; এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সন্তুষ্ট হবেন। এমনটা এজন্য হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পশক্তিই থাকে না। যার ফলে কারও কথা-ই সহ্য হয় না। কখনও ওর সমালোচনা করে, কখনও তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। আমাদের অবস্থা যখন এ-ই হবে, তখন কে আমাদের ভালো মনে করবে? এ সব কিছু আমাদের মধ্যে এজন্য হয় যে, আমাদের ভেতরে দৃঢ় সংকল্পশক্তি থাকে না এবং আমরা নিজেদের নফসকে লাগাম পরাতে পারি না। ফলে আমাদের নফস লাগামহীন ঘোড়ার মতো হয়ে যায়; যা আমাদের ভাগিয়ে যেথায় ইচ্ছে সেথায় নিয়ে যায়। আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এজন্যই আমরা জীবনে ব্যর্থ হই। আমরা যদি দৃঢ় সংকল্পশক্তির মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে আমরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারব।

সংকল্পশক্তি বৃদ্ধিকারী একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা

পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) আমাদের এক বন্ধু ছিলেন। দেশ ভাগের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক ধনসম্পদ দিয়ে ধনাঢ্য করেছিলেন। সেখানে তার ডজন-ডজন পেট্রোলপাম্প ও গ্যাসস্টেশন ছিল। সেসময় আল্লাহ তা'আলা তাকে এত বিপুল সম্পদ দিয়েছিলেন যে, ওয়াফদা কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারের মাসিক বেতন ছিল দেড়শো রুপি। আমি আমার জীবনে সেই সময়টা দেখেছি। তারা দুজন এক কোম্পানি হিসেবে পরিচিত হয়। তিনি তার অফিসারদের বেতন আড়াইশো রুপি করে দিলেন। আমরা বিস্মিত হয়ে ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা করছিলাম, এই কোম্পানিতে আড়াইশো রুপি বেতন হয়ে গেছে। তখন আমাদের হোস্টেলে মাসিক খরচ হতো পচিশ রুপি। সেসব কথা এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের এই

বন্ধুর এক অফিসার কোম্পানির দুই লাখ রুপি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বর্তমানে মনে করুন কোটির চেয়েও বেশি। আল্লাহর শান দেখুন! আমাদের বন্ধু এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন যে, নিরুদ্দেশ অফিসার রুপিগুলো এদিক-সেদিক অপচয়ের মাধ্যমে শেষ করে অবশেষে ফিরে এসে যখন কান্নাকাটি করতে লাগল, আমার ভুল হয়ে গেছে; আমার বাচ্চাকাচ্চা আছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, তখন তিনি তাকে শুধু ক্ষমা-ই করেননি; বরং তাকে দ্বিতীয়বার চাকরিতেও বহাল করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করুন, তিনি কত বড় মনের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন।

যখন দেশ ভাগ হলো, তখন এই ব্যক্তি করাচি বিমানবন্দরে স্ত্রীকে নিয়ে এমনভাবে অবতরণ করেন যে, স্ত্রীর মাথায় শুধু দোপাট্টা ছিল; আর কিছু ছিল না। এখানে তার এক ভাই বসবাস করছিল, তার বাড়িতে চলে এলেন। কিন্তু তার মধ্যে রক্তের চাপ ছিল খুব বেশি। তার বিলিয়ন-বিলিয়ন রুপি জলে গেল। যা ব্যাংকে ছিল, তাও গেল এবং এদিক-সেদিক যা ছিল, তাও গেল। রাতে ছিলেন ধনী, সকালে যখন অবতরণ করলেন, তখন ছিলেন নিঃস্ব-গরিব। একটা পয়সাও তার কাছে ছিল না। তিনি নিজে বলেছেন, সে-সময় আমার মস্তিষ্কে খুব রক্তচাপ ছিল।

তাঁর স্ত্রী খুবই পরহেযগার ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনুধাবন করছিলেন, এই অবস্থায় যদি স্বামী পেরেশানির সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে সেটা পাগলামির পর্যায়ে চলে যাবে। তাই তিনি স্বামীর মনোবল বাড়াতে থাকলেন। বন্ধু বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন ভাইয়ের বাসায় খানা খেতে বসি, তখন আমার স্ত্রী বলতে শুরু করেন, আমি একজন মহিলা। আমি তো খুবই দুর্বল এবং এই পরিস্থিতির কারণে অত্যন্ত পেরেশান। কিন্তু আমার স্বামীর সিনায় এমন বাহাদুর অন্তর রয়েছে যে, তিনি তো এই পেরেশানিকে হাতের ময়লা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী যখন এ-জাতীয় কথা বলত, তখন ভেতরে-ভেতরে আমি লজ্জিত হতাম যে, আমি একজন পুরুষ, তার চেয়ে তো আমাকে বেশি শক্ত হওয়া চাই; নিজের মধ্যে শক্তি-সাহস সঞ্চার করা চাই। স্ত্রী এক-দুই দিন কথা বলে আমাকে নির্ভার করে দিল। সে আমাকে বলত, হয়রান-পেরেশান তো মহিলারা হয়ে থাকে। তথাপি আমি নিজেও পেরেশান নই এবং আপনাকেও পেরেশান করছি না। আমাদের রিযিক আল্লাহর যিম্মায় এ-ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যে পালনকর্তা আমাদের সে-দেশে রিযিক দিচ্ছিলেন, সেই পালনকর্তা-ই আমাদের এ-দেশেও রিযিক দেবেন। এখানেও তিনি রিযিক কম দেবেন না। তাই আপনি

সামান্য অগ্রসর হোন। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভাই থেকে ঋণ নিয়ে একটি ট্রাক তৈরী করি এবং সেই ট্রাক চালাতে শুরু করি। আল্লাহ তা'আলা তো রিযিক দেওয়ার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। ঠিক পাঁচ বছর পর আমি শত-শত ট্রাকের মালিক হয়ে গেলাম।

আল্লাহওয়ালাদের দৃঢ় সংকল্প

এই দৃঢ় সংকল্পশক্তি বেশি-বেশি যিকিরের মাধ্যমে লাভ হয়। মানুষ যত বেশি যিকির করতে থাকবে, তার ভেতরে দৃঢ় সংকল্পশক্তিও তত বৃদ্ধি পাবে। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। দৈনিক আধা ঘন্টা বসে যিকির করুন, কোনো কাজই সম্পন্ন করা আপনার দৃষ্টিতে কঠিন মনে হবে না। আপনি যদি ইচ্ছে করেন, আজ রাত জাগ্রত হব; নিশ্চয়ই আপনি জাগ্রত হতে পারবেন। আপনি যদি সংকল্প করেন, মিথ্যে কথা বলব না, তাহলে অবশ্যই আপনার দ্বারা মিথ্যাচার হবে না। আপনি যদি সংকল্প করেন, গায়রে মাহরাম মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাহলে আপনার দ্বারা বেগানা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত হবে না। যেসব যুবক এসে বলে, হযরত! আমি এই আমল করতে পারি না, সেই আমল করতে পারি না; তারা মূলত অধিক পরিমাণে যিকির করে না। যার ফলে নিজেদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।

আল্লাহওয়ালাদের ভেতরে দৃঢ় সংকল্পশক্তি অনেক বেশি থাকে। এই দৃঢ় সংকল্পশক্তি বলেই তারা বলেন, হারাম ভক্ষণ করব না, তারপর আর হারামের কাছেও যান না। তারা বলেন, হারাম কার্যকলাপ করব না, পরবর্তী কালে আর কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হন না। তারা বলেন, আমি শরীয়তপরিপন্থী কোনো কার্যকলাপ করব না, শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করেন না। এই দৃঢ় সংকল্পশক্তি-ই তাদেরকে তাহাজ্জুদের সময় সজাগ করে দেয়। সাধারণ মানুষেরই কি শুধু ক্লান্তি আসে? আল্লাহওয়ালাদের কি ক্লান্তি আসে না? তাঁদেরও ক্লান্তি আসে। সাধারণ মানুষের এদিক-সেদিক মিষ্টি এবং চটপটি খেতে মন চায়, তো আল্লাহওয়ালাদের কি মন চায় না? তাঁদেরও মন চায়। কিন্তু তাঁরা নিজেদের নফসকে লাগামহীন ছেড়ে দেন না। যেমন– ঘোড়সাওয়ার ঘোড়ার লাগাম মজবুতভাবে ধরে রাখে, যেন সেটি তার মনমতো না দৌড়ায়। ঘোড়সাওয়ার কখনওই নিজের ইচ্ছার বাইরে ঘোড়াকে দৌড়ানোর সুযোগ দেয় না। এমনিভাবে সালেক স্বীয় নফসের ঘোড়াকে শরীয়তের লাগাম পরিয়ে দেয়, যাতে করে শরীয়তের রাস্তায় চলে; এ থেকে ছিটকে পলায়ন না করে।

আল্লাহ তা'আলা উঁচু হিম্মতওয়ালা লোকদের মহব্বত করেন। হাদীছ শরীফে এসেছে, 'আল্লাহ তা'আলা উঁচু হিম্মতওয়ালা লোকদের পছন্দ করেন।'

আল্লামা ইকবাল লিখেছেন–

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

সেসব যুবকের প্রতি মহব্বত আমার
জাল নিক্ষেপ করে যারা নক্ষত্ররাজির ওপর

শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার ফলাফল

অধিক পরিমাণে যিকিরের মাধ্যমে দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি লাভ হয়, সেটি হচ্ছে নিজ শক্তিকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করা। একে Power of Concentration অর্থাৎ– তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগকে একীভূত করার শক্তি বলা হয়। অর্থাৎ– বান্দা যে কাজ করছে, নিজের পূর্ণ শক্তি সেখানে সে কাজে লাগাবে। এটিও আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। বর্তমানে এই ব্যাধি খুবই ব্যাপক যে, মানুষ যেকোনো কাজ করে, অর্ধ মনোযোগ নিয়ে করে। পূর্ণ মনোযোগ ও জ্ঞান ব্যয় করে কাজ করে না। শুধু ভাসাভাসা চিন্তাভাবনায় কাজ করে। দেখা যায়, ছাত্রদের পড়ালেখা ব্যতীত সব কাজ ভালো লাগে। চলমান লাভজনক ব্যবসা পিতা ছেলের দায়িত্বে সোপর্দ করেছেন। আর ছেলে সেই ব্যবসা উজাড় করে দেয়। এমনটি এ-কারণে হয় যে, কাজের প্রতি ছেলের আকর্ষণ থাকে না। তার আকর্ষণ থাকে বন্ধুদের প্রতি। তার আকর্ষণ থাকে খেলাধুলার প্রতি। তার আকর্ষণ থাকে মহিলাদের প্রতি। কাজেই সে ব্যবসা কিভাবে করবে? অর্থাৎ– যে কাজ যার দায়িত্বে সোপর্দ করা হয়, সে উক্ত কাজে শতভাগ মনোযোগ, মেধা ও বিচার-বুদ্ধি ব্যয় করছে না। ফলে সে কাজটি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হচ্ছে না। এই অবস্থায় সর্বশক্তি একীভূত করার নেয়ামত লাভ হলে কাজ অতি সহজ হয়ে যায়। এই নেয়ামত পাওয়ার পর মানুষ কেবল তার দায়িত্ব পালন নিয়েই একশো ভাগ চিন্তা করে এবং একশো ভাগ পরিশ্রম করে। নিজশক্তি একীভূত করে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মাধ্যমে মানুষ অনেক বেশি কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

আমাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ধ্যান-খেয়াল নিবদ্ধ করতে। এটি কতটুকু কঠিন কাজ? আমরা কি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আমরা তা করতে সক্ষম নই। সুতরাং করতে সক্ষম না হওয়া এ কথার প্রমাণ যে, কাজটি খুবই কঠিন। কত-কত সময় মুরাকাবা অবস্থায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়; কিন্তু এই ধ্যান-খেয়ালের ছোটাছুটি করা দূর হয় না। এ কারণেই পূর্ণ উপকারিতাও পাওয়া যায় না। তবে যদি নিজের সর্বশক্তি একীভূত করে নেওয়া যায়, তাহলে শত কঠিন কাজও এক মুহূর্তে হয়ে যায়।

বড়-বড় পাথর ভাঙা

আচ্ছা, মার্শাল প্র্যাকটিসে অভিজ্ঞ একজন লোক বড়-বড় পাথর কিভাবে ভেঙে ফেলে? তার মধ্যে দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার গুণ আছে, যার সাহায্যে সে এমন-এমন কাজ করে ফেলে, যা দেখে দর্শক হতবাক হয়ে যায়।

আমি একবার এক চাইনিজ লোককে দেখলাম। সে এক জায়গায় বসে পড়ল। অন্য লোকজন কংক্রিটের তৈরী মোটা একটি ছাঁচ তার মাথায় রেখে দিল। তারপর এক যুবক তিন কিলোগ্রাম ওজনের একটি মোটা হাতুড়ি দিয়ে পূর্ণ শক্তিতে তার মাথায় আঘাত করল। কংক্রিটের ছাঁচ তো দুই টুকরো হয়ে গেল; কিন্তু তার মাথার কিছুই হয়নি। সে নিচে আরামে বসে রইল। দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, সেই লোক সম্পূর্ণ নিরাপদ রইল! আমি হাতুড়িটা তুলে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার পক্ষে এক হাতে সেটা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না।

এক বৃদ্ধের মহিষের সাথে লড়াই

জাপানে এক বৃদ্ধ ছিল। তিনি মার্শাল আর্টসে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তার ক্লাবের পরিচিতি ছিল, সেখানে যে-ই যেত নিদর্শন হয়ে আসত। কিন্তু তিনি এমনভাবে শেখাতেন যে, দক্ষ বানিয়ে দিতেন। তার ক্লাবে নিরাপত্তাহীন প্রতিযোগিতা হতো। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ; কিন্তু যুবকদের সাথে মোকাবেলা করতেন।

শেষ জীবনে তিনি মানুষের সাথে মোকাবেলা করা-ই ছেড়ে দিলেন। মানুষের পরিবর্তে মহিষের সাথে মোকাবেলা করতেন। লোকজন শক্তিশালী,

মোটা-তাজা যুবক মহিষ রিং-এর ভেতরে নিয়ে আসত। আর এই বৃদ্ধ রিং-এর ভেতরে প্রবেশ করে মহিষের সাথে লড়াই করত। এখন বলুন, মহিষের সাথে মানুষের মোকাবেলা করা কেমন কাজ? মজার বিষয় হলো, শেষ দিকে তিনি যখন আরও বেশি পারদর্শী হয়ে গেলেন, তখন তিনি তিন আঘাতেই মহিষকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। তিনি কী করতেন?

তিনি এই করতেন যে, সাদা কাপড় নিয়ে মহিষের সামনে দাঁড়াতেন। মহিষ তাকে আঘাত করার জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে দ্রুত গতিতে তার কাছে আসত। যখনই মহিষ তার সামনে চলে আসত, তিনি খুব তীব্রতার সাথে একদিকে ছিটকে গিয়ে হাত দ্বারা মহিষের একটি শিংয়ের ওপর প্রচণ্ড একটি আঘাত করতেন। আঘাতে মহিষের সম্পূর্ণ শিং-ই ভেঙে বের হয়ে যেত। এভাবে মহিষের রক্ত বের হলে সেটি আরও রক্তপিপাসু বনে যেত। তারপর অন্যদিক দিয়ে ঘুরে আবার হামলা করতে আসত। মহিষ যখন দ্বিতীয়বার তার দিকে আসত, তখন কাছে আসতেই তিনি অন্যদিকে চলে যেতেন এবং অপর হাত দ্বারা দ্বিতীয় শিং-এর ওপর আঘাত হানতেন। এই আঘাতে মহিষের দ্বিতীয় শিংটিও ভেঙে যেত। তারপর মহিষ যখন তৃতীয়বার তার দিকে আসত, তখন মহিষের রাগ দেখার মতো হতো। সে তীব্র রাগে এবং এমন প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসত যে, টক্কর মেরে বৃদ্ধকে শেষ করে দেবে। কিন্তু যখনই সেটি বৃদ্ধের একেবারে কাছাকাছি চলে আসত, তৎক্ষণাৎ তিনি একদিকে সরে পড়ে সেটিকে একটু সামনে চলে যেতে দিতেন। সামন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার পর সেটির মেরুদণ্ডের হাড়ে এক জবরদস্ত আঘাত হানত। এতে মহিষের মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যেত এবং সেখানেই বসে যেত। তারপর সেটি আর চলাফেরা করার উপযুক্ত থাকত না।

আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, তিনি এমনটি কিভাবে করেছেন! তিনি নিজের সকল শক্তি একস্থানে কেন্দ্রীভূত করা শিখে নিয়েছিলেন। মার্শাল আর্টসওয়ালাগণ নিজ বিষয়ের পাশাপাশি চিন্তাচেতনাও শিক্ষা দেয়। কেননা, এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে একস্থানে প্রয়োগ করার সামর্থ্য এসে যায়। এর অর্থ হচ্ছে, আপন শক্তিকে একস্থানে জমা করা একটি বিস্ময়কর নেয়ামত। আল্লাহওয়ালাদের থেকে যে বড়-বড় কারামত প্রকাশ পায়, সবই তাদের সংকল্পশক্তি এবং চিন্তাশক্তিকে একীভূত করার ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়। হেপ্‌নাটিজম (সম্মোহন বিদ্যা) আপন দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে একীভূত করারই নাম।

হেপ্‌নাটিজম (সম্মোহন বিদ্যা)-এর একটি প্রদর্শনি

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। সে-সময় এখানে জংগ এলাকায় সার্কাস আসে। বড় ভাই আমাদের সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমি ইতিপূর্বে কখনও হাতি দেখিনি। তিনি বলছিলেন, আমি তোমাকে হাতিও দেখাব, বানরের নাচও দেখাব। সেই বয়সে বানর ইত্যাদি দেখতে ভালো লাগে। আমি ছোট ছিলাম বিধায় সেখানে গিয়ে হাতির কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার ধারণা ছিল না, হাতির এত লম্বা শুঁড় থাকে। আমি বুঝতে পারলাম তখন, যখন হাতি তার শুঁড় আমার দিকে প্রসারিত করল। এটা তো ভালো যে, হাতি শুঁড় দিয়ে কিছু করেনি। কিন্তু যখন আমি দেখলাম, যে শুঁড় এখন পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল, সেটা একেবারে আমার সামনে চলে এসেছে, তখন আমি সন্ত্রস্ত হয়ে কিছুটা পেছনে সরে এলাম। এ-সময় আমার ধারণা হয়েছে, হাতির শুঁড়ও একটি বস্তু। যেহেতু আমি জীবনে প্রথমবার হাতি দেখছিলাম, তাই খুব বিস্ময়ের সাথে দেখতে থাকি।

এই সার্কাসে আমরা হেপ্‌নাটিজমের একটা প্রদর্শনি দেখলাম। এক বৃদ্ধ লোক হেপ্‌নাটিজমের কৌশল শিক্ষা দিলেন। সেটি আশ্চর্যকর প্রদর্শনি ছিল। আঠারো-বিশ বছর বয়স্কা একটি যুবতি মেয়ে ছিল। সে একটা দরজা দিয়ে পালিয়ে এল। হাতে তার লোহার দুটি বর্শা। সে বর্শাদুটি হাতে নিয়ে সবাইকে ঘুরে-ঘুরে দেখাচ্ছিল। বর্শার অগ্রভাগ এত ধারালো ছিল যে, আমাদের সন্নিকটে বসা এক ব্যক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাতে হাত লাগালে তার হাত থেকে রক্ত বের হয়ে যায়। সে এটাই দেখাচ্ছিল যে, দেখুন, এগুলোর অগ্রভাব কত ধারালো। মজলিসের সকলকে দেখানো শেষ হলে সে একটা উচুঁ স্থানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। এবার সেই বৃদ্ধ লেকাটি এল। এসে মেয়েটির দিকে তাকাল এবং কী যেন পড়তে লাগল। বৃদ্ধ মেয়েটির দিকে খুব ধ্যানের সাথে দৃষ্টিপাত করছিল।

তারপর প্রশ্ন করল, আমি কে?

আমেল।

তুমি কে?

মামূল।

বৃদ্ধ লাগাতার তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি দেখলাম, কিছুক্ষণ পর মেয়েটি বেহুঁশ হতে শুরু করল। এবার বৃদ্ধ মেয়েটির এক বগলে একটি বর্শা অপর বগলে অন্য বর্শাটি দিয়ে দিলেন। তারপর মেয়েটি যখন বর্শাগুলো

দেখাচ্ছিল, তখন সে নিজের বগলও দেখাচ্ছিল যে, আমার বগলে কিছুই নেই।

মেয়েটি প্রথমে তো সোজা দাঁড়ানো ছিল। তারপর বর্শাগুলোর ওপর চলে এল। এমনকি তার পূর্ণ ভার এই দুই বর্শার ওপর ছেড়ে দিল। এবার সে কিছু পড়তে থাকল। যখন সে সম্পূর্ণরূপে বেহুঁশ হয়ে গেল, তখন যে দুই-তিন ফুট উচুঁ কাষ্ঠের ওপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, বৃদ্ধ সেই কাঠটি বের করে নিল। আমরা খুব পেরেশান হয়ে পড়লাম। এ-সময় মেয়েটি সেই বর্শাদুটির ওপর ঝুলন্ত ছিল। বৃদ্ধ তার কাজ চালিয়ে যায়। তারপর একটি বিস্ময়কর কাজ করল। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ লোকটি মেয়টির এক পার্শ্ব উঠিয়ে তার নিচ থেকে একটা বর্শা বের করে নিল। তারপর একটা বর্শার ওপর মেয়েটির সমস্ত দেহ ঝুলন্ত ছিল। বিজ্ঞানপড়ুয়ারা তো বিষয়টি বুঝতে সক্ষম। কিন্তু আমি তো তখন শিশু ছিলাম। তাই বিষয়টি আমার বুঝে আসছিল না। অবশ্য বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর লাগছিল যে, মেয়েটির এক বগলের নিচে বর্শা আর তার ওপর শূন্যে সে ঝুলে আছে।

তারপর বৃদ্ধ আবার পড়তে থাকল। কিছুক্ষণ পর সে মেয়েটির উভয় পা ধরে শূন্যে সোজা করে দিল। এ-সময় সে শূন্যে এমনভাবে শুয়ে ছিল, যেমনভাবে কোনো মেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। এটা তার ভেল্কির সর্বশেষ ধাপ ছিল। মেয়েটি দুই-চার মিনিট এভাবে শূন্যে শুয়ে থাকে। সকলেই তা দেখছে এবং তালি বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনল এবং মেয়েটি একটা বর্শার ওপর ঝুলতে লাগল। তারপর দ্বিতীয় বর্শাটি নিচে লাগাল। তারপর কিছু পড়ে নিয়ে মেয়েটির নিচে কাঠটি রেখে দিল। তারপর মেয়েটির অবস্থা এমন ছিল, যেমন কেউ বেহুঁশ থেকে হুঁশ হওয়ার পর তার হয়ে থাকে। তার এত ঘাম এসেছিল যে, তার সমস্ত চেহারায় ঘামের ফোটা ছিল। তার কাপড়ও ঘামে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এ-সময় আমাদের থেকে সে পাঁচ-সাত ফুট দূরত্বে ছিল। তারপর দুজন মহিলা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তার জন্য পা উঠানোও কঠিন হচ্ছিল। হেপ্নাটিজমের এই প্রদর্শনি আমি নিজে দেখেছি।

বৃদ্ধ যখন মেয়েটিকে শূন্যে শুইয়ে দিল, তখন আমার পিতার একটি কথা স্মৃতিতে ভেসে উঠল। তিনি একবার জাদুকরদের একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। সাথে এটাও বলেছিলেন যে, এসব জাদুকর দৃষ্টিশক্তির ওপর

জাদু করে। বাস্তবে বিষয়টি তেমন নয়, যেমনটি দেখা যায়। আজও আমার মনে আছে, আব্বাজানের কথা স্মরণ হওয়ার পর আমি আমার চক্ষুদ্বয় মলতে শুরু করি যে, এটা প্রতারণা হচ্ছে, নাকি বাস্তব। সেই ঘটনা বাস্তবিকই এমন হয়েছিল যে, মেয়েটি একটা বর্শার ওপর শুয়ে ছিল।

এবার প্রশ্ন জাগে, এত কিছু কিভাবে হলো? সেটা এভাবে হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি তার সর্বশক্তি একস্থানে একীভূত করে তা অন্যদের ওপর প্রয়োগ করার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল। এজন্যই সে মেয়েটাকে নিজের দৃষ্টিশক্তির নির্ভরতায় রাখতে পেরেছিল।

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, তখন একবার আমি সাইয়্যিদ জাওয়ার হুসাইন শাহ (রহ.)-এর খেদমতে করাচিতে যাই। হযরত জাওয়ার হুসাইন শাহ (রহ.) একজন অনেক বড় আলেম এবং ফকীহ ছিলেন। আমি তাঁকে এই ঘটনা শুনিয়ে নিবেদন করলাম, হযরত! আমি এই ঘটনা নিজে দেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর মূল রহস্য আমার বুঝে আসেনি। হযরত বললেন, এটা কোনো জাদু নয়; বরং সেই ব্যক্তি নিজের দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে এসব করেছে।

বস; এটাই আমার প্রদর্শনি

তারপর হযরত (রহ.) নিজে একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, ইন্ডিয়াতে এক ব্যক্তি প্রদর্শনি দেখাল। সে লোকদের বলেছিল, আমি ঠিক ছটার সময় এসে প্রদর্শনি দেখাব। সময় নির্দিষ্ট ছিল। অনেক লোকের সমাগম হলো। ছটাও বেজে গেল। বরং দশ মিনিট বেশি হয়ে গেল। কিন্তু সেই ব্যক্তি এল না। এভাবে কিছু বিলম্ব করে এল। এসে সালাম দিল এবং বলতে লাগল, যেহেতু এখনও সময় হয়নি, পনেরো মিনিট বাকি, তাই আমি এখন যাচ্ছি এবং আমার সঠিক সময়ে আমি আসব। লোকজন বলল, সময় তো হয়ে গেছে। সে বলল, না, আপনারা আপনাদের ঘড়ি দেখুন। যখন লোকজন নিজেদের ঘড়ি দেখল, তখন দেখা গেল, বাস্তবেই সকলের ঘড়িতে পোনে ছটা বাজছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, ততক্ষণ সকলের ঘড়ির কাঁটা পৌনে ছটাতে-ই থাকল। তারপর সে বলতে লাগল, 'বস; এটাই আমার প্রদর্শনি ছিল। আস্সালামু আলাইকুম।'

টিভির পর্দায় একটি প্রদর্শনি

একজন পি.এইচ.ডি. ডক্টরও তখন হযরত জাওয়ার হুসাইন শাহ (রহ.)-এর খেদমতে বসা ছিলেন। হযরত (রহ.) থেকে এই ঘটনা শুনে তিনি বললেন, হযরত! আমি আপনাকে এরচেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা শোনাচ্ছি। হযরত বললেন, শোনান! তিনি বললেন, একবার ইংল্যান্ডে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি টিভিতে আপনাদের একটা প্রদর্শনি দেখাব। তাকে টিভিতে প্রদর্শনি দেখানোর অনুমতি দেওয়া হলো। প্রদর্শনি দেখানোর শেষ পর্যায়ে সে বলল, সমগ্র দেশে যেব্যক্তিই টিভি দেখছেন, নিজ-নিজ হাতে লোহার কোনো বস্তু নিন। এ কথা শুনে কেউ চামচ ধরল, কেউ ছুরি ধরল। লোকটি লোহার কোনো বস্তু ধরার কথা বলার পর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যার হাতে যা ছিল সব বাঁকা হয়ে গেল। সারা দেশেরে মানুষ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে টিভির পর্দায় বসে এ কথা বলল; আর তার তাওয়াজ্জুহ এত ক্রিয়া করছিল যে, সারা দেশে তার কথায় যে যা ধরেছিল সব বাঁকা হয়ে গেল। পরবর্তী কালে লোকজন তার বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, আপনি আমাদের এই ক্ষতি সাধন করেছেন। সে জবাবে বলল, আমি শুধু এতটুকু বলেছিলাম যে, ধরুন। বাঁকা করতে তো বলিনি।

এর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়, মানুষ নিজের দৃঢ় সংকল্পশক্তিকে একীভূত করে অনেক বিস্ময়কর ও বিরল কাজ করতে সক্ষম। সর্বোপরি মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিও বটে। আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মধ্যে এই গুণাগুণ রেখেছেন। কিন্তু এসব গুণাগুণ আমরা পরীক্ষা করি না।

গুনাহগারদের ওপর আল্লাহওয়ালাদের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব

আল্লাহওয়ালাগণও দৃঢ় সংকল্পশক্তিকেই নিজেদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের ওপর প্রয়োগ করেন। মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, গুনাহের সাগরে ডুবন্ত যুবক আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রবে আসে এবং সামান্য সময় বসে। তিনি বাহ্যত কিছুই করেন না। সাধারণ এক-দুটি কথা বলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতেই তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। যার ফলে সে ফিরে গিয়ে নেককার হয়ে যায়। সে মূলত শাইখের সেই তাওয়াজ্জুহের ওপর অবস্থান করে, যাকে দৃঢ় সংকল্পশক্তি বলা হয়। পরবর্তী কালে এই তাওয়াজ্জুহ অন্তরে ক্রিয়া করতে থাকে।

অনেক হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত। এক যুবক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো। আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অমুক গুনাহের কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বোঝালেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বোঝানোর পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সিনায় হাত রাখলেন এবং তাকে দু'আ করে দিলেন। সেই যুবক বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাত রাখার এমন ক্রিয়া হয়েছে যে, আমার অন্তরে এই গুনাহের প্রতি যত ঘৃণা জন্মেছে, তত ঘৃণা অন্য কোনো গুনাহের প্রতি ছিল না।

এটি কী জিনিস ছিল? এটি বিলুপ্তিকরণ তাওয়াজ্জুহ ছিল। মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সিনায় হাত রাখলেন এবং সিনা থেকে সমস্ত ময়লা-আবর্জনা বের করে দিলেন। এই নেয়ামত আল্লাহওয়ালাদের সিনায় স্থানান্তরিত হয়, যার বদৌলতে তাদের থেকে কারামত প্রকাশিত হয়। যেহেতু আমরা অধিক পরিমাণে যিকির করি না, সেহেতু আমাদের জীবনে এ-জাতীয় ঘটনা ঘটে না।

আমাদের নামাযের অবস্থা

এখনও নিজেদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার যোগ্যতা আমাদের অর্জিত হয়নি। এর পরিচয় এই যে, আমরা যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন নামাযের প্রতি আমাদের মনোযোগ-ই যায় না। যখন এই যোগ্যতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন আমরা নামাযে দাঁড়ালে কেবল নামাযের মধ্যে আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকবে। জনৈক বুযুর্গের কাছে কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনার কি নামাযে দুনিয়ার ধ্যান-খেয়াল আসে? তিনি জবাব দিলেন, না আমার নামাযে দুনিয়ার ধ্যান-খেয়াল আসে, না আসে নামাযের বাইরে। মাশাআল্লাহ! যখন এমনভাবে মনোযোগের সাথে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে ফরিয়াদ করে এবং প্রার্থনা করে, তখন তাকে বলা হয়–

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'(কে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ নাকি তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে?) না সেই সত্তা, যিনি অপারগ ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন?'[১২]

---

১২. সূরা নামল : আয়াত ৬২

আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ অস্থির ও ব্যাকুল বান্দার ফরিয়াদ নিশ্চিত কবুল করে থাকেন। আমাদের মূলত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার কাজটি হয়ে ওঠে না। তাই আমাদের জবানে প্রভাব নেই, কথায় ক্রিয়া নেই। নামাযের মধ্যে সৌন্দর্য নেই। আমাদের অবস্থা তো হলো এই, আমরা নামায পড়তে থাকি; আর আমাদের ধ্যান-খেয়াল বাজারের অলিগলিতে ঘুরতে থাকে। এটা কেয়ামতের নিদর্শনাবালির মধ্যে পরিগণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তোমরা দেখবে, মসজিদ নামাযী দ্বারা ভরপুর থাকবে। কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে শূন্য থাকবে।'

একজন ইমাম সাহেব ছিলেন। তিনি চার রাকাতের নিয়্যাত করে নামায শুরু করলেন। কিন্তু দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে বসে গেলেন। অবশ্য তার সন্দেহ জেগেছে। এজন্য তিনি মুক্তাদীদের কাছে জানতে চেয়েছেন, নামায দুই রাকাত হয়েছে, নাকি চার রাকাত? মুক্তাদীদের মধ্যে এমন কেউ-ই ছিল না, যে নিশ্চিত করে বলতে পারে, নামায কত রাকাত হয়েছে। একপার্শ্বে একজন বৃদ্ধ লোক বসা ছিলেন। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমরা দুই রাকাত পড়েছি। আপনি আবার নামায পড়ান। ইমাম সাহেব দ্বিতীয়বার চার রাকাত পড়ালেন আর মনে-মনে এই ভেবে আনন্দিত হলেন যে, যাক এমন একজন তো পাওয়া গেল, যিনি নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম হলেন, আমরা দুই রাকাত পড়েছি।

নামাযান্তে ইমাম সাহেব তাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত আছে। কেননা, নামাযে আপনার মনোনিবেশ নামাযের দিকেই থাকে। তারপর ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আমি দুই রাকাত পড়িয়েছি? লোকটি জবাবে বলতে লাগল, ইমাম সাহেব! মূল ঘটনা হলো, আমার চার ছেলে। প্রত্যেক রাকাতে আমি এক ছেলের ব্যবসার হিসাব-নিকাশ করি। আজকে আমি মাত্র দুজনের হিসাব করেছিলাম, আপনি সালাম ফিরিয়ে দিলেন; এখনও দুজনের বাকি রইল। এটাই এর দলীল, আপনি চার রাকাত পড়াননি। দুই রাকাত পড়িয়েছেন। যেহেতু নামাযে আমাদের অবস্থা এ-ই হয়, এজন্যই এরূপ নামাযের মাধ্যমে আমাদের বারাকাত ও কামালাত লাভ হচ্ছে না।

একটি কুরআনী সিদ্ধান্ত

কুরআনে কারীমের একটি ফয়সালা হলো–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে।'[১৩]

আমরা নামাযও পড়ি এবং অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরতও থাকি না। এর ফলাফল দাঁড়ায়, আমরা প্রকৃত অর্থে নামাযই পড়ি না। আমাদের নামায যদি প্রকৃত অর্থে নামায হতো, তাহলে অবশ্যই তা আমাদেরকে অশ্লীল এবং গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখত। কিন্তু যেহেতু আমাদের নামায আমাদেরকে গর্হিত কার্যলাপ থেকে বিরত রাখছে না, কাজেই এর অর্থ হলো, আমাদের এই চিকিৎসা ক্রিয়াকারী চিকিৎসা নয়। আমরা এমন নামায কিভাবে পড়ব, যা আমাদের অশ্লীল ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে রুখে দেবে? এজন্য সকল মনোযোগ একস্থানে কেন্দ্রীভূত করা জরুরি। এ বিষয় আল্লাহওয়ালাগণ শিক্ষা দেন। তাদের দু'আ ও সাহচর্যে মানুষের এই নেয়ামত লাভ হয়।

গাইরুল্লাহ-এর ধ্যান-খেয়ালমুক্ত নামায পড়ার ঘটনা

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.), সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর হাতে বাই'আত ছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি এই হাদীছ শরীফ পড়ি, 'যদি কোনো বান্দা দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়ে; যন্মধ্যে নামায বহির্ভূত কোনো ধ্যান-খেয়াল না আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' এই হাদীছ পড়ার পর আমার অন্তরে চিন্তা জাগল, আমি এখনই কেন এরূপ দুই রাকাত নামায আদায় করছি না? তিনি বলেন, আমি দুই রাকাত পড়ার নিয়ত করে নামায শুরু করলাম। কিন্তু নামাযবহির্ভূত খেয়াল এসে গেল। তারপর হিম্মত করে বারবার দুই রাকাত পড়তে থাকলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই কোনো-না-কোনো খেয়াল আসতেই থাকল। এমনকি একবার তো এমন হয়েছে যে, আমি একশো রাকাত পড়ার পর ক্লান্ত হয়ে বসে গেলাম এবং চিন্তা করতে থাকলাম, ইয়া আল্লাহ! এরূপ নামায পড়া কত কঠিন যে, একশো রাকাতের মধ্যে দুই রাকাতও এরূপ আমার নসিব হলো না।

---

১৩. সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৫

তারপর খেয়াল হলো, আমার এই অবস্থা শাইখের কাছে বলব। সুতরাং আমি সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ (রহ.)-এর কাছে নিবেদন করলাম, হযরত! আমি তো একশো রাকাত পড়েছি; কিন্তু তন্মধ্যে দুই রাকাতও এরূপ পড়তে সক্ষম হইনি। তিনি উত্তরে বললেন, রাতে তুমি তোমার চৌকি আমার কাছাকাছি রাখবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। সুতরাং ঈশার পর আমি আমার চৌকি হযরত (রহ.)-এর চৌকির নিকটে রাখলাম। তাহাজ্জুদের সময় হলে আমি উঠলাম। হযরত (রহ.) বললেন, উঠে গেছ? আমি আরজ করলাম, জি। তারপর আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল। হযরত (রহ.) বললেন, যাও আল্লাহর জন্য উজু করো। আমি উজু করে এলাম। এমন উজু আমি আমার জীবনে কখনও করিনি। আল্লাহর দিকে ধ্যান, মনোযোগ, বিস্ময়কর অবস্থা এবং তবিয়তের ওপর ভাবাবেগ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তিনি বলেন, আমি যখন এলাম, হযরত জিজ্ঞেস করলেন, উজু করে ফেলেছ? আমি আরজ করলাম, জি। এবার হযরত বললেন, যাও; আল্লাহর জন্য দুই রাকাত পড়ো। তিনি যে আল্লাহ শব্দ বললেন, এর দরুন আমার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে, যেই-না আমি দুই রাকাতের নিয়ত বাঁধলাম, অমনি ক্রন্দন শুরু করে দিলাম। পূর্ণ নামাযে আমি কান্নাকাটি করতে থাকলাম এবং এরূপ মনে হচ্ছিল যে, আমি আল্লাহর উপস্থিতে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান।

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি এমনটি সম্ভব না হয়, তাহলে এরূপ ধ্যান করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'

এর বাস্তব নমুনায় পূর্ণ নামায পড়লাম। যখন সালাম ফেরালাম, তখন আমার অনুভূত হলো যে, আমি নামায পূর্ণ করেছি। সালাম ফেরানোর পর আমি মনে-মনে ভাবলাম, এর অর্থ হচ্ছে, পূর্বেকার আমার জীবনের সমস্ত নামাযের মধ্যে কোনো নামাযই এমন নেই, যাকে নামায বলা যায়।

পরে হযরত (রহ.) ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নামায কিভাবে পড়েছ? আমি আরজ করলাম, হযরত! আমি এমনভাবে নামায পড়েছি, যেন আল্লাহ আমার সামনে দাঁড়ানো; আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো খেয়ালই ছিল না। তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের পর অবস্থা কী ছিল? আমি আরজ করলাম, নামাযের পর আমার এই খেয়াল ছিল যে, আমার পূর্বেকার নামাযের মধ্যে তো কোনো নামাযই কবুল হয়নি। হযরত (রহ.) জবাব দিলেন, সাহাবায়ে

কেরাম এভাবেই নামায আদায় করতেন। তাঁরা এমনভাবে নামায পড়তেন যে, যখন তাঁরা নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ধ্যান-খেয়াল থাকত না। আর যখন নামায শেষ করতেন, তখন তাদের এই অবস্থা হতো যে, তাঁরা ভাবতেন, আমার নামায তো কবুল হওয়ার উপযুক্তই নয়।

এজন্য আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, বাই'আত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এই যে, সালেক নিজ শাইখের খেদমতে এই মনোবাসনা নিয়ে আসবে, হযরত! আমাকে আল্লাহর অলিদের নামাযের মতো নামায শিক্ষা দিন। বর্তমানে তো দু'আ আর দম-ফুঁক নেওয়ার জন্য বাই'আত হয়ে থাকে। কখনও পানি দম-ফুঁক করিয়ে নিল, কখনও খেজুর ফুঁক করিয়ে নিল এবং কখনও হাদিয়া-তোহফা প্রদান করল। ব্যস; এতটুকুতেই পীর-মুরীদী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পীর-মুরীদীর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, এমন এক বান্দা, যিনি নিজ শাইখের সংশ্রবে থেকে সাহাবাদের নামাযের মতো নামায পড়তে শিখেছেন, আমরাও তাঁর খেদমতে গিয়ে বসব এবং বলব, হযরত! আমাদেরও আল্লাহওয়ালাদের নামাযের মতো নামায পড়া শিক্ষা দিয়ে দেন। বর্তমানে তো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই হয় না। না শিক্ষার্থীদের, না শিক্ষকদের।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার শক্তি

আচ্ছা, বলুন তো দুনিয়াতে যারা বিজ্ঞানী হন, তারা কিভাবে হন? তারা নিজেদের মনোযোগকে একটি বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করেন। তারা একই বস্তুতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে-করতে এত গভীরে চলে যান, যেখানে সাধারণ কোনো লোক যেতে পারে না। এভাবেই তারা বিজ্ঞানী হয়ে যান এবং নিত্যনতুন বস্তু আবিষ্কার করতে থাকেন। যে-কেউ তো নতুন-নতুন বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় না। কেননা, তার মস্তিষ্ক সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আর এজন্য পৌঁছতে পারে না যে, সে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে জানে না। যদি আমরা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি, তাহলে যে-কাজই আমরা শুরু করব, তাতেই আমরা সফল হব ইনশাআল্লাহ।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা

এটি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা-ই তো ছিল যে, হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমি জিহাদে এত বেশি মনোনিবেশ করতাম, নামাযে দাঁড়িয়েও জিহাদের সারি ঠিক করতে থাকতাম। দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে এত

প্রবল ছিল যে, জিহাদ করা অবাস্থায় তো জিহাদই করতে থাকতেন। কিন্তু নামাযের মধ্যেও তাঁর ধ্যান-খেয়াল জিহাদে নিবদ্ধ থাকত। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তাঁর এই আমল যেহেতু নিজের জন্য ছিল না, বরং আল্লাহর জন্য ছিল, তাই নামাযের ভেতরে জিহাদের কাতার ঠিক করাও তাঁর নামাযই ছিল। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ একাগ্রতা দান করেন, তাহলে কী-ইবা বলার থাকবে।

একাগ্রতার এই শক্তি অধিক পরিমাণে যিকির থেকে লাভ হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে যিকিরকারী যদি ছাত্র হয়, তাহলে লেখাপড়ায় কৃতকার্য, যদি ব্যবসায়ী হয়, তাহলে ব্যবসায় সফল, যদি অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকে, তাহলে সেই পেশায় সে সফল হবে। যেহেতু তাদের মধ্যে একাগ্রতা থাকবে, তাই তারা যে-কাজেই আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ মোতাবেক মাশওয়ারা এবং সিদ্ধান্ত তাদের মস্তিষ্কে ঢেলে দেবেন। ফলে তাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

ইউনানি চিকিৎসা বিলুপ্ত হওয়ার কারণসমূহ

প্রথম-প্রথম যে চিকিৎসা হতো, সবই এই দৃঢ় সংকল্পশক্তির মাধ্যমে হতো। মূল ইউনানি চিকিৎসা যা ছিল এখন তো তা লুপ্ত হয়ে গেছে। এর পেছনে দুই প্রকার ত্রুটি কাজ করেছে।

১. হুকুমতের পক্ষ থেকে ত্রুটি : হুকুমতের ত্রুটি হচ্ছে, তারা চিকিৎসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। হুকুমত যদি তাদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করত, বড়-বড় চিকিৎসকদের কর্মসংস্থান হতো, গবেষণা হতো। তাদের প্রাইভেট চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতো, মানুষের মাঝে তাদের পরামর্শ, নিয়ম-পদ্ধতি প্রচার পেত, ফলে আজ এই বিদ্যা মানুষের মাঝে এমনভাবে চলত যেমন হোমিওপ্যাথিক ধারা চলছে।

২. চিকিৎসকদের ত্রুটি : হুকুমত যেহেতু চিকিৎসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেনি, তাই প্রত্যেক চিকিৎসককে নিজ-নিজ পেশা নিজেকেই চালিয়ে নিতে হলো। এ কারণে অর্ধেক চিকিৎসক চিন্তা করল, ঠান্ডা ও সর্দি-কাশির ওষুধ চালানোর মধ্যে তেমন লাভ নেই। তাই আমি অভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসা করি। অতএব, তারা কবিরাজ বাবা বনে গেল। অন্য জাতির লোকজন বিজ্ঞানী হলেন আর আমাদের জাতির বিজ্ঞানীগণ কবিরাজ বাবা হলেন। এখন তারা জায়গায়-জায়গায় লিখিয়ে রেখেছে, পুরুষ কখনও বৃদ্ধ হয় না।

বহিরাগত লোকজন যখন আমাদের দেশের দেওয়ালে-দেওয়ালে এ-জাতীয় লেখা পড়েন, তখন তারা মনে করেন, এখানকার সমস্ত জাতিই দুর্বল। এরা কেবল নিত্যনতুন পেয়ালা তৈরি আর বাদশাহদের থেকে পুরস্কার লাভ করে। কখনও স্বর্ণের পেয়ালা তৈরি করে, কখনও রুপার পেয়ালা তৈরি করে। তারা পেয়ালার মধ্যে লেগে থাকল। যোগ্য চিকিৎসক যারা ছিলেন, তারা অন্যদিকে চলে গেলেন আর বাকি চিকিৎসকগণ শুধু ঠান্ডা আর সর্দি-কাশি ইত্যাদির চিকিৎসা আয়ত্ত করল।

চিকিৎসকদের অনেক বড় ভুল এটাও ছিল, যদি কারও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো সফল তদবির আয়ত্ত হতো, তাহলে তিনি সেটা অন্য কাউকে বলতেন না। আমাকে একজন এমবিবিএস ডাক্তার বললেন, আমার স্ত্রীর অর্শরোগ ছিল। আমি এর চিকিৎসা হাসপাতালের পরিবর্তে একজন হাকীম সাহেবের কাছে করালাম। তিনি এত ভালো চিকিৎসা করলেন যে, আমার স্ত্রী পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল। ডাক্তার বলেন, আমি হাকীম সাহেবের কাছে তদবির সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি। কিন্তু প্রতিবারই তিনি বলেন, আমি বলতে পারব না। অবশ্য এই তদবির আমি আমার ছেলেকে বলব। তিনি নিজের শেষ বয়সে ছেলেকে এই তদবির বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু অল্প বয়সের কারণে ছেলে তদবিরটি ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। তিনি ছেলেকে লিখেও দিলেন। কিন্তু ছেলে লেখাটাও বিনষ্ট করে দিল। এভাবেই এই তদবিরটি বিনষ্ট হয়ে গেল এবং জাতি এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

হাকীমগণ এই তামাশা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল, বিশ্ব আমাকে স্মরণ করবে যে, অমুক হাকীমের কাছে অনেক ভালো তদবির ছিল এবং দুনিয়াতে আমার সুনাম থাকবে। অথচ তারা যদি তদবিরটি ব্যাপক করে দিতেন, তাহলে এর মাধ্যমে দুনিয়াতে তাদের সুনাম থাকত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষ বলত, এই তদবির রমযান সাহেবের আবিষ্কার। এই তদবির সালমান সাহেবের আবিষ্কার। আপনারা কি দেখছেন না, যারা হোমিওপ্যাথিকে কাজ করেছেন, তাদের নাম দুনিয়াতে বাকি আছে। তারা যে বস্তু বা পদ্ধতিই আবিষ্কার করেছেন, প্রচার-প্রসার করে লোকদের দিয়েছেন। এজন্য বর্তমান বিশ্ব তাদের স্মরণ করছে। পক্ষান্তরে আমাদের হাকীম নিজের সিনায় সংরক্ষিত তদবির নিজের সাথে নিয়ে কবরে চলে গেলেন এবং তাঁর সাথে ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যাও সমাহিত হয়ে গেল।

একটি কৃত্রিম চাঁদ

এই আচরণ শুধু ইউনানি চিকিৎসার সাথেই হয়নি; বরং এছাড়াও কতিপয় বিষয়ভিত্তিক দক্ষতাসম্পন্ন লোক নিজেদের বিষয়গত রহস্যও অন্যদের থেকে গোপন রাখতেন। আব্বাসীয় যুগে হাকীম ইবনে হাশেম নামে এক ব্যক্তি একটি কৃত্রিম চাঁদ তৈরি করল। সেটাকে নাখশাবের চাঁদ বলা হতো। কেননা, এই চাঁদ নাখশাব নামের কোয়া থেকে উদিত হতো। এই চাঁদ আনুমানিক দুইশত বর্গমাইল এলাকা আলোকিত করত। এই চাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল, সূর্য অস্তমিত হতেই সেটি উদিত হতো এবং সূর্য উদয় হতেই সেটি অস্তমিত হয়ে যেত। হাকীম ইবনে হাশেম এই চাঁদের মূল রহস্য কাউকে বলেননি। তিনি এর রহস্য বক্ষে ধারণ করেই এসিডের মটকায় পড়ে গেলেন এবং তাতেই মৃত্যুবরণ করলেন।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

اطباء کے حیرت انگیز واقعات (চিকিৎসকদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী) নামে একটি কিতাব আছে। সুযোগ হলে আপনারা কিতাবটি পড়বেন। কিতাবটিতে বাস্তবেই বিস্ময়কর অনেক ঘটনা স্থান পেয়েছে। প্রথম যুগের চিকিৎসকগণ শিরা দেখেই রোগ নির্ণয় করে ফেলতেন। পক্ষান্তরে বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে, ডাক্তার দশ দশটি টেস্ট করানোর পরও বলেন, আমি এখনও বলতে পারছি না, রোগটা কী। উক্ত কিতাবে একটি ঘটনা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, একজন চিকিৎসক ছিলেন খুবই মুত্তাকী। তিনি কখনও মহিলাদের স্পর্শ করতেন না। মহিলাদের হাতের কবজিতে সুতা বাঁধিয়ে এই সুতার সাহায্যে রোগ নির্ণয় করতেন। একবার চিকিৎসকের প্রতিপক্ষদের মধ্যে কেউ বলল, আমি তাকে পরীক্ষা করব, তিনি কিভাবে সুতার মাধ্যমে রোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। সুতরাং সে তাঁর চিকিৎসালয়ে একজন মহিলা নিয়ে গেল এবং পর্দার পেছনে তাকে বসিয়ে দিল। চিকিৎসককে মহিলার নাম বলে দেওয়া হলো। তারপর তিনি সুতা ধরে ব্যবস্থাপত্র লিখলেন, এই রোগীর কাচা গোশ্ত প্রয়োজন। ওষুধ প্রদানকারী কম্পাউন্ডার (ডাক্তারের সহকারী) ব্যবস্থাপত্র হাতে নিয়ে হতবাক হয়ে গেল এবং চিকিৎসকের কাছে এসে বলল, হাকীম সাহেব! এটা কী লিখেছেন? এই মহিলার কি কাচা গোশ্ত প্রয়োজন? হাকীম সাহেব বললেন, হ্যাঁ, সুতার মাধ্যমে তার এই রোগের সন্ধানই আমি পেয়েছি। রোগীকে ডেকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তখন সে বলল, আমি

বিড়ালের কবজিতে সুতা বেঁধেছিলাম। মূলত এই মহিলা হাকীম সাহেবকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি বিড়াল নিয়ে এসেছিল এবং নিজের হাতের কবজিতে সুতা না বেঁধে বিড়ালের কবজিতে বেঁধেছিল।

চিকিৎসকদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ফলাফল

চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি পুস্তক আছে 'আল-কানূন'। কিতাবটি শত-শত বছর পূর্বের লেখা। তাতে যা কিছু লেখা হয়েছে, সব বর্তমানেও শতভাগ সঠিক। এক চিকিৎসক 'মৃত্যুর নিদর্শন' নামে পুস্তক লিখেছেন। তিনি বলেছেন, যখন এই নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়, তখন মৃত্যু অনিবার্য হয়ে যায়। বর্তমানে চিকিৎসাজগতে এত উৎকর্ষ সাধন সত্ত্বেও সেই নিদর্শনগুলোকে বাস্ত ব নিদর্শন বলা হয়। অর্থাৎ– বলা হয়ে থাকে, বর্তমানেও যদি সেসব নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে মানুষ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে না। ইবনে সূরীর পুস্ত কে গাছের শুকনা শিকড়ের রঙিন অনেক ছবি ছিল। পুস্তকটিতে সেসব শিকড়ের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ ছিল। আবুল কাসিম যাহরাবি কিডনির পাথর বের করতে অপারেশনের জন্য শরীরের যে স্থান নির্ধারণ করেছিলেন, আজও পর্যন্ত তারই অনুকরণ হচ্ছে। রক্ত প্রবাহের নতুন থিউরিকে উইলিয়াম হারবের আবিষ্কার বলা হয়ে থাকে। অথচ তারও অনেক পূর্বে ইবনে নাফীস এই থিউরি আবিষ্কার করেছিলেন।

এই জ্ঞান তাঁদের কিভাবে অর্জিত হয়েছে? তাঁরা নিজেদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে নিজ-নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা সেই কাজ সম্পর্কিত উপকারী জ্ঞান তাদের মস্তিষ্কে ঢেলে দিতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই মনোযোগই নেই। যদ্দরুন গবেষণাকর্মও নেই। বরঞ্চ আমাদের দেশে তো কোনো শাখাতেই গবেষণা হচ্ছে না।

স্পেশালিষ্ট (বিশেষজ্ঞ) হওয়ার পদ্ধতি

নিজের দৃঢ় সংকল্পশক্তি কেন্দ্রীভূত করতে না পারার কারণে আমাদের নামাযই কেবল দুর্বল হচ্ছে, তা নয়; বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা দুর্বল। কোনো ক্ষেত্রেই আমরা সামনে অগ্রসর হচ্ছি না যখন কাফের-মোশরেকরা সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে। এর কারণ এই যে, তারা নিজেদের সর্বশক্তি একস্থানে কেন্দ্রীভূত করছে। এ কারণেই তাদের মধ্যে স্পেশালিষ্ট গঠনের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ– তারা শিশুর পাঁচ-সাত বছর বয়সেই অনুমান করে

ফেলে, এই শিশু কোন ধরনের খেলা খেলতে পারদর্শী হবে। তাকে সেই খেলাতেই অভ্যস্ত করে, যেদিকে তার আকর্ষণ আছে। একেই Aptitude test তথা আকর্ষণ পরীক্ষা বলা হয়। এই শিশু যখন যুবক হয়, তখন সে এই খেলায় সমগ্র বিশ্বে ফাস্ট হয়ে যায়। আমাকে এক জায়গায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ছেলেমেয়েকে এগারো-বারো বছর বয়স হওয়ার পর নিয়ে যাওয়া হয় নির্দিষ্ট কোনো খেলা খেলানোর জন্য, তাহলে তারা বলে, আপনারা বিলম্ব করে নিয়ে এসেছেন। কাজেই তাকে নিয়ে যান। তাকে দিয়ে এখন চলবে না। অর্থাৎ– তারা এগারো-বারো বছর বয়স হওয়ার পর কোনো ছেলেমেয়েকে খেলায় অন্তর্ভুক্তই করেন না। তারা বলেন, তাকে শৈশবে নিয়ে আসা উচিৎ ছিল। এভাবে তারা শৈশবকালেই শিশুর মেজায কোন খেলার প্রতি ধাবিত সেটা উপলব্ধি করে তাকে তখন থেকেই প্রস্তুত করতে শুরু করে। আর সে শিশু বয়স থেকেই খেলতে থাকে। এভাবে খেলতে-খেলতে একটা পর্যায়ে সে এমন পারঙ্গম হয়ে ওঠে যে, সারা বিশ্বে সে প্রথমস্থান অর্জন করে নেয়।

ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ফলাফল

নিজের সর্বশক্তি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করার বৈশিষ্ট্য আমাদের চার ফকীহ ইমামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যখনই তাঁরা কোনো মাসআলা নিয়ে গবেষণা করতেন, তখন তারা এর একেবারে গভীরে চলে যেতেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) এই ময়দানে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিলেন। উদাহরণত–

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) একবার দরস দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এক মহিলা মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এলেন। যেহেতু ইমাম সাহেব দরস দিচ্ছিলেন, তাই মহিলা নিজ থেকেই দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এক শিশুর হাতে একটি আপেল দিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে পাঠালেন। শিশুটি ইমাম সাহেবের কাছে আপেলটি দিলে তিনি আপেলটি দুই ভাগ করে ফিরিয়ে দিলেন। এ নিয়ে তাঁর চল্লিশজন শাগেরদ দিনভর ভাবতে থাকলেন, মহিলা কী করলেন আর ইমাম সাহেব (রহ.) কী করলেন। কিন্তু তাঁদের কিছুই বুঝে এল না। পরিশেষে তাঁরা নিবেদন করলেন, হযরত! আপনিই আমাদের বলে দিন, ব্যাপারটা কী ছিল? ইমাম সাহেব (রহ.) বললেন, মহিলা আমার কাছে

ফিক্‌হের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। তাঁরা আরজ করলেন, হযরত! 'আপেল পাঠিয়ে ফিকহের কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা যায় তা বোঝা আমাদের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে।

হযরত (রহ.) বললেন, মহিলা হায়েয অবস্থায় ছিল এবং তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, আমার ওপর গোসল কখন ওয়াজিব। এজন্য সে আমার কাছে এমন একটি আপেল পাঠিয়েছে, যার এক পার্শ্ব রক্তের মতো সম্পূর্ণ লাল রংবিশিষ্ট ছিল আর অপর পার্শ্ব হালকা ধরনের হলদে বর্ণের ছিল। মহিলা জানতে চেয়েছিল, যদি কোনো মহিলার অবস্থা এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত এসে যায়, তাহলে গোসল করতে পারবে কিনা? এজন্য আমি আপেলটি দুই টুকরা করে ফেরত দিলাম। যার মাঝে এই বার্তা ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপেলের ভেতরকার শুভ্রতার মতো কাপড় সম্পূর্ণ সাদা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করতে পারবে না।

একবার এক বৃদ্ধ ইমাম সাহেবের মাহফিলে এলেন। এসে তিনি ইমাম সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, وَاوٌاَوٌوَاوَيْن হযরতের শাগরেদগণ বৃদ্ধের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, বৃদ্ধ কী বলছেন। ইমাম সাহেব জবাবে বললেন, وَاوَيْن। তারপর বৃদ্ধ প্রত্যাবর্তন করা অবস্থায় বললেন, ىٌىٌ। ইমাম সাহেবের চল্লিশজন শাগরেদের মধ্যে অধিকাংশই ফকীহ ও মুহাদ্দিছ পর্যায়ের লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না, দুই পক্ষের মাঝে কী কথোপকথন হয়েছে। তাঁরা দিনভর চিন্তাভাবনা করতে থাকলেন, এই গোপন রহস্যের সমাধান কী। কিন্তু তাঁরা সমাধান বের করতে পারেননি। পরিশেষে হযরতের কাছে আবেদন করা হলো, হযরত! আপনি-ই বলে দিন, এই বৃদ্ধ কী বললেন আর জবাবে আপনি কী বললেন?

ইমাম সাহেব বললেন, বৃদ্ধ আমার কাছে ফিক্‌হের মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। তাঁরা বললেন, হযরত! এটি একটি আশ্চর্যকর মাসআলা, যা আমাদের বুঝে আসেনি। হযরত (রহ.) বললেন, লোকটি বলেছে, وَاوٌاَوٌوَاوَيْن। তিনি মূলত আমার কাছে নামাযের মাসআলা জিজ্ঞেস করছিলেন যে, যখন আমি আত্তাহিয়্যাতু পড়তে বসব, তখন আমি এটি এক , এর সাথে পড়ব, নাকি দুই , এর সাথে পড়ব? উত্তরে আমি বললাম, দুই ,-এর সাথে পড়বেন।

এ কারণেই আমরা হানাফীগণ এরূপ পড়ি–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ

এখানে সুস্পষ্ট যে, এর মধ্যে দুই , আছে। অন্য মাযহাবের লোকজন এক , -এর সাথে পড়েন। এবার শাগরেদগণ আরজ করলেন, হযরত! এই বিষয়টি তো এখন আমাদের বুঝে এসেছে। কিন্তু আপনার উত্তরের প্রতিউত্তরে বৃদ্ধ যে বলল, لا غربية ولا شرقية এর উদ্দেশ্য কী ছিল? ইমাম সাহেব বললেন, লোকটি প্রস্থানকালে আমাকে দু'আ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, হে আবুহানীফা! আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এই ইল্‌ম দান করেছেন। তিনি নিজ রহমতে এই ইল্‌ম সমগ্র দুনিয়ায় প্রসারিত করুন এবং পবিত্র গাছের মতো করুন, لا شرقية ولا غربية, অর্থাৎ– কেবল প্রাচ্যও নয় এবং কেবল পাশ্চাত্যও নয়।

সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক কি এত বেশি গভীর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারে? এই নেয়ামত কেবল সেসব লোকদেরই লাভ হয়, যারা নিজের মনোযোগকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে নেন। তাসাওউফ আমাদের এই বিষয়ই শিক্ষা দেয় যে, নিজের সমস্ত মনোযোগ নফসের ওপর কেন্দ্রীভূত করো। তারপর দেখবেন, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষসহ অন্যান্য সকল পাপ-পঙ্কিলতা কিভাবে পালায়। নিজেদের মনোযোগ নিজ-নিজ কাজে কেন্দ্রীভূত করুন। পরে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের মস্তিষ্কে সেই কাজের উপযুক্ত ইলহাম কিভাবে দান করেন। বর্তমানে এই দুই নেয়ামত না থাকার কারণে আমাদের জীবন সকল ময়দানে অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অধিক পরিমাণে যিকির করার তাওফীক দান করুন, যেন আমরা দৃঢ় সংকল্পশক্তির উঁচু স্তরও অর্জন করতে পারি এবং নিজেদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করারও সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

কবুল হওয়ার ভাবনা

'একটি ব্যাপক উদাহরণ বুঝুন। এক মহিলা অভিজাত বংশীয়। অনেক উচ্চশিক্ষিতা, খুবই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও ভদ্র। বাড়ির সমস্ত কাজে দক্ষ। এই সবকিছুকেই তার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বলে। আর এসবের সাথে-সাথে সে যদি স্বামীর কাছে পছন্দনীয়ও হয়ে যায়, তাহলে একে কবুলিয়াত তথা কবুল হওয়া বলে। আপনারা দেখে থাকবেন, কখনও-কখনও এরূপ গুণবতী রূপসি মহিলাও তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, তার মধ্যে যোগ্যতা-উপযুক্ততা, গুণাগুণ সবই আছে। কিন্তু সে কবুলিয়াত থেকে বঞ্চিত। ঠিক তদ্রূপ যদি লোকজন আমাদের মুফতী সাহেব বলেন, খতীব সাহেব বলেন, পীর সাহেব বলেন, সূফী সাহেব বলেন, তাহলে কী লাভ? দেখার বিষয় তো হলো, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের কাছে কবুল তথা গৃহীত, নাকি গৃহীত নয়।'

কবুলিয়াতের ফিকির

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

و قال الله تعالى في مقام آخر اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ج

و قال الله تعالى في مقام آخر اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

কাবেলিয়াত ও কবুলিয়াত (যোগ্যতা ও কবুল হওয়া)-এর তাৎপর্য

দুটি শব্দ সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি تابليت (যোগ্যতা), অপরটি قبوليت (কবুল হওয়া) শব্দদুটির তাৎপর্য ভালোভাবে বোঝা জরুরি। تابليت (যোগ্যতা)-এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সামর্থ্য থাকা, গুণাগুণ থাকা, পূর্ণাঙ্গতা থাকা, ভালো বংশীয় হওয়া, রূপ-লাবণ্যে সেরা হওয়া, মর্যাদা ও পরিপূর্ণতায় শ্রেষ্ঠ হওয়া, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগণ্য হওয়া, জ্ঞান-গরিমায়ও উচ্চাঙ্গের হওয়া, সকল ক্ষেত্রে অভিজাত হওয়া, নিজের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে আঞ্জামদানে অভিজ্ঞ হওয়া এবং নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতা থাকা। এগুলোকে যোগ্যতা বলা হয়। قبوليت (কবুল হওয়া) হচ্ছে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয়ও হয়ে যাওয়া। এ থেকে বুঝে আসে تابليت (যোগ্যতা) এক জিনিস, قبوليت (কবুল

হওয়া) ভিন্ন জিনিস। এরূপও হয়ে থাকে যে, কোনো ব্যক্তির قابلیت (যোগ্যতা) থাকা সত্ত্বেও তার قبولیت (কবুল হওয়া) ভাগ্যে জোটে না। এটা বড় ভয়ের বিষয়। এ সংক্রান্ত অনেক উদাহরণ উপস্থাপন করা সম্ভব।

যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কবুল না হওয়ার ঘটনাবলি

ইবলীস আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়া

আযাযীল (শয়তান) আল্লাহ তা'আলার এত ইবাদাত করেছে যে, সে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে-কোণে সেজদা করেছে। এমনকি সে طاؤس الملائكة (ফেরেশতাদের ময়ূর) উপাধিতে ভূষিত হয়। এত অধিক পরিমাণে ইবাদাতকারী হওয়া যোগ্যতার বিষয়। তার কাছে ইল্‌মও ছিল। এজন্যই তো যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আদমকে সেজদা করলে না কেন? সে আগ বেড়ে দলীল পেশ করতে থাকল–

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

'আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন (যা উর্ধ্বমুখী) আর তাকে (হযরত আদম আ.) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন (যা নিম্নমুখী)।'[১৪]

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) বলেন, এই শয়তান আবেদও ছিল, আলেমও ছিল। বরং তিনি বলেন, সে আরেফও ছিল। কেননা, যখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ

'সুতরাং তুই আমার দরবার থেকে বের হয়ে যা। কেননা, তুই অভিশপ্ত।'[১৫]

তো তার জ্ঞান ছিল, ক্রোধের সময়ও আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য তার থেকে পৃথক হয় না। তাই তৎক্ষণাৎ সে বলতে লাগল–

رَبِّ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

'হে প্রভু! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে দিন।'[১৬]

---

১৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২
১৫. সূরা হিজর : আয়াত ৩৪
১৬. সূরা হিজর : আয়াত ৩৬

জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন,

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ

'তোকে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সুযোগ দিয়ে দেওয়া হলো।'[১৭]

সুতরাং এটা কামালাতের বিষয়। সে আলেমও ছিল, আবেদও ছিল, আরেফও ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটি গুণের কমতি ছিল; সে আল্লাহর আশেক ছিল না। যদি আশেক হতো, তাহলে মাহবূবের নির্দেশ শুনে কখনওই অস্বীকার করত না। নির্দেশ হওয়ার সাথে-সাথে সেজদাবনত হয়ে যেত। তাই সেসব কামালাত থাকা সত্ত্বেও তাকে বিতাড়িত করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন–

إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

'কেয়ামত পর্যন্ত তোর প্রতি আমার অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকবে।'[১৮]

মোটকথা, তার মধ্যে قابليت (যোগ্যতা) তো ছিল, কিন্তু قبوليت (কবুল) তার ভাগ্যে জোটেনি।

ফেরাউনের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হওয়া

ফেরাউন তার যুগের বড় অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ ছিল। সে এত দাম্ভিক ও সীমালঙ্ঘনকারীতে পরিণত হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ.)কে তার কাছে যাওয়ার হুকুম দিলেন, তখন ইরশাদ করলেন–

اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى

'আপনি ফেরাউনের কাছে যান, নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'[১৯]

তার সরকার এত শক্তিশালী ছিল যে, তারা বনী ইসরাঈলের সন্তানদের জবাই করে দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ ছিল না। আপনারা একটু চিন্তা করুন। বর্তমানে বড় থেকে বড় রাষ্ট্রপ্রধান কারও সন্তানকে জবাই করুক; দেখবেন পরদিনই তার সিংহাসন উল্টে গেছে। ফেরাউন হাজার-হাজার শিশু জবাই করিয়েছে; অথচ তার

---

১৭. সূরা হিজর : আয়াত ৩৭

১৮. সূরা হিজর : আয়াত ৩৫

১৯. সূরা নাযি'আত : আয়াত ১৭

বাদশাহিতে এর কোনো ক্রিয়া-ই হয়নি। মুফাস্সিরীনে কেরাম লিখেছেন, সে আনুমানিক একশো বছর হায়াত পেয়েছিল। তার শারীরিক সুস্থতা এত ভালো ছিল যে, তার কখনও মাথাব্যথাও হয়নি। তার সুস্থতাও ছিল, ধনভান্ডারও ছিল, ক্ষমতাও ছিল, তার কাছে ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও ছিল। তাই তো সে একবার স্বজাতিকে বলতে লাগল–

أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ

'মিশরের রাজত্ব আমার নয় কি এবং এসব নদী, যেগুলো আমার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে?'[২০]

পানির ব্যবস্থাপনার ওপর তার খুব গর্ব ছিল। এত সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়নি। ফলে ঈমান আনয়নের তাওফীক তার নসিব হয়নি। অবশেষে ডুবতে-ডুবতে এবং মরতে মরতে বলতে থাকল–

اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

'আমি মূসা ও হারূনের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।'

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বললেন–

اٰلْئٰنَ

'এখন ঈমান আনলে?'

এখন তো অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

ফেরাউন মারা যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার দেহটা সংরক্ষণ করলেন, যাতে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

ওমর ইবনে হিশামের ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া

ওমর ইবনে হিশাম মক্কার সর্বোচ্চ জ্ঞানী লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। সে নিজেকে নিয়ে এত অহংকারী ছিল যে, সায়্যিদুনা ওমর ফারূক (রাযি.)-এর নামও ওমর ছিল। কিন্তু ওমর ইবনে হিশাম সায়্যিদুনা ওমর ফারূক (রাযি.)কে বলত, আমাকে ওমর বলা চাই আর আপনার ক্ষেত্রে উমাইর (যার অর্থ ছোট ওমর) বলা চাই। তাই তো ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)কে ঈমান আনয়নের পূর্বে উমাইর বলা হতো। ওমর ইবনে

---

২০. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫১

হিশাম তাকে ওমর বলতে দিত না। সে বলত, ওমর আমি-ই। সে এত জ্ঞানী ছিল যে, যেসব কাজ অনেক লোকের সমন্বয়েও সমাধান হতো না, সে একাই সেসব কাজ সমাধান করে দিত। এজন্য লোকজন তার নামকরণ করে أَبَا الْحَكَمِ (জ্ঞানীদের পিতা)। পরবর্তী কালে দীন কবুল না করায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখে দেন আবুজাহ্‌ল। অর্থাৎ- মূর্খতার পিতা। দেখুন, যোগ্যতা এত বেশি যে, সে কুরাইশের সরদার, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অঢেল ধনসম্পদের মালিক, লোকজন তার ইশারায় নাচতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয়নি। ফলে সে কাফের অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে।

ওয়ালীদের অহংকার তাকে নিয়ে ডুবেছে

আরেকজন সরদারের নাম ছিল ওয়ালীদ। তার বারোটি ছেলে ছিল। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, সে যখন ছেলেদের পাশে বসত, তখন অহংকারে গদগদ করত এবং বলত, বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বে আমার মতো আর কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ○ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ○ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ○ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ○

'আমাকে ও তাকে ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অদ্বিতীয় করে; আর তাকে প্রদান করেছি প্রচুর ধনসম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী অনেক ছেলে এবং তার জন্য সকল উপকরণ প্রস্তুত করে দিয়েছি।'[২১]

এবার দেখুন, এত কিছুর অধিকারী সে ছিল, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে সে কবুল হয়নি; ফলে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত রইল। অথচ, একবার সে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের এক বৈঠকে বলেছিল, আমি নিজে একজন কবি, আলোচনা-বিবৃতি আমি বুঝতে সক্ষম, আমার কাছে এই কুরআন কবির কীর্তি মনে হয় না এবং পাগলের প্রলাপও মনে হয় না। কিন্তু লোকজন যখন তাকে প্রশ্ন করল, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তখন সে সহকর্মী ও অন্যান্য লোকদের খুশি করার জন্য বলল, আমি ভেবেচিন্তে বলছি। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার ভান করার পর বলল, এ তো জাদু, যা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে।

---

২১. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ১১-১৪

তার এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ○ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ○

'নিঃসন্দেহে সে চিন্তা করল এবং মনঃস্থির করল; সুতরাং সে ধ্বংস হোক, কিভাবে সে মনঃস্থির করল!'[২২]

দেখুন, কত-ই না শাহী আন্দাজে আল্লাহ তা'আলা তার অবস্থা বর্ণনা করছেন। সতুরাং এই ওয়ালীদ পলীদও পরিশেষে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

আবুল ফযল ও ফয়েজির বঞ্চনা

হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর সময়ে এক পরিবারে দুই ভাই ছিল। একজনের নাম আবুল ফযল, অপরজনের নাম ফয়েজি। তারা দুজনই সে-সময়কার বড় পণ্ডিত আলেম ছিলেন। তাদের ইল্‌মের অবস্থা এই ছিল যে, তাঁরা কুরআন মাজীদের একটি তাফসীর লিখেছেন নুকতাবিহীন আরবি ভাষায়। অর্থাৎ– এই তাফসীরে ب,ت,ث,ج ইত্যাদি নুকতাবিশিষ্ট্য কোনো হরফই ব্যবহার করেননি। তাঁরা তাফসীরটির নামকরণ করেছেন 'সাওয়াতিউল ইলহাম' নামে। এই নামের মধ্যেও নুকতা নেই। এক লাইব্রেরীতে তাফসীরটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি বিস্মিত ছিলাম, তারা এরূপ শব্দ কোথা থেকে এনে থাকবেন? পূর্ণ কুরআন মাজীদের তাফসীর লেখা-ই তো কত বড় কাজ। সেখানে আবার এমন শব্দ দ্বারা লেখা, যন্মধ্যে কোনো নুকতা থাকবে না, সেটা নিতান্তই কঠিন কাজ। বাহ্যিকভাবে চিন্তা করে দেখুন, কত যোগ্যতার অধিকারী তাঁরা ছিলেন। সীমাহীন মেধাবী ছিল। উভয়ের কাছেই ফটোগ্রাফিক মেমোরী ছিল।

আবুল ফযল বয়সে বড় ছিল। তার সামনে কোনো বিষয় দুবার পাঠ করা হলে সেটা তার মুখস্থ হয়ে যেত। ফয়েজি ছিল বয়সে ছোট। তার সামনে কোনো বিষয় একবার পাঠ করা হলে সেটা তার মুখস্থ হয়ে যেত। তাই তারা তখনকার কবিদের নাকের আগায় নিশ্বাস এনে রেখেছিলেন। যখন কোনো কবি বাদশাহর প্রশংসামূলক কবিতা লিখে নিয়ে আসত, তখন বাদশাহ তাকে দরবারে সেটি পড়ে শোনাতে বলতেন। কবি দাঁড়িয়ে সেটি পড়ে শোনালে ফয়েজী সেই কবিতা মুখস্থ করে ফেলত। তারপর সে দাঁড়িয়ে বলত, বাদশাহ

---

২২. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ১৯, ২০

সালামত! এটা তো আমার রচনা। বাদশাহ বলতেন, এটা তোমার রচিত হলে এবার তুমি শোনাও। সে দাঁড়িয়ে পূর্ণ লেখা শুনিয়ে দিত। যখন ফয়েজি শোনাল, তো এটা দুবার শোনা হয়ে গেল। এবার বড় ভাই আবুল ফযলও দাঁড়িয়ে বলত, বাদশাহ সালামত! আমি সাক্ষ দিচ্ছি, এটা আমার ভাইয়ের রচিত। তারপর সেও শুনিয়ে দিত। অনুমান করুন, তারা কত প্রখর মেধাবী ছিল এবং তাদের কাছে কী পরিমাণ ইল্‌ম ছিল? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দরবারে তারা কবুল হয়নি এবং শুধু দরবারী মোল্লা হয়েই থাকল। এই দুই ভাই-ই সেই লোক, যারা ফাতাওয়া দিয়েছিল, বাদশাহকে সম্মানসূচক সেজদা করা জায়েয। এই দুজনই ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর বিরোধিতা করেছে এবং তারাই তাঁকে জেলখানায় পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়েছে। এই ভেবে হতভম্ব হয়ে যাই যে, তারা দুজনই যুগের মুজাদ্দিদের শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

একটি ব্যাপক উদাহরণ

একটি ব্যাপক উদাহরণ বুঝুন। এক মহিলা অভিজাত বংশীয়, অনেক উচ্চশিক্ষিতা, অনিন্দসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, ভদ্র এবং বাড়ির সমস্ত কর্ম-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এই সবকিছুকেই তার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বলে। আর এসবের সাথে-সাথে সে যদি স্বামীর কাছে পছন্দনীয়ও হয়ে যায়, তাহলে একে কবুলিয়াত তথা কবুল হওয়া বলে। তাই তো আপনারা দেখে থাকবেন, কখনও-কখনও এরূপ গুণবতী রূপসি মহিলাও তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তো আর তালাক দেয় না। যেকোনো কারণে অপছন্দনীয় হওয়ার কারণেই সব সময় স্ত্রীকে নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

আমার এক দোস্ত বলেন, আমার পাঁচ বোন। চারজনের দেহাবয়ব ও শিক্ষা মধ্যম পর্যায়ের। এক বোন এমন যে, আমরা পরিবারের লোকজনও তার মেধা এবং রূপ-লাবণ্যে বিস্মিত। যখন কোনো মহিলা আমাদের বাসায় পাত্রী দেখতে আসত, তখন আমার মা এই বোনকে আলমারীর পেছনে লুকিয়ে রাখতেন যেন কারও দৃষ্টি তার প্রতি না পড়ে। নতুবা তারা তার সাথেই সম্বন্ধ করতে চাইবে। দোস্ত বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, পাঁচ বোনেরই বিয়ে হলো। তাদের মধ্যে অন্য চারো বোনের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় ভরপুর জীবন লাভ হলো। কিন্তু এই সুন্দরী বোনের তালাক হয়ে গেল এবং বাড়িতে ফিরে এল। এর মাধ্যমে সহজেই অনুমিত হয়, যোগ্যতা ভিন্ন জিনিস আর কবুল হওয়া ভিন্ন জিনিস।

কবুল হওয়ার সৌভাগ্য লাভকারীদের দৃষ্টান্ত

সায়্যিদুনা ইবরাহীম (আ.)-এর কবুল হওয়া

সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে কবুল হওয়ার চিন্তা লেগেই থাকত। তিনি আল্লাহর ঘর নির্মাণ করেছেন এবং নির্মাণ করা অবস্থায় তা কবুল করার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন। কুরআন মাজীদে তাঁর সেই দু'আ বর্ণিত হয়েছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'স্মরণ করুন সেই সময়কে, যখন ইবরাহীম বাইতুল্লাহর ভিত্তি উঠাচ্ছিল, সাথে ইসলমাঈলও, (তখন তারা বলেছিল), হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে (এ কাজ) কবুল করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'[২৩]

যিনি কবুল হন, তার মধ্যে এরূপ চিন্তাভাবনা লেগেই থাকে। মাত্র কাজের সূচনা হচ্ছে কিংবা এখনও পরিকল্পনাধীন; এ অবস্থায়ই যেন আল্লাহর দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কবুল করে নিলেন এবং সাথে-সাথে বলে দিলেন–

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ط قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

'আর স্মরণ করুন সেই সময়টাকে, যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেন। তারপর তিনি সেসব পূর্ণ করেন। আল্লাহ বললেন, (হে ইবরাহীম) আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম বানাব।'[২৪]

এটাই কবুল হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানবজাতির ইমাম বানিয়ে দিলেন এবং কুরআনে কারীমের মধ্যে এত হৃদয়গ্রাহী আন্দাজে তাঁর আলোচনা করলেন যে, যখনই এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করি, অভিভূত হয়ে যাই।

---

২৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৭

২৪. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৪

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল একটি উম্মত।'[২৫]

অনেক সময় একা এক ব্যক্তিই নিজ সত্তায় একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। এমনিভাবে ইবরাহীম (আ.) একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে তাঁর মর্যাদা এত বেশি ছিল যে, তাঁকে একটি উম্মত তথা জাতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা সামনে ইরশাদ করেন–

قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ط اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○ وَآتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ○ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ○

'তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্যকারী ছিলেন এবং তিনি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী ছিলেন; আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করে নিলেন এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করলেন। আর আমি তাঁকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করলাম এবং নিঃসন্দেহে তিনি পরকালেও অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, আপনি ইবরাহীমের দীন অনুসরণ করুন একনিষ্ঠভাবে।'[২৬]

এটি ইবরাহীম (আ.)-এর কবুল হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীবকেও তাঁর সম্পর্কে প্রত্যাদেশ করলেন। সুবহানাল্লাহ!

বিবি মারয়াম (আ.)-এর কবুলিয়াত

হযরত ইমরান (আ.) নামে আল্লাহ তা'আলার একজন নবী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় আগত সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন। দেখুন, কবুল কোথায় হয়? যেখানে শুরু থেকেই কবুল হওয়ার চিন্তা ভাবনা লেগে থাকে। ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় ঘরের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল এবং সাথে-সাথে কবুল হওয়ার দু'আও করা হচ্ছিল। এখানে মারয়াম (আ.)-এর সন্তান এখনও গর্ভে, ভূমিষ্ট হয়নি; মা তখন থেকেই কিভাবে কবুল

---

২৫. সূরা নাহল : আয়াত ১২০

২৬. সূরা নাহল : আয়াত ১২০-১২৩

করানো যায় সেই ভাবনায় ব্যস্ত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সেই বাস্তব অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

'আর স্মরণ করুন সেই সময়টি, যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমি আমার গর্ভের সন্তানকে আপনার জন্য মান্নত করেছি (আপনাকে সঁপে দিয়েছি) সবকিছু থেকে মুক্ত করে। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন।'[২৭]

লক্ষ্য করুন, আমরা তো বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি এবং এ পর্যায়ে এসে কবুল হওয়ার কথা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। কিন্তু যারা কবুল হয়েছেন, তাঁরা মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই মা তাদের জন্য কবুলিয়াতের দু'আ চাওয়া শুরু করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের কবুল করেছেন। মারয়ামকে কবুল করার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

'অতএব তাঁর প্রভু তাকে উত্তমরূপে কবুল করলেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে বড় করলেন।'[২৮]

আল্লাহ তা'আলা মারয়ামকে (আ.) কবুল করে নিলেন। কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কী সম্মান দান করলেন? শুনুন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ○

'(ফেরেশতা বললেন,) হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বজগতের নারীদের ওপর তোমাকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।'[২৯]

বোখারি শরীফের কবুলিয়াত

সিহাহ সিত্তাহ (সহীহ হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব) এমন ছয়টি কিতাব, যেগুলো সম্পর্কে উম্মতের মুহাদ্দিছীনে কেরাম একমত যে, এসব কিতাবে

---

২৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫
২৮. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৭
২৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৪২

লিপিবদ্ধ হাদীছসমূহের একটি বড় মর্যাদা রয়েছে। এজন্যই ওলামায়ে কেরাম দরসে নেযামীর শেষ বছর এই কিতাবগুলো পড়েন এবং পড়ান। সেসব কিতাবের মধ্যে 'মুআত্তা ইমাম মালেক' একটি। উক্ত কিতাবে ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনার দৃষ্টিকোণ থেকে এমন মজবুত হাদীছসমূহ লিখেছেন, যেসব হাদীছের বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।

হাদীছ বর্ণনার একটি সূত্র হলো, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), তাঁর থেকে তাঁর গোলাম ইমাম নাফে' (রহ.) এবং তাঁর থেকে ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেন। এই সূত্রকে سِلْسِلَةُ الذَّهَبِ (সোনালি সূত্র) বলা হয়। তাঁরা তিনজনই এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, তাদের এই সূত্র যেন স্বর্ণের চেইনের মতো। ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর কিতাবে এরূপ শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হাদীছই জমা করেছেন এবং কিতাবটি 'সিহাহ সিত্তা'র মধ্যে শামিল হয়েছে। এই ছয় কিতাবের মধ্যে ইমাম বোখারি (রহ.)কর্তৃক সংকলিত একটি কিতাব রয়েছে, যাকে সহীহ বোখারি বলা হয়। এই কিতাবটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমনভাবে কবুল হয়েছে যে, কুরআনে কারীমের পর হাদীছের কিতাবসমূহের মধ্যে বোখারি শরীফকে সর্বাধিক সহীহ কিতাব বলা হয়। কিতাবটির এমন কবুলিয়াত লাভ হয়েছে যে, আপনি যদি কোনো স্থানে কোনো হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহলে অন্য লোকজন জিজ্ঞেস করবে, হাদীছটি কি বোখারি শরীফে বর্ণিত আছে? অথচ হাদীছের সহীহ হওয়ার স্তর বিবেচনা করলে দেখবেন, মুসলিম শরীফের অবস্থান বোখারি শরীফের চেয়ে নিম্নে নয়। বরং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের কাছে বোখারি শরীফের তুলনায় মুসলিম শরীফ শক্তিশালী। কিন্তু কবুলিয়াতের স্তরে বোখারি শরীফ অগ্রগণ্য। এ কারণেই ইমাম বোখারিকে (রহ.) 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' তথা হাদীছের জগতে মুমিনদের আমীর বলা হয়। তিনি হাদীছের জগতে আমীরুল মুমিনীন হয়ে গেলেন। অথচ এই পৃথিবীতে লাখ-লাখ মুহাদ্দিছ গত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বুখারাতে জন্মগ্রহণকারী এক যুবককে এমনভাবে কবুল করে নিলেন যে, তিনি ইন্তিকাল করলে দাফন করার পর তার কবরের মাটি থেকেও লোকজন সুঘ্রাণ পাচ্ছিল।

দারুল উলূম দেওবন্দের কবুলিয়াত

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে হাজার-হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা বিদ্যমান আছে। আমাদের এশিয়া মহাদেশেও একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাকে

আমরা 'দারুল উলূম দেওবন্দ' বলি। আল্লাহ তা'আলা এই মাদরাসাটিকে এমনভাবে কবুল করে নিয়েছেন যে, এই দারুল উলূমের ইল্‌মি ফয়েজ সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিস্তার লাভ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা এই অধমকে ইসলামের দাওয়াতের কাজে ডজনখানেক দেশে সফর করার তাওফীক দান করেছেন। আফ্রিকাও দেখেছি, আমেরিকাও দেখেছি। এশিয়াও দেখেছি, ইউরোপও দেখেছি। সেইসব জঙ্গলও দেখেছি, যেখানে মানুষখেকো গাছ আছে। গাছগুলোর পাতা মানুষকে তার আলিঙ্গনে নিয়ে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তার শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। এমন-এমন গাছও দেখেছি, যেগুলোর কাণ্ডের ভেতরকার ছিদ্র দিয়ে দোতলা বাসও চলে যায়।। অনুমান করুন কত বড় হবে? সে কাণ্ডের ভেতরে দিয়ে বিরাট রাস্তা তৈরি হয়েছে। উক্ত রাস্তায় বাস চলাচল করে। সাইবেরিয়া অঞ্চলও দেখেছি। সেখানে আপনি শত-শত মাইল চলে যাবেন, বরফ ছাড়া অন্য কিছুই আপনার দৃষ্টিগোচর হবে না।

একবার আমাদের বরফের ওপর নামায পড়তে হয়েছে। আল্লাহু আকবার! উজুর জন্য পানিও ছিল না। তাই আমরা বরফ ভেঙে পানি বের করি এবং সেই পানি দিয়ে উজু করি। এই পানি শরীরের যে অংশে লাগে, সেখানে রক্ত জমে যাওয়ার কারণে লাল বর্ণের দেখায়। সেখানকার বরফ এত ঠান্ডা। কিন্তু আমরা সেখানে নামায পড়লাম, দু'আ করলাম, দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ আমরা যে চাদর বিছিয়েছিলাম, সেটি আদ্রও হয়নি। যেমন বিছিয়েছিলাম তেমনই শুকনা ছিল। আমার সঙ্গী জিজ্ঞেস করল, হযরত! চাদর তো আদ্রও হলো না? আমি বললাম, চাদর তখনই আদ্র হতো যদি বরফ গলত। এখানে আমাদের বসা এবং নামায পড়ায় ততটুকু সময় ব্যবধান হয়নি যে, বরফ সামান্য গলবে এবং চাদর ভিজে যাবে। এমন স্থানও প্রত্যক্ষ করেছি, যেখানে বরফ দ্বারা নির্মিত ঘর রয়েছে। ছাদও বরফের, পিলারও বরফের, দেওয়ালও বরফের, দরজাও বরফের। মজার বিষয় হলো, সেখানে একটি হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে যে ট্রেতে করে খানা পরিবেশন করা হয়, সেটিও বরফের তৈরী। আল্লাহর কুদরত দেখুন, সেখানে তাপমাত্রা কত নিম্ন পর্যায়ে থাকে। এমন অঞ্চলও দেখেছি, যেখানে ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত থাকে। আমি সেই স্থানও দেখেছি, যেখানে লোকজন লিখে লাগিয়ে রেখেছে, End of the world অর্থাৎ– এটা পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্ত। সমস্ত বিজ্ঞানী এতে একমত। হুবহু সেই জায়গাতেও এই সফরে পৌঁছার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন। এত কিছু আমি

এজন্য উপস্থাপন করছি যে, এই অধম নিজের জীবনে দ্বীনি কাজে যেখানেই গেছে, সেখানেই তারও পূর্ব থেকে ওলামায়ে দেওবন্দের কোনো-না-কোনো আধ্যাত্মিক সন্তানকে দীনের কাজ করতে দেখেছে। এমনই হয় কবুলিয়াত–

یہ علم و ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل
آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل
کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

এটি ইল্‌ম ও গুণের দোলনা, ইতিহাসের শাহী অধ্যায়
এখানকার প্রতিটি ফুল একটি অগ্নিশিখা, প্রত্যেক ব্যক্তি একটি মিনারা
আবেদের দৃঢ় বিশ্বাসের আলো সাইয়্যিদদের খাঁটি পরিচ্ছন্ন আমল
চোখ কোথায় দেখতে পাবে ইখলাসের এরূপ তাজমহল
অহংকার এখানে দেবে যায়, প্রলয় থেমে যায়
এই ফকীরি বালাখানার সামনে শাহী মহল নত হয়ে যায়।

সুবহানাল্লাহ! এসবই আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবি (রহ.)-এর এই প্রতিষ্ঠানের কবুলিয়াতের নিদর্শন।

মহান জবেহ-এর কবুলিয়াত

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন যে, যখন কবুল হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ফয়েজ ও বরকত আগত লোকদের মধ্যে জারি করে দেন। কুরআন শরীফ থেকে এর দলিল পেশ করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)কে আল্লাহর নামে কুরবানি করেছেন। কুরবানির এই আমল কোনো সাধারণ আমল ছিল না। স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন–

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

'নিঃসন্দেহে এটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।'[৩০]

---

৩০. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৬

ভাই! পরীক্ষার্থী ছাত্ররা বলেই থাকে, প্রশ্নপত্র খুবই কঠিন ছিল। এখানে বিস্ময়ের বিষয় হলো, পরীক্ষা গ্রহণকারী বলছেন, আমি প্রশ্নপত্র অনেক কঠিন করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা নিজে বলছেন, এটা একটা মহা পরীক্ষা ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই কুরবানি আল্লাহ তা'আলার কাছে এত পছন্দ হয় যে, তিনি বলেন–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.

'এবং আমি ভবিষ্যতে আগত লোকদের মাঝে এই আমল জারি করে দিলাম।'[৩১]

শুধু এতটুকুই করেননি, বরং সামনে বললেন–

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

'হে ইবরাহীম! আপনার প্রতি সালাম।'[৩২]

সুবহানাল্লাহ! পরীক্ষা গ্রহণের পর স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করছেন, হে ইবরাহীম! আপনার ওপর সালাম। আমরা আমাদের ভাষায় এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করব যে, হে ইবরাহীম! তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি কতই-না উত্তম কুরবানি দিয়েছ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজ কবুল করে নিলে পরবর্তী কালে এই বান্দার ফয়েজ অথবা প্রতিষ্ঠানের ফয়েজ ভবিষ্যতে আগত লোকদের মাঝে জারি করে দেন, যা কবুল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ীর কবুলিয়াত

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের জীবনসঙ্গিনী হাজেরাকে পানি ও তরুলতাহীন প্রান্তরে রেখে চলে যেতে থাকেন। এ-সময় হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের এই মরুপ্রান্তরে কেন রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) কোনো উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন। এবারও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাদের আল্লাহর নির্দেশে এখানে রেখে চলে যাচ্ছেন? এবার তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর নির্দেশে রেখে যাচ্ছি। এতদশ্রবণে হাজেরা বললেন, আপনি যদি আল্লাহর নির্দেশে আমাদের এখানে রেখে যান, তাহলে

---

৩১. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৮

৩২. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৬

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধ্বংস করবেন না। পরবর্তী কালে ছেলের জন্য পানির উদ্দেশ্যে সাফা এবং মারওয়ায় দৌড়ান। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর এই দৌড়ানো এত পছন্দ হয়েছে যে, তিনি এই আমল আগত লোকদের মাঝে জারি করে দিলেন। হাজীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত সায়ীর এই আমল না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হজ সম্পন্ন হয় না।

একটা পিপীলিকার কবুলিয়াত

একবার হযরত সুলাইমান (আ.) নিজের সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় পিপীলিকার দল ছোটাছুটি করছিল। এক পিপীলিকা অন্য সব পিপীলিকাকে বলল–

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

'হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানে (ছিদ্রে) প্রবেশ করো।'[৩৩]

আল্লাহ তা'আলার কাছে পিপীলিকার এই কল্যাণকামিতা এত পছন্দ হয়েছে যে, কুরআন মাজীদে শুধু যে তার আলোচনা করেছেন তা নয়, বরং 'নাম্‌ল' নামে একটি সূরার নামকরণ করে পিপীলিকার নামকে সব সময়ের জন্য সম্মানিত করেছেন। এই পিপীলিকার আলোচনা কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। বরঞ্চ কেয়ামতের পরেও স্থায়ী হবে। কেননা, জান্নাতেও কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত হবে।

ক্ষুধায় ধৈর্যধারণের ওপর কবুলিয়াত

একবার হাসান ও হুসাইন (রাযি.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত ফাতেমা (রাযি.) মান্নত করলেন, উভয় ছেলে সুস্থ হলে আমরা তিন দিন রোযা রাখব। আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে উভয় শাহজাদা সুস্থতা লাভ করলেন। প্রথম দিন রোযা রেখে হযরত ফাতেমা (রাযি.) ইফতারির আয়োজন করলেন। ইফতারের পূর্বে এক মিসকিন দরজায় আওয়াজ দিল। তাঁরা এই মিসকিনকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিলেন। ইফতারির আয়োজন যা করেছিলেন, সব উঠিয়ে তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা পানি দিয়ে ইফতার করে নিলেন। রাতও এভাবে কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন আবার রোযা রাখলেন। সন্ধা হলে বিগত দিনের মতো ইফতারি প্রস্তুত

---

৩৩. সূরা নামল : আয়াত ১৮

করে সামনেই রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে এক এতিম শিশু এসে গেল। তারা সমস্ত খানা উঠিয়ে তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি দ্বারা ইফতার করে নিলেন। তৃতীয় দিনও রোযা রাখলেন। এ দিনও সন্ধ্যায় ইফতারের আগমুহূর্তে একজন কয়েদি দরজায় এসে গেল। তারা সব খানা উঠিয়ে কয়েদিকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি দ্বারা ইফতার করলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের এই আমল এত পছন্দ হয়েছে যে, তাদের শানে তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠালেন এবং ইরশাদ করলেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)

'এবং খানার প্রতি তাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে। (এবং তারা বলে) নিঃসন্দেহে আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের খাদ্য দান করছি। না আমরা তোমাদের থেকে প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা।'[৩৪]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা তিন দিন ক্ষুধা সহ্য করলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আলোচনা কুরআনে কারীমে করে দিলেন। এভাবে কেয়ামতের পর পর্যন্ত তাদের আলোচনা স্থায়িত্ব পেল।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর কবুলিয়াত

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর মনে হারাম শরীফে উপস্থিত হওয়ার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। যিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলোতে তো তাঁর দেহ থাকত এখানে; কিন্তু অন্তর থাকত হারাম শরীফে। এই দিনগুলোতে তিনি একথা বেশি-বেশি বলতেন যে, 'জানা নেই আশেকগণ কী করছেন?' তিনি হাজীদের 'আশেক' নামে স্মরণ করতেন। তিনি কুরবানির উদ্দেশ্যে নিজে বাড়িতে গরু অথবা ছাগল লালনপালন করতেন। নিজহাতে পানি পান করাতেন এবং ঘাস দিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই আগ্রহকে এমনভাবে কবুল করলেন যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারা যাওয়ার পর আঠারো বছর পর্যন্ত রাওজা শরীফের মুখোমুখি সামনে বসে

---

৩৪. সূরা দাহর : আয়াত ৮, ৯

হাদীছ শরীফ পড়ানোর সম্মান লাভ করেন। সেখানে তাঁর কাছে আরব-অনারব অনেক মাশায়েখ সবক নিতে আসতেন। সুবহানাল্লাহ! কিভাবে স্থায়িত্ব লাভ হলো!

শাতেবিয়্যাহ্ রিসালার কবুলিয়াত

ইমাম শাতেবি (রহ.) শাতেবিয়্যাহ রিসালা লেখার পর সেটি হাতে নিয়ে বারো হাজার তাওয়াফ করলেন। অর্থাৎ– চুরাশী হাজারবার বাইতুল্লাহ শরীফে চক্কর দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই রিসালাকে এমন স্থায়িত্ব দান করলেন যে, এখনও কোনো ব্যক্তি শাতেবিয়্যাহ না পড়ে কারী হতে পারে না। স্মরণ রাখবেন, কবুল হওয়ার সম্পর্ক সেই মহব্বতের সাথে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দা লাভ করে। সেখানে সামন্যতম খাঁদও অচল। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যদি কারও অকেজো আমলও কবুল করে নেন, তাহলে সে তো সেই মালিকের শান।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর কবুলিয়াত

খাজা গোলাম হাসান সিওয়াক (রহ.) খাজা সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর এজাযতপ্রাপ্ত খলীফা ছিলেন। তিনি প্রভাবশালী বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি যার দিকে চোখ তুলে তাকাতেন, সে মুসলমান হয়ে যেত। হিন্দুরা ইংরেজদের আদালতে মামলা দায়ের করে দিল, তিনি আমাদের জোরপূর্বক মুসলমান বানাচ্ছেন। ইংরেজ জজ তাঁকে আদালতে তলব করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি হিন্দুদের জোরপূর্বক মুসলমান বানাচ্ছেন কেন? হযরত (রহ.) জবাব দিলেন, না, আমি তো তাদের মুসলমান করিনি। তারা নিজেরাই তো মুসলমান হয়েছে। জজ চাপাচাপি করল, না, আপনি মুসলমান বানিয়েছেন। পরিশেষে হযরত (রহ.) সেখানে উপস্থিত এক হিন্দু লোকের দিকে আঙুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, তাকেও কি আমি মুসলমান করেছি? সেই হিন্দু লোক সাথে-সাথে কালেমা পড়তে শুরু করল। তারপর অন্য একজনের দিকে ইশারা করলে, সেও কালেমা পড়তে শুরু করল। এভাবে সেখানে দণ্ডায়মান পাঁচজন হিন্দু কালেমা পড়ে নিল। এবার জজের মনে চিন্তা জাগল, আমার দিকে না আবার ইশারা হয়ে যায়; তাই সে মামলা খারিজ করে দিল।

তিনি নিঃসন্দেহে প্রভাব সৃষ্টিকারী বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর তেমন কবুলিয়াত অর্জিত হয়নি, যেমনটি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর অর্জিত হয়েছে।

তাঁর মাধ্যমে সাত লাখ মানুষ মুসলমান হয়েছে এবং নয় লাখ মানুষ তাঁর কাছে মুরীদ হয়েছে। বর্তমানে তাঁকে سُلْطَانُ الْهِنْد (ভারতবর্ষের রাজা) বলা হয়। একবার এক ইংরেজ হিন্দুস্তান এল। হিন্দুস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি হিন্দুস্তানে আশ্চর্যকর কী বস্তু দেখেছেন। সে বলল, এক ব্যক্তি কবরে শায়িত থেকেও মানুষের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

রাবেয়া বসরির কবুলিয়াত

রাবেয়া বসরি ব্যতীত আর কোনো নেককার মহিলা কি গত হননি? অনেক খোদাপ্রেমিকা, ইবাদাতগুজার এবং সতী-সাধবী নারী গত হয়েছেন। কিন্তু রাবেয়া বসরির স্বতন্ত্র কবুলিয়াত অর্জিত হয়েছে। তাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ছিল অত্যধিক। তাঁর ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, আম্মাজান! পরজগতে আপনার কী অবস্থা হয়েছে? তিনি বললেন, আমার কাছে মুনকার-নাকীর এসে প্রশ্ন করল, مَنْ رَبُّكِ (তোমার প্রভু কে)? জবাব দিলাম, আল্লাহর কাছে গিয়ে বলো, হে আল্লাহ! তোমার রয়েছে আঠারো হাজার প্রকারের সৃষ্টজীব। তথাপি তুমি আমি বৃদ্ধাকে ভোলনি। পক্ষান্তরে তুমি ব্যতীত আমার তো আর কোনো কিছুই নেই; এ অবস্থায় আমি তোমাকে কিভাবে ভুলে যাব? সুবহানাল্লাহ!

ফিকহে হানাফীর কবুলিয়াত

এসব হাদীস নয় ২/১৪৯

এই উম্মতের মাঝে ষোলোজন ফকীহ ফিকহের জগতে আলাদা আলাদা ধারায় ইজতিহাদের কাজ করেছেন। তাঁদের সকলেরই তাকলীদ করা হতো এবং প্রত্যেকেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু সময় যতই গড়িয়ে চলল, তাদের অনেকের অনুসারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল। সর্বশেষ চার ফকীহ ব্যতীত অন্য কারও কোনো অনুসারী আর অবশিষ্ট থাকল না। ফলে এই চার ফকীহর চারটি ধারাই চার মাযহাব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করল। আর কোনো ফকীহ-এর কোনো ধারার ধারক না থাকায় ক্রমান্বয়ে বাকি সব ধারা বিলুপ্ত হয়ে গেল। যদি কেউ প্রশ্ন করে, ফিকহের ওপরই আমলই যখন মূল বিষয়, তাহলে চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ কেন? এর উত্তর বোঝার জন্য একটি উদাহরণের ওপর চিন্তা করুন। এক ব্যক্তির দশটি সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে একের পর এক ইন্তিকাল করতে-করতে সবশেষে থাকল চারজন। এ

অবস্থায় স্বয়ং সেই ব্যক্তিও ইন্তিকাল করলেন। এখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি জীবিত চারজনের মধ্যে বণ্টন হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, সন্তান তো দশজন ছিল, সম্পদ এই চারজনের মধ্যে বণ্টন হবে কেন? তো এর জবাব হবে, 'আল্লাহর ইচ্ছা; তাই'। এমনিভাবে ফকীহ ও মাযহাব কেন চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ? এর জবাবও হলো, 'আল্লাহর ইচ্ছা তাই'।

এই চার ফিকহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ফিকহে হানাফীকে অত্যধিক কবুল করেছেন। ফিকহে হানাফীকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করেছেন যে, মুসলিম দেশসমূহে সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে এই ফিকহে হানাফী। ওছমানি খেলাফতকালে দেশের সংবিধান ছিল ফিকহে হানাফী মোতাবেক ইসলামি শরীয়ত। উপমহাদেশ পাক-ভারতে যখন মোগলদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এখানেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফিকহে হানাফী জারি ছিল। এই মর্যাদা শুধু ফিকহে হানাফীরই লাভ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আজ দেখুন, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, তাতারিস্তান, রাশিয়া, ইউক্রেন, ইরাক ও সিরিয়ায় ফিকহে হানাফীর ওপর আমলকারীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। ভেবে দেখুন, এসব দেশের সমষ্টি অর্ধপৃথিবী থেকে বেশি হয়। এটিই কবুলিয়াত।

এক নববধূর কবুলিয়াত ভাবনা

এক নববধূকে তার নিকটতম বান্ধবীরা সাজিয়ে দিচ্ছিল। এক বান্ধবী তাকে বলল, তোকে তো অলংকারে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এবং জামা জোড়া খুব মানিয়েছে। সব মিলিয়ে তোকে অপরূপা লাগছে। বান্ধবীর মুখে এসব প্রশংসা শুনে নববধূর চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। প্রশংসাকারিণী ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমার থেকে কি কোনো ভুলচুক হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন? উত্তরে নববধূ বলল, তুমি তো আমার রূপ-সৌন্দর্যের খুব প্রশংসা করছ। অপরদিকে আমার অন্তরে চিন্তা জেগেছে, যে স্বামীর জন্য আমাকে তোমরা সাজিয়ে দিচ্ছ, আমি তার কাছে যাওয়ার পর তিনি যদি আমাকে পছন্দ না করেন, তাহলে তোমার প্রশংসা আমার কী কাজে আসবে? ঠিক তদ্রূপ লোকজন যদি আমাদের মুফতী সাহেব বলেন, খতীব সাহেব বলেন, পীর সাহেব বলেন অথবা সূফী সাহেব বলেন, তাহলে আমাদের কী লাভ হবে? দেখার বিষয় তো হলো, আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুলিয়াত অর্জিত হয়েছে কিনা? একবার সাইয়্যিদ সালমান নদভী (রহ.) সফর থেকে প্রত্যাবর্তন

করলে, কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! কেমন আছেন? হযরত কবি ছিলেন। তিনি ছন্দাকারে উত্তর দিলেন–

یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے
دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے

এখানে এমন বা তেমন যেমনই থাকি
দেখা চাই সেখানে কেমন থাকি।

অর্থাৎ– প্রকৃতপক্ষে দেখার বিষয় তো হলো, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাদের হাশর কেমন হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে তখন আমরা কবুল হব কি-না। দুনিয়াতে যদি লোকজন প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়ে যায় আর আমরা তাতে খুব আনন্দিত হই, তাহলে এর কোনো প্রতিদান তো আমরা হাশরের ময়দানে পাব না। অনেক লোকের অবস্থা এরূপ হবে, তারা দুনিয়াতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে আরজ করবে, হে আল্লাহ! আমি দীনের অনেক খেদমত করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তুমি সবকিছু এজন্য করেছ, যেন তোমাকে বড় আলেম বলা হয়। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। এখন আমার কাছে তোমার কোনো প্রতিদান নেই।

কবুলিয়াত লাভের জন্য সদা চিন্তাশীল থাকবেন

কবুলিয়াতের জন্য চিন্তাশীল হয়ে দু'আ করতে হয়। অনেক সময় কোনো ব্যক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকে, কিন্তু তার কবুলিয়াত লাভ হয় না। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করুন। আপনি ফল ক্রয় করতে বাজারে যান। দোকানিকে বলেন, আমাকে আপেল দিন। দোকানি আপনাকে আপেল দিয়ে দেয়। তার কাছে আরও অন্য জাতের ফলও থাকে। আপনি আপেল নেয়ার পর সে আপনাকে বলে, কলাও নিয়ে যান। কলাগুলো দেখতে খুব সুন্দর, সুন্দর ঘ্রাণময়, সাইজও বড়সড়, মোটাসোটা, আকর্ষণীয়। কিন্তু এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আপনি কলার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই বলেন, আমার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে ডালিমসহ আরও কত ভালো-ভালো ফল থাকে। সেগুলোতে আপনার চাহিদা থাকে না। এ-সময় দোকানি আপনাকে বাধ্য করতে পারে না। যেন সর্বোচ্চ গুণাগুণ থাকা সত্ত্বেও সেসব ফল আপনার দৃষ্টিতে কবুলিয়াত পেতে পারে না।

তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তির কাছে যদি অনেক কিছু থাকে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি তার প্রতি না পড়ে, তাহলে কী ফল হবে? এজন্যই দুনিয়ার জীবনে কোনো ব্যক্তি নিজের গুণাবলির ওপর গর্ব করতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দার গর্ব-অহংকার চলে না। বরং তার দরবারে আবেদন-নিবেদন চলে। যেব্যক্তি আল্লাহর সামনে অসহায়ের মতো মস্তকাবনত করে এবং প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার মধ্যে গর্ববোধ কাজ করে, লৌকিতা, অহংকার চলে আসে, সে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। এজন্যই আমাদের আকাবিরগণ এ-ব্যাপারে অত্যধিক চিন্তাশীল থাকতেন।

আমরা এস্তেগফার করি। আমাদের এস্তেগফার হয় গুনাহের ওপর– হে আল্লাহ! আমরা যেসব গুনাহ করেছি, সেগুলোর ওপর আমাদের আযাব দিয়েন না। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের এস্তেগফার হয়– হে আল্লাহ! আমরা যত নেক আমল করেছি, করছি, সেগুলো আপনার শান মোতাবেক নয়। ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) লিখেছেন, মানুষ যতই খুশুখুজু ও একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করুক না কেন, যতই মনোযোগসহ সুন্দর করে নামায আদায় করুক না কেন, আমাদের সকল ইবাদাত, সকল নামায আল্লাহ তা'আলার শানের পর্দা থেকে নিম্নে থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলার শান এর চেয়েও ঊর্ধ্বে, এর চেয়েও ঊর্ধ্বে, এর চেয়েও ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ– আমরা কখনও এরূপ নামায পড়তে সক্ষম নই, যে নামায সম্পর্কে বলা যাবে, হ্যাঁ এই নামায আল্লাহ তা'আলার যথাযথ শান মোতাবেক হয়েছে। তাই তো আমাদের মুরব্বীগণ চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঈশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তারপরও হারাম শরীফে উপস্থিত হয়ে মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে এই দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ!

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

'আপনার ইবাদাত তেমনভাবে করতে পারিনি, যেমনভাবে আপনার শান মোতাবেক যথাযথ হক আদায় করে করা উচিৎ ছিল। আপনার পরিচয় যেমনভাবে লাভ করা দরকার ছিল, তেমনভাবে আপনার পরিচয়ও লাভ করিনি।'

যেখানে আমাদের বড়রা এরূপ বলছেন, সেখানে আমরা কোন খেতের গাজর-মুলা, আমরা নিজেদের ইবাদাতের ভিত্তিতে নিজেকে আল্লাহর আশেক ভেবে ঘুরিফিরি যে, আমি এত পরিমাণ দরূদ পড়ি, এত পরিমাণ কালেমা

পড়ি, এত সময় মুরাকাবা করি। বাস্তব কথা হলো, আমরা যত ইচ্ছে ইবাদাত করতে থাকি, কিন্তু আমাদের ইবাদাত আল্লাহ তা'আলার উঁচু শান মোতাবেক হতে পারে না।

আমাদের দৃষ্টান্ত তো সেই সন্তানের মতো, যাকে পিতা প্রথম দিন স্কুলে পাঠান। সন্তান স্কুল থেকে এসে পিতাকে বলে, স্যার আমাকে লেখা শিখিয়েছেন। পিতা বলেন, বাবা, আমাকে দেখাও কী লেখা শিখেছ। সে একটি খাঁতা এগিয়ে দেয়, যাতে সে আঁকাবাঁকা কতগুলো দাগ টেনে রেখেছে। কেননা, স্কুলে সেটা তার প্রথম দিন এবং সে লেখা কিছুই পারে না। কিন্তু পিতা যেহেতু তার প্রতি পরম দয়ালু, তাই তাকে উৎসাহ জোগানোর জন্য তার এই আঁকাবাঁকা দাগের ওপরই তিনি পুরস্কার দিয়ে দেন। এটা তার সুন্দর লেখার পুরস্কার নয়। বরং তার প্রতি পিতার মায়া-মমতার ভিত্তিতেই এই পুরস্কার। এরূপই মনে করুন, আমরা যত নামায পড়ছি বা যত ইবাদাত করছি এসবের ওপর যদি আমরা প্রতিদান পাই, তাহলে এটা এজন্য নয় যে, আমাদের সমস্ত ইবাদাত বড় শানবিশিষ্ট। না, আমরা এমন ইবাদাত করতেই সক্ষম নই, যা আল্লাহর শান মোতাবেক হবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানবজাতির ওপর পরম করুণাময় ও দয়ালু, তাই অকেজো, অচল ইবাদাতের ওপরই স্বীয় দয়া ও অনুকম্পায় আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের প্রতিদান প্রদান করেন। সুতরাং কেউ যেন অন্তরে এমনটি না ভাবে যে, আমি অনেক বড় ইবাদাত করে ফেলেছি। তাই প্রতিটি নেক কাজের পর আল্লাহ তা'আলার কাছে অবশ্যই এই দু'আটি করা চাই–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের থেকে এই নেক কাজটুকু কবুল করে নিন, নিঃসন্দেহে আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

ক্ষমা প্রার্থনা শিক্ষাদান

অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝে রাখুন, অধিক পরিমাণে ইবাদাতের পর ক্ষমা প্রার্থনা করা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

উজু একটি ইবাদাত। হাদীছ শরীফে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। উজুর পানির যে ফোটা অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ে, এর সাথে মানুষের গুনাহও ঝরতে থাকে।

এক হাদীছে এসেছে–

اَلْوَضُوءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

'উজু মুমিনের অস্ত্র।'

এটি এমন একটি অস্ত্র, যা দ্বারা মানুষ শয়তানের মোকাবেলা করে। যেহেতু উজু একটি ইবাদাত, তাই উজুর মাঝখানে দুনিয়াবি কথা না বলে বলা হয়েছে, তোমরা দু'আসমূহ পড়তে-পড়তে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়ে উজু করো। দেখুন, উজু একটি ইবাদাত এবং এই ইবাদাত শেষ করে দাঁড়ানোর পর যেসব দু'আ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি দু'আ এই–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র এবং আপনারই সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তন। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আপনি ছাড়া ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আমি আপনার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং নিজের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করছি।'

চিন্তা করুন! উজু একটি ইবাদাত। তথাপি উজু করার পর ক্ষমাপ্রার্থনা এবং তাওবা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নামায শেষে সালাম ফিরানোর পরপর একবার আল্লাহু আকবার এবং তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ বলা সুন্নাত। এর উপকারিতা হলো, নামাযে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো ক্ষমা করে দেন।

তাহাজ্জুদের সময় বিছানা থেকে উঠে ইবাদাত করা কত-ই না ফযীলতের বিষয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তাহাজ্জুদের সময় ঘোষক এই ঘোষণা করে–

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَ لَه

'আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী, তাকে দান করা হবে?'

তখন আল্লাহ তা'আলার মকবুল বান্দাদের শয়ন থেকে জাগ্রত হওয়ার এবং দু'আ করার সময় হয়। এ-সময় যারা ইবাদাত করে, তারা অনেক বড় কাজ করে। কিন্তু এই ইবাদাত করার পরও বান্দাকে ক্ষমাপ্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

'তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমাত (অর্থাৎ–সমস্ত রাত ইবাদাত করত) এবং সাহরির সময় (আল্লাহর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করত।'[৩৫]

---

৩৫. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭, ১৮

মানুষ জীবনে সাধারণত একবার হজ করে। কতিপয় এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন, যাদের বারবার হজ করার তাওফীক লাভ হয়। হজ অনেক বড় প্রতিদানপূর্ণ ইবাদাত। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তির ভাগ্যে হজ্জে মাবরূর নসিব হয়ে যায়, তিনি গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, যেমন তিনি পবিত্র ছিলেন সেই সময়, যখন তিনি মাতৃগর্ভ থেকে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। এই হজের মধ্যে উকূফে আরাফাহ বড় একটি রুকন। আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময় আল্লাহ তা'আলার এত বেশি রহমত বর্ষিত হয় যে, শয়তান অপমানিত ও অপদস্থ হয়ে যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি শয়তানকে বদরের দিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে দেখেছি। তারপর উকূফে আরাফার দিন তাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত বোধ করতে দেখলাম। উকূফে আরাফার দিন সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে বলে, আমার বহু বছরের শ্রম বিফলে গেল! এ-সময় আল্লাহ তা'আলা এত বেশি লোকের গুনাহ ক্ষমা করেন যে, একস্থানে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি উকূফ করল এবং অন্তরে চিন্তা করল, আমার দু'আ হয়তো কবুল হয়নি, আল্লাহ তা'আলা এই লোকের প্রতি প্রচণ্ড রাগান্বিত হন। বিষয়টা তো এমন, যেমন কোনো দানবীর ব্যক্তির দরজা দিয়ে এল এবং বলল, আমি কিছুই পাইনি। যদি সেই দানবীর ব্যক্তি কথাটি শোনেন, তাহলে তার মধ্যে কী পরিমাণ রাগের সৃষ্টি হবে যে, তুমি আমার দরজা দিয়ে এসে বলছ এখানে এসে আমি কিছুই পাইনি। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলারও জালালি অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তুমি আমার দ্বারে এসে পড়েছ, তারপরও বলছ আমার কিছুই অর্জিত হয়নি। না, আমি সীমাহীন দানকারী। মোটকথা, মানুষ সেখান থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ

'হজ মানেই তো উকূফে আরাফাহ।'

যেহেতু উকূফে আরাফাহ করার দ্বারা হজের সবচেয়ে বড় রুকন আদায় হয়ে যায়, তাই লোকজন যখন সেখান থেকে ফিরে আসে, তখন যেন তাদের অত্যধিক কল্যাণ অর্জিত হয়ে যায়।

আমার বন্ধুগণ! যদি বিষয়টি আমাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, যেন আমরা হজ করতে গিয়ে দু'আ করি, তাহলে আমরা তো আমাদের গুনাহ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত; আমাদের জবান মিথ্যুক, দৃষ্টি অপবিত্র, দেহের

গোশত সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে তৈরী, পোশাক সন্দেহযুক্ত সম্পদ দ্বারা প্রস্তুতকৃত, কাজেই দু'আ কবুল হতো কী হতো না আমাদের জানা নেই। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দু'আ করে দিয়েছেন, যা প্রত্যেক হাজীর দু'আর ওপর কবুলিয়াতের মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সময় এই দু'আ করেছেন–

'হে আল্লাহ! আপনি হাজীদেরও ক্ষমা করুন এবং তারা যাদের ক্ষমার জন্য দু'আ করে, তাদেরও ক্ষমা করুন।'

দেখুন! যারা যখনই হজ করতে যান, তাদের দু'আর ওপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর কার্যকারিতা রয়েছে। আমরা যেভাবেই হোক সেখানে যদি পৌঁছে যেতে পারি, তাহলে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ আমাদের আশ্রয় দিয়ে দিল। সুতরাং আরাফা থেকে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বের হওয়া চাই যে, আল্লাহ তা'আলা অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং এখন আমাকে এক নতুন ধারার জীবন শুরু করতে হবে।

চিন্তা করুন! উকূফে আরাফাকারীদের যারা আরাফার ময়দানে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তারপর মুযদালিফায় অবস্থানের আমল করেন, এখানেও তাঁরা দু'আর মধ্যে লিপ্ত থাকেন। দু'আ শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আবার এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ

'তারপর লোকজন যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'[৩৬]

ইয়া আল্লাহ! আমি হজ করছি। আপনার কাছে এত পছন্দনীয় আমল! কিন্তু আপনার হুকুম তারপরও যেন আমরা এস্তেগফার করি। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

এর চেয়েও বড় একটি উদাহরণ শুনুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জীবন ছিল তাকওয়া-পরহেযগারিতে পরিপূর্ণ, আল্লাহর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত, আল্লাহ তা'আলার প্রেমিক এবং গুনাহ থেকে

---

৩৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৯

পবিত্রতম জীবন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ জীবন যাপন করেছেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর হক আদায় করত রিসালাতের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। তাই তো বিদায় হজের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সাহাবাদের উদ্দেশে বলেন, হে আমার সাহাবীগণ! আমি কি আল্লাহ তা'আলার বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি? তখন এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী সাক্ষ্য দিলেন, أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ (হে আল্লাহর মাহবূব! আপনি আমানতের হক আদায় করে দিয়েছেন।) এ-পর্যায়ে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! আপনি এর ওপর সাক্ষী থাকুন।

পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে বলতে পারে, আমি আমার জীবনের হক আদায় করে দিয়েছি। স্বতন্ত্র সেই মহান ব্যক্তিত্ব, লক্ষাধিক সাহাবা যাঁর প্রত্যয়ন করছেন যে, হে মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছানোর হক আদায় করে দিয়েছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ শেষে যখন প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে বার্তা এল–

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছবে আর আপনি দেখবেন, লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে-দলে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় তাওবা কবুলকারী।'[৩৭]

দেখুন, এত পবিত্র জীবন যাপন করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছেন, হে আমার মাহবূব! আপনি এস্তেগফার করুন!

সাইয়্যিদাহ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো নামায পড়তেন, তখন এই দু'আ করতেন–

---

৩৭. সূরা নাসর : আয়াত ১-৩

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

'হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনার সপ্রশংস গুণকীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আপিন আমাকে ক্ষমা করুন!'

যেখানে আল্লাহ তা'আলার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা ছিল এই, তিনি আমল করার পর এস্তেগফার করতেন, সেখানে আমাদের তো আরও বেশি-বেশি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার। আমরা যেমন পচা-গলা ফল দেখতে পছন্দ করি না, তেমনি হতে পারে আমাদের এই মনোযোগহীন নামায ও আলস্যপূর্ণ আমল আল্লাহ তা'আলাও দেখতে পছন্দ করবেন না। তাহলে আমাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে? এজন্য আজ আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মৃতিতে ভালোভাবে ধারণ করা জরুরি যে, সর্বদা আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াতের দু'আ করতে হবে।

আমল কবুল হওয়ার জন্য তাকওয়া জরুরি

কোনো ব্যক্তি নিজের আমলের ওপর গর্ব করতে পারে না।

ہر چہ گیرد علتی علت شود

'যা কিছু বের হয়, ত্রুটিপূর্ণ আর ত্রুটিপূর্ণই হয়।'

আমরা যেসব আমল করি, সেগুলোও আমাদের মতোই ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। কেননা, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ লোক যে আমল করে, তা অসম্পূর্ণই হয়ে থাকে। আমরা যদি এসব অসম্পূর্ণ আমলের ওপর গর্ব করে চলি এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করে ফিরি যে, আমি মাদরাসায় হাদীছের কিতাব পড়াচ্ছি, আমি খানকায় বসে লোকদের আল্লাহ-আল্লাহ শিখাচ্ছি, আমি তো আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজ করছি, আমি দীন প্রতিষ্ঠায় অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছি, তাহলে তা হবে নিতান্ত ভুল। এসব আমলের ওপর গর্বিত হওয়া যাবে না। যা কিছু করছি, আমরা তো করে যাচ্ছি, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের শান অনুযায়ী করতে পারছি না। সুতরাং আমাদের জন্য জরুরি, আমরা যেন এসব আমল করেও আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্যতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং দু'আ করি। কেননা, নেক কাজ করেও যখন ভয় করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কবুল করে নেবেন। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।'[৩৮]

মুত্তাকী কে? যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। অন্য শব্দে বলা যায়, যারা ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলই কেবল কবুল করেন। এই গুণ আমাদের আকাবিরদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল।

সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয়

সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাদের মহান নকশবন্দিয়া সিলসিলার সর্বোচ্চ ইমাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নেসবত তাঁকে প্রদান করেছেন। তারপর তাঁর থেকে এই নেসবত সামনে অগ্রসর হয়েছে। নবীঁ আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَا صَبَّ اللهُ فِيْ صَدْرِيْ إِلَّا وَقَدْ صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ أَبِيْ بَكْرٍ.

'আল্লাহ তা'আলা আমার বক্ষে যা কিছু ঢেলে দিয়েছেন, তার সবই আমি আবুবকরের বক্ষে ঢেলে দিয়েছি।'

সুবহানাল্লাহ! কী নূর-ই না লাভ হবে! কী নেয়ামত-ই না অর্জিত হবে!

এক হাদীছে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَّنْظُرَ إِلٰى مَيِّتٍ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى ابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ

'যার ইচ্ছে আছে ভূপৃষ্ঠে চলাচল করছে এমন মাইয়্যিত দেখার, সে যেন ইবনে আবী কুহাফাহ তথা আবুবকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।'

সুবহানাল্লাহ! তাঁর নিজেকে আল্লাহর জন্য মিটিয়ে দেওয়ার পূর্ণতার ওপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য রয়েছে।

একটি হাদীছ সাইয়্যিদ জাওয়ার হুসাইন শাহ সাহেব (রহ.)ও তাঁর কিতাবে এনেছেন। তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

---

৩৮. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭০

لَوِ اتُّزِنَ إِيْمَانُ أَبِيْ بَكْرٍ مَعَ إِيْمَانِ أُمَّتِيْ لَوَجَدَهُ.

'যদি আমার সমস্ত উম্মতের ঈমানের সাথে আবুবকরের ঈমান ওজন করা হয়, তাহলে আবুবকরের ঈমান ভারী হয়ে যাবে।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমি সকলের সমস্ত অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আবুবকর! আপনার অনুগ্রহসমূহের প্রতিদান কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত নিজে দান করবেন। চিন্তা করুন! অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া, শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর 'অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া চাই' এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যিনি দুনিয়াতে এসেছেন, তিনি লোকজনের অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার হক কিভাবে আদায় করবেন। আবুবকর! আপনার মহত্ত্বের ওপর উৎসর্গ, আপনি কতই না প্রিয় জীবন যাপন করেছেন। আপনি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এমন-এমন অনুগ্রহ করেছেন যে, দোজাহানের সরদার স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, আমি সকলের সমস্ত অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হে আবুবকর! আপনার অনুগ্রহসমূহের প্রতিদান কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নিজে প্রদান করবেন।

আল্লাহ তা'আলার মাহবূব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেকোনো একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু একজন ব্যক্তি এমন হবে, যাকে জান্নাতের সব কটি দরজা থেকে আহ্বান জানানো হবে। আর সেই ব্যক্তি হবে আবুবকর সিদ্দীক।

এরূপ বরকতময় জীবন যাপনকারী মহান ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যখন বসতেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব ও অমুখাপেক্ষিতা নিয়ে চিন্তা করে সন্ত্রস্ত হয়ে বলতেন–

হায়! আমার মা যদি আমাকে গর্ভেই না নিতেন!

হায়! আমি যদি কোনো মুমিনের শরীরের পশম হতাম!

হায়! আমি যদি কোনো পাখি হতাম!

হায়! আমি যদি খড়কুটো হতাম!

তিনি এ কথাগুলো কেন বলতেন? এজন্য যে, তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের মহান শান বুঝতেন। তিনি জানতেন, আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই পাকড়াও করলে সেই অধিকার তাঁর

আছে। এজন্যই এত পবিত্র জীবনের অধিকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তা'আলার সামনে ক্রন্দন করতেন।

সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয়

সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرًا

'আমার পরে কোনো নবী হলে, অবশ্যই ওমর হতো।'

অর্থাৎ– তাঁর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যবলী ছিল যে, যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কেউ নবী হতেন, তাহলে হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) তখনকার নবী হতেন। এখানে প্রশ্ন জাগে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর শানে কেন বললেন না, আমার পরে নবী এলে আবুবকর নবী হতো? হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি (রহ.)-এর কাছে কেউ এই প্রশ্ন করলে হযরত অত্যন্ত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মাকাম ছিল ভিন্ন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর মহা সাহচর্য লাভ হয়েছিল। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সম্পর্কে مَعَنَا বিশেষণ যোগ হয়। যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাহচর্য অর্জিত হয়েছিল, তখন তিনি বললেন, لَوْ كَانَ بَعْدِيْ অর্থাৎ– আমার পর নবী হলে... তো পরে কে আছেন? তাঁর পরে ওমর ফরূক (রাযি.)-এর মাকাম ছিল। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرًا

অর্থাৎ– আমার পর কোনো নবীর আবির্ভাব হলে, উমরের নবুওয়তের মাকাম লাভ হতো।

সাইয়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মর্যাদা অনেক উঁচু ছিল।

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

'যখন তাঁরা দুজন (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবুবকর সিদ্দীক) গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে (আবুবকর

সিদ্দীক) বলছিলেন, তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।'[৩৯]

এই আয়াতের مَعِيَّتِ كُبْرٰى (বড় সাহচর্য) তাঁর লাভ হয়েছিল। ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নববী সাহচর্যের ওপর আশ্চর্যজনক রচনা লিখেছেন। তিনি বলেন, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে ইসলামের মধ্যে নববী সাহচর্য দান করেছেন। গারে হেরার মধ্যে নববী সাহচর্য দান করেছেন। রাওযা শরীফে সাহচর্য দান করেছেন। জান্নাতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দ্বিতল বিশিষ্ট বালাখানা দান করবেন। ওপর তলায় আল্লাহ তা'আলার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করবেন। নীচ তলায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) অবস্থান করবেন। এ কারণেই ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) নিজের লেখায় তাঁকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসস্থানসঙ্গী বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! এই সাহচর্য শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতেও রাসূলের বাসস্থানসঙ্গী বানিয়ে তাঁর সাহচর্য দান করবেন।

একবার সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হুমায়রা! তুমি কী দেখছ? তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখছি, আকাশে কত তারকা! কোনো বান্দার কি এত নেকি হতে পারে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, উমরের এত নেকি হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, ওমর যে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে, শয়তান সেই রাস্তা ছেড়ে দেয়।

কুরআনে কারীমের অনেক জায়গা এমন আছে, যেখানে হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর মতামত আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়েছে। এমনই সঠিক বিজ্ঞতা তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এরূপ বিচক্ষণতা দান করেছিলেন যে, তিনি এদিকে নিজের মত পেশ করলেন আর বাস্তবে সেই মত আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়ে গেল।

---

[39]. সূরা তাওবা : আয়াত ৪০

যাঁর মাকাম ছিল এই, তাঁর শানে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে এত বেশি ভয় করতেন যে, তিনি নিজের ব্যাপারে সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কান্নাকাটি করতেন। এমনকি তাঁর গণ্ডদেশে অশ্রু বয়ে যাওয়ার কারণে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি কখনও এমন শরবত পান করেননি, যাতে তাঁর অশ্রুর সংমিশ্রণ হতো না। তিনি শরবত পান করতে আরম্ভ করতেই ঝরঝর করে তাতে অশ্রু পড়তে শুরু করত।

তিনি নিজ খেলাফতকালে হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে ডেকে বললেন, হুযায়ফা! আমি জানি, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে মুনাফিকদের নাম বলে গেছেন। আমি এও জানি, তিনি আপনাকে অন্য কারও কাছে নাম প্রকাশ করতে নিষেধও করে গেছেন। তাই আমি আপনার কাছে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করছি না। তবে আপনি আমাকে এতটুকু তো বলে দিতে পারেন, তাদের মধ্যে উমরের নাম নেই তো?

হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাহাদাত লাভের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন, বৎস! আমাকে দ্রুততম সময়ে গোসল দেবে, দ্রুততম সময়ে কাফন পরাবে এবং অতি দ্রুততার সাথে দাফন করে দেবে। ছেলে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা সবকিছু দ্রুততার সাথেই তো করব, কিন্তু আপনি এত জোর তাগিদ দিচ্ছেন কেন? উত্তরে হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) আশ্চর্যজনক কথা বলেছেন। বললেন, তাড়াহুড়া করতে এত জোর তাগিদ আমি এজন্য করছি যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তোমরা তাড়াতাড়ি আমাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে আমার বোঝা তোমাদের কাঁধ থেকে দ্রুত নামিয়ে দেবে। উমরের শেষ পরিণতি তো আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও আল্লাহর ভয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল আউলিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর শিষ্য ছিলেন। ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর ফিকাহ সংকলনের চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শ কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। অনেক বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেছিলেন।

এমনকি আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে লিখা হয়েছে, মুহাদ্দিছীনে কেরামের মধ্যে ইমাম বোখারি (রহ.) সম্পর্কেও সমষ্টিগতভাবে এত প্রশংসামূলক বাক্য ব্যবহার হয়নি, যত ব্যবহার হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর শানে। তিনি একই সময়ে চল্লিশ হাজার লোককে হাদীছের দরস দিতেন। তৎকালে স্পিকার ছিল না। এজন্য তিনি যখন হাদীছ পড়ে শোনাতেন, তখন অন্য লোকজন তা শ্রবণ করে মুকাব্বির হয়ে পেছনের লোকদেরকে শোনাতেন। একবার মুকাব্বিরদের সংখ্যা গণনা করা হলে তাদের সংখ্যা হয়েছিল বারোশত। এবার বলুন, মুকাব্বিরই যেখানে বারোশত, সেখানে সমাবেশটা কত বড় ছিল!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর শানে জনৈক মুহাদ্দিছ বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর জিন্দেগি কয়েক বছর একেবারে কাছ থেকে দেখেছি। আমি তাঁর জিন্দেগির মাঝে আর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির মাঝে একটা প্রার্থক্য দেখেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রবের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর এই সৌভাগ্য হয়নি। এছাড়া তাঁদের জিন্দেগি আর তাঁর জিন্দেগির মাঝে অন্য কোনো পার্থক্য আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) অন্তিম মুহূর্তে চৌকিতে শোওয়া ছিলেন। তিনি শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন, আমাকে মাটিতে শুইয়ে দাও। শিষ্যগণ হয়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এ কী বলছেন? তিনি দ্বিতীয়বার একই নির্দেশ দিলেন। অগত্যা শিষ্যগণ তাঁকে চৌকি থেকে উঠিয়ে নিচে মাটিতে শুইয়ে দিল। তখন মাটিতে কার্পেট বা অন্য কোনো বিছানা কিছুই ছিল না। সকল ছাত্র চিৎকার দিয়ে উঠল। কেননা, তারা তাদের ওস্তাদকে মাটিতে শোওয়ানোর পর দেখল, তিনি নিজের চেহারা মাটিতে ঘষতে শুরু করেছেন এবং হাত দিয়ে দাড়ি ধরে বলছেন, 'আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের বার্ধক্যের প্রতি রহম করুন! তিনি বলেননি, আমি একজন মুহাদ্দিছ। বলেননি, আমার ওয়ায দ্বারা অনেক মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। বলেননি, আমি তাকওয়ার জিন্দেগি যাপন করেছি। আমি রাতে ইবাদাত করে কাটিয়েছি বলেননি। তিনি নিজের কোনো আমল সামনে পেশ করেননি। বরং অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজের দাড়ি ধরে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে শুধু এই মিনতি করছে, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের বার্ধক্যের ওপর রহম করুন!

এরূপ পছন্দনীয় আমলকারী আমাদের বড়দের আল্লাহভীতির যখন এই অবস্থা ছিল, তো আমার দোস্তগণ! আমরা আমাদের আমলের ওপর কিভাবে আনন্দিত ও নির্ভার হতে পারি। আমরা কিভাবে মনে করতে পারি, আমরা বড় যিকিরকারী এবং তাহাজ্জুদগুজার হয়ে গেছি! এসবই শয়তানের প্রবঞ্চনা। প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে তো নিজ-নিজ গুনাহের ওপর কান্নাকাটি করা চাই। যাদের মধ্যে স্বীয় নেক কাজের ওপর গর্ব আছে, তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জরুরি ক্রন্দন করা। আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের এই দু'আ করা চাই যে,, হে আল্লাহ! ভুলচুকে ভরা আমাদের আমলগুলো কবুল করে নিন; আমরা জানি এগুলো কবুলের উপযুক্ত নয়; স্বাদহীন সেজদা, রূহহীন নামায। আমরা মসজিদে নামায পড়তে থাকি আর বাজারের অলিগলিতে ঘুরে ফিরি।

নিজের যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখা যাবে না

আজকের মাহফিলে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন যে, আমাদেরকে নিজেদের যোগ্যতা দেখা যাবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেদের কবুল করানোর জন্য সর্বদা চেষ্টা-তদবির চালাতে হবে। কেননা, যখনই কোনো অংহকারী মহান প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পড়ে যায়, তখন অনেক বড়-বড় ব্যক্তির মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়।

عدل کریں تے کمبدے جاوں اچیاں شاناں والے

تے فضل کریں تے بخشے جاوں میں جوی منہ کالے

'তিনি ইনসাফ করলে ধরা পড়বে অনেক উঁচু মর্যাদার অধিকারী

তিনি অনুগ্রহ করলে ক্ষমা পাব আমি কালো চেহারার অধিকারী।

যদি তিনি নিষ্ঠার মুআমালা করেন, তাহলে আমাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে তিনি যদি অনুগ্রহের মুআমালা করেন, তাহলে আমার মতো কালো চেহারার অধিকারীও ক্ষমা পেয়ে যাবে। এ দুনিয়াতে অনেক এমন লোক গত হয়েছেন, যারা বড়-বড় ইবাদাতগুজার ছিলেন। তথাপি তারা আল্লাহর দরবারে কবুল হতে পারেননি। বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন আবেদ ছিল। তিনি চারশত বছর ইবাদাত করেন। আমাদের তো বয়সই একশো বছর হয় না; অথচ তিনি চারশো বছর ইবাদাতই করেছেন। এমনকি হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে 'মুস্তাজাবুদ্‌দা'ওয়াত'

(যার দু'আ কবুল হয়)-এর মাকাম দান করা হয়েছিল। তিনি যেকোনো দু'আ করতেন, কবুল হয়ে যেত। তিনি চারশো বছর পর্যন্ত ইবাদাতকারী এবং দু'আ কবুলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বান্দা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একটি ভুল করে বসলেন। যদ্দরুন আল্লাহ্ তা'আলার জালালিয়াত চলে আসে এবং তিনি এই বান্দার চারশো বছরের ইবাদাত বাজেয়াপ্ত করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'সুতরাং, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের মতো।'[৪০]

আল্লাহ্! যেব্যক্তি আপনার সামনে চারশো বছর পর্যন্ত সেজদা করল, তার ব্যাপারে আপনি কুরআন মাজীদে ঘোষণা দিলেন, তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো; তাহলে আমরা কোন খেতের গাজর-মুলা। আমাদের ওজন বা মর্যাদা-ই বা কী যে, আমরা নিজেদের নগণ্য ইবাদাতে গর্বিত হয়ে যাব। আমার বন্ধুগণ! প্রতিপালকের কাছে আমাদের কবুলিয়াত চাওয়া চাই। আল্লাহ্! আমরা আমাদের অচল মুদ্রায় গর্ব করে বেড়াচ্ছি; কিন্তু আপনি স্বীয় ফজল ও করমে এগুলো কবুল করে নিন।

একটি আকর্ষণীয় ঘটনা

হযরত শাইখুল হাদীছ (রহ.) তাঁর এক কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্ উন্দুলুসি (রহ.)-এর একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ উন্দুলুসি (রহ.) হযরত শিবলি (রহ.)-এর শাইখ ছিলেন। হাফেযে কুরআন এবং হাফেযে হাদীছও ছিলেন তিনি। লক্ষাধিক হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি লাখো মানুষের আধ্যাত্মিক রাহবর ছিলেন। একবার তার মধ্যে সামান্য গর্বের ভাব সৃষ্টি হয়ে গেল। ঘটনাটি ছিল এই, একবার তিনি খৃষ্টানদের একটি জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় ক্রুশদণ্ড দেখতে পান। এ-সময় তাঁর অন্তরে উদয় হলো, এরা কত নির্বোধ, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে শরীক করছে! এতটুকু বিষয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। যেন বুঝিয়ে দিলেন, তুমি যদি হিদায়াতপ্রাপ্ত হও, তাহলে এটা কী তোমার কৃতিত্ব, নাকি আমার দয়া।

---

৪০. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭২

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন পরীক্ষায় অবতীর্ণ করলেন যে, তিনি শূকর চরাতে লেগে গেলেন। শিষ্যদের বলে দিলেন, তোমরা চলে যাও! কেননা, আমার ভেতরে থেকে সবকিছু উধাও হয়ে গেছে। লোকজন পেরেশান হয়ে ফিরে এল।

এক বছর পর হযরত শিবলি (রহ.) শাইখের অবস্থা জানার জন্য সেখানে যান। লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের শাইখ কোথায়? তারা বলল, হয়তো জঙ্গলে কোথাও খৃষ্টানদের শূকর চরিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি সেখান থেকে জঙ্গলে গেলেন এবং দেখলেন, সেই জুব্বা, সেই পাগড়ি, সেই লাঠি, যা নিয়ে তিনি ইতিপূর্বে জুমার খুতবা দিতেন এবং قَالَ اللهُ وَقَالَ الرَّسُوْلُ (আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) পড়াতেন, আজ সেগুলো পরিহিত অবস্থায়ই শূকর চরাচ্ছেন। শিবলি (রহ.) কাছে গিয়ে বললেন, হযরত! আপনি কুরআন মাজীদের হাফেয ছিলেন। এখন কি আপনার কুরআন মাজীদ স্মরণ আছে, নাকি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, আমি সব ভুলে গেছি। শিবলি (রহ.) বললেন, হযরত! কোনো একটি আয়াতও স্মরণ নেই? হযরত অনেক চেষ্টার পর বললেন, হ্যাঁ, একটি আয়াত স্মরণ আছে। সেই আয়াতটি হলো,

مَنْ يُّهِنِ اللهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে মর্যাদাদানকারী কেউ নেই।'[৪১]

তারপর বললেন, হযরত! আপনার কি কোনো কিছু স্মরণ আছে? তিনি বললেন, আমি সব ভুলে গেছি। শিবলি (রহ.) বললেন, একটি হাদীছও স্মরণ নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ; একটি হাদীছ মনে আছে। সেটি হলো–

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

'যেলোক তার দীনকে পাল্টে ফেলবে, তাকে হত্যা করো।'

এতে হযরত শিবলি (রহ.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। যখন তিনি কাঁদতে শুরু করেন, তখন তাঁর শাইখের ওপরও আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি পড়ে গেল এবং শাইখও কাঁদতে শুরু করলেন। শাইখ কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে এই আশা তো করিনি যে, আপনি আমাকে এই দুরবস্থায় নিপতিত করবেন। যখন তিনি

---

৪১. সূরা হাজ্জ : আয়াত ১৮

অসহায়ত্বের এ কথাগুলো বললেন, তখন আল্লাহর করুণা হলো এবং তিনি তাঁকে সেসব নেয়ামত ফিরিয়ে দিয়ে পুনরায় তাকে যুগের বড় শাইখ বানিয়ে দিলেন।

ব্যাকুলতা সৃষ্টিকারী আয়াত

কুরআনে কারীমে এমন কতিপয় আয়াত আছে, যা মানুষকে ব্যাকুল করে রাখে। উদাহরণত–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

'তাদের ধাপে-ধাপে এমনভাবে অধঃপতিত করব যে, তারা বুঝতেই পারবে না।'[৪২]

একটু চিন্তা করুন! অনেক আলেম এমন আছেন, যারা ছাত্রজীবনে তাহাজ্জুদ পড়তেন। ইশরাক, চাশত এবং আউয়াবীনও পড়তেন। কিন্তু যখন লেখাপড়া শেষে বাড়ি ফিরলেন এবং বিয়ে করলেন, তখন তাদের জীবনের সেই ধারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা নিজেদের আলেমই মনে করছেন। তবে আমলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে নিজেরাই বলছেন, ছাত্রজীবন খুব ভালো ছিল। তারা ভুলে যাচ্ছেন, এমন হয়ে যাচ্ছে কি-না যে, আমরাই এই আয়াতের পাত্র হয়ে গেলাম।

আপনারা দেখে থাকবেন, প্রথম পর্যায়ে পরিপূর্ণ তাকওয়ার জীবন যাপন করতেন। কিন্তু যখন তার কোনো কার্যকলাপ আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় হয়ে যায় এবং তিনি তাকে অধঃপতিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তাকে অধঃপতিত করেন না। বরং ক্রমান্বয়ে তাকে অধঃপতিত করেন।

প্রথম পর্যায়ে যথাযথ গুরুত্বসহ তাহাজ্জুদ নামাযের আমল ছিল। এক পর্যায়ে তা ছুটে যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

তারপর ইশরাকের নামাযের প্রতিও যত্ন থাকে না।

তারপর চাশত ও আউয়াবীনের নামাযের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়।

তারপর তাকবীরে উলা ছুটে যেতে থাকে।

---

৪২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮২

তারপর মেসওয়াকের সুন্নতও ছুটে যেতে থাকে।

তারপর ফরজও ছুটে যাওয়া শুরু হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত মানুষ হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়।

এই সেই ব্যক্তি, যে মুত্তাকী ছিল। কিন্তু গর্ব ও অহংকারবশত কাউকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছে আর আমাদের মালিকের কাছে সেটা অপছন্দ হয়েছে। তাই তিনি তাকে ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত করেছেন। সে অধঃপতনের বিষয়টি বুঝতেই পারেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ

'আমি তাদেরকে ধাপে-ধাপে এমনভাবে অধঃপতিত করব যে, তারা বুঝতেই পারবে না।'[৪৩]

এই আয়াতটি পড়লে অন্তর ব্যাকুল হয়ে যায়, ইয়া আল্লাহ! কখনও আমাদের সাথে এরূপ মুআমালা না হয়ে যায়।

২. এরূপ আরও একটি আয়াত আছে, যা পড়লে শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। আয়াতটি শোনার পূর্বে একটি কথা শুনুন। একবার আমরা মদীনা শরীফ থেকে হজের জন্য যাচ্ছিলাম। আমাদের গাড়িতে সেখানে কর্মরত একজন ব্যক্তি উঠে বসে গেল। আইনত তাদের পাঁচ বছরে একবার হজ করার অনুমতি ছিল। কিন্তু মহব্বত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ভেবে রেখেছিলেন, আমি চেকপোস্ট পর্যন্ত যাব। চেকপোস্টের লোকজন আমাকে সামনে যেতে দিলে আমার হজ হয়ে যাবে। আর বাঁধা দিলে ফিরে চলে আসব। গাড়ি যখন চেকপোস্টের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন আমি দেখলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত এবং চেহারা নীল বর্ণ ধারণ করেছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অবস্থা কেন হলো? তিনি বললেন, চেকপোস্ট সামনে এসে গেছে। তারা কোনো গাড়ি দেখে ইশারা করে বলে দেয়, যাও। আবার কোনো গাড়ি দেখে ইশারায় থামতে বলে। তারা যদি আমাদের গাড়ি দেখে ইশারায় থামতে বলে, তাহলে আমার কী হবে? এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। লোকটির এই অবস্থা দেখে আমি কুরআনে কারীমে মনোনিবেশ করলে একটি আয়াত মনে পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন কিছু মানুষকে দেখে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন–

---

৪৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮২

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'ওদের থামাও! আমি ওদের জিজ্ঞাসা করব।'[৪৪]

ওরা বড়-বড় কথা বলত। ওরা নিজেদের বড় কিছু মনে করত। আমি অমুক, আমি তমুক। অন্যদের ব্যাপারে বলত, সে তো ফাসেক ও বদকার এবং অন্যদের গীবত করত। তারা অন্যদেরকে কষ্ট দিত। তারা অন্যের হক ছিনিয়ে নিত। তারা অন্যের দোষত্রুটি বলাবলি করত এবং দোষ খুঁজে বেড়াত। তারা অন্যের ইজ্জত-সম্মান লুটে নিত।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ

'তাদের থামাও, আমি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করব, তাদের জবাবদিহি করব, তারা কীরূপ জীবন যাপন করে এসেছে।'

অপরদিকে হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ

'হিসাব-নিকাশে যার জবাব চাওয়া হবে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হবে।'

আমাদেরও নিজেদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা চাই, আমরা কিরূপ জীবন যাপন করছি। আমার বন্ধুগণ! চিন্তা করবেন না, আমি এটা করছি, আমি সেটা করছি। কখনও না। বরং চিন্তা করবেন, আমি যা করছি, জানা নেই তা আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয় কিনা? মূল বিষয় কবুল হওয়া। সুতরাং মিনতির সাথে কবুলিয়াত প্রার্থনা করতে হবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

صَيْدُ الْخَاطِر (সাইদুল খাতির) কিতাবে ইমাম ইবনে জাওযি (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। যখন আমি ঘটনাটি পড়ি, কান্না ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে পারি না। তিনি বলেন, মিশরের জামে মসজিদে একজন মুআয্যিন ছিলেন। তিনি মিনারে উঠে বহু বছর পর্যন্ত আল্লাহু আকবারের আওয়াজ উঁচু করেছেন। বাহ্যিকভাবে তিনি দীনদার ছিলেন। কিন্তু তার অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি বিদায় নিয়েছিল। বিপরীতে অন্তরটা ছিল

---

৪৪. সাফফাত : আয়াত ২৪

পাপাচারে ভরপুর। একবার তিনি আযান দিতে মিনারায় উঠলেন। মিনারার আশেপাশে অনেক বাসাবাড়ি ছিল। খৃষ্টানদের একটি বাসায় তার দৃষ্টি পড়ল। সেখানে একটি রূপসি মেয়ে দেখতে পেল। মেয়েটির ওপর দৃষ্টি পড়ার সাথে-সাথে তার ভেতরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। আযান দেওয়ার পরিবর্তে সে মিনার থেকে নিচে নেমে এল এবং মেয়েটির পিতার সাথে দেখা করে বলল, আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। মেয়ের পিতা বলল, এজন্য আপনাকে খৃষ্টান হতে হবে। সে বলল, ঠিক আছে; আমি খৃষ্টান হতে প্রস্তুত; আমার সাথে তার বিয়ে পড়িয়ে দিন। এবার মেয়ের পিতা বলল, আপনি ওপর তলায় আসুন! আমি আপনার সাথে আমার মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি। সে ওপরে উঠতে থাকলে সিড়ি থেকে পা ফসকে উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

'না আল্লাহকে পেল, না মূর্তির মিলন

না এদিকের থাকল, না ওদিকের।

এই ঘটনা পড়ার পর চিন্তা করি, হে আল্লাহ! সেই ব্যক্তি বহু বছর আপনার নাম সমুন্নত করেছে। জানা নেই, তার কোন কাজটা আপনার কাছে অপছন্দ হয়েছে। যদ্দরুন এত মর্যাদাময় আমল করা সত্ত্বেও আপনি তাকে অন্তিম সময়ে ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দিলেন। ঘটনাটি স্মরণ রেখে আমাদের খুব বেশি ভয় করা জরুরি। এরূপ না ভাবা চাই, আমি মসজিদে বসি, যিকিরের মাহফিলে যাই, আমি বাই'আত হয়ে অনেক উঁচু স্থরে পৌঁছে গেছি, আমি অনুমতি ও খেলাফত লাভ করেছি। এগুলো সবই সাধারণ বিষয়। মূল কথা হলো নিজেদের আল্লাহর কাছে কবুল করানো এবং প্রতি পদে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করা।

কবুলিয়াত লাভের মূল্যবান ব্যবস্থাপত্র

আমার বন্ধুগণ! আমরা অপরাধী। এজন্য আমাদের উচিৎ নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া। আমাদের সমস্যা হলো, যদি কেউ আমাদের ব্যাপারে সামান্য কোনো কথা বলে, আমরা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাই। এই রাগ এ কারণে আসে যে, আমরা নিজেদের ভুলের উর্ধ্বে মনে করি। পক্ষান্ত

রে আমাদের আকাবিরগণ বলেছেন, সালেকের পরিচয় হলো, যদি কোনো ব্যক্তি তার গীবত করে, তাহলে তা শ্রবণ করে রাগান্বিত না হয়ে মনে-মনে এতটুকু বলবে, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, বাস্তবে আমি এরূপই।

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। কোনো ব্যক্তি তাঁর সামনে অতিরঞ্জিত করে বলল, আপনার মধ্যে এই দোষও আছে, ওই দোষ আছে। তিনি শুনতে থাকলেন। সবশেষে তিনি বললেন, ভাই! আপনি যদি আমার প্রতি আরও অসন্তুষ্ট হতে চান, হতে পারেন। কেননা, আপনি আমার অল্পস্বল্প দোষ সম্পর্কে অবগত আছেন। আর আমি আমার অনেক দোষ সম্পর্কে অবগত। আমাদের আকাবিরদের অবস্থা ছিল এই। তাঁরা নিজেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। যদি আমরাও তাদের মতো নিজেদের প্রতি দৃষ্টি রাখি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কবুলিয়াত লাভ হয়ে যাবে।

একটি চমৎকার দু'আ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের থেকে তাদের জান ও তাদের ধনসম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।'[৪৫]

উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি ইশারা করে এক কবি ফারসিতে খুব চমৎকার কথা লিখেছেন–

تو بہ علم ازل مرا دیدی
دیدی آنگہ بعیب بخریدی
تو بعلم آں و من بعیب ہماں
رد مکن آنچہ خود پسندیدی

'হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনন্ত ইল্‌মের সাহায্যে আমাকে দেখেছেন। তখন দোষত্রুটিসহ দেখা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন। ইল্‌মের সাথে আপনি সেই আপনিই আছেন; আর আমি দোষত্রুটির সাথে সেই আমিই আছি। যে বস্তু আপনি ক্রয় করেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

---

৪৫. সূরা তাওবা : আয়াত ১১১

যদি এভাবে কাকুতিমিনতির সাথে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর রহমত নাযিল হবে।

অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত ভয় করা জরুরি

আমার বন্ধুগণ! মনে রাখবেন, অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো বান্দা-ই আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা থেকে নিরাপদ হতে পারে না। কেননা, কে জানে কখন কী ঘটে যায়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ঘটনা। তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় শিষ্যগণ তাঁর সামনে কালেমা পড়তে শুরু করেন। ইমাম সাহেব (রহ.) শুধু ১-১ (লা, লা) বলছিলেন। পূর্ণ কালেমা বলছিলেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁর অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলে শিষ্যগণ জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! ঘটনা কী? তিনি বললেন, শয়তান আমার সামনে এসে বলতে লাগল, আহমাদ ইবনে হাম্বল! আপনি ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন। আর আমি বলছিলাম, না এখনও হইনি।

হে বিতাড়িত! যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোর প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ নই। যেখানে আমাদের বড়দের অবস্থা ছিল এই, সেখানে আমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। সুতরাং আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বক্ষণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কম্পিত থাকি এবং টুটাফাটা যে আমল করছি, সেগুলো কবুল করে নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতিভরে দু'আ করতে থাকি। কবুলিয়াতের মূল ঘোষণা তো কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার পর হবে। দুনিয়াতে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় কে কোন অবস্থায় আছে।

کون مقبول ہے کون مردود بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھوڑا کون ہے

কে মাকবুল, কে প্রত্যাখ্যাত, জানা নেই; কী জ্ঞান আছে তোমার কী হবে কে
যখন সকলের আমল পাল্লায় উঠবে, তখন স্পষ্ট হবে অচল-অকেজো কে।

কেয়ামতের দিন স্পষ্ট হবে, কে কোন পর্যায়ের। এখন আমরা নিজেদের শাইখকে অনেক উঁচু স্তরে আসীন করি। তাদের মাঝে তুলনা করা শুরু করি। এগুলো সবই বেয়াদবি। আমাদেরকে সকল মাশায়েখের প্রতি ইজ্জত-সম্মান

প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার কাছে মাকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা চাই। আর নিজেকে দুনিয়াতে সর্বনিম্ন স্তরের, সর্বাপেক্ষা কম আমলকারী মনে করা চাই।

হে আল্লাহ! আমাদের এসব অচল-অকেজো আমলগুলো কবুল করে নিন এবং কেয়ামতের দিন আপনার দরবারে আমাদের সম্মানের পাত্র করে নিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِه وَأَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

জীবিকার বণ্টন

'আল্লাহর ওপর যাদের তাওয়াক্কুল থাকে, তাদের রিযিক সব সময় আসতেই থাকে। এটা কত-ই না আশ্চর্যের বিষয় যে, ইঁদুর-বিড়াল খেতে পায় আর যারা আল্লাহ তা'আলার নায়েব ও খলীফা, তারা ক্ষুধার্ত থাকে। এই সংকীর্ণতা ও দুরবস্থা বেশিরভাগ আমাদের গুনাহের ফলাফল হয়ে থাকে। নতুবা বিশ্বজাহানের যে প্রতিপালক হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে মান্না-সালওয়া খাওয়াতে পারেন, তিনি কি উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে মান্না-সালওয়া খাওয়াতে পারেন না? রিযিকের ব্যাপারে সব সময় বিশ্বাস রাখবেন, আমার রিযিক মানুষের দায়িত্বে নয়; বরং মহান প্রতিপালকের দায়িত্বে। মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ কখনও ভোলেন না।'

জীবিকার বণ্টন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى, اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلا اَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ آخَرَ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

পার্থিব জীবনে সম্পদের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلا اَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমার সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে দেয়। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'[৪৬]

আল্লাহ তা'আলার স্মরণে দুটি বস্তু প্রতিবন্ধক হয়। একটি ধনসম্পদ। দ্বিতীয়টি সন্তানসন্ততি। দুটি বস্তুই মানুষের রিযিকের মধ্যে গণ্য। ধনসম্পদ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নেয়ামত এই শর্তে যে, এর ব্যবহার সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে। যদি ধনসম্পদ ব্যয়ে সঠিক পদ্ধতি

---

[46]. সূরা মুনাফিকূন : আয়াত ৯

অবলম্বন না করা হয়, তাহলে তা মানুষের জন্য মহাবিপদ হয়ে দাঁড়ায়। এর উদাহরণ চাকুর মতো। যদি কোনো ব্যক্তি চাকু দিয়ে ফল কিংবা সবজি কাটে, তাহলে তো সেটা খুব ভালো কাজ।

কিন্তু সে যদি এই চাকু দিয়ে কোনো মানুষের হাত কেটে ফেলে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা সীমাহীন জঘন্য কাজ। অর্থাৎ– চাকুর ব্যবহারই তাকে ভালো অথবা মন্দ বানিয়ে দেয়। এমনিভাবে যদি সম্পদের ব্যবহার সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক খাতে হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত ভালো। পক্ষান্তরে এর ব্যবহার যদি মন্দ হয়, তাহলে এই সম্পদই মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকর হয়ে যাবে। সম্পদ এমন একটা বস্তু, যা ছাড়া মানুষের জীবন অচল। আবার এর সাথে সঠিক আচরণ করাও সহজ নয়। আমাদের মাশায়েখগণ এর দৃষ্টান্ত পানি আর ভোঁদরের মতো বলে বর্ণনা করেছেন। ভোঁদরের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পানিতে এসে বসার পর সে যদি সামান্যতম বিপদ আঁচ করতে পারে যে, তাকে কোনো শিকারী শিকার করতে চাচ্ছে, তাহলে পানির ওপর থেকেই উড়ে চলে যায়। এমনটি এজন্য হয় যে, এর পালক খুব চিকন; পানিতে ভিজে না। এই ভোঁদরকে যদি পানিতে ভালোভাবে চুবানো যায় এবং এর সমস্ত পালক ভিজে যায়, তাহলে তার পক্ষে ওড়া কঠিন হয়ে যায়।

তো আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, হে মানবজাতি! তোমরা সম্পদের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখো, যেরূপ সম্পর্ক ভোঁদর রাখে পানির সাথে। মাছরাঙা পানির ওপর বসে। তারপর যখনই প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে, তখন সেখান থেকেই সোজা উড়াল দিয়ে চলে যায়। সম্পদের সাথে মানুষের সম্পর্কও এরূপই হওয়া চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ তার প্রয়োজনের অধীন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো। আর যেখানেই সম্পদ অন্তরকে নাপাক করা শুরু করবে, সেখান থেকেই তা বর্জন করে সোজা আল্লাহ তা'আলার দিকে উড়ে আসবে।

আপনারা দেখে থাকবেন, নৌকা পানিতে চলে। কেউ যদি বালিতে সেটি চালাতে চায়, তাহলে কস্মিনকালেও চলবে না। কেননা, এটি তৈরি-ই হয়েছে পানিতে চলতে। কিন্তু পানিতেও সেটি তবেই চলবে যখন পানি থাকবে নিচে আর সেটি থাকবে ওপরে। পানি যদি নৌকার ভেতরে চলে আসে, তাহলে সেই পানি নৌকা ডুবে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ মানুষের আয়ত্তে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবাকৃতির এই নৌকা ঠিকঠাক চলতে থাকে। আর যখন সম্পদ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেয়, তখন তার ঈমানের নৌকাও ডুবে যায়।

তাই তো বলা হয়, সম্পদ মানুষের উত্তম সেবক আর নিকৃষ্ট মনিব। যেব্যক্তি একে সেবক বানিয়ে রাখে, তার জীবনে সবকিছুই সহজ হয় এবং পরকালেও সহজ হবে। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করা হলে, উঁচু মর্যাদা লাভ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি সম্পদকে নিজের মনিব বানিয়ে নেয় এবং পূজা করতে শুরু করে, তার জন্য এই সম্পদ নিকৃষ্ট মনিব হয়ে যায়। এজন্য-ই তো কিছু মানুষ সম্পদশালী হয়; আর কিছু মানুষ সম্পদের চৌকিদার হয়। সম্পদশালী হন তারা, যাদের আল্লাহ তা'আলা অঢেল সম্পদ দান করেন এবং তারা দুহাতে আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় করেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে নিজের কাছে সঞ্চয় করে এবং প্রতিদিন নিদ্রা থেকে জেগে ব্যাংক-ব্যালেন্স দেখে, হিসাব-নিকাশ করে যে, আজকে এ পরিমাণ হয়েছে, গতকাল এই পরিমাণ ছিল, পরশু এই পরিমাণ ছিল। এ-জাতীয় লোকজন সম্পদের চৌকিদার হয়। তারা মারা যাওয়ার পর তাদের সন্তানেরা ভোগ-বিলাসিতা করবে। কিন্তু এসব সম্পদের হিসাব-নিকাশ তাদের থেকেই নেওয়া হবে।

সম্পদ কল্যাণেরও কারণ, অকল্যাণেরও কারণ

সম্পদের মধ্যে মঙ্গলও আছে, অমঙ্গলও আছে। কুরআনে কারীমে সম্পদ মঙ্গলজনক হওয়ার বর্ণনা এসেছে। উদারহণ স্বরূপ–

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

'সে যদি কল্যাণ (সম্পদ) রেখে যায়, তাহলে পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য সঙ্গত ওসিয়ত করে যাবে।'[৪৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

'নিশ্চয়ই সে খাইর (সম্পদ)-এর মহব্বতে খুবই কঠোর।'[৪৮]

উক্ত আয়াতে خَيْر দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পদ।

---

৪৭. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮০

৪৮. সূরা আদিয়াত : আয়াত ৮

সম্পদের একটি উপকারিতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

'এবং তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ সোপর্দ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ বানিয়েছেন।'[৪৯]

এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পদকে মানবজাতির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ সাব্যস্ত করেছেন। অন্য এক আয়াতে বাইতুল্লাহ শরীফকেও মানবাজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ বলেছেন। ইরশাদ করেছেন–

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ

'আল্লাহ মহিমান্বিত কা'বাঘরকে মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ বানিয়েছেন।'[৫০]

এখানে ওলামায়ে কেরাম বলেন, বাইতুল্লাহ শরীফ মানবজাতির আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ। আর সম্পদ দৈহিক জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপকরণ।

ধনদৌলত মানবজাতির অমঙ্গলেরও কারণ। এটা এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, যখন ধনসম্পদ হাতে আসে, তখন গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ সম্পদশালী হলে তার চলন-বলনে সম্পদের ঝংকারও শামিল হয়ে যায়। তাই তো তার কথাবার্তাতেই উপলব্ধি হয়, তার আঁচলে কিছু আছে। সে আল্লাহর বান্দা মানুষকে মানুষই গণ্য করে না। এই সম্পদের কারণে মানুষের মধ্যে গর্ব-অহংকার চলে আসে। কারুন তার সময়কার বড় ধনী ব্যক্তি ছিল। লোকজন যখন তাকে দেখত, তখন তারাও তার মতো হওয়ার কামনা করত। কুরআন মাজীদে এসেছে, যখন লোকজন তাকে দেখত, তখন তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে যেত এবং তারা বলত–

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

'হায় আফসোস! আমাদেরও যদি তেমন সম্পদ থাকত, যেমন সম্পদ দেওয়া হয়েছে কারুনকে! নিঃসন্দেহে সে বড় সৌভাগ্যবান।'[৫১]

---

৪৯. সূরা নিসা : আয়াত ৫

৫০. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯৭

৫১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৯

বর্তমান যুগেও সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ এটাই। প্রত্যেক ব্যক্তি চায়, আমার কাছে কল্পনার অধিক সম্পদ চলে আসুক।

আর্থিক পেরেশানি

আপনারা যদি মুসলিম দেশগুলোতে ঘুরে দেখেন, তাহলে আপনারা এমন অনেক ব্যক্তি পাবেন, যারা আর্থিক সমস্যার কারণে দিশেহারা। যদি সেখানকার অধিবাসীদের সাথে কথা বলেন, তাহলে–

কেউ বলবে, আমার ছেলের চাকরি হচ্ছে না।

কেউ বলবে, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা যাচ্ছে।

কেউ বলবে, আমার এত ক্ষতি হয়ে গেছে।

কেউ বলবে, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য নেই।

কেউ বলবে, ছেলেকে বিয়ে করাতে হবে। তার জন্য ঘর নির্মাণের জায়গা নেই।

মোটকথা, তাদের সকল পেরেশানির মূলে দেখা যাচ্ছে সম্পদ আর সম্পদ। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করা অনেক উপকারী বলে মনে হচ্ছে।

পেরেশানির সমাধান

দুটি বিষয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে। একটি হচ্ছে সম্পদের আধিক্য। আরেকটি হচ্ছে সম্পদের বরকত। আপনারা অনুসন্ধান করলে দেখবেন, বর্তমানে লোকজন সম্পদের আধিক্য কামনা করে। সম্পদের বরকত কামনা করে না। কেউ বলে, আমি এখন গ্রেড সতেরোতে আছি, যদি গ্রেড আঠারোতে উন্নীত হতে পারি, তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কেউ বলে, আমি এখন ব্যবসা শুরু করেছি, যদি ব্যবসাটি চালু হয়ে যায়, তাহলে আমার সকল প্রয়োজন মিটে যাবে। কেউ বলে, আমার ছেলে এম. এইচ. সি. করছে। সে যদি কোনো একটা লাইন ধরে ফেলতে পারে, তাহলে আমার সব সমস্যার অবসান ঘটে যাবে। অর্থাৎ– তাদের দৃষ্টিতে সকল সমস্যার সমাধান হবে তখন, যখন সম্পদে প্রাচুর্য আসবে। অথচ সম্পদের প্রাচুর্যে আমাদের সমস্যার সমাধান নেই। বরং সম্পদের বরকতে সমস্ত সমস্যার সমাধান বিদ্যমান। অনেক কোটিপতি আছে, যাদের সম্পদে বরকত নেই। ফলে তাদের পেরেশানি দূর হচ্ছে না। হাজার-হাজার লোক আছেন, যারা কারখানার মালিক, বড় চাকরিজীবী, বড় ব্যবাসয়ী, কিন্তু তাদের মতো অন্য সাধারণ কোনো লোক পেরেশান হয় না।

একজন জেনারেল ম্যানেজারের অবস্থা

এই অধমের কাছে একবার টেক্সটাইল মিলের একজন জেনারেল ম্যানেজার এলেন। তিনি দুটি মিলের ম্যানেজার ছিলেন। আনুমানিক বিশ বছর পূর্বের কথা। সে-সময় তার বেতন ছিল এক লাখ রুপি। আজকের লাখ নয়, বিশ বছর পূর্বের লাখ। বর্তমানে ডলারের রেট ষাট রুপি। আর তখন ডলারের রেট ছিল আঠারো রুপি। তিনি বলতে লাগলেন–

আমার বাসা ভাড়া কোম্পানি দেয়।

আমার পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে চিকিৎসাব্যয় কোম্পানি বহন করে।

আমার বাসার সকল কর্মচারী অর্থাৎ– ড্রাইভার, বাবুর্চি ও দারোয়ান সবার বেতন কোম্পানির দায়িত্বে।

এমনকি আমার ইনকামট্যাক্সও কোম্পানি পরিশোধ করে। আর আমি নির্ভেজাল এক লাখ রুপি নিয়ে বাসায় আসি।

তিনি বললেন, আমার পরিবারের সদস্য আমার তিন সন্তান, আমি, আর আমার স্ত্রী। অর্থাৎ– পরিবারের মোট সদস্য পাঁচজন। তারপর তিনি চোখের অশ্রুতে কেঁদে থেমে গেলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই সমস্যাটা কী? তিনি বললেন, আমার ব্যয় নির্বাহ হয় না। আমি বললাম, এত আয় সত্ত্বেও আপনার প্রয়োজন পূর্ণ হয় না? তো এর কারণ কী? তিনি বললেন–

'আমি পঁচাত্তর লাখ রুপি ব্যয় করে অমুক স্থানে বাড়ি নির্মাণ করলাম। জানি না, কন্ট্রাক্টর এর ডিজাইনে কোনো ত্রুটি করেছে কিনা? নির্মাণের কিছু দিন পর বাড়ির পিলার ধসে গেল এবং সম্পূর্ণ কংক্রিট নিচে মাটির সাথে মিশে গেল। এখানে পঁচাত্তর লাখ রুপি বিনষ্ট হলো। এছাড়া তেইশ লাখ রুপির একটি জিরোমিটার গাড়ি ক্রয় করলাম। এক জায়গায় গাড়ি পার্কিং করে ব্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ইতোমধ্যে অন্য একটি গাড়ি এক মোটর সাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে আমার গাড়ির সাথে এমনভাবে সংঘর্ষ লাগল যে, আমার গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।'

যখন আমি তার এই বিবরণ শুনলাম, তখন আমার উপলব্ধি হলো, মানবজাতির সমস্যার সমাধান সম্পদের আধিক্যের মধ্যে নয়; বরং সম্পদের বরকতের মধ্যে নিহীত।

এক শ্রমিকের তৃপ্তিদায়ক ঘুম

আমি গত কিছু দিন হয় মসজিদের ছাদ ঢেলেছি। জুলাই মাস ছিল। দ্বিপ্রহরে শ্রমিকদের পানাহার, নামায ও বিশ্রামের জন্য এক ঘন্টার ছুটি দেওয়া হলো। এ-সময় আমি এক যুবককে দেখলাম, জুলাই মাসে রোদের মধ্যে দুপুর একটার সময় কংক্রিটের স্তূপে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ঘটনা হলো, ছুটি হওয়ার পর সে সেখানেই শুয়ে পড়ে এবং নিদ্রা চলে আসে। তাকে দেখে আমি হয়রান হলাম যে, দুনিয়াতে কতিপয় লোক এমনও আছে, যাদের গরমকালে দ্বিপ্রহরের একটা বাজে উত্তপ্ত কংক্রিটেও তৃপ্তির ঘুম এসে যায়। আবার কতিপয় লোক এমনও আছে, যাদের এসিরুমে নরম বিছানাতেও ঘুম আসে না। তারা ঘুমের ট্যাবলটও খান; তারপরও কিন্তু তাদের ঘুম আসে না। তারা এপাশ-ওপাশ করতে-করতে ঘুমের জন্য মান্নত করেন; কিন্তু ঘুম আসে না। এর কারণ হলো, তাদের অন্তর থাকে অস্থির।

ধ্বংসের গন্ধ ও কুফরের গন্ধ

আল্লাহ তা'আলার সমীপে বরকত প্রার্থনা করা জরুরি। বরকত বলা হয়, মানুষের কাছে যে-পরিমাণ সম্পদ আছে, তা-ই প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়ে যাওয়া। এই দু'আ অনেক স্বল্পসংখ্যক লোকই করে থাকে। তবে অঢেল সম্পদ হয়ে যাক এই দু'আ সবাই করে। এজন্যই সমস্যার সমাধান হয় না। স্মরণ রাখবেন, যদি সম্পদ বেড়ে যায়, তাহলে এর মধ্যে ধ্বংসের গন্ধ আছে। আর যদি সম্পদ হ্রাস পায়, তাহলে এর মধ্যে কুফরের গন্ধ আছে। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا.

'দারিদ্র কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার উপক্রম হয়।'

কেননা, যখন পানাহারের কিছু থাকবে না, ক্ষুধার্ত থাকবে এবং সন্তানদের প্রয়োজন মিটাতে পারবে না, তখন জবানে অভিযোগের ভাষা চলে আসবে যে, তিনি তো আমাদের কথা শোনেনই না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এ-ধরনের অভিযোগের কথা মানুষকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ কারণেই সম্পদ বেশি হলে তাতে ধ্বংসের গন্ধ আর কম হলে, তাতে কুফরের গন্ধ থাকে। এ কারণেই আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, বর্তমান যুগে সম্পদ মানুষের ঈমানের জন্য ঢালস্বরূপ। অবশ্য এই সম্পদ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করতে হবে, যাতে করে মানুষের পরকাল কল্যাণকর হয়।

খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.)-এর আত্মবিমুখতা

আমাদের মহান নকশবন্দিয়া ধারার একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল খাজা উবায়দুল্লাহ আহরার (রহ.)। তিনি সমরকন্দের বাসিন্দা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত অঢেল সম্পদ দিয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে সব সময় একটি কাফেলা চলত এবং তাদের ঘোড়া বাঁধার খুঁটি স্বর্ণ-রূপার তৈরি ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আত্মবিমুখতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।

একবার মাওলানা জামি (রহ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে যখন দেখলেন, এখানকার তো ঘোড়া বাঁধার খুঁটিগুলোও স্বর্ণ-রুপার তৈরি, তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং দূর থেকেই একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করলেন–

نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد

'সে আল্লাহর লোক নয়, যে দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে।'

এই পঙ্‌ক্তিটি বলে তিনি ফিরে চলে এলেন। পথে দুপুর হয়ে গেল। তিনি এক মসজিদে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর তন্দ্রা চলে এলে তিনি দেখলেন, হাশরের ময়দান এবং ইয়া নাফসী ইয়া নাফসীর জগত বিদ্যমান। এ-সময় কতিপয় লোক তাঁর কাছে তাদের হক দাবি করছে। এবার মাওলানা ফেঁসে গেলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করছেন, আমার কী হবে? ইতোমধ্যে তিনি খাজা উবায়দুল্লাহ আহরারকে (রহ.) দেখলেন, তিনি ঘোড়ার ওপর আরোহী এবং তাঁর পেছনে বিরাট সংখ্যক অনুসারী। পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মাওলানা! কী হয়েছে? জামি সাহেব বললেন, পাওনাদাররা আমাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি খুবই বিচলিত যে, আমি তাদের হক কিভাবে আদায় করব? তিনি বললেন, আচ্ছা, আপনার কাছে অভাব থাকলে আমার হিসাব থেকে তাদের হক আদায় করে দিন। একথা বলে তিনি প্রস্থান করলেন এবং মাওলানা জামি সাহেবের চোখ খুলে গেল।

এবার মাওলানা জামি সাহেবের অন্তরে ভাবনা জন্মাল যে, এই হযরত দুনিয়ামুখী নন। এর মধ্যে অবশ্যই কোনো রহস্য নিহীত আছে। কাজেই আমাকে পুনরায় তাঁর কাছে যাওয়া চাই। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমার উপকার হবে। তারপর তিনি হযরতের কাছে আবার এলেন। তিনি যখন হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরতের অন্তরে

সেই কথাটি ঢেলে দিলেন, যে কথাটি বলে তিনি প্রস্থান করেছিলেন। হযরত তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, মাওলানা! আপনি যে কথাটি বলে চলে গিয়েছিলেন, সেই কথাটি আমাদের একটু শোনান তো। তিনি আরজ করলেন, হযরত! না, না, তেমন কোনো কথা নয়। হযরত তাগিদ দিয়ে বললেন, না, আপনি কথাটি আমাদের শোনান। তিনি আরজ করলেন, হযরত! আমি বলেছিলাম–

نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد

'সে আল্লাহর লোক নয়, যে দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব রাখে।'

হযরত (রহ.) পঙ্‌ক্তিটি শুনে ছন্দ পূর্ণ করে দিলেন এবং বললেন,

اگر دارد برائے دوست دارد

'যদি দুনিয়ার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হয়, তাহলে পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য রাখা চাই।'

এজন্যই কেয়ামত দিবসে অনেক মানুষ এমন হবে, যারা গরিব-মিসকিন হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হাশর কারুনের সাথে করাবেন। এর কারণ হলো, তাদের অন্তরের বাসনা ছিল তেমন, যেমন ছিল কারুনের বাসনা। অপরদিকে অনেক মানুষ এমন হবে, যারা তাদের সময়কার রাজা-বাদশাহ এবং তুলতুলে নরম বিছানায় আরাম গ্রহণকারী, আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের সেবকদের মধ্যে তাদের হাশর করাবেন।

সম্পদের ক্ষেত্রে কঠিন সর্তকতা

কেয়ামত দিবসে মানুষকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছ এবং কোথায় ব্যয় করেছ? তাই ইসলাম সম্পদ উপার্জনে সতর্কতা অবলম্বন শিখিয়েছে এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রেও শর্তারোপ ও সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন পৃথিবীতে সম্পদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। তাই তো তাঁদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রচুর সম্পদ আসত; আর তাঁরা তা আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে খরচ করে দিতেন। একদা সাইয়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) রোযা অবস্থায় ছিলেন। তিনি গনিমতের সম্পদ থেকে বারো হাজার দরহাম পেলেন। সেই মুহূর্তেই নিজের সেবিকাকে ডেকে বললেন, মদীনার বিধবা ও

এতিম শিশুদের ডেকে আনো এবং এই অর্থ তাদের মাঝে বিলিয়ে দাও। তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বিলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ইফতারের সময় ঘনিয়ে এলে সেবিকা তাঁকে বলল, কিছু অর্থ দিন; ইফতারের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসি। সাইয়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বললেন, তোমার কাছে তো অর্থ ছিল? সেবিকা আরজ করল, সেগুলো সব বিলিয়ে দিয়েছি। এবার তিনি বললেন, তুমি আমাকে শুরুতে বলে দিতে। আমার তো নিজের জন্য কিছু রাখার কথা স্মরণই হয়নি। সুবহানাল্লাহ! বারো হাজার দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিলেন; কিন্তু নিজের ইফতারির জন্য কিছু রাখতে মনে নেই।

পৃথিবীতে এক শ্রেণির লোক এমন আছে, যারা সাপের মন্ত্র জানে। তারা সাপ ধরে ফেললেও সাপ তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করে না। সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থেকে দুনিয়ার মন্ত্র আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই দুনিয়া তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের কাছে তো সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় কারামত এই যে, একবার জিহাদের সফরে পথে তাদের সামনে সমুদ্র পড়লে তাঁদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমুদ্র অতিক্রম করে চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও সমুদ্রে ডোবেননি। কিন্তু মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের কাছে সাহাবায়ে কেরামের বড় কারামত হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন এবং তাদের পদতলে দুনিয়ার সমুদ্র প্রবাহিত হতে লাগল, তখন তাঁরা এই দুনিয়ার সমুদ্র থেকে নিজেদের ঈমানের নৌকা নিরাপদ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ধনদৌলতের পূজা থেকে পরিত্রাণের দু'আ

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের জন্য এবং নিজের সন্তানাদির জন্য একটি দু'আ করেছিলেন। সেই দু'আটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন–

وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

'হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।'[৫২]

---

৫২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৫

صَنَمٌ এর বহুবচন। صَنَمٌ এর অর্থ মূর্তি। কিন্তু কতিপয় মুফাস্সিরীনে কেরাম اَصْنَام থেকে স্বর্ণ-রুপা উদ্দেশ্য নেন। তাঁরা বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার সন্তানদের স্বর্ণ-রুপার পূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পাঁচটি বস্তু আবশ্যিকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত

হাদীছসমূহে বর্ণিত হয়েছে, পাঁচটি বস্তু আবশ্যিকভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে একটি বস্তু থাকবে, সেখানে অপরটি অবশ্যই থাকবে।

১. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্লজ্জতা বেশি হবে, সেখানে রোগ-ব্যাধিও বেশি হবে। তাই তো আপনারা দেখবেন, যেসব স্থানে নির্লজ্জতা ব্যাপক, সেসব স্থানে এমন এমন রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হচ্ছে, যা ইতোপূর্বে কেউ দেখেওনি, শোনেওনি। তারা এত ভীতসন্ত্রস্ত যে, একে অপরকে সালাম বিনিময় করতেও ভয় পায়। দেখা যায়, কিছু-কিছু এলাকায় ডাক আদান-প্রদানকারী লোকজন হাতে হাতমোজা পরিধান করে। টিকিট আদান-প্রদানকারী লোকজন হাতমোজা পরে রাখে। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি হাতমোজা পরে আছেন কেন? তাহলে তারা বলে, এজন্য পরি, যাতে কারও রোগব্যাধি আমাদের হাতে লেগে না যায় এবং তার শরীর থেকে আমাদের শরীরে রোগ চলে না আসে। তাদের মধ্যে বাস্তবেই এজাতীয় রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যে, তাদের একজন অপরজনের হাত স্পর্শ করাও বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।

২. যে-সম্প্রদায়ে ওজনে কম করার প্রবণতা থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেন।

৩. যে-জাতি যাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্ভিক্ষ দ্বারা দুর্বল করে দেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। ভূ-গর্ভে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। ফল-ফসল কিছুই ফলে না। আর এভাবেই তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে যায়।

৪. যে-জাতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে শুরু করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শত্রুবাহিনীকে বিজয়ী করে দেন।

৫. যে-জাতি আল্লাহ তা'আলার বিধানকে তুচ্ছ, নগণ্য এবং অবাস্তব মনে করতে শুরু করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অনৈক্য আর বিবাদের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেন।

তাওয়াক্কুলকারী ও দুনিয়াবিমুখ কে?

একব্যক্তি ইমাম শাফিয়ী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! কোনো ব্যক্তি এই ওসিয়ত করল যে, আমি মারা যাওয়ার পর আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাওয়াক্কুলকারী লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। এই অবস্থায় তার সম্পদ কাদের মাঝে বণ্টন করা হবে? ইমাম শাফিয়ী (রহ.) জবাব দিলেন, তার সম্পদ কৃষিজীবীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। কেননা, তারা যখন জমিনে বীজ বপণ করে, তখন তাতে কেবল পানি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর তাদের ক্ষমতায় কিছুই হয় না। এই বীজ গজানো এবং তাতে ফুল-ফল আসা সবই আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.

'তোমরা কি এই বীজ গজাও, নাকি আমি গজাই?'[৫৩]

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) লোকটিকে 'তার সম্পদ কৃষিজীবী লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে' এই জবাব এ-কারণে দিলেন যে, তাদের মাঝে তাওয়াক্কুল থাকে এবং তাদের দৃষ্টি থাকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, সেই ব্যক্তি যদি এই ওসিয়ত করে যে, আমার সম্পদ জ্ঞানীদের মাঝে বণ্টন করে দেবে, তাহলে কোন প্রকারের লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে? ইমাম শাফিয়ী (রহ.) উত্তরে বললেন, এ অবস্থায় তার সম্পদ সাধকদের (যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে দুনিয়া বিসর্জন দিয়েছে) মাঝে বণ্টন করা হবে। কেননা, তাঁরা পরকাল অর্থাৎ বড় বস্তুর লক্ষ্যে ছোট বস্তু উৎসর্গ করে থাকে। তারা চিরস্থায়ী বস্তু অবলম্বন এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তু বিসর্জন দিয়ে থাকে। এটাই জ্ঞানীদের নিদর্শন।

বিচক্ষণ ব্যক্তি কে?

শরীয়তের বিবেচনায় বিচক্ষণ ব্যক্তি কে? ওলামায়ে কেরাম এর উত্তরে বলেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি, যিনি কারও দ্বারা প্রতারিত হন না। হাদীছ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, মুমিন না ধোঁকা দেয়, না ধোঁকা খায়। জনসাধারণের মাঝে তো সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ বলে বিবেচিত, যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, প্রতারণা করতে পারে অথবা মানুষকে ঠকাতে পারে। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় বিচক্ষণ তাকে বলা হয়, যে অন্যদের দ্বারা প্রতারিত হয় না।

---

৫৩. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৬৪

ফকীহ্ কাকে বলে?

আভিধানিক অর্থে তো বোধসম্পন্ন লোককে ফকীহ্ বলা হয়। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় ফকীহ্ বলা হয়, যিনি স্বীয় কার্যক্রম জরুরতের গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন এবং জরুরতের অধিকের প্রতি লালায়িত নন।

কৃপণ কাকে বলে?

যে যাকাতকে বোঝা ও জরিমানা মনে করে, তাকে কৃপণ বলা হয়। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা-ই সম্পদ দিয়েছেন। আর এখন সে আল্লাহ্ তা'আলার নামে খরচ করছে না। এই অধমের সাথে এক নাস্তিকের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, এই যে যাকাতের বিধান, আমি এর ওপর কেন আমল করব এবং কেন যাকাত দেব? সম্পদ আমি নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন করলাম, তারপর আমি তা অন্যকে দিয়ে দেব এটা কী করে সম্ভব? এই অধম তাকে বলল, জি, আপনাকে এই সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন এবং তন্মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলারও হক রয়েছে। সে বলল, আমি নিজে পরিশ্রম করেছি এবং ঘাম ঝরিয়েছি; এখন আমার সম্পদে অন্যরা কিভাবে হকদার হয়ে গেল? আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি ঘাম ঝরিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু এর অর্থ হলো, আপনি কিছু ব্যবহার করেছেন, যার বদৌলতে আপনি এই সম্পদ লাভ করতে পেরেছেন। সে বলল, হ্যাঁ, আমি আমার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছি। আমি বললাম, এবার বলুন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জ্ঞান না দিতেন, তাহলে কি আপনি এই সম্পদ অর্জন করতে পারতেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এর ব্যাখ্যা হলো, যিনি জ্ঞান দিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সম্পদও তিনিই দিয়েছেন। পরিশেষে তিনি বললেন, এখন আমার একথা বুঝে এসেছে যে, দাতা আল্লাহ্ তা'আলা-ই।

ধনী কাকে বলে?

উর্দূতে তো ধনী তাকেই বলে, যিনি প্রচুর সম্পদশালী। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী বলা হয় তাকে, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার বণ্টনে সন্তুষ্ট। অর্থাৎ– তিনি এরূপ বলেন, আমাকে আমার মালিক যা কিছু দিয়েছেন আমি তাতে সন্তুষ্ট। অঢেল সম্পদের অধিকারী লোককে দেখে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অঢেল দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাকে আরও দান করুন আর তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তাতে বরকত দান করুন।

শিক্ষণীয় উপদেশমালা

যেহেতু পূর্বেকার যুগে পিতামাতাও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন, তাই তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ-নিজ সন্তানদের অনেক উপদেশ দিতেন। তাই তো হযরত লুকমান (আ.)ও নিজ ছেলেকে মহা মূল্যবান কতগুলো উপদেশ দান করেন। তিনি আফ্রিকার বাসিন্দা ছিলেন। কালো বর্ণের ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল নূরে নূরান্বিত। আফ্রিকার দেশসমূহে দুজন এমন মহান ব্যক্তি গত হয়েছেন, যাঁরা আকাশের নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল জীবন যাপন করেছেন। একজন হযরত লুকমান (আ.), দ্বিতীয়জন হযরত বেলাল হাবশি (রাযি.)। এজন্য আফ্রিকাবাসী এই দুই মহান ব্যক্তির আলোচনা খুব বেশি-বেশি করে থাকে। একজনকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত প্রজ্ঞা দ্বারা ধন্য করেছেন। আরেকজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক-মহব্বত দ্বারা ধন্য করেছেন।

হযরত লুকমান (আ.) নিজের ছেলেকে উপদেশ করতে গিয়ে বলেন–

১. বৎস! দুনিয়ার জন্য তুমি ততটুকু পরিশ্রম করো, যতটুকু তুমি দুনিয়াতে অবস্থান করবে। দুনিয়ায় তো মানুষ পঞ্চাশ, একশো, একশো পঞ্চাশ বছর থাকে। পক্ষান্তরে পরকালে থাকে মিলিয়ন-বিলিয়ন বছর, বরঞ্চ অনুমানও করা সম্ভব নয়।

২. বৎস! তুমি আল্লাহ তা'আলার ততটুকু ইবাদাত করো, যতটুকু তুমি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। এখন আপনারা নিজেরা-ই আন্দাজ করুন, আমরা আল্লাহর প্রতি কতটুকু মুখাপেক্ষী। একশোতে একশো মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক মুআমালায় আমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমাদের উচিৎ, অত্যন্ত মজবুতির সাথে ইবাদাত করা।

৩. বৎস! গুনাহ করার ক্ষেত্রে ততটুকু দুঃসাহস করবে, যতটুকু তুমি শাস্তি বহন করার সামর্থ্য রাখ। আমরা কী শাস্তি বহন করতে পারি? আমরা একেবারেই শাস্তি বহন করতে পারি না। আমরা তো রোদের উত্তাপ সহ্য করতে পারি না; জাহান্নামের উত্তাপ কিভাবে সহ্য করব। আমাদের যদি একজন লোকের সামনেও ভর্ৎসনা করা হয়, তাহলে, তৎক্ষণাৎ অবস্থা পাল্টে যায়। কিন্তু কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সমস্ত মানুষের সামনে তিরস্কার করবেন। কখনও জ্বলন্ত আগুনের কাছে হাত নিলে অনুধাবন হয়ে যাবে, জাহান্নামের আগুনে গেলে কী অবস্থা দাঁড়াবে।

৪. বৎস! জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করো, যতক্ষণ না তা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা পাবে।

৫. বৎস! যদি তোমাকে গুনাহ্ করতেই হয়, তাহলে এমন স্থান অনুসন্ধান করবে, যেখানে প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা দেখতে পান না।

ভাগ্যে লেখা রিযিক নিশ্চিত লাভ হয়

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁর সকল বান্দাকে রিযিক প্রদান করেন। মুসলমানকেও প্রদান করেন, কাফেরকেও প্রদান করেন। ভালো নেককার ব্যক্তিকেও দেন, বদকার পাপাচারকেও দেন। এটি একটি সুদৃঢ় বিষয় যে,

اَلنَّصِيْبُ يَصِيْبُ

'ভাগ্যে যা আছে, তা পৌঁছবেই।'

স্মরণ রাখবেন, মানুষের ভাগ্যে লেখা রিযিক, চাই তা পাহাড়ের চূড়ায় থাক অথবা সমুদ্রের অতল গহ্বরে থাক তার কাছে পৌঁছবেই। মৃত্যু আসা যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি মৃত্যুর পূর্বে নিজের ভাগ্যে লেখা রিযিক ভোগ করাও সুনিশ্চিত বিষয়। যেমন– মৃত্যু আসার বিকল্প নেই, তেমনি ভাগ্যে লেখা রিযিকও পাওয়ার বিকল্প নেই। হাদীছ শরীফে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তির রিযিক পাহাড়ের কিনারায়ও থাকে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পানির সর্বশেষ ফোঁটাটুকু পান না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মৃত্যু আসবে না।

কুকুর তার রিযিক পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছল?

একবার আমি লাহোর থেকে খানেওয়াল যাচ্ছিলাম। লাহোর থেকে আমরা সকাল বেলা যাত্রা শুরু করলাম। গরমকালে সকাল বেলা তন্দ্রা বেশি আসে। আমি গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দিলাম, সেখানে আমাকে একটা মিটিং-এ উপস্থিত হতে হবে। তাই গাড়ি একটু দ্রুত চালাবেন, সাথে-সাথে সতর্কতাও অবলম্বন করবেন। তিনি বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না। এই দুর্বল বান্দা পেছনের সিটে বসে মিটিংসংক্রান্ত একটি বই পড়তে লাগল। ড্রাইভার গাড়ি খুব দ্রুত চালাতে লাগল। কেননা, রাস্তাও ফাঁকা ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার শান দেখুন, ড্রাইভার এক জায়গায় হঠাৎ শক্তভাবে ব্রেক চাপল। ব্রেক চাপার সময় একটা আওয়াজ ভেসে এল। আমি বুঝে গেলাম, গাড়ি কোনো কিছুতে লেগেছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! কী হয়েছে? তিনি বললেন, অকস্মাৎ একটি কুকুর সামনে এসে পড়েছিল।

আমি সেটিকে বাঁচাতে শক্তভাবে ব্রেক চাপলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে সেটি নিচে এসে গেছে। আমি পেছন ঘুরে তাকালাম। কিন্তু কুকুরটা দৃষ্টিতে পড়ল না। তাই আমি ভাবলাম, সম্ভবত নিচে পড়ে গেছে।

তারপর গাড়ি সামনে চলতে থাকল। আমার খেয়াল হলো, হয়তোবা ড্রাইভারের তন্দ্রা আসছে। তাই এই অধম তাকে বলল, রাস্তায় চায়ের কোনো রেস্টুরেন্ট চোখে পড়লে গাড়ি থামাবেন। আমি আপনাকে এক কাপ 'ড্রাইভার চা' পান করাব। যেন বাকি সফর ভালোভাবে হয়। আনুমানিক পঁচিশ কিলোমিটার সামনে যাওয়ার পর তিনি গাড়ি থামালেন। গাড়ি থামার পর আমার অন্তরে উদয় হলো, কুকুরটা কোথায় লেগেছিল একটু দেখে নেই। এ উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে অবতরণ করলাম এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, কুকুরটা গাড়ির বোঁটের ওপর দিব্যি আরামে বসা। আমি যখন সেটিকে দেখছিলাম, তখন সেটিও এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করতে থাকে। প্রথম তো জড়সড় হয়ে বসে ছিল। তারপর নিচে নেমে এল। কাছেই রেস্টুরেন্টের লোকজন হাড়গোড় জমা করে রেখেছিল। কুকুরটা সেখানে গিয়ে হাড় চিবানো শুরু করে দিল। তখন আমার এই কথাটি বুঝে এল যে, আল্লাহ তা'আলা এর রিযিক এখানে রেখেছিলেন। অপরদিকে পঁচিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করা এর জন্য অনেক কঠিন ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঘটনা এই ঘটেছিল যে, যখন ড্রাইভার ব্রেক চাপল আর কুকুরটা লাফ দিল, তখন সেটি বোঁটের ওপর উঠে বসে গেল। ইতিমধ্যে গাড়ি চলতে শুরু করে দিল। ফলে সেটি সেখানেই বসে থাকল এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তার সফর সমাপ্ত করে দিলেন।

যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন

একবার আমরা একটি বড় গাড়িতে উঠে চিঁউট রোড দিয়ে জংগ অভিমুখে আসছিলাম। দিনের বেলা ছিল। রাস্তাও ভালো ছিল। এজন্য ড্রাইভারও গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে চালাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলার শান, আমরা এক জায়গায় পৌঁছে দেখি, একেবারে কাছেই দুটা কুকুর পরস্পরে ঝগড়া করছে। ড্রাইভার ব্রেক তো চাপল এবং একদিক দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কুকুরদুটা লম্ফঝম্প করে এদিকেই চলে এল। যখন কুকুরদুটাও এদিকে এল, তখন আমাদের গাড়িটি কুকুরগুলোর ওপর দিয়ে এমনভাবে গেল, যেমনভাবে স্পিডব্যাকারের ওপরদিয়ে যায়। যখন

কুকুরগুলোর ওপর দিয়ে গাড়িটি গেল, তখন আমি মনে করলাম এগুলো মরে গেছে। কেননা, গাড়িটি অনেক বড় ছিল এবং ভেতরে চার-পাঁচজন লোকও ছিল। এছাড়া আমার আসবাবপত্রও মাশাআল্লাহ অনেক এবং গাড়ির নিজস্ব ওজন তো আছেই। আমি ড্রাইভারকে বললাম, মনে হচ্ছে, আপনি ড্রাইভিং সিটে বসার দু'আ পড়েননি। যদি ড্রাইভিং সিটে বসার সময় দু'আ পড়ে নেওয়া হয়, তাহলে এরূপ অঘটন ঘটে না। তিনি বললেন, হযরত! আমি তো খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। বাস্তবিকই তিনি অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং ব্রেকও ধরেছিলেন। এ অবস্থায় আমি যখন পেছন ফিরে তাকালাম, তখন একটা কুকুর দ্রুতবেগে ছুটে যেতে দেখলাম। সেটা গাড়ির নিচ থেকে বের হয়ে দৌড়াচ্ছে। যখন একটা বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, তখন আমাদের সকলের আফসোস কিছুটা হ্রাস পেলো যে, যাক একটা তো বেঁচে গেল।

তারপর ড্রাইভার আবার গাড়ি দ্রুতবেগে চালালেন। চলতে-চলতে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে এক স্থানে লোকজন গাড়ির পেছনের দিকে ইশারা করতে লাগল। ড্রাইভারও বুঝে গেলেন। তিনি লোকদের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? এবারও লোকজন গাড়ির পেছনের দিকে ইশারা করতে থাকে। আমি তাকে বললাম, গাড়ি থামিয়ে দেখুন, ঘটনাটা কী? তিনি গাড়ি থামিয়ে দেখলেন। কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। আমি তাকে বললাম, গাড়ি পেছন দিকে নিয়ে দেখুন। যখন তিনি গাড়ি পেছন দিকে নিতে শুরু করলেন, তখন ব্রেকারের ওপর থেকে ঠাস করে কী যেন নিচে পড়ল। আমি বললাম, মনে হচ্ছে, আবার কোনো কুকুর নিচে এসে গেছে। গাড়ি যখন পেছনে নেওয়া হলো, তখন আমরা দেখলাম, দ্বিতীয় কুকুরটাও উঠে পালিয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমার বুঝে এল না, প্রথম কুকুরটাও আহত হলো না, দ্বিতীয়টাও না। অথচ প্রথম কুকুরটার ওপর দিয়েও গাড়ি গেছে, দ্বিতীয়টির ওপর দিয়েও গাড়ি গেছে। এটাও বুঝে এল না যে, দ্বিতীয় কুকুরটা কয়েক মাইল পর্যন্ত গাড়ির মধ্যে কোথায় আটকে ছিল এবং আল্লাহ তাকে কীভাবে বাঁচালেন? আমি মনে-মনে বললাম, মাওলা! বাস্তবে আপনি যাকে রক্ষা করতে চান, তাকে আপনি রক্ষা করেই ছাড়েন।

মোরগের রিযিক

একব্যক্তি গোজরানওয়ালার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ব্যবসার সূত্রে কোয়েটায় থাকতেন। একদা তার ছোট ছেলে ছোলাবুট খাচ্ছিল। বাচ্চারা

অনেক দুষ্টু হয়ে থাকে। চাই মানুষের বাচ্চা হোক বা ছাগলের বাচ্চা কিংবা বানরের বাচ্চা। সে কিছু না কিছু করতে-ই থাকে। ছেলেটি ছোলা আরামে খাওয়ার পরিবর্তে একটি ছোলা নিয়ে মুখের দিকে নিক্ষেপ করে আর মুখ দিয়ে সেটা ধরে। এভাবে খেলে-খেলে সে খাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন, একটি ছোলা তার নাকে চলে গেল। নিজেই ছোলাটি বের করার জন্য নাকে আঙুল দিলে সেটি আরও ভেতরে চলে গেল। এ অবস্থায় তার মায়ের কাছে এল। এবার মা চেষ্টা করল ছোলা বের করতে। কিন্তু সেটি আরও ভেতরে চলে গেল। যখন ছোলাটি অনেক ভেতরে চলে গেল, তখন সে কাঁদতে শুরু করল।

তাঁরা এদিনই দেড় ঘন্টা পর এক বিয়েতে অংশগ্রহণের জন্য গোজরানয়ালার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কোয়েটা থেকে লাহোরের ফ্লাইটে আসার কথা। স্বামী বাসায় এলে স্ত্রী বলল, ছেলের নাকের ভেতরে একটা ছোলা আটকে গেছে। সে কান্নাকাটি করছে। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। তিনি বললেন, সে দুষ্টুমি করেছে; তাই এখন মজা বুঝুক। আমি যদি তাকে এখানকার কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, তাহলে ফ্লাইট বিলম্ব হয়ে যাবে। ওকে তুমি বলো, এত সময় যখন থাকতে পেরেছ; আর দুই ঘন্টা ধৈর্য ধারণ করো। আমি গোজরানয়ালা পৌঁছে তাকে অমুক চাচার কাছে নিয়ে যাব এবং সেখানে ছোলা বের করাব। তারা সবাই বিমানবন্দর পৌঁছল। তারপর কোয়েটা থেকে লাহোর গেল এবং লাহোর থেকে এক ঘন্টা পর গোজরানয়ালা পৌঁছে গেল।

এবার তিনি ছেলেকে নিয়ে তাঁর চাচার কাছে গেলেন। তাঁর স্ত্রী টয়লেটের দরজা খুলে ছেলেকে টয়লেটে বসিয়ে স্বামীকে বললেন, ছেলে টয়লেটে গেছে, আপনি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন, এখনই এসে যাচ্ছে। তারা এখনও সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। ইতোমধ্যে ছেলের এত তীব্র হাঁচি এল যে, সেই ছোলা বের হয়ে এল। ডাক্তার সাহেবের ঘরে একটি মোরগ ঘুরছিল। মোরগটা ছোঁ মেরে সেই ছোলা নিয়ে খেয়ে ফেলল। ছোলাটা মূলত এই মোরগের রিযিক ছিল এবং কোয়েটাতে পড়ে ছিল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এই ছোলা সেখানে পৌঁছাবেন, এজন্য তিনি তাকে এই ছেলের নাকে প্রবেশ করিয়ে কার্গোর মতো ব্যবহার করলেন।

খাজা বায়েজিদ বুস্তামি (রহ.)-এর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা

তো শতভাগ সুনিশ্চিত কথা, যে রিযিক বান্দার প্রাপ্য, তা সে পাবেই। সেই রিযিক যদি পাহাড়ের তলদেশেও থাকে, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত তার

মৃত্যু হবে না, যতক্ষণ-না সে এই রিযিক ভোগ করবে। রিযিকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ওপর পরিপূর্ণ ভরসা থাকা চাই। আমাদের মহান নকশবন্দিয়া সিলসিলার এক মহান ব্যক্তি ছিলেন বায়েজিদ বুস্তামি (রহ.)। তিনি বলতেন, রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওপর আমার এত নির্ভরতা আছে যে, যদি সমস্ত ভূপৃষ্ঠ তামায় পরিণত করে দেওয়া হয় এবং সমস্ত সৃষ্টজীবকে আমার পরিবার বানিয়ে দেওয়া হয় এবং আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও না পড়ে, তবুও আমার কোনো চিন্তা নেই যে, তাদের খাবারের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে? কেননা, যে প্রতিপালক রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনি কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে অবশ্যই তাদের রিযিক পৌঁছাবেন। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের যিম্মাদারি আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন।'[৫৪]

অদৃশ্য জগৎ থেকে খানার ব্যবস্থা

ইমাম কুরতুবি (রহ.) লিখেছেন, যখন আশ'আরিয়্যীন গোত্রের লোকজন হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন, তখন তাদের পথখর্চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁদের খাবার-দাবারের কিছু ব্যবস্থা করে দেন। সেই ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মুবারকের কাছে পৌঁছলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায়। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করছিলেন।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের যিম্মাদারি আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন।'[৫৫]

আয়াতটি শ্রবণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অন্তরে উদয় হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের যিম্মাদারি নিজে নিয়েছেন, তাহলে

---

৫৪. সূরা হূদ : আয়াত ৬

৫৫. সূরা হূদ : আয়াত ৬

আমরাও তো আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্যান্য প্রাণীর ব্যতিক্রম নই। অবশ্যই তিনি আমাদের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন। এই চিন্তা করে তিনি এখান থেকেই প্রস্থান করলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছুই বললেন না। কিন্তু তিনি ফিরে এসে নিজ সাথিদের বললেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসছে। তাঁর সাথিগণ একথার মর্ম এই বুঝল যে, তিনি আমাদের প্রয়োজনের কথা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থাপন করেছেন এবং আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা এমনটি বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

তারা তখনও বসা-ই ছিলেন। ইতিমধ্যে দুই ব্যক্তি বড় একটা ভান্ড নিয়ে এলেন, যা গোশ্ত ও রুটি দ্বারা ভরপুর ছিল। তারা খাবার দিয়ে চলে গেলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন। কিন্তু তারপরও অনেক খাবার উদ্বৃত্ত রইল। তাঁরা চিন্তা করলেন, এই অতিরিক্ত খাবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। সুতরাং দুই ব্যক্তি খাবার নিয়ে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছে গেলেন। পেছনে-পেছনে তাঁরা সমস্ত লোক হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রেরিত খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো কোনো খাবার পাঠাইনি। এ-সময় তাঁরা বিস্তারিত বিবরণ দিলেন যে, আমরা আমাদের অমুক সাথিকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছিলাম। আর তিনি প্রত্যাবর্তন করে এই বলেছিল। তাই আমরা মনে করেছি, আপনিই খাবার পাঠিয়েছেন। বিবরণ শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– এ খাবার আমি পাঠাইনি। বরং সেই প্রতিপালক পাঠিয়েছেন, যিনি প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিজ যিম্মায় নিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

আমি এক দেশে এক প্রকার ফুল দেখেছি। ফুলের ভেতরে মধুর মতো অনেক মিষ্ট শিরা। সেখানকার লোকজন বলেছে, এটি এভাবেই খোলা থাকে এবং যখন কোনো পোকা অথবা পাখি এর শিরা ভেতর থেকে খেতে শুরু করে, তখন এর পাতাগুলো বন্ধু হয়ে যায়। আর পোকা বা পাখি সেখানেই কাবু হয়ে যায়। পরবর্তী কালে অঙ্কুর বের হয় এবং এই পোকা বা পাখি

থেকে খোরাক নিয়ে কচি গাছ বেঁচে থাকে। আল্লাহু আকবার! তো পরম দয়ালু প্রভু যেখান থেকে চান, বান্দাদের রিযিক পৌঁছান। বান্দার কোনো খবরই থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রিযিক পৌঁছে দেন।

গুনাহ সত্ত্বেও চারটি নেয়ামত অব্যাহত থাকে

দেখুন, আমরা যদি কারও জন্য মাসিক ভাতা জারি করি আর সে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করে, তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত এই হবে যে, আমরা তার ভাতা বন্ধ করে দেব। নতুবা আমরা তাকে এরূপ বলব যে, তুমি এমনটি আর করবে না। তারপর যদি সে সেই কাজ আবার করে, আর আমরা তা দেখে ফেলি, তাহলে আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হবে, আজ থেকে তার ভাতা বন্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আচরণ এরূপ নয়। তিনি ধৈর্যশীল ও সহনশীল। তিনি আমাদের অনেক অপরাধ সত্ত্বেও সহযোগিতামূলক আচরণ করেন।

এক বুযুর্গ বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এত সহনশীল যে, মানুষ গুনাহ করে; তথাপি তিনি তাদের চারটি নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না।

১. কবীরা গুনাহ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বান্দার রিযিক বন্ধ করেন না।

২. কবীরা গুনাহ করা সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত বান্দার সুস্থতা তৎক্ষণাৎ কেড়ে নেন না। এও তো হতে পারত যে, এদিকে বান্দা চুরি করতে হাত বাড়াত, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তার হাত অবশ করে দিতেন।

৩. মানুষ কবীরা গুনাহ করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে সঙ্গে-সঙ্গে অপদস্থ করেন না। বরং তার গোপনীয়তা বজায় রাখেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকেও সাথে-সাথে পাকড়াও করেন না। তাকে সুযোগ দেন, হতে পারে আমার বান্দা তাওবা করে নেবে।

তো গুনাহ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য এই চারটি নেয়ামত অব্যাহত রাখেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ নয় তো কী?

আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী কার্যকলাপ

তিনটি কার্যকলাপ এমন, যা আল্লাহ খুব বেশি অসন্তুষ্ট করে।

যথা–

১. আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলিকে তুচ্ছ মনে করে, তিনি তার প্রতি সীমাহীন অসন্তুষ্ট হন। এ-ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম-আহকাম নিশ্চিন্তে লঙ্ঘন করে। তার এতটুকুও অনুভুতি থাকে না যে, আমি কোন স্রষ্টা ও মালিকের হুকুম লঙ্ঘন করছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

'এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, তোমরা এগুলোর কাছেও যাবে না।'[৫৬]

২. আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা।

দ্বিতীয় সেই সব ব্যক্তি, যারা দু'আ তো করে; কিন্তু সাথে-সাথে এরূপ বলা শুরু করে যে, তিনি তো আমাদের কথা শোনেনই না। আমাদের কোনো দু'আ-ই তো কবুল হয় না। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেসব ব্যক্তির প্রতি কঠিন অসন্তুষ্ট হন যে, প্রার্থনাও করছে আমার কাছে, আবার পরক্ষণেই বলছে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। এটা কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বান্দার এ-জাতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অপছন্দ করেন।

৩. আল্লাহ তা'আলার বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট না থাকা।

এরূপ বান্দাদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন, যারা আল্লাহর বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ

'আমি তাদের মাঝে তাদের জীবনোপকরণ নিজে বণ্টন করি।'[৫৭]

আল্লাহ তা'আলা যে বণ্টন করে দেন, তাতে সকলেরই সন্তুষ্ট থাকা জরুরি। যারা আল্লাহ তা'আলার বণ্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হন, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। মানুষ যে হিংসা করে, এটা আল্লাহ তা'আলার বণ্টনের ওপর অসন্তুষ্টির কারণে করে। আল্লাহ তা'আলা কাউকে অধিক জীবন উপকরণ দিয়ে দেন। এতে হিংসুক ভেতরে-ভেতরে দগ্ধ হতে থাকে। ভেতরে ভেতরে আগুনে দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ

---

৫৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৭

৫৭. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩২

তা'আলার বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট না হওয়ার দরুন হয়। আর এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। ঘরে যদি পিতা কেনো সামগ্রী নিয়ে আসেন এবং নিজ পছন্দ অনুযায়ী সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দেন, তাহলে তিনি প্রত্যাশা করেন, সন্তানরা আমার বণ্টনে সন্তুষ্ট হবে। আর কোনো সন্তান এতে আপত্তি তুললে পিতার মন বলে, ভবিষ্যতে তাকে কিছুই দেওয়া যাবে না। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকে না; এজন্য হিংসা করে থাকে। যার ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলার বণ্টনের ওপর সন্তুষ্টি নসিব হয়, সে কারও ওপর হিংসা করে না। কেউ পর্যাপ্ত সম্পদের মালিক হয়, কেউ সম্মান লাভ করে, কেউ সুস্থতা পায়, কেউ উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়। তাদের প্রতি সে হিংসা করে না। বরং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

রিযিকের মধ্যে দুই ধরনের অনুগ্রহ

তাফসীরে মাযহারীতে লিখা হয়েছে, হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, রিযিকের মুআমালায় বান্দাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার দুই ধরনের দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। প্রথম কথা তো হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে তার অবস্থা অনুযায়ী খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করেন। দ্বিতীয় কথা হলো, তিনি কাউকে তার পূর্ণ জীবনের রিযিক একই সময়ে একত্রে দিয়ে দেন না। যদি একই সময়ে একত্রে দিয়ে দিতেন, তাহলে প্রথমত মানুষের জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে যেত এবং দ্বিতীয়ত যতই সংরক্ষণ করত, তারপরও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যেত না।

রিযিক লাভের উপকরণ

যা কিছুর সাথে রিযিকের সংশ্লিষ্টতা আছে, সেগুলো তো আল্লাহ তা'আলা দিয়েই দেন। অবশ্যই বিষয়টি এমন নয় যে, বড়-বড় ব্যবসায়ীদেরই কেবল আল্লাহ তা'আলা রিযিক দেন। রিযিকের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা অশিক্ষিত লোকদেরও পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ দিয়ে দেন। হজের সময় জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে বলল, আমি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি টাকা আলাদা রেখে দিয়েছি। কথাটি শুনে আমি বড় আনন্দিত হলাম যে, তিনি কল্যাণমূলক কাজ করছেন। তারপর তিনি তার ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণও দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের গ্রুপের সমস্ত লোকদের জন্য একটি কাগজ তৈরি করতে হলো। যেহেতু তিনি

আমাদের গ্রুপেই ছিলেন, তাই আমি তাকে বললাম, আপনিই কাজটি করুন। তিনি বললেন, জী, আমার এই আঙ্গুলের মাথায় কালি লাগিয়ে দিন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি দস্তখত করতে পারি না। তারপর এই কোটিপতি ব্যক্তি সেখানে টিপ দিল এবং কাগজটি গ্রহণ করল।

যাকে ইচ্ছে তিনি বাসমতি চাউলের মাধ্যমে রিযিক দান করেন।

যাকে ইচ্ছে তিনি মোরগ-পোলাও দিয়ে রিযিক প্রদান করেন।

যাকে ইচ্ছে তিনি বরফের চাকা দিয়ে রিযিক প্রদান করেন।

আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যাকে আল্লাহ তা'আলা মাঠার মাধ্যমে রিযিক দিয়েছেন। তিনি মাঠার ট্যাংক বানিয়েছেন। মেশিনের সাহায্যে মাঠা তৈরি হচ্ছিল এবং ট্যাংকিতে এসে জমা হচ্ছিল। ঘরে পানির যে পাম্প বসানো হয়, তিনি তা বসিয়েছিলেন এবং এর থেকে একটু দূরে দশ পনেরোটি টেপ লাগানো ছিল। তিনি টেপ খুলতেন আর গ্লাসে মাঠা ভরে দিয়ে দিতেন। সেখানে লাইন লেগে থাকত। আমি সেখানে প্রায় আড়াইশো লোকের লাইন দেখেছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে মাঠার মাধ্যমে রিযিক দিচ্ছেন। এখন যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যবসা করেন, তাহলে তিনি বলেন মাঠার ব্যবসা করি।

এই অধমের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন এক ব্যক্তির চায়ের দোকান আছে। সাধারণভাবে তো মনে হয়, রোজ শ-দু'শ টাকা উপার্জন হয়ে থাকবে। কিন্তু সে একবার তার অবস্থা লিখে জানালে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। সে লিখেছে, চায়ের দোকান থেকে দৈনন্দিন বিক্রি বারো হাজার রুপি হয়। যার দৈনিক বিক্রি বারো হাজার রুপি, তার লাভ কত হবে?

এগুলো সবই রিযিকের উপকরণ, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারও জন্য একটি উপকরণ এবং কারও জন্য অন্য একটি উপকরণ ব্যবস্থা করেছেন। কারও প্রতি আমাদের হিংসা পোষণ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া। আমরা যদি রিযিকের পেরেশানিতে থাকি, তাহলে অন্য লোকজনের প্রতি লক্ষ না করে আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাদের আঁচল বিছিয়ে দেব। যে প্রতিপালক অন্য সব সৃষ্টজীবকে রিযিক দিতে সক্ষম হচ্ছেন, তিনি নিশ্চিতভাবে আমাদেরও দিতে পারেন।

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জীবনের জরুরত

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[৫৮]

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'এবং আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[৫৯]

এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবজাতি সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের ইবাদাত করা। একটা হলো মানষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আরেকটা হলো মানুষের জরুরত। আল্লাহ তা'আলা কত সুন্দরভাবে দায়িত্ব বণ্টন করেছেন! জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করার দায়িত্ব মানুষের যিম্মায় সোপর্দ করে দিয়েছেন। আর মানুষের জরুরত পূর্ণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজ যিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে। অপরদিকে জীবনের জরুরত অনুপাতে মানুষের রিযিক আসে। আল্লাহ তা'আলা যা দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের যিম্মাদারি আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন।'[৬০]

মানুষ যতক্ষণ নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার জরুরতসমূহও পূর্ণ করতে থাকেন। পক্ষান্তরে মানুষ যখন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করা ত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জরুরত পূর্ণ করা ছেড়ে দেন।

---

৫৮. সূরা আল-মুমিনূন : আয়াত ১১৫

৫৯. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬

৬০. সূরা হূদ : আয়াত ৬

রিযিক পাওয়ার পথ দুটি

রিযিক পাওয়ার দুটি পথ রয়েছে। বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। মুরগির মালিক কখনও কোনো পাত্রে দানা দিয়ে মুরগির সামনে রেখে দেয়। মুরগি যখন ইচ্ছে পাত্র থেকে খেয়ে নেয়। আবার কখনও মালিক হাতে গম নিয়ে ছুড়ে মারে। এতে গম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় আর মুরগি দিনভর সেই গম বেছে-বেছে খেতে থাকে। এভাবে মুরগি তো রিযিক সেই পরিমাণই পায়, যে-পরিমাণ পাত্রে পেত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে তাকে দিনভর একটা-একটা করে গম বেছে খেতে হয় এবং এজন্য মাথা নত করতে হয়। এটাই পার্থক্য। যেসব লোক নেক কাজ করে, আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাত্রে ঢেলে রিযিক প্রদান করেন আর তারা অতি সহজে এই রিযিক থেকে উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে যারা অবাধ্যতা করে এবং অলসতার শিকার হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেন এবং বলেন, দিনভর পরিশ্রম করে খেতে থাকো! সেই বেচারা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত বাজারে খাটুনি খাটে, অফিসে খাটুনি খাটে, সাইকেল চালায়, হোন্ডা চালায়, গাড়ি চালায় এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বলে থাকে, কী করব? পরিবারের সকল সদস্য শ্রমজীবী। তথাপি ব্যয় নির্বাহ হয় না। স্মরণ রাখবেন, প্রতিপালক যে রিযিক দেবেন, তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। মানুষ যদি এই রিযিক বৈধ পন্থায় উপার্জন করে, তাহলে তা-ই অর্জন করবে। আর যদি তাড়াহুড়া করে অবৈধ উপায়ে উপার্জন করে, তাহলেও সেই পরিমাণই অর্জন করবে, যা ইতোপূর্বে তাকদিরে লেখা হয়েছে। কিন্তু সিলমোহর লেগে যায় যে, অমুক অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে।

চলমান যুগে রিযিক অর্জনে সহজতা

রিযিক অর্জনের ক্ষেত্রে যতটুকু সহজতা বর্তমানে রয়েছে, তা ইতোপূর্বে কখনও ছিল না। আপনি সমগ্র এলাকায় এমন কোনো পরিবার দেখাতে পারবেন না, যাদের ঘরে পূর্ণ একদিন চুলায় আগুন জ্বলে না। হতে পারে, তিনবারের জায়গায় দুবার রান্না হচ্ছে অথবা দুবারের পরিবর্তে একবার রান্না হচ্ছে। এরূপ পরিবার সম্ভবত দু-একটা থেকে থাকবে, যাদের ঘরে পূর্ণ দিন চুলায় আগুন জ্বালানোর সুযোগ হয় না। বরং আমরা যারা আছি, তুলনামূলক বেশিই ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত আছি। বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারে প্রিয় খাবারগুলো রান্না হয়। মহিলারা পুরুষদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আজ কী

রান্না করব? এই যে জিজ্ঞাসা, আজ কী রান্না করব? এর মর্ম হলো তারা প্রিয় খাবার রান্না করে। তাদের সামনে চয়েজ তথা পছন্দ-অপছন্দ থাকে। ইচ্ছে হলো তো এটা রান্না করবে। আবার ইচ্ছে হলো তো, ওটা রান্না করবে। এটাকেই তো পছন্দের এবং প্রিয় খাবার বলা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কী অবস্থা ছিল? সাইয়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, আমাদের ঘরে দু-দু মাস চুলায় আগুন জ্বলত না। এমনকি চুলার ভেতরে ঘাস গজিয়ে যেত। এবার বলুন, চুলার ভেতরে ঘাস কখন গজায়? যখন লাগাতার কয়েক মাস আগুন না জ্বলে, তখনই তাতে ঘাস গজায়। তিনি বলেন, দুটি কালো বস্তুর ওপর আমাদের জীবন চলত। একটি খেজুর, অপরটি পানি। বর্তমান যুগে তো আমরা কল্পনা-ই করতে পারি না। তারপরও বর্তমানে রিযিকের ব্যাপারে প্রতিপালকের প্রতি যত অভিযোগ, এত অভিযোগ আগে কখনও ছিল না। অথচ মাঝখানে তিনবার চা পানকারীদের জবানেও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তারা তিনবার আহার করে এবং তিনবার চা-বিস্কিট খায়। তারপরও রিযিকে বড় সংক্ষীর্ণতার অভিযোগ করে।

আমাদের দায়িত্ব ছিল বন্দেগির হক আদায় করা। আমরা তা আদায় করি না। উল্টো যা আল্লাহ নিজ দায়িত্বে নিয়েছেন, তার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরছি। আমাদের নির্বোধ বলা হবে না তো কী বলা হবে? যদি মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে, তাহলে তিনি রিযিকের মধ্যে বরকত দান করেন। বিপরীতে কেউ যদি শরীয়তপরিপন্থী কাজ করে, তাহলে রিযিকের বরকত উঠিয়ে নেন। যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রেখে চলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাপদ রিযিক দান করবেন। আর যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করবে, তিনি তাকে ফাঁসিয়ে দেবেন। তারপর সে রিযিকের পেছনে জুতা ক্ষয় করে বেড়াবে।

রিযিকের ব্যাপারে মানুষের পেরেশানি

যেহেতু সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক সকল সৃষ্টজীবের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই তিনি রিযিক পৌঁছাচ্ছেন। তারপরও মানুষ এর জন্য পেরেশান হয়। অথচ অন্য কোনো প্রাণী এজন্য পেরেশান হয় না। কোনো পাখি নিজের রিযিক স্টক করে রাখে না।

আল্লাহর ওপর যাদের তাওয়াক্কুল থাকে, তারা সব সময় রিযিক পায়। এটা কত বিস্ময়কর বিষয় যে, ইঁদুর-বিড়াল খাবার পায় আর যারা আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রতিনিধি ও খলীফা তারা ক্ষুধার্ত থাকে! এই দুরবস্থা ও

পেরেশানি অধিকাংশই আমাদের গুনাহের ফল। নতুবা বিশ্বজাহানের যে প্রতিপালক, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়কে মান্না-সালওয়া খাওয়াতে পারেন, তিনি কি উম্মতে মুহাম্মাদীকে মান্না-সালওয়া খাওয়াতে পারেন না? রিযিকের ব্যাপারে সর্বদা এই বিশ্বাস রাখবেন যে, আমার রিযিক কোনো মানুষের যিম্মায় নয়; বরং মহান প্রতিপালকের যিম্মায়। মানুষ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ভোলেন না। আপনারা একটা অজগর সাপের কথা শুনে থাকবেন। সে চোখে দেখত না। একজন মানুষ তার মুখে পানি ঢেলে দিত। আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে রিযিক পৌঁছান।

কাকের বাচ্চার লালনপালন

তাফসীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত আছে, কাকের বাচ্চা যখন ডিম থেকে বের হয়, তখন সেগুলোর পালক ও শরীরের পশম সাদা থাকে। তা দেখে কাক বাচ্চাগুলোর প্রতি ঘৃণা করে পালিয়ে যায়। কিছু দিন পর সেগুলোর পালক ও পশমের রং কালো হয়ে গেলে পিতামাতা আসে এবং তাদের খাবার দেয়। প্রাথমিক দিনগুলোতে যখন পিতামাতা এই ছোট বাচ্চাদের ঘৃণা করে পালিয়ে যায় এবং তাদের কাছেও আসে না, এ-সময় আল্লাহ তা'আলা এগুলোর কাছে ছোট-ছোট মশা পাঠিয়ে দেন। এই মশা এদের খাদ্য হয়ে যায়।

মৌলভী হয়ে খাবে কোথা থেকে?

আপনাদের মধ্যে কেউ কি এমন কোনো লোক দেখেছে, যিনি বলেন, আমি বড় মসজিদ এবং বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি আর এখন আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এমন ব্যক্তি একজনও পাওয়া যাবে না। অপরদিকে আমি আপনাদের এরূপ হাজারো লোকের সন্ধান দিতে পারি, যারা বড়-বড় ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং ব্যবসা করতে-করতে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে-করতে দিউলিয়া হয়েছেন এমন লোকের দৃষ্টান্ত হাজার-হাজার। পক্ষান্তরে মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে দেউলিয়া হয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। সুতরাং এবার বলুন, অধিক রিযিক কোন পথে পাওয়া যায়? নিঃসন্দেহে নেকির পথে আল্লাহ তা'আলা রিযিক বেশি প্রদান করেন। অথচ লোকজন বলে, ইল্‌ম শিক্ষা করে মৌলভী হবে; পরে খাবে কোথা থেকে? এটা বর্তমানে ব্যাপক একটি উক্তি। আপনারা চিন্তা করুন, রিযিক যদি ব্যবসায়ীদের ঘরেই বেশি থাকত, তাহলে

তো হালুয়া তাদের নামের সাথে যুক্ত হতো। অথচ হালুয়া মৌলভীদের নামের সাথে যুক্ত। আল্লাহর শোকর, দীনের কাজ যারা করেন, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধু শুকনা রুটি খাওয়ান না। বরং মাখন দ্বারা তৈরি হালুয়াসহ রুটি খাওয়ান। পার্থক্য হলো, যারা সারাদিন রিযিকের পেছনে ছুটে বেড়ায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের প্রতিদান তাদের দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। আর যারা দীনের কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের পরকালে সুখের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য আংশিক দুনিয়াতেও দেন। এজন্য আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে মহব্বত করেন, তাকে তিনি দুনিয়া থেকে এমনভাবে রক্ষা করেন, যেমনভাবে মানুষ সর্দি-কাশির রোগীকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান করেন। তথাপি এ পরিমাণ রিযিক তারা অবশ্যই পেয়ে থাকেন, যেন অন্যের কাছে তাদের হাত পাততে না হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আনন্দে ভরপুর জীবন দান করেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, একটি ছেলে খুবই মেধাবী ছিল। সে তখনও অনেক ছোট ছিল। একবার আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে আরবি ভাষা প্রিয়, নাকি ইংরেজি ভাষা। সে জবাব দিল, আরবি ভাষা। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার কাছে আরবি ভাষা প্রিয় কেন? সে উত্তর দিল, এ কারণে যে, কুরআন মাজীদ আরবি ভাষায়। হযরত বলেন, আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আরবি পড়ে তুমি খাবে কোথা থেকে? সে এই প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত আস্থার সাথে উত্তর দিল, যখন কোনো ব্যক্তি আরবি পড়ে, তখন সে আল্লাহর হয়ে যায়। আর যখন সে আল্লাহর হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে ঢেলে দেয় যে, অমুককে দাও। তাই তারা দেয় এবং সে খায়। আমি বললাম, তা ঠিক; কিন্তু মানুষ এরূপ ব্যক্তিকে হীন মনে করে। সে বলল, হীন তো তখন হয়, যখন কারও কাছে আবেদন করে। সে আবেদনই করে কখন, লোকজন তো হাতজোড় করে দিয়ে যায়। হযরত বলেন, আমি তার মেধা দেখে বিস্মিত হয়ে তার চেহারার দিকে চেয়ে থাকি যে, এত ছোট বয়সে এ পর্যায়ের জ্ঞান রাখে। আল্লাহু আকবার।

মানুষ আল্লাহ তা'আলার শানে যেমন ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে তেমনই আচরণ করেন। কাজেই দীনের কাজ যারা করেন, তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই যে, আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সে-পথেই খাওয়াবেন, যে-পথে তিনি তাঁর নবীদের খাইয়েছেন। আপনারা

বলুন, নবী-রাসূলগণ কি পৃথিবীতে এসে দোকানপাট চালিয়েছিলেন, নাকি অফিস আদালতে কাজ করেছিলেন? তাঁরা নিজেদের সারাদিন আল্লাহর দীনের কাজে নিমগ্ন রাখতেন। আর এই দীনের কাজের বদৌলতে আল্লাহ তাদের রিযিক দান করতেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা

ইমাম রাযি (রহ.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল। এ-সময় তাঁর মধ্যে নিজের পরিবারের লোকদের জীবিকার ধ্যান চলে এল। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর এই ব্যাপারটা ভালো লাগল না। তাই তিনি বললেন–

'হে মূসা! সামনের এই পাথরটিতে আপনার লাঠি দ্বারা আঘাত করুন!'

হযরত মূসা (আ.) লাঠি দ্বারা পাথরটিতে আঘাত করলে পাথরটি ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেল। তিনি ঘটনা দেখে হতভম্ব হলেন যে, এই পাথরের ভেতরে থেকে আরও একটি পাথর বের হলো। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এই পাথরেও লাঠি দ্বারা আঘাত করুন। হযরত মূসা (আ.) এই পাথরেও লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তা থেকেও আরও একটি পাথর বেরিয়ে এল। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, এখন এই তৃতীয় পাথরটিও দুই টুকরা করুন। তিনি তা-ই করলেন। যখন তিনি তৃতীয় পাথরটি দুই টুকরা করলেন, তখন এর ভেতরে থেকে পিঁপড়ার মতো ছোট একটা পোকা বের হলো। পোকাটার মুখে তার খাদ্য– অর্থাৎ সবুজ পাতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) থেকে পর্দা সরিয়ে দিলে তিনি দেখলেন, এই ছোট পোকাটা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে–

سُبْحَانَ مَنْ يَّرَانِيْ وَيَسْمَعُ كَلَامِيْ وَيَعْلَمُ مَكَانِيْ وَيَذْكُرُنِيْ وَلَا يَنْسَانِيْ.

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আমাকে দেখছেন, আমার কথা শুনছেন, আমার অবস্থানস্থল জানেন, আমাকে স্মরণ রাখেন, আমাকে ভুলে যান না।'

এর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)কে এই নিশ্চয়তা ও সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্যে ছিল যে, যে আল্লাহ পাথরের ভেতরকার পাথরে অবস্থানকারী পোকাকে জীবিকা পৌঁছাচ্ছেন, সেই আল্লাহ তাঁর পরিবার সম্পর্কে উদাসীন কিভাবে হতে পারেন?

উপকরণ ছাড়া রিযিক এবং উপকরণের মাধ্যমে রিযিক

মানুষ দুভাবে রিযিক লাভ করে। একটা হলো উপকরণের মাধ্যমে, আরেকটা হলো উপকরণ ছাড়া। যে রিযিক উপকরণের মাধ্যমে লাভ হয়, তার মধ্যে কখনও দোকান উপকরণ হয়ে যায়, কখনও ব্যবসা উপকরণ হয়ে যায়, কখনও খেত উপকরণ হয়ে যায়, আবার কখনও কোনো জানোয়ার উপকরণ হয়ে যায়। উপকরণ ছাড়া রিযিক পাওয়ার ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো মাধ্যম ছাড়াই রিযিক পৌঁছিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ, ফসলের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন, ব্যবসায় বরকত দিয়ে দেন। যে-পরিমাণ উপার্জন করার আশা ছিল, তারচেয়ে বেশি উপার্জন হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে সরাসরি রিযিক দান করেন। যখন মানুষের অবস্থা হলো, যেসব উপকরণ থেকে সে কোনো মাধ্যমে রিযিক লাভ করে, সেসব উপকরণে সে আট ঘন্টা ডিউটি পালন করে। পক্ষান্তরে যেখান থেকে কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রিযিক লাভ হয়, সেই নামাযের স্থানে আট মিনিট সময় দেওয়ারও তার সুযোগ হয় না।

জনৈক ব্যক্তি জুমার দিন তার খেতে পানি দিচ্ছিল। ইতোমধ্যে জুমার আযান হয়ে গেল। লোকটি চিন্তা করতে লাগল, যদি পানি দেওয়ার কাজে লেগে থাকি, তাহলে জুমা ছুটে যাবে। অপরদিকে যদি জুমা পড়তে যাই, তাহলে পানি দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এখন কী করা যায়? অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল, জুমা পড়তে যাবে। সিদ্ধান্তমতো খেতের কাজ বন্ধ করে জুমা পড়তে চলে গেল। জুমার নামায পড়ে খেতে এসে দেখে, খেত পানিতে ভরে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। প্রতিবেশী লোকজন তার কাছে এসে বলতে লাগল, আশ্চর্য বিষয়, আমরা আমাদের খেতে পানি দিচ্ছিলাম আর বালতি ছিদ্র হয়ে আপনার খেতে পৌঁছে যাচ্ছিল, যার ফলে আপনার খেত পানিতে ভরা।

স্মরণ রাখবেন, যখন ঘরে আটা না থাকে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কেঁদে-কেঁদে দু'আ করে। স্বাদ তো তখন অনুভব হয়, যখন থলে আটায় পরিপূর্ণ ভরা থাকে। কিন্তু তারপরও কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করা হয়, হে আল্লাহ! দেওয়ার মালিক তো একমাত্র আপনি-ই। আমি তো আপনারই কাছে প্রার্থনা করছি। একবার ইবনে আতা সেকান্দার (রহ.)কে আল্লাহ্ তা'আলা ইলহাম করলেন, আমি এমন রিযিকদাতা, তুমি যদি রিযিক না পাওয়ার জন্য দু'আ কর, তবুও আমি দেব। সুতরাং যদি কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা কর, তাহলে আমি

কেন দেব না? সত্য কথা হলো, আমাদের দৃষ্টি থাকে নিজেদের প্রিয় বস্তুর প্রতি। আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত ভান্ডারের প্রতি থাকে না। অথচ মুমিন ব্যক্তির দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত ভান্ডারের প্রতি থাকা চাই, নিজের প্রিয় বস্তুর প্রতি নয়। তাই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

أَنْفِقْ بِلَالًا وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.

'হে বেলাল! খরচ করো, আরশওয়ালার পক্ষ থেকে হ্রাস পাওয়ার ভয় করো না।'

অতএব, রিযিকের ব্যাপারে মুমিনকে কোনো অবস্থাতেই বিচলিত না হওয়া চাই। একটা কাজ আমাদের দায়িত্বে আছে। সেটা হলো, রিযিক অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া। আর রিযিক পৌঁছানোর কাজ আল্লাহর দায়িত্বে। যখন আমরা পদক্ষেপ নেব, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।

বলুন তো, যে ঘোড়া দ্রুতগামী এবং দৌড়প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে বড়-বড় পুরস্কার নিয়ে আসে, সেই ঘোড়াকে ঘাস দিতে মালিকের কখনও কষ্ট হয়? এই ঘোড়াকে ঘাস দিতে গিয়ে কখনও কোনো পেরেশানি হয় না। কেননা, সেটা তার জন্য সুনাম-সুখ্যাতি বয়ে আনছে এবং উত্তম একটি জীবিকার উপকরণ। বরং মালিকের মনের বাসনা হলো, এটা আরও খাক। এমনিভাবে যারা দীনের কাজ করেন, তাদের রিযিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলাও আনন্দিত হন। তিনি নিজ বান্দাকে অপরের সামনে লাঞ্ছিত করেন না। বরং সম্মানজনক রিযিক প্রদান করেন। তবে এর জন্য শর্ত হলো, বান্দার দৃষ্টি প্রতিপালকের প্রতি থাকতে হবে, অন্য কারও প্রতি নয়। বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। রিযিক পৌঁছানোর কাজ আল্লাহ তা'আলার যিম্মায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। হ্যাঁ, আমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করি, তারপর আশা করি, তিনি আমাদের হালুয়া খাওয়াবেন, তাহলে তো এই নেয়ামত পাওয়া যাবে না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিপদাপদে নিক্ষেপ করেন। বরং তাকে রিযিক দিয়েও অস্থির করে দেন। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার সত্তার ওপর যদি মানুষের পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকে, তাহলে তার যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলা নিজে পূর্ণ করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সম্মান রেখেছেন

একবার আমরা সফর করছিলাম। হাইওয়েতে আসার পর কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে আমি ড্রাইভারের দিকে খেয়াল করে দেখি, তিনি বড় পেরেশান। কখনও এদিক দেখছেন, কখনও ওদিক দেখছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে? তিনি বললেন, হযরত! আপনি শুধু তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকেন, আল্লাহ দয়া করবেন, আল্লাহ মান-সম্মান রাখবেন। আমি বললাম, দু'আ করছি, আল্লাহ আপনার মান-সম্মান রাখবেন। তিনি গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চালাচ্ছিলেন। পঞ্চাশ কিলোমিটার পর গ্যাসস্টেশন পাওয়া গেল। তিনি গাড়ি গ্যাসস্টেশনে প্রবেশ করালেন এবং বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! আমি বললাম, কী ঘটেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ মান-সম্মান রেখেছেন। আমি বললাম, এবার তো বলবে, আল্লাহ কিভাবে মান-সম্মান রক্ষা করলেন। তিনি বললেন, হযরত! আমি আপনাকে গাড়িতে উঠানোর পূর্বে যে জায়গা থেকে আসছিলাম, সেখানে থাকতেই আমার গাড়ি পেট্রোল শেষ হয়ে যাওয়ার সংকেত দিয়েছিল।

আমি ভেবেছিলাম, বাসায় যেতে রাস্তায় কোনো পাম্প থেকে পেট্রোল নিয়ে নেব। কিন্তু আমি ভুলে গেলাম। তারপর আপনার সফর ছিল। আপনাকেও উঠিয়ে নিলাম এবং হাইওয়েতে চলে এলাম। যখন আমার দৃষ্টি মিটারের ওপর পড়ল, তখন আমি দেখলাম, পেট্রোল শেষ হওয়ার সংকেত থাকাবস্থায় গাড়ি সাধারণত যত মাইল চলে, তারচেয়ে দেড়-দুই গুণ বেশি আরও আগেই চলা হয়ে গেছে। কাজেই এখনই গাড়ি কোথাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যখন হাইওয়ের মাঝখানে গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন পীর সাহেব অসন্তুষ্ট হবেন এবং বলবেন, আপনি এমন নির্বোধ ও অসচেতন মানুষ!

তিনি বলতে থাকলেন, এই ধারণা জাগতেই আমি মনে-মনে এই দু'আ করি 'হে আল্লাহ! আমি আপনার একজন সৎকর্মপরায়ন বান্দাকে গাড়িতে বসিয়েছি। আপনি তাঁকে পেরেশানি থেকে বাঁচান এবং আমার মান-সম্মান রাক্ষা করুন। আমাকে অপদস্থ করবেন না, ভুল করে বসেছি।' এই দু'আ করে আমি স্পিডের ওপর পা রাখলাম। এতক্ষণ ৬০-৭০ কিলোমিটার গতিতে যাচ্ছিলাম। এবার আমি ১২০ কিলোমিটার বেগে চলতে শুরু করি। ১২০ কিলোমিটার বেগে তখন চলতে শুরু করি, যখন আমি বুঝতে পারি, ভেতরে পেট্রোল বলতে কিছুই নেই। আমার ধারণা ছিল কষ্ট করে পাঁচ-দশ কিলোমিটার চলতে পারব। কিন্তু গাড়ি চলতেই থাকল। এমনকি পঞ্চাশ

কিলোমিটার চলার পর গ্যাসস্টেশন পাওয়া গেল এবং আমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললাম।

সুবহানাল্লাহ! যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সামনে এভাবে অপারগতা পেশ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে খুশি করেন।

মেহমান এলে মন ছোট না করা

অনেক সময় মানুষ মেহমান এলে মন ছোট করে ফেলে। অথচ বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তা'আলা মেহমান আসার পূর্বেই তার রিযিক পৌঁছিয়ে দেন। স্মরণ রাখবেন! যে রিযিক মেহমান আহার করে, তা মেজবান নিজের থেকে আহার করায় না। সে তো শুধু আগুন জ্বালানো এবং দস্তরখানে খাবার পরিবেশনের ছাওয়াব পায়। বাকি মেহমান নিজের রিযিকই খেয়ে থাকে। এ-ও মনে রাখবেন! এটা মেহমানের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ যে, তিনি ঘরে এসে খেয়ে যান। যদি মেহমান না আসত, তাহলে হয়তোবা খাবার প্রস্তুত করে তাকে খাওয়ানোর জন্য তার পেছনে ছুটতে হতো। এজন্য রিযিকের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় এমনও হয়, আগন্তুক মেহমান কোনো কারণে আসতে পারেন না আর তার জন্য প্রস্তুতকৃত আহার্য অন্য কারও ভাগ্যে চলে যায়।

মিসকিনদের রিযিক

এক ডাক্তার সাহেব তাঁর কোনো বন্ধু আসবেন এই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তাকে আপ্যায়নের জন্য হোটেল থেকে খাবার আনতে গেলেন। একটা মুরগি রোষ্ট করার অর্ডার দিয়ে তিনি হোটেল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়ালেন। কাছেই কতিপয় মিসকিন ব্যক্তি বসে পরস্পর কথাবার্তা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, বন্ধু! ক্ষুধা পেয়েছে, এখন খাবারের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে? অপরজন জবাব দিল, রিযিকের যিম্মাদারি তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন; তিনি নিজেই খাবার পাঠিয়ে দেবেন। ডাক্তার সাহেব তাদের কথাবার্তা শুনে মুচকি হাসছিলেন আর ভাবছিলেন, এই অসহায় গরিব-মিসকিন লোকদের আল্লাহ তা'আলার ওপর কত দৃঢ় বিশ্বাস! হঠাৎ ডাক্তার সাহেবের মোবাইল রিংটোন বেজে উঠল। তিনি কল রিসিভ করলে তাঁর সেই বন্ধু বলছিলেন, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আজ আমি আপনার কাছে আসতে পারব না। ডাক্তার সাহেব অর্ডার দেওয়া মুরগির রোষ্ট এসব মিসকিনকে দিয়ে দিলেন আর তারা আনন্দিত হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করতে লাগল।

বাজেট রজনী

আজকের রজনী শরীয়তের দৃষ্টিতে বাজেট রজনী। যেমন বহু দেশে জুন মাস বাজেট মাস। এই মাসে বাজেট তৈরি করা হয় যে, আগামী বছর কী-কী কাজ করতে হবে, এজন্য কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং কী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। ঠিক তদ্রূপ আজকের রাত মানুষের জন্য বাজেটের রাত। আগামী বছরের জন্য রিযিকের সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলা আজকের রাতে করে দেবেন। এই রিযিকের মধ্যে ঘরবাড়িও অন্তর্ভুক্ত, স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত, সন্তানসন্ততিও অন্তর্ভুক্ত, সুস্থতাও অন্তর্ভুক্ত, ধনসম্পদও অন্তর্ভুক্ত, ইজ্জত-সম্মানও অন্তর্ভুক্ত, অন্তরের প্রশান্তিও অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, মানুষের প্রয়োজনীয় যত কিছু আছে, সবই এই রিযিকের মধ্যে শামিল। আমরা যখন পেরেশান হই, তখন এর কারণ এসবের মধ্য থেকেই কোনো একটা হয়ে থাকে। কেউ সন্তান না হওয়ার কারণে পেরেশান হয় আর বলে, এত বছর হয়ে গেল সন্তান হচ্ছে না। কেউ সন্তান লেখাপড়া না করার কারণে পেরেশান হয়। আমার বন্ধুগণ! আমাদের পেরেশানি যে প্রকারেরই হোক, সেটা দূর করা যদিও আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু আমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষে খুবই সহজ। যেমন– কোনো শ্রমিক অফিসার থেকে দস্ত খত করাবে, কোনো একজন তাকে বলল, সুযোগ মতো অফিসারকে মিনতির সাথে তোষামোদ করে নাও, তাঁর কাজ তো কলমই চালানো। যেভাবে অফিসারের কলম চালানোতে শ্রমিকের কাজ হয়ে যায়, তেমনি প্রভুর একটা নজরের বদৌলতে সারা জীবনের কাজ হয়ে যায়। কাজেই আজকের রাত ইবাদাতে কাটাতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেহেতু রিযিকের সিদ্ধান্ত হয়, তাই আমি চাই এর পরের দিন রোযা থাকি। এজন্য শাবানের পনেরো তারিখে রোযা রাখাও সুন্নাত।

অনেক মানুষ মাখলুকের সামনে অভিযোগ করে থাকে। দোস্তকে বলে, আমার এই পেরেশানি। ডাক্তারকে বলে, আমার এই পেরেশানি। হাকীমকে বলে, আমার এই পেরেশানি। মুফতী সাহেবকে বলে, আমার এই পেরেশানি। বন্ধুগণ! আমরা যে সারা বছর মাখলুকের কাছে আমাদের পেরেশানির কথা বলি, তদপেক্ষা এটা কি উত্তম নয় যে, আজকের এই রজনীতে আমাদের সকল পেরেশানি আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থাপন করে যাই? আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি

আমাদেরকে আজকের এই রজনীতে তাঁর ঘরে সমবেত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ, আল্লাহ তা'আলা থেকে সবকিছু চেয়ে নেওয়া। চাওয়ার নিজ-নিজ ধরন রয়েছে।

চমৎকার একটি দু'আ

একবার এরূপ শাবানের পনেরো তারিখের রাত ছিল। কোনো এক মসজিদে প্রোগ্রাম হলো। প্রোগ্রাম শেষে লোকজন বিভিন্ন ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে গেল। অনেকে নফল নামায পড়ছিলেন, অনেকে তেলাওয়াত করছিলেন। আবার অনেকে মুরাকাবা করছিলেন। এই অযোগ্য বান্দাও একটা স্থানে বসা ছিল। আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন, এক বৃদ্ধ লোক এই অধমের পাশে বসে তাসবীহ পড়তে থাকেন। তারপর তিনি দু'আ করেন। আমি তার দু'আর শুধু একটা বাক্য শুনেছি। বাক্যটি আমার এত ভালো লেগেছে যে, আমি আমার ইবাদাতই ভুলে গেছি। তিনি এই দু'আ করছিলেন...

اللہ سائیں آ! ماہنہ ہک واری جنت وڑن دیویں, اگاں آپے لگاوتساں

'হে আল্লাহ! আমাকে একটিবার জান্নাতে প্রবেশ হতে দিও; সামনে আমি নিজেই বিচরণ করতে থাকব।'

সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! তার এরূপ দু'আ করতে পছন্দ হয়েছে। এমন বয়স্কদের কিছু কথা খুব ভালো লাগে।

জনৈক বয়স্ক ব্যক্তির আকর্ষণীয় প্রশ্ন

কোনো গ্রামে একজন পীর সাহেব তাশরীফ আনলেন। তিনি মসজিদে বয়ান করবেন। গ্রাম্য লোকজন সমবেত হলো। বয়ান শুরু হওয়ার পূর্বে এক নির্বোধ বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। লোকটি দূরদর্শিতার ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল, পীর সাহেব! আমরা অশিক্ষিত মানুষ। কোনো কথা আমাদের বুঝে না এলে আমরা প্রশ্ন করতে পারব কি? পীর সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন। তারপর পীর সাহেব বয়ান শুরু করলেন। বয়ান করতে-করতে পীর সাহেব একসময় বললেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুলসেরাতের ওপর দিয়ে যেতে হবে। অনেক হাদীছে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তিনি বোঝানোর বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করলেন, সেই পুল চুলের চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা বেশি ধারালো। একথা বলার পর সেই বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, পীর সাহেব! আমার মনে হয়, কথাটি মিথ্যে।

পীর সাহেব তাকে কথাটি বোঝালেন যে, পুলসিরাত বাস্তব। এর আলোচনা কিতাবাদিতে আছে। এই পুলের ওপর দিয়ে সকল মানুষকে যেতে হবে। কিন্তু বৃদ্ধ একই কথা বলছে, আমার মনে হচ্ছে, এটা মিথ্যা। সবশেষে পীর সাহেব তাকে শান্ত করার জন্য বললেন, বাস্তবেই কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে। এবার বৃদ্ধ বলতে শুরু করল–

আচ্ছা, এরূপ পুলের ওপর দিয়ে যেতে হবে, যা চুলের চেয়েও বেশি সূক্ষ্ম এবং তরবারির চেয়ে বেশি ধারালো?

পীর সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই।

একথা শুনে বৃদ্ধ বলল, পীর সাহেব, তাহলে আপনি বলে দিন, এই পুল অতিক্রম করে মানুষ সামনে অগ্রসর হবে, আল্লাহর এরূপ নিয়্যতই নেই।

তারপর পীর সাহেব আবার বয়ান শুরু করে দিলেন। বয়ান করতে-করতে, একস্থানে এসে বললেন, নামায পড়ুন। নামায না পড়লে আল্লাহ তা'আলা হিসাব নেবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন। প্রথমে দোযখে শাস্তি দেওয়ার পর জান্নাতে পাঠাবেন। বৃদ্ধ আবার দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, পীর সাহেব আমার মনে হচ্ছে, এটাও মিথ্যা।

পীর সাহেব বললেন, না, মিথ্যা নয়। কিতবাদিতে লেখা আছে, যেব্যক্তি গুনাহ করার পর তাওবা করবে না এবং এরূপ দীন থেকে উদাসীন হয়ে জীবন যাপন করবে, সে প্রথমে দোযখে যাবে। সেখানে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ শেষ হলে, সে জান্নাতে যাবে। বৃদ্ধ তার কথায় অটল থাকল যে, এটা মিথ্যে। পীর সাহেব যখন, তাকে বোঝালেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন, তখন বৃদ্ধ বলল, পীর সাহেব! আপনি আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, আমার ঘরে কোনো মেহমান এল আর আমি তাকে পাঁচ-সাতবার জুতাপেটা করলাম; তারপর তাকে বললাম, জনাব! আসুন, মোরগ খেয়ে নিন, তাহলে কি সে খাবে?

তারপর বৃদ্ধ বলল, পীর সাহেব! কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যাকে মাফ করবেন, তাকে এমনিতেই মাফ করে দেবেন।

প্রত্যেক দু'আ কবুল হয়

আজকের রজনী দু'আ করার রজনী। সম্মিলিতভাবেও দু'আ করুন এবং তারপর মসজিদে, নিজ-নিজ ঘরে একাকিও দু'আ করুন! আমাদের শরীর যতটুকু সঙ্গ দেয়, ততটুকু দু'আ করুন!

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হন।'

দু'আ করা অবস্থায় এটা মনে রাখবেন যে, বান্দার সব দু'আ কবুল হয়। অবশ্য দু'আ কবুলের তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা রয়েছে। কখনও এমন হয় যে, বান্দা যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা সরাসরি দিয়ে দেন। যাকে আমরা দু'আ কবুল হওয়া বলে থাকি। কখনও আল্লাহ তা'আলা দু'আর বদৌলতে আগতপ্রায় এমন বিপদাপদ অথবা পেরেশানি দূর করে দেন। যদি তা-ও না হয়, তাহলে এই দু'আ তার আমলনামায় পুঁজি হিসেবে সঞ্চিত হয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই বান্দাকে ডেকে বলবেন, হে আমার বান্দা, তোমার আমলনামায় দু'আসমূহ সঞ্চিত আছে। আমি তোমার উপকারার্থে দুনিয়াতে এগুলো পূর্ণ করিনি। আজ আমি তোমাকে এগুলোর বিনিময় দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ শান অনুযায়ী এই বান্দাকে এত প্রতিদান দেবেন যে, বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! দুনিয়াতে যদি আমার কোনো দু'আ-ই পূর্ণ না হতো এবং আমার সমস্ত দু'আর বিনিময় আজ আপনি আপনার শান মোতাবেক আমাকে প্রদান করতেন!

এই তিন পদ্ধতির কোনো-না-কোনো পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহে দু'আ কবুল হয়। এর কারণ এরূপ যেমন, কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি কোনো ফকির থেকে এমনটা শুনতে চায় না যে, আমি দশটা টাকা আবেদন করেছিলাম, কিন্তু আপনি দেননি। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে এরূপ শুনতে পছন্দ করেন না যে, হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করেছিলাম; কিন্তু আপনি দেননি। এটা আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী যে, কোনো বান্দা পরম দয়ালু প্রতিপালক ও দানবীর সত্তার কাছে প্রার্থনা করবে; তারপর কেয়ামতের দিন বলবে, হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করেছিলাম; কিন্তু আপনি দেননি। নিশ্চিতভাবে এমনটি হবে না। আল্লাহ অবশ্যই প্রদান করেন। তবে বান্দা যখন দু'আ করা অবস্থায় বলতে শুরু করে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথা শোনেন না, আমাদের দু'আ তো কবুল হয় না, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ পুরাতন ছেঁড়া কাপড়ের মতো তার মুখেই ছুড়ে মারেন।

দুটি বিশেষ নেয়ামত

সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বলতেন, যেব্যক্তি দুটি নেয়ামত লাভ করবে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে।

১. একটি হলো, তাকে বিচারকের দ্বারে যাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে।

২. দ্বিতীয়টি হলো, তাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

বাস্তবিকই এই দুই নেয়ামত আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামতের মধ্যে গণ্য।

পরীক্ষিত তিনটি বিষয়

তিনটি বিষয় অত্যন্ত পরীক্ষিত। বিষয়গুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেবেন।

১. প্রথম বিষয় হলো, যেব্যক্তি খুবই পেরেশান অবস্থার সম্মুখীন এবং কোনোভাবেই তার পেরেশানির অবসান ঘটছে না। তো হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, সে যেন বেশি-বেশি এস্তেগফার পড়ে। ইস্তিগফারের আধিক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তরের উৎকণ্ঠা দূর করে দেন। কাজেই 'আসতাগফিরুল্লাহ' বেশি-বেশি বলা চাই। কোনো ব্যক্তি যেকোনো কারণে উৎকণ্ঠিত হলে চলা-ফিরায় মুখে বেশি-বেশি এস্তেগফারের অজিফা আদায় করতে পারে। সকাল-সন্ধ্যা দুশোবার তাসবীহ পাঠ করতে চাইলে তাও করতে পারে।

২. দ্বিতীয় বিষয় হলো, যার ওপর দারিদ্র্য ও দুরবস্থা চেপে বসেছে, অনেক চেষ্টা-তদবির সত্ত্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য না চলে এবং এছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা না থাকে, তো সে যেন বেশি-বেশি পড়ে–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এটা এমন এক আমল, যার আধিক্যের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রিযিকের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।

৩. তৃতীয় বিষয় হলো, যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর নেয়ামত দিয়ে থাকেন এবং তিনি কামনা করেন, আমার থেকে এই নেয়ামত ফিরিয়ে না নেওয়া হোক, তাহলে তিনি যেন বেশি-বেশি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেন। এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার হাতে সকল নেয়ামত নিরাপদ

রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা সন্তান দিয়েছেন, ঘরবাড়ি দিয়েছেন, নেককার স্ত্রী দিয়েছেন, রিযিক দিয়েছেন, মান-মর্যাদা দিয়েছেন, এখন যিনি কামনা করেন, আমার কাছে এসব নেয়ামত নিরাপদ থাক, তাহলে তার জন্য উচিৎ অধিক পরিমাণে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে থাকা। এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার এসব নেয়ামতের মধ্যে আরও প্রাচুর্য দান করবেন।

রিযিক বৃদ্ধি করার কতিপয় আমল

আমাদের মাশায়েখদের রিযিক বৃদ্ধি করার কতিপয় পরীক্ষিত আমল–

১. তন্মধ্যে একটা তো হলো, সর্বক্ষণ উজু অবস্থায় থাকা। কয়েকজন বুযুর্গ তাঁদের কিতাবে একথা লিখেছেন যে, আমি যখন উজু অবস্থায় থাকার অভ্যাস শুরু করি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে রিযিকের পেরেশানি থেকে মুক্ত করে দেন। তাই সব সময় উজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করা চাই। পানির ব্যবস্থা না হলে তায়াম্মুমই করে নেওয়া চাই। অর্থাৎ– কিছু না কিছু হওয়া চাই। হয়তো উজু অবস্থায়, নয়তো তায়াম্মুম অবস্থায়।

২. দ্বিতীয় আমল দৃষ্টির হেফাজত করা। কুদৃষ্টির কারণে মানুষের হালাল রিযিক হ্রাস করে দেওয়া হয়।

৩. তৃতীয় আমল, নিজের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ধাবিত রাখা। এটাকেই আমাদের মাশায়েখগণ 'উকূফে কালবী' বলে থাকেন।

৪. চতুর্থ আমল, হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি (রহ.) আমাদের মুরশিদে আলমকে (রহ.) একটি অজিফা বলেছিলেন। হযরত (রহ.) সেই অজিফা এই অধমকেও বলেছিলেন। যেহেতু আজ রিযিকের ব্যাপারে দু'আ করা হবে এবং কতিপয় দোস্ত ফোন করে তাদের জন্যও দু'আ করতে বলেছেন, সেহেতু সহজেই অনুমেয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ পেরেশানি রিযিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই অজিফাটি আপনারা সকলেই শুনুন। সেসব নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও এই অনুমিত আছে, যাদের পর্যন্ত আমার আওয়াজ যাচ্ছে। অজিফাটি খুবই সহজ।

অজিফাটি হলো, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আগে-পরে দরূদ শরীফ পড়া এবং মাঝখানে সাতবার সূরা কুরাইশ পড়া।

এটি রিযিকের পেরেশানি অবসানের একটা ও পরীক্ষিত আমল। এই অধম তার জীবনে শত-শত নয়, বরং হাজারো লোককে এই আমল বলেছে এবং আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাদের সকলের পেরেশানি দূর করেছেন। জনৈক

ব্যক্তি বলেছিল, আমি নিজহাতে হাজার টাকা কখনও হিসাব করিনি। তাকে অধম এই আমল বলেছে এবং সে আমল শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তার রিযিকের মধ্যে এমন বরকত দিলেন যে, সে আজ কোটিপতি হয়ে জীবন যাপন করছে। সে নিজে বলত, এই আমলের পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার ব্যবসায় বরকত দান করলেন। বিশেষ করে যখন সূরা কুরাইশের এই আয়াত পড়বেন,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ পড়ার সময় রিযিকের মধ্যে বরকতের কল্পনা করবেন এবং وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ পড়ার সময় সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে পরিত্রাণ লাভের কল্পনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার রিযিকের পেরেশানিও দূর করে দেবেন এবং আপনাকে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকেও মুক্তি দান করবেন।

৫. হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরি (রহ.) বলতেন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) থেকে বর্ণিত, যেব্যক্তি সকালে সত্তরবার গুরুত্বসহকারে নিয়মিত এই আয়াত পড়বে, সে রিযিকের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

ছাত্রদের জন্য দুটি উপহার

ছাত্রদের জন্য দুটি বিষয় উপস্থাপন করছি। তারা এগুলোকে এই অধমের পক্ষ থেকে নিজেদের জন্য উপহার মনে করবে।

১. এই অধম অনেক বুযুর্গের দৈনন্দিন আমলের বিবরণ পড়েছে। তারপর সেগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, লেখাপড়ায় যে ছাত্র পারঙ্গম নয়, অর্থাৎ পড়ে আর ভুলে যায়, তার পক্ষে স্মরণ রাখা কঠিন এবং ইল্‌মের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না, সে যদি এই আমল করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তার অন্তর খুলে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) একবার এই আয়াত পড়তে-পড়তে পূর্ণ রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতটি হলো قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا তিনি এই আয়াত সারা রাত বারবার পড়তে থাকেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেই আমলটি হলো, সেই ছাত্র যখন রাতে

তাহাজ্জুদ পড়বে, তখন এই আয়াতের পূর্বাপর মিলিয়ে নামাযের সুন্নাত কেরাত পরিমাণ তেলাওয়াত করবে এবং প্রত্যেক রাকাতে এই আয়াতটি নিজের আগ্রহ অনুপাতে যত বেশি সম্ভব তেলাওয়াত করবে। এতে সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। যদি সেই ছাত্র তাহাজ্জুদ নামাযে কয়েকদিন এই আমল করে, তাহলে এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর খুলে দেবেন এবং তার সিনা ইল্‌মের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

২. আরও একটা আমল আছে। জনৈক বুযুর্গ এই অধমকে সেটির অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে আমি আপনাদের সেটির অনুমতি দিচ্ছি। উপকার উঠান। অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে সবক আয়ত্তকরণে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ছাত্র-ছাত্রী নিজে কিংবা তাদের পিতামাতা প্রত্যহ প্রত্যেক নামাযের পর সূরা الم نشرح পড়ে তাদের সিনায় ফুঁ দেবেন। আগে ও পরে একবার দরূদ শরীফও পড়বে। সন্তান যদি বোধসম্পন্ন ও বড় হয়, তাহলে যখনই পড়তে বসবে, লেকচার শুনতে বসবে অথবা শিক্ষকের দরস শুনতে বসবে, তখন এই সূরা পড়ে নিজের সিনায় ফুঁক দেবে। যেব্যক্তি একে নিজের আমল বানিয়ে নেবে, আল্লাহ তা'আলা তার স্মরণশক্তি শক্তিশালী করে দেবেন। আমি এই আমলটি হাজারো বন্ধুদের ওপর পরীক্ষা করেছি।

এক ছাত্র বলল, সে এক বছর মেট্রিক পরীক্ষায় ফেল হয়েছে। তারপর সে আমলটির বিবরণ কোনো মাহফিলে এই অধম থেকে শুনেছে এবং সে নিয়মিত গুরুত্বসহকারে আমল শুরু করে দেয়। পরবর্তী বছর সে সারা স্কুলে ফাস্ট হয়েছে। এমনিভাবে কোনো মাহফিলে এই অধম আমলটির কথা বলে। বেশ কিছুদিন পর এক ছাত্রী চিঠি লিখে তার অবস্থার বিবরণ দিল। সে লিখেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, ডাক্তার হব। কিন্তু আমি তো অনেক কষ্টে পাশ করতাম। এ অবস্থায় আমি আপনার থেকে কোনো মাহফিলে এই আমলের কথা শুনি এবং আমল শুরু করে দেই। কখনও বাদ যায়নি। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমি পরীক্ষা দিলাম এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলাম।

দাম্পত্য জীবনের সফলতার জন্য অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র

দাম্পত্যজীবনের সফলতার জন্যও একটি আমল শুনে নিন। আমলটি হচ্ছে, কুরআনে কারীমের এই আয়াতটি মুখস্থ করে নিন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির দিক থেকে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের ইমাম বানান।'[৬১]

ফরজ, সুন্নাত, ওয়াজিব, নফল যেকোনো নামায পড়বেন প্রত্যেক নামাযে শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর পূর্বে এই আয়াতটি পড়বেন। তারপর সালাম ফেরাবেন।

এই আমল একজন সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ব্যক্তি দিয়েছিলেন। আপনারা বিস্মিত হবেন যে, সে-সময় এই অধম এখনও দশম শ্রেণিতে পড়ালেখা করছিল। বুযুর্গ ব্যক্তি তখন বললেন, আমার পক্ষ থেকে অনুমতি আছে পড়া শুরু করে দাও। যখন তোমার বিয়ে হবে, তখন ইনশাআল্লাহ তিনি সফলতা দেবেন। সেই সময় থেকে অধম এই দু'আ পড়ে আসছে। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত এই অধমকে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় দাম্পত্যজীবন দিয়ে রেখেছেন। অধমের স্ত্রী হলো আমার শাইখের শাইখের মেয়ে। যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো, তখন কখনও-কখনও মনে হতো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিজস্ব একটা সম্পর্ক থাকে এবং এই নেসবতেরও নিজস্ব একটা আদব আছে। এভাবে তো আমাকে দ্বিগুণ সম্মান করতে হবে। এজন্য কখনও চিন্তা জাগত, জানি না, আমি কিভাবে দুটির মর্যাদা রক্ষা করব। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমার জন্য এই জটিলতা সহজ করে দিয়েছেন।

বিয়ের পরের দিনই ফজরের নামাযান্তে নাস্তার জন্য বাসায় গেলে আমার স্ত্রী বলল, নাস্তা পরে করবেন, আগে আমাকে বাই'আত করে নিন। আলহামদু লিল্লাহ! এখন সে আমার স্ত্রীও এবং আমার মুরীদও। স্ত্রী যখন মুরীদ হয়, তখন দাম্পত্যজীবন কতই-না সুখের হয়। এই অধম মনে করছে, এটি সেই আমলের বরকত।

আপনারা আয়াতটি মুখস্থ করে নেবেন এবং প্রতিদিনের আমল বানিয়ে নেবেন। অধমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এর অনুমতি দেওয়া হলো। এসব আমল আপনারা নিজেরা করতে পারেন। কিন্তু অন্যদের বলতে হলে সাহেবে নেসবত হওয়া জরুরি। যে-কেউ অন্য কাউকে অনুমতি দিতে পারে না। দিলে তাতে বরকত হয় না। অবশ্য আপনাদের মধ্যে যদি সাহেবে নেসবত কেউ থাকেন, তাহলে তিনি এই আমলের অনুমতি ভবিষ্যতে অন্যদের দেবেন। আল্লাহ তাতে বরকত দান করবেন।

---

৬১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৭৪

ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তাও প্রার্থনা করবে

অদ্য রজনীতে সালাতুত্ তাসবীহ পড়া অনেক বড় একটা ইবাদাত। নারী-পুরুষ সবাই পড়ে থাকে। সাথে-সাথে সালাতুত্ তাওবাও পড়া চাই। তাওবার নিয়্যতে দুই রাকাত নফল নামায পড়বেন, যেন এখন পর্যন্ত জীবনে যত গুনাহ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সব ক্ষমা করে দেন। তারপর দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করুন এবং ভবিষ্যতে আমাকে 'ইসমত' দান করুন। ইসমত হলো আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তায় এসে যাওয়া। কৃত গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা অর্ধেক আমল। বাকি অর্ধেক হলো আল্লাহর নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। আমরা বহুবার এই ভুল করি যে, কৃত গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করি; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহর নিরাপত্তা প্রার্থনা করি না। তারপর বলি, আবার আমার থেকে গুনাহ হয়ে গেছে। তাই এই উভয় নেয়ামত প্রার্থনা করতে হবে। এক দিকে অতীত গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করব, আরেক দিকে ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তারও প্রার্থনা করব যে, হে আমাদের প্রতিপালক! ভবিষ্যতে আমার নিরাপত্তা বিধান করুন। ভাইসব! আমাদের পক্ষে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা কঠিন; কিন্তু আমাদের প্রভুর পক্ষে মুক্ত রাখা তো সহজ। আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তাহলে তিনি আমাদের গুনাহ থেকে মুক্ত রাখবেন।

আল্লাহ বান্দাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের পুণ্যের প্রতিদান দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আযাব দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ.

'তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আযাব দিয়ে কী লাভ করবেন?'[৬২]

আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) এই আয়াতের তরজমা করতেন এরূপ, যদি তোমরা ঈমান আনয়ন কর এবং শোকর আদায় কর, তাহলে তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কী পাবেন? অর্থাৎ– যদি তোমরা ঈমানদার ও শোকরগোজার হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের

---

৬২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৭

কেন আযাব দেবেন? মূল বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আযাব দিতে চান না। আমরা নিজেদের গুনাহের মাধ্যমে আমাদের ওপর নিজেরাই আযাবকে আহ্বান করছি।

সকল আসমায়ে হুসনা আল্লাহর রহমতের অর্থবোধক

হযরত মুফতী তকী উসমানি (দা. বা.) তাঁর 'খুতুবাত'- এর মধ্যে একটা চমৎকার বিষয় লিখেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিরানব্বইটি আসমায়ে হুসনা থেকে কোনো একটি নামও আযাব দেওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝায় না। অথচ মানুষ মনে করে, আল্লাহর কতিপয় নাম আযাব এবং শাস্তি দেওয়ার কথা বোঝায়। উদাহরণত, আল্লাহর একটি নাম 'জাব্বার'। জাবের অর্থ জবর করা। জবর বলা হয় কারও ওপর জোর জবরদস্তি করাকে। এ থেকে বাহ্যত মনে হয়, বড় ভয়াবহ পরিস্থির সম্মুখীনকারীকে 'জাব্বার' বলা হয়। এমনিভাবে 'কাহ্হার' কহর তথা প্রতিশোধগ্রহণকারীকে বলা হয়। এরূপ মনে হয় যে, জাব্বার ও কাহ্হার শব্দদুটি আযাব ও শাস্তি দেওয়া বোঝাচ্ছে। তাকী সাহেব বলেন, বিষয়টি আসলে এরূপ নয়। উর্দুতে একটি শব্দের মর্ম হয় এক রকম; কিন্তু আরবিতে এই শব্দেরই মর্ম হয় অন্য রকম। যেমন–

ذلیل 'যলীল' শব্দ উর্দুতে অনেক নীচু শ্রেণির লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর আরবিতে দুর্বলদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বদর প্রান্তরে সাহায্য করেছেন; অথচ তখন তোমরা ছিলে দুর্বল।'[৬৩]

উর্দু ভাষায় কাউকে 'যলীল' বললে সে একে গালি মনে করে।

এমনিভাবে 'دلا' (দাল্লা) শব্দ উর্দু ভাষায় গালি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় এই শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। হজ-ওমরাকারীগণ জানেন, সেখানে একটা কোম্পানিকে 'দাল্লা কোম্পানি' বলা হয়। কতিপয় ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, হযরত! এসব লোক পরস্পর একে অপরকে 'দাল্লা' বলে কেন? আমি বললাম, এটা উর্দু 'দাল্লা' নয়, বরং আরবি 'দাল্লা'।

---

৬৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩

উর্দুতে একটি শব্দ আছে بندر 'বান্দর'। একটা জানোয়ারকে বান্দর বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন, এক আরবি শাহজাদার নাম বান্দর ইবনে সুলতান। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমার বিষয়টি বুঝে আসেনি যে, এই লোকটি তার পিতার জন্য এত বোঝা কেন হলো, যার ফলে তিনি তার নামই রেখে দিলেন বান্দর? কিন্তু পরক্ষণেই অন্তরে ধারণা সৃষ্টি হতো, কোনো ছেলে নিজ পিতার ওপর বোঝা তো হতে পারে না। সুতরাং তাহকীক করে জানতে পারলাম, আরবি বাসায় ফুলকে বলা হয় বান্দর। তার পিতা আরবি ভাষায় তার নামকরণ করেছেন 'ফুল' আর আমি তাকে চার পা বিশিষ্ট বান্দর মনে করছিলাম।

এমনিভাবে বাহ্যত মনে হয়, সীমাহীন কঠোরতাকারীকে 'জাবের' বলা হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় ভেঙে যাওয়া হাড় সংযোগকারীকে 'জাবের' বলা হয়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ অর্থাৎ– হে ভাঙা হাড় জোড়া লাগানেওয়ালা।

অতএব, ছিন্ন হওয়া আত্মীয় সম্পর্ক পুনঃস্থাপনকারীকে জাব্বার এবং জাবের বলা হয়। সুবহানাল্লাহ! এই নাম তো আযাব দেওয়া বোঝায় না। বরং আল্লাহ তা'আলার রহমত বোঝায়। তেমনিভাবে 'কাহ্হার' নাম 'কাহ্র' থেকে এবং উঁচু পর্যায়ের বস্তুকে 'কাহের' বলা হয়। পাহাড়ের শৃঙ্গকে 'কাহেরা' বলা হয়। যেমন– মিশরের একটা শহরের নাম কাহেরা। আল্লাহ তা'আলা 'কাহ্হার' হওয়া মর্ম হচ্ছে, তিনি সর্বাপেক্ষা উঁচু এবং সমস্ত কিছুর ওপর পরাক্রমশালী। আমরা বাহ্যিকভাবে বুঝি, 'জাব্বার ও কাহ্হার' আযাবদাতার নাম। অথচ নামদুটি আযাব অর্থদায়ক নয়, বরং এই দুই নামও আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বড়ত্বের অর্থবোধক। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নাম নিয়ে গবেষণা করলে প্রতীয়মান হয়ে যে, এগুলো তিনটি অর্থদায়ক।

হয়তো আল্লাহর রহমতের অর্থদায়ক।

অথবা আল্লাহ পালনকর্তা হওয়ার অর্থদায়ক।

অথবা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অর্থদায়ক। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ শব্দের নিজস্ব অর্থ কী? হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদি (রহ.) বলতেন, যদি আল্লাহ শব্দের উর্দু অনুবাদ করা হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে 'منوہن' অর্থাৎ অন্তর বিজয়কারী। সুবহানাল্লাহ! তাঁর সত্তার তো নামই এরূপ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নামের উসিলা দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা চাই।

আল্লাহ তা'আলার দুটি নাম 'রাহমান ও রাহীম'। অর্থাৎ– অতিশয় দয়ালু ও পরম দয়ালু। এই নামদুটি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার রহমত বোঝায়। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রাহমান শব্দ সেই সত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়, যিনি আপন-পর সকলের ওপর দয়া ও অনুগ্রহকারী। আর যিনি বিশেষ করে শুধু নিজ আপনজদের ওপর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহকারী তার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় 'রাহীম'। যেমন– প্রত্যেক মহিলা পৃথিবীর সকল শিশুর প্রতি মমতাময়ী হয়, কিন্তু এটা স্বাভাবিকভাবে। আর নিজ সন্তানের প্রতিও মমতাময়ী; কিন্তু এটা বিশেষভাবে। রাহমান ও রাহীমের বিষয়টিও এ-জাতীয়। কেউ-কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মুসলমান ও কাফের সকলকে রিযিক প্রদান করেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি 'রাহমান'। আর পরকালে কেবল ঈমানদারদের তাঁর নেয়ামত দান করবেন এ হিসেবে তিনি 'রাহীম'।

এই নামদুটির আরও একটি অর্থ করা হয়, যা বস্তুত প্রেমিকজনিত অর্থ। আর তা হলো, রাহমান অর্থ 'বিনা প্রার্থনায় দানকারী' আর রাহীম অর্থ 'যে প্রার্থনা করে না, তার প্রতি অসন্তুষ্ট'। এবার বলুন, আল্লাহ তা'আলা বিনা প্রার্থনায় দান করেন কি-না? নাস্তিকরা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে না। তথাপি তিনি তাদের ধনসম্পদও দেন, সুস্থতাও দেন, স্ত্রীও দেন, সন্তানাদিও দেন, ঘরবাড়িও দেন; এছাড়াও আরও কত-কত নেয়ামত দেন। সুতরাং তিনি রাহমান এ হিসেবে যে, যারা চায় না, তাদেরও তিনি দান করেন। আর রাহীম এ হিসেবে যে, যারা চায় না, তাদের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। কাজেই যেহেতু মহান প্রভুর কামনা হলো, আমার বান্দারা আমার কাছে প্রার্থনা করুক, সেহেতু প্রার্থনায় আমরা যেন ত্রুটি না করি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা আরশে আযীমে লিখে রেখেছেন–

سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ عَلٰى غَضَبِيْ

'আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর অগ্রগণ্য হয়েছে।'

আল্লাহ তা'আলা এটি কেন লিখে রেখেছেন? এজন্য যে, তিনি রহমত ও অনুগ্রহকারী। বিষয়টি একটি উপমার মাধ্যমে বুঝুন। যদি কোনো পিতা সন্তানদের টাকা-পয়সা না দেওয়ার ইচ্ছে করেন, তাহলে তিনি কি ঘরে এসে দেখাবেন, আমার পকেটে এত টাকা আছে? বরং তিনি যখন ঘরে আসবেন, তখন সন্তানদের বুঝতেই দেবেন না, পকেটে টাকা আছে কি-না। আর তিনি যদি ঘরে এসে সন্তানদের সামনে টাকা বের করেন এবং বলে দেন, তাহলে

এর মর্ম হয়, তিনি সন্তানদের দিতে চাচ্ছেন। এমনিভাবে যেহেতু মহান প্রভু তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করে দিয়েছেন–

نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, নিশ্চয়ই আমি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৬৪]

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, হে আমার বান্দাগণ! আমার কাছে দু'আ করো, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেব এবং আপন অনুগ্রহে তোমাদের কল্পনারও অধিক দান করব।

ক্ষমার ঘোষণা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি বড় গুনাহগার ছিল। তার আমলনামা গুনাহ দ্বারা কালো হয়ে গিয়েছিল। একবার সে ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করল এবং তার জবান থেকে 'ইয়া রব!' (হে প্রভু) উচ্চারিত হলো। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। তার আমলনামায় শুধু 'ইয়া রব!' (হে প্রভু) লিপিবদ্ধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা তার আমলনামায় 'ইয়া রব!' (হে প্রভু) লিখেছ কেন? ফেরেশতারা উত্তর দিলেন, ইয়া আল্লাহ! সে কেবল এই শব্দটুকুই বলেছিল এবং পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল; এজন্য আমরা শুধু এটুকুই লিখে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আমার ফেরেশতারা! আমি সকল অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। আমি জানি, সে আমার কাছে কী প্রার্থনা করতে চাচ্ছিল। মূলত সে 'ইয়া রব!' (হে প্রভু) এজন্য বলেছিল যে, সে আমার কাছে তার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাচ্ছিল। এ-সময় তার ওপর নিদ্রা প্রবল হয়ে গেল, ফলে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আমি তার অন্তরের এই ইচ্ছার বদৌলতে তার সকল গুনাহ মার্জনা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ! যে বান্দা ঘুমের মাঝে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে গিয়ে 'ইয়া রব!' (হে প্রভু) বলল, আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে যে বান্দা জাগ্রত অবস্থায় হুঁশ-জ্ঞান নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, তিনি তার দু'আ কেন কবুল করবেন না?

---

৬৪. সূরা হিজর : আয়াত ৪৯

দুই গুনাহগারের ক্ষমা

কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব (রহ.) একটা ঘটনা লিখেছেন। প্রথম-প্রথম তো আমি ঘটনাটি বর্ণনা করতে ভয় পেতাম। কিন্তু তাঁর বয়ানসমূহে ঘটনাটি পড়ার পর বর্ণনা করার সাহস পেলাম। এমনিভাবে পরবর্তী কালে একই ঘটনা 'ফাওয়াইদুল ফাওয়ায়িদ' নামক কিতাবেও পড়েছি। আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন দুই ব্যক্তির হিসাব নেবেন। তাদের আমলনামায় কোনো নেকি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের দোযখে যাওযার নির্দেশ দেবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের বলবেন, দোযখে যাও! তখন তাদের মধ্যে একজন তো দোযখের দিকে দ্রুত যেতে থাকবে। অপরজন ধীরে-ধীরে চলা শুরু করে পেছন ফিরে দেখবে। তারপর আবার চলা শুরু করে অল্পক্ষণ পরই পেছন ফিরে আবার দেখবে। খানিক পর আল্লাহ তা'আলা তাদের দুজনকেই ডাকবেন। ডেকে দ্রুত চলমান ব্যক্তিকে বলবেন, আমি তোমাকে বললাম, যাও দোযখে আর সাথে-সাথে তুমি দ্রুত যেতে শুরু করলে যে? সে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমি পৃথিবীতে তো আপনার হুকুম পালনে কেবলই ত্রুটি করেছি। এখন আপনি দোযখে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তাই আমি চিন্তা করলাম, এই হুকুমটি পূর্ণ করে নিই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যেহেতু বুঝেছ, আমার হুকুম এত সম্মানজনক যে, এর ওপর আমল করা উচিত, তাই এ কারণে আমি তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলাম। সুতরাং এবার তুমি জান্নাতে চলে যাও।

তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলবেন, তুমি ধীরে-ধীরে যাচ্ছিলে আবার পেছনে ফিরে ফিরে দেখছিলে এর কারণ কী? সে বলবে, ইয়া আল্লাহ! সারা জীবন আপনার রহমত আমার সাথে ছিল। কখনও আপনার রহমত আমাকে নিরাশ হতে দেয়নি। আজ আপনি নির্দেশ দিলেন, যাও দোযখে; আমি আপনার নির্দেশ পালনার্থে সামনে পা ফেলছিলাম আর পেছনে ফিরে-ফিরে দেখছিলাম, হয়তোবা আপনার রহমত বর্ষিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা, তোমার যেহেতু আমার রহমতের ওপর এত ভরসা, তাই তোমারও জন্যও আমার জান্নাতের দরজা খুলে দিলাম। তুমিও জান্নাতে চলে যাও।

সকল পেরেশানি আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করো

আজকের রজনীতে আপনারা পরকালের ব্যাপারেও দু'আ করুন এবং ইহকালীন জীবনের ব্যাপারেও দু'আ করুন, যাতে ইহকাল-পরকাল উভয়

জগতে ইজ্জত-সম্মান ভাগ্যে জোটে এবং আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমাদের নেকিতে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করার তাওফীক দান করেন। যিনি প্রার্থনা করতে চান, আজ থেকেই প্রার্থনা শুরু করে দিন, যাতে আগামী বছর এসব পেরেশানি সমূলে দূর হয়ে যায়। কেউ ব্যবসা লাভজনক না হওয়ার কারণে পেরেশান হয়। কেউ এজন্য পেরেশান হয় যে, অমুক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কেউ এজন্য পেরেশান হয় যে, তিন বছর হয়ে গেছে বিয়ে করেছে; কিন্তু এখনও সন্তান হয়নি। কেউ বলে, ঘরে যুবতি মেয়ে আছে, তাদের বিয়ের প্রস্তাব আসছে না এজন্য পেরেশান। আমার বন্ধুগণ! এটা কি উত্তম নয় যে, আমরা আমাদের সকল পেরেশানি লোকদের না বলে আপন প্রভুকে বলি। সুতরাং আজ আমরা সকলেই আমাদের প্রভুর কাছে মন খুলে দু'আ করব। এক ব্যক্তি দু'আ করা অবস্থায় বলে, আয় আল্লাহ! আমাকে দশ বিলিয়ন রুপি দান করুন। পার্শ্বে বসা ব্যক্তি শুনে বলল, আহা রে এত! সে বলল, জনাব! আপনার কাছে আবেদন করিনি, আমার প্রভুর কাছে আবেদন করছি। মানুষের কাছে নয়, আমাদেরকে মানুষের প্রভুর কাছে চাইতে হবে এবং যখন আমরা তাঁর কাছে চাইব, তখন ইনশাআল্লাহ পরম দয়ালু প্রভু মেহেরবানি করবেন। স্মরণ রাখবেন, যখন লোকজন সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করে, তখন তিনি তাদের দু'আ প্রত্যাখ্যান করেন না। তাদের মধ্যে যদি একজন লোকের দু'আও কবুল হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে অন্য সকলের দু'আসমূহও কবুল করে নেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান, আমার বান্দা আমার কাছে দু'আ করুক এবং আমার নেয়ামতসমূহ দ্বারা উপকৃত হোক।

পনেরো শা'বান থেকে সাতাশে রমযান পর্যন্ত

কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ আছে, পনেরো শা'বান থেকে বাজেট প্রস্তুতকরণ আরম্ভ হয়ে যায়। সর্বশেষ সাতাশে রমযানের রজনী তথা শবে কদরে আল্লাহ তা'আলা এই বাজেট মঞ্জুর করে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের জন্য ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করে দেন। এই বাজেটে সবকিছু লিপিবদ্ধ হয়। কী পরিমাণ রিযিক পাবে, সুস্থ থাকবে, নাকি অসুস্থ, আনন্দে থাকবে, নাকি দুঃক-কষ্টে, আগামী শা'বান (শবে বরাত) পর্যন্ত জীবিত থাকবে, নাকি এর আগে পৃথিবী থেকে চলে যাবে সবকিছুই তাতে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অনেক বন্ধু মনে করেন, শুধু আজকের রাত বাজেটের রাত, না; বরং আজকের রাত সেই বাজেট প্রস্তুতকরণ শুরুর প্রথম রাত এবং শবে কদর সর্বশেষ রাত। যেহেতু

আজ থেকেই বাজেট তৈরি শুরু হয়ে যাবে, তাই আমাদের উচিৎ, আমরা যেন আজ থেকেই চাওয়া শুরু করি, যাতে শুরু থেকেই সব ঠিক হয়ে যায় এবং আজ থেকে শবে কদর পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু যিকির ও ইবাদাত-বন্দেগিতে আমাদের অতিবাহিত করা চাই।

আল্লাহর রহমতের সূর্য

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) একটি কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ধরুন, সকাল সাতটায় সূর্য উদিত হয়। কিন্তু যখন পাঁচটা বাজে, তখন থেকে অন্ধকার চলে যেতে শুরু করে। তারপর প্রতি মুহূর্তে আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি পৌনে সাতটার সময় এত আলো ছড়িয়ে পড়ে, যেন সূর্য উদয় হয়ে গেছে। এ কারণেই সূযোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্বে লোকজন দ্বিধায় পড়ে যায়, নিশ্চিত বলা যায় না, সূর্য উদয় হয়ে গেছে কি-না? কেননা, এ-সময় পার্থক্য করার জ্ঞান থাকে না। তিনি বলেন, শা'বানের পনেরো তারিখ আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকতের সূর্যের সুবেহ সাদিকের সময় এবং তারপর এই আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি শা'বানের শেষ দিবসে এমন বরকতই অবতীর্ণ হয়, যেমন রমযান মাসে হয়ে থাকে। তারপর রমযান মাসে আল্লাহর রহমতের সূর্য উদয় হয়ে যায়। এই বরকত আজ থেকেই অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে এবং রমযান মাসের শেষ অবধি তা এভাবে অবতীর্ণ হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এই রহমত ও বরকত থেকে আমাদের পর্যাপ্ত অংশ দান করুন।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

কিতাবাদিতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত আছে। কারুন মূসা (আ.)কে বলল, আমি যাকাত আদায় করতে পারব না। সে চিন্তা করল, যাকাত দেওয়া থেকে মুক্তির সহজ পদ্ধতি হলো, মূসার জনপ্রিয়তায় ধস নামিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ– কোনো অপবাদ আরোপ করা। হিংসুকরা এরূপই করে থাকে। যখন তারা কোনোভাবেই সফল হতে পারে না, তখন কোনো-না-কোনো বিষয় মনগড়া বানিয়ে অপবাদ লাগিয়ে দেয়। কারুন এক অপরিচিত মহিলাকে এজন্য প্রস্তুত করল যে, তুমি সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলবে, মূসা আমাকে অপকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল। এর প্রতিদানস্বরূপ আমি তোমাকে মূল্যবান পুরস্কার দেব। মহিলা তার কথায় সায় দিয়ে বলল, ঠিক আছে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) এক সমাবেশে বনী ইসরাঈলের উদ্দেশে বয়ান

শুরু করলে মহিলা কারুনের শেখানো কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যখন সে হযরত মূসা (আ.)-এর নূরানি চেহারা দেখল, তখন তার মধ্যে ভীতি সঞ্চার হয়ে গেল এবং সে কিছুই বলতে পারল না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, কী বলতে চাচ্ছ বলো। সে সবকিছু ফাঁস করে করে দিল। সে বলল, কারুন আমাকে বলেছিল, আমি তোমাকে অর্থ দেব; তুমি একথা বলবে। কিন্তু যখন আমি আপনার নূরানি চেহারা দেখলাম, তখন আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

যখন হযরত মূসা (আ.) শুনলেন, সে আমার ভাবমূর্তিতে এজাতীয় কালিমা লেপন করতে চাচ্ছিল, তখন তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, হে আল্লাহ! এই লোক আমার ওপর এরূপ অপবাদ আরোপ করতে চাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আমার প্রিয় মূসা! আমি অল্প সময়ের জন্য ভূমিকে তোমার নির্দেশের অনুগত করে দিলাম। তুমি যা আদেশ করবে ভূমি তাই করবে। মূসা (আ.) ভূমিকে নির্দেশ দিলেন, হে ভূমি! কারুনকে গ্রাস করে নাও। সাথে-সাথে ভূমি কারুনের দেহের এক তৃতীয়াংশ গ্রাস করে নিল। সে যখন ভূমিতে ধসতে লাগল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে কাকুতিমিনতি ও কান্নাকাটি করতে শুরু করল। হযরত মূসা (আ.) আবার বললেন, হে ভূমি! একে গ্রাস করে নাও। এবার ভূমি তার দুই তৃতীয়াংশ গ্রাস করে নিল। এবারও সে কাকুতিমিনতি করে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু মূসা (আ.) এ-সময় ক্রোধের চরম সীমানায় ছিলেন। যদ্দরুন তিনি তৃতীয়বার ভূমিকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। ফলে ভূমি তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিল।

ভূমি তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওহী পাঠালেন, হে আমার প্রিয় নবী! আমি অল্প সময়ের জন্য ভূমিকে তোমার অনুগত করে দিলাম আর তুমি ভূমিকে নির্দেশ দিলে কারুনকে গ্রাস করে নিতে। অথচ কারুন তোমার সামনে ক্ষমার ফরিয়াদ করতে থাকে; কিন্তু তুমি ভূমিকে নির্দেশ দিতেই থাকলে গ্রাস করে নিতে। হে আমার প্রিয়নবী! সে যদি তখন আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাহলে আমি প্রভু তার ফরিয়াদ কবুল করে নিতাম। সুবহানাল্লাহ! আমাদের প্রভু তো এরূপ পরম করুণাময় প্রভু, যিনি ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করে খুশি হন। অতএব, আমাদের উচিৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব বেশি-বেশি ক্ষমার ফরিয়াদ করা এবং দু'আ করা যে, হে পরম করুণাময় প্রভু! আজকের রাতকে আমাদের

জন্য পুঁজি বানিয়ে দিন, পুণ্যের মাধ্যম বানিয়ে দিন এবং আমাদের ভবিষ্যত জীবন শারীরিক সুস্থতা, ঈমানের নিরাপত্তা,এবং মান-সম্মানের নিরাপত্তার সাথে দ্বীনি শিক্ষা অনুযায়ী অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দিন এবং সমস্ত পেরেশানি থেকে পরিত্রাণ দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

দাওয়াত ও তাবলীগের দশটি সোনালি মূলনীতি

'মুমিনের ব্যক্তিত্ব বা পদমর্যাদা একজন সৈনিকের মতো। কেননা, একজন সৈনিক যেমন নিজেও রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন মেনে চলে এবং অন্যদেরও তা পালন করাতে সচেষ্ট হয়, ঠিক তদ্রূপ মুমিনও আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধের ওপর নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যদেরও সেসব বিধিনিষেধ পরিপালন করাতে সচেষ্ট হয়। আমরা যদি এই নেয়ামত বণ্টনকাজে নিয়োজিত থাকি, তাহলে আমরাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অগণিত নেয়ামত পেতে থাকব। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, এটা আমার রাস্তা, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি।"[৬৫]

---

৬৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০৮

দাওয়াত ও তাবলীগের দশটি সোনালি মূলনীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

وقال الله تعالى في مقام اٰخر وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

বিশ্বজগত পরিচালনার বিন্যাস

আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বজগত আপন পরিপূর্ণ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য একটা শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। এই পার্থিব জীবনে একদল মানুষ দাতা আর একদল গ্রহীতা। একদল মানুষ শিক্ষাদানকারী, আরেকদল শিক্ষা গ্রহণকারী। একদল বড় হয়, আরেকদল ছোট থাকে। কতিপয় লোক শাসক হয় আর কতিপয় শাসিত হয়। কতিপয় বিচারক হয় আর কতিপয় বিচারপ্রার্থী হয়। যদি সকল মানুষ এক পর্যায়ের হয়ে যায়, তাহলে পার্থিব জীবনব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। যেমন– একটা কারখানায় একজন ম্যানেজার থাকে এবং অন্যরা তার অধীনে থাকে। যদি সকলকে একই পদে আসীন করে দেওয়া হয়, তাহলে ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনব্যবস্থা পরিচালনার একটি

শৃঙ্খলা বিধান করেছেন। এই শৃঙ্খলায় আল্লাহ তা'আলা কতককে উচ্চ স্তর দান করেছেন এবং অন্য কতককে তার অধীন করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শৃঙ্খলা তার মূল অবস্থায় বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ সবকিছু ঠিকঠাক চলবে। যদি শৃঙ্খলা উল্টে যায়, তাহলে ফলাফলও উল্টে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

'পুরুষরা নারীদের শাসক।'[৬৬]

অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলা পারিবারিক বিষয়াদিতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব পুরুষদের প্রদান করেছেন। পুরুষরা পরিবারের পাহারাদার ও যিম্মাদার। আর নারীদেরকে পুরুষদের অধীন করে তাদের মহারানি বানিয়েছেন। যদি এই বিন্যাস পাল্টে যায় এবং নারীরা পুরুষদের শাসক হয়ে যায়, তাহলে আপনারা দেখবেন, সেই পরিবারের ফলাফল সবসময় বিপরীত হবে। সেখান থেকে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বের হবে। দীনের কাজ না হয়ে দুনিয়ার কাজ হবে। ভালোর স্থলে মন্দ হবে। এটা আল্লাহকর্তৃক প্রদত্ত বিন্যাস। আল্লাহ তা'আলা যাকে উঁচুতে আসীন করেছেন, তিনি উঁচুতে থাকুন, যাকে নিচু স্তরে স্থান দিয়েছেন, তিনি নিচুতেই থাকুন এবং আল্লাহ তা'আলার এই বিন্যাসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ তা'আলার বিন্যাস উল্টে দিলে আযাব অবতীর্ণ হয়। এজন্যই লূত সম্প্রদায়ের ওপর নিপতিত আযাবের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

'অতএব, আমি সেই জনপদকে উল্টিয়ে ওপর-নিচ করে দিলাম।'[৬৭]

তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করেছিল। তাই শাস্তিস্বরূপ তাদের জনপদের ওপরকে নিচে, নিচকে ওপরে পরিণত করে দেওয়া হলো। অর্থাৎ অধঃমুখী করে দেওয়া হলো।

আমানত সোপর্দ করা

যেব্যক্তি কালেমা পড়ল, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে একটা চুক্তি করল। এই চুক্তির দ্বারা মানুষ ঈমানদার হয়ে যায়। স্মরণ রাখবেন, ঈমান একটি আমানত।

---

৬৬. সূরা নিসা : আয়াত ৩৪
৬৭. সূরা হিজর : আয়াত ৭৪

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'নিশ্চয়ই আমি এই আমানত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সামনে পেশ করেছিলাম।'[৬৮]

লক্ষ্য করুন। এখানে আল্লাহ তা'আলা 'আমানত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই আমানত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পর্বতমালার সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এই আমানত বহন করতে রাজি হয়নি। তারপর আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত স্বীয় কুদরতে এই যিম্মাদারি তাঁর বান্দাদের ওপর সোপর্দ করে দিলেন এবং মানবজাতি মাথা পেতে এই যিম্মাদারি নিয়ে নিল।

আমানতের ক্ষেত্রে চিরাচরিত একটি নিয়ম হলো, আমানত কারও প্রদত্ত বস্তু হয়ে থাকে এবং যথাস্থানে তা পৌঁছাতে হয়। কোনো ব্যক্তি যথাস্থানে আমানত না পৌঁছালে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

'অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহ আমানতের মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।'[৬৯]

এই ঈমান যখন কোনো মানুষের বক্ষে অবতীর্ণ হয়, তখন তা আমানত হয়ে যায়। এই আমানত সামনে পৌঁছানো জরুরি। কোথায় পৌঁছাতে হবে? আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এটি আল্লাহ তা'আলার প্রস্তুত করা একটি বিন্যাস। এই আমানত প্রথমে নবী-রাসূলগণ প্রাপ্ত হন এবং তাঁরা সকলেই তাদের জীবদ্দশায় নিজ-নিজ উম্মতের কাছে তা পৌঁছিয়ে যান। রহমতের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাঁর মাথায় খতমে নবুওয়তের মুকুট পরানো হয়। এর বরকতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নেয়ামত তাঁর ওয়ারিশদের দিয়ে গেছেন।

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

'ওলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিশ।'

---

৬৮. সূরা আহযাব : আয়াত ৭২

৬৯. সূরা নিসা : আয়াত ৫৮

অতএব, তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হয়ে এখন এই আমানত সমগ্র বিশ্বে বিস্তার ঘটাবে এবং অন্য যারা ওলামায়ে কেরাম থেকে ভাগ পাবে, তারাও নিজ-নিজ স্তর অনুযায়ী এই আমানত অন্যদের পৌঁছাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার সুবাদে এই যিম্মাদারি প্রত্যেক মুমিনকে সোপর্দ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে দাঈ তথা দীনের প্রতি আহ্বানকারী হওয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং যেসব ছাত্রী আজকে বোখারি শরীফের শেষ হাদীছ পড়ে ফেলেছে, তারা যেন এরূপ চিন্তা না করে যে, এখন আমরা পরীক্ষা শেষ করে অবসর হয়ে যাব এবং বাসাবাড়িতে গিয়ে আরাম করব। পার্থিব জীবন আরামের নয়। মনে রাখবে–

দুনিয়া কাজের জন্য,

কবর আরামের জন্য এবং

জান্নাত ভোগবিলাসিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

অতএব, দুনিয়াতে মুমিনের আরাম নেই। কাজ, কাজ, কাজ। শুধু সামান্য বিশ্রাম। এই বিশ্রামের পেছনেও উদ্দেশ্য থাকবে, আমি সতেজ ও উদ্যমী হয়ে আবার নবউদ্যমে কাজ শুরু করব। এজন্য মুমিনের বিশ্রামকেও আল্লাহ তা'আলা তার কাজের মধ্যে গণ্য করেন। তাই তো ইরশাদ হয়েছে–

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ

'আলেমদের নিদ্রা ইবাদাত।'

সুবহানাল্লাহ! যে-মুমিন ব্যক্তির নিদ্রা ইবাদাত হিসেবে গণ্য, তার জাগ্রত থাকা কত বড় ইবাদাত হবে

হাদীসের নামে জালিয়াতি ৩৩৮ পৃষ্ঠা

ওস্তাদকে হাদিয়া প্রদানের পদ্ধতি

স্বীকৃত নীতি হলো, দাতা গ্রহীতা থেকে শ্রেষ্ঠ হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

'ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।'

অর্থাৎ– দানকারী হাত গ্রহণকারী হাত অপেক্ষা উত্তম হয়। যেহেতু এই হাদীছে عُلْيَا তথা ওপরের এবং سُفْلٰى তথা নিচের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাই মাশায়েখগণ শিক্ষা দেন যে, আদবের দাবি হলো, কেউ যদি তার ওস্তাদকে

কোনো হাদিয়া প্রদান করে, তাহলে হাদিয়ার বস্তু নিজের উভয় হাতের ওপর রেখে ওস্তাদের সামনে পেশ করবে, যেন গ্রহণকারী হাত তার ওপর থেকে গ্রহণ করে।

একবার সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) কেঁদে-কেঁদে দু'আ করছিলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম হয়। এখন আমার কাছে কিছু সম্পদ আছে এবং আমি এই সম্পদ আপনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করতে চাচ্ছি। কিন্তু এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী যে, আমি দেব আর তিনি গ্রহণ করবেন। তাই আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে একথা উদয় করে দিন যে, তিনি যেন আবুবকরের সম্পদ নিজের সম্পদ মনে করে ব্যবহার করেন। আল্লাহু আকবার!

ছাত্রীদের পরিশ্রমের ক্ষেত্র

পৃথিবীতে মানুষের দুটি অবস্থান রয়েছে। হয়তো সে দাঈ তথা দীনের পথে আহ্বানকারী হবে, নয়তো মাদ'উ তথা আহূত হবে। এছাড়া তৃতীয় কোনো অবস্থান নেই। মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা দাঈ তথা আহ্বানকারী হয়ে জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাজেই যেসব ছাত্রী আজ ইল্‌ম অর্জন সমাপ্ত করবে, তাদের মাথায় অন্য একটি দায়িত্ব বর্তাবে। এখন তাকে সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমলও করতে হবে এবং নিজেদের পরিবারে দীনের দাওয়াত দানকারী হিসেবেও কাজ করতে হবে। তাদের পরিশ্রমের ক্ষেত্র হবে, তারা ঘরোয়া পরিবেশে অবস্থান করে ঘরের শিশু-কিশোর ও মহিলাদের, এমনিভাবে নিকটবর্তী মহল্লার যে সমস্ত মহিলার সাথে ওঠাবসা হয়, তাদের সকলকে এবং পরিবারের মাহরাম পুরুষদের দীনের প্রতি ধাবিত করবে। এর ফল হবে, প্রতিটি ঘর একটি করে দ্বীনি মাদরাসায় পরিণত হবে এবং প্রত্যেক মা সন্তানের মাতাও হবে এবং তাদের শিক্ষিকাও হয়ে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'

মোটকথা, শিক্ষা সমাপণকারিণী প্রত্যেক ছাত্রী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মিক কন্যা হয়ে সেই কাজ আঞ্জাম দেবে, যা

নবীজি নিজে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দ্বীনি ইল্‌ম ও আল্লাহর মারেফতের যে আমানত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি তা তাঁর উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي

'নিশ্চয়ই আমি কেবল বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দানকারী।'

চিন্তা করুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قَاسِمٌ (বণ্টনকারী) শব্দ ব্যবহার করেছেন। أَنَا قَاسِمٌ (নিশ্চয়ই আমি বণ্টনকারী) বলেছেন। বলেননি أَنَا خَازِنٌ (আমি ধনভান্ডারের মালিক)। সুতরাং আমরাও যখন এই নেয়ামত প্রাপ্ত হই, তখন আমাদেরও উচিৎ তা অন্যদের মাঝে বণ্টন করা। এটি সেই কল্যাণ, যা বণ্টন করলে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অথচ পৃথিবীর ধনসম্পদ বণ্টন করলে হ্রাস পায়। কাজেই ছাত্রীরা এখনই দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করা চাই যে, তারা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে যে নেয়ামত অর্জন করেছে, তা অন্যদের মাঝে বণ্টন করবে।

দাওয়াতের কাজ না করার ওপর অনুশোচনা

মুমিনের ব্যক্তিত্ব বা পদমর্যাদা একজন সৈনিকের মতো। কেননা, একজন সৈনিক যেমন নিজেও রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন-কানুন মেনে চলে এবং অন্যদেরও তা পালন করাতে সচেষ্ট হয়, ঠিক তদ্রূপ মুমিনও আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধের ওপর নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যদেরও সেসব বিধিনিষেধ পরিপালন করাতে সচেষ্ট হয়। আমরা যদি এই নেয়ামত বণ্টন কাজে নিয়োজিত থাকি, তাহলে আমরাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অগণিত নেয়ামত পেতে থাকব।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, এটা আমার রাস্তা, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি।'[৭০]

---

৭০. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০৮

আর যারা এই কাজ করবে না, কেয়ামত দিবসে তাদের কী অবস্থা হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا.

'আর যেদিন অনাচারী নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে-কামড়াতে বলবে, হায়, কতই-না উত্তম হতো যদি আমি রাসূলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতাম!'[৭১]

তারা বলবে, হায়! কতই-না ভালো হতো যদি আমরা রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনধারা মেনে চলতাম। অর্থাৎ– তাদের এর ওপর অনুশোচনা হবে।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ খোলামেলা এবং এর পদ্ধতি নির্ধারণ আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ– নির্দেশ সুস্পষ্ট এবং ওলামায়ে কেরাম নববী শিক্ষাকে সামনে রেখে সময়োচিত পদ্ধতি নির্ণয় করতে থাকবেন।

কোথাও মাদরাসাগুলোতে শিক্ষা-দীক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

কোথাও কুরআনের দরসের পদ্ধতিতে।

কোথাও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের আদলে।

কোথাও খানকাসমূহে আল্লাহ-আল্লাহর পদ্ধতিতে।

এগুলো সবই দাওয়াতের পদ্ধতি। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। এ-ধরনের ব্যক্তি হয়তো নির্বোধ অথবা মূর্খ। মহান প্রভুর হুকুম হলো দাওয়াতদাতা হওয়া। কিন্তু এর সাথে পদ্ধতিগত যতটুকু সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাতে ব্যাপকতা আছে। এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও অবস্থা রয়েছে। যদি কেউ মনে করে, বর্তমানে 'তাবলীগ জামাত' নামে দাওয়াত ও তাবলীগের যে পদ্ধতি বিরাজমান কেবল এটাই দাওয়াত, তাহলে কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কার সকল মানুষ দাওয়াতের কাজ করা ছাড়া দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন? এভাবে একটা পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া মস্ত ভুল। অবশ্য এমনটি বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগে তাবলীগ জামাতের আদলে

---

৭১. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৭

দাওয়াত প্রদান দাওয়াতের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। এটি বাস্তবসম্মত কথা, যা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই।

যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগের বিভিন্ন পদ্ধতি ও রূপ রয়েছে, কাজেই বলা যেতে পারে, মাদরাসায় বসে হাদীছের দরসদানকারী ওস্তাদও দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং মসজিদে সকাল-সন্ধ্যা দ্বীনি শিক্ষাদানকারী ওলামায়ে কেরামও দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। তবে স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর দিকে দাওয়াতের এই কাজ প্রত্যেককে নিজ-নিজ অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী করা জরুরি। বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম যাঁরা আছেন, তাদের মধ্যে একটি দল পরিপূর্ণ দাঈ তথা দাওয়াত দানকারী হয়ে কাজ করবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ○

'এবং তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত তারাই সফলকাম।'[৭২]

একদল ওলামায়ে কেরাম তো এই ফরজে কিফায়ার কাজ পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে থাকবে। আর অন্য সকলেই নিজ-নিজ অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী তা করবে। মনে করবেন না, এটি শুধু ওলামায়ে কেরামের ওপর ফরজ। দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া কেবল আলেমদের কাজ নয়। বরং কালেমাপড়ুয়া প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ এটি। যে যেখানে চাকরি করে, যেখানে কাজ করে, যেখানে বসবাস করে, সেখানেই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চারপাশের লোকদের ধাবিত করবে এবং সত্য ও সঠিক জীবন যাপন করতে উৎসাহ জোগাবে।

তাবলীগের সর্বোত্তম পদ্ধতি

দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি হলো আপাদমস্তক দাওয়াত হয়ে যাওয়া এবং নিজের কথা-কাজ দুটি দ্বারাই লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। বরং আমলের মাধ্যমে দীনের দিকে আহ্বান করা কথার মাধ্যমে আহ্বান করার চেয়ে বেশি ফযীলতময়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

---

৭২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪

আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রাথমিক অবস্থায় নিজের আমল দ্বারা মানুষকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। সায়্যিদাহ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন–

فُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْاَخْلَاقِ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মদীনাবাসীদের অন্তর জয় করেছেন।'

স্মরণ রাখবেন, দুনিয়া তরবারির মোকাবেলা করতে পারে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মোকাবেলা করতে পারে না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দৃশ্যত একটা মূল্যহীন বস্তুর মতো মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর কসম! এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষ সর্বাধিক মূল্যবান বস্তুও ক্রয় করে নেয়।

تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن

وہ کام جو انسان کا کردار کرتے ہے

'না বয়ান-বিবৃতি দ্বারা সম্ভব, না সম্ভব লেখনি দ্বারা
সেই কাজ যা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য করে।'

চারিত্রিক গুণের বরকত বয়ান-বিবৃতি এবং লেখনি দুটি থেকেই অধিক হয়ে যায়।

قول میں رنگِ عمل بھر کے بنادے رنگیں

لبِ خاموش عطا کر دل گویا کر دے

'কথার মধ্যে আমলের রং মিশিয়ে রঙিন করে নাও
জবান বন্ধ রেখে অন্তরকে বাকসম্পন্ন করে নাও।'

এমন লোকদের জবান কথা না বললেও তাদের আমল ও চরিত্র কথা বলে এবং মানুষের অন্তর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এজন্যই হযরত নদভী (রহ.) লিখেছেন, চীনে আটজন মুসলমান ব্যবসায়ী গিয়েছিলেন। তারা সেখানে ব্যবসা করেন। তাদের ব্যবসার সৌন্দর্য দেখে দেশের সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা বয়ানও করেননি, বিবৃতিও দেননি। তারা সেখানে গিয়ে কেবল ব্যবসা করেছেন। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, দ্বীনে ইসলামের প্রতিটি আমলের মধ্যে এরূপ সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ রয়েছে, যা কাফেরদে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য চুম্বকের মতো আকর্ষণ রাখে।

দাওয়াত ও তাবলীগে অভ্যন্তরীণ নূরের গুরুত্ব

যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অভ্যন্তরীণ নূর দান করেন, তাহলে তার জন্য দীনের কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ

'আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি অন্তর্দৃষ্টির সাথে।'[৭৩]

এজন্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দাওয়াতের কাজ করলে তার ফয়েজ ও বরকত অনেক বেশি হয়। আরবি ভাষায় অন্তর্দৃষ্টিকেই দ্বীনি বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া বলা হয়।

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

'আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।'

অন্য একস্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

'আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।'[৭৪]

এটি এমন একটি নূর, যা আল্লাহ তা'আলা ইখলাস ও সুন্নাতের অনুকরণের বদৌলতে মুমিন বান্দাকে দান করেন। মানুষ যখন অন্তর্দৃষ্টির এই নূর নিয়ে পথ চলে, তখন এর ফয়েজ অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ কারণেই আমাদের আকাবিরগণের এক-একটি সফরে হাজার-হাজার কাফের কুফর ছেড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যেত।

কুরআন মাজীদের আলোকে মুবাল্লিগের কতিপয় গুণ

কুরআন মাজীদ থেকে মুবাল্লিগের এমন কিছু গুণের সন্ধান পাওয়া যায়, যেসব গুণে মানুষ গুণান্বিত হলে আল্লাহ তা'আলা তার কাজের মধ্যে অনেক বরকত দান করেন। ছাত্রীরা গুণগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো, এগুলো

---

৭৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১০৮

৭৪. সূরা আন'আম : আয়াত ১৪৫

নিজেদের মধ্যে ধারণ করো। তারপর দেখবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কথায় কেমন প্রভাব সৃষ্টি করে দেন।

১. অন্তকরণে আল্লাহকে মহব্বত করা : সর্বপ্রথম বিষয় হলো, আমল ও ইবাদাতের মাধ্যমে নিজেদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দ্বারা এমনভাবে ভরপুর করে নেওয়া, যেন সেই মাকাম অর্জন হয়ে যায়, যার বর্ণনা কুরআন কারীমে করা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'এবং যারা ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা তীব্র হয়।'[৭৫]

এই তীব্র ভালোবাসা মূলত সুদৃঢ় ঈমান। যখন অন্তরে আল্লাহর প্রতি এ পর্যায়ের ভালোবাসা থাকবে, তখন এই ভালোবাসা নিয়ে যেব্যক্তি কথা বলবে, তখন তা অন্যদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে।

از دل خیزد بر دل ریزد

'যে কথা অন্তর থেকে নির্গত হয়, তা অন্যের অন্তরে স্থান করে নেয়।'

এ কারণেই সাধারণ কোনো ব্যক্তি অপরকে কোনো আমল করতে বললে তার আমল করার তাওফীক হয় না। পক্ষান্তরে সৎকর্মপরায়ণশীল খাঁটি আল্লাহওয়ালা কোনো ব্যক্তি একই আমলের কথা তাকে বললে সে আমল শুরু করে দেয়। কেননা, বক্তার পবিত্রতার কারণে তার কথায় একটা বরকত থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা আমলের তাওফীক দিয়ে দেন। এই হেদায়াত তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আমরা যখন এই ফরজ আদায় করব, তখন আমরা বিনিময়ের হকদার হয়ে যাব। ফলাফল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ওপর সোপর্দ করে দেব। তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছে করবেন, আকৃষ্ট করবেন।

২. দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া দাওয়াত দেওয়া : আমাদের জন্য জরুরি হলো, দীনের যেকোনো কথা বলব, তা যেন দুনিয়াবি কোনো চাওয়া-পাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া হয়। এটি মুবাল্লিগের জন্য বড় মহৎ একটি বৈশিষ্ট্য। তার অন্তরে কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকবে না। তাই তো নবীগণ নিজ-নিজ উম্মতদের বলেছেন–

---

৭৫. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

يٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

'হে আমার সম্প্রদায়! এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না।'[৭৬]

অর্থাৎ– তাঁরা বোঝাতে চাইতেন, আমি তোমাদের কিছু দিতে এসেছি, তোমাদের থেকে নিতে আসিনি। যখন এমন নিঃস্বার্থ হয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন এর মধ্যে আরও অধিক বরকত হয়।

৩. ব্যক্তি নির্দিষ্ট করা ছাড়া দওয়াত দেওয়া : দাওয়াতের সময় সকলকে দাওয়া দিতে হবে। এমন যেন না হয় যে, শুধু শিক্ষিত লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। দাওয়াত শিক্ষিত লোকদেরও দেবে, অশিক্ষিতদেরও দেবে; ছোটদেরও দেবে, বড়দেরও দেবে; ধনীদেরও দেবে, গরিব-মিসকিনদেরও দেবে। অনেকবার দেখা গেছে, কোনো মেয়ে কম শিক্ষিতা হলে ছাত্রী ও শিক্ষিকা কেউই তার প্রতি বেশি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং চিন্তা করে, এ তো অশিক্ষিত ধরনের মেয়ে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এই স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মেয়েরও তো ঈমান এবং আমলের প্রয়োজন আছে। যার মধ্যে যেমন আগ্রহ ও আবেদন দেখবে, তার ওপর তেমন মেহনত করবে। এক অন্ধ সাহাবী অন্তরে আগ্রহ নিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এলে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার প্রতি কিছুটা উদাসীনতা প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ হয়ে তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবীকে বন্ধুসুলভ ভঙ্গিতে বলে দিলেন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ○ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ○

'তিনি মুখ মলিন করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে বসলেন এজন্য যে, তাঁর কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসেছিল।'[৭৭]

বোঝা গেল, যখন কেউ প্রার্থনা নিয়ে আসে, তখন প্রয়োজন তাকে সবসময় হ্যাঁসূচক উত্তর দেওয়া, যতটুকু সম্ভব তার সামনে নিজেকে বিনয়ী হিসেবে প্রকাশ করা, নিজের আরাম ত্যাগ করা এবং যথাসম্ভব প্রার্থনার জবাব সবসময় হ্যাঁসূচক দেওয়ার চেষ্টা করা।

---

৭৬. সূরা হূদ : আয়াত ৫১

৭৭. সূরা আবাসা : আয়াত ২১

৪. অন্তরে অনুকম্পা ও উদারতা থাকা : মুবাল্লিগের অন্তর সর্বদা অনুকম্পা ও উদারতায় পরিপূর্ণ থাকা চাই। কেননা, এটি দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ। রাগান্বিত হওয়া, অন্যদের ব্যাপারে নিজের মধ্যে ঘৃণা জন্ম দেওয়া, তুচ্ছ কথায় চড়াও হওয়া কিংবা একবার বলেই বিরত থাকা এবং বলা, আমি তাকে বলেছিলাম; কিন্তু সে তো শোনেই না; এগুলো মুবাল্লিগের কাজ নয়। আল্লামা শিবলি (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবুজাহলকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিন হাজারবার তার ঘরে যান। এ থেকে প্রমাণিত হয়, স্বভাবে অন্যদের কল্যাণকামিতা থাকতে হবে। তাই তো নবীজি বলেছেন–

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

'আমি তো আমার সাধ্যমতো তোমাদের সংশোধনই কামনা করছি।'[৭৮]

আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে আগমন করে দাওয়াতের যে কাজ করেছেন, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 'সংশোধন'ই ছিল। তবে এই গুণ মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে, যখন সে আল্লাহমুখী হয়। যখন মানুষ ইবাদাতে, আল্লাহর যিকিরে এবং ফিকিরে খুব মন লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করে, তখন তিনি এই গুণাবলি তাকে প্রদান করেন।

৫. তাহাজ্জুদে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করা : নবীদের শানে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা রাতের শেষ প্রহরে নিদ্রা থেকে উঠে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করতেন। ইরশাদ হয়েছে–

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

'তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমাত এবং সাহরির সময় এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করত।'[৭৯]

অন্য একস্থানে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

'নিশ্চয়ই তাঁরা সৎকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আল্লাহকে ডাকত ভয় ও আশা নিয়ে এবং তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনয়ী।'[৮০]

---

৭৮. সূরা হূদ : আয়াত ৮৮
৭৯. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭, ১৮
৮০. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯০

মোটকথা, মুবাল্লিগের অন্তরে বিনয়ও থাকবে, ভয়ও থাকবে, আশাও থাকবে এবং তারা রাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনাও করবে। যখন তারা এভাবে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ উম্মতের ব্যাপারে চিন্তিত থাকতেন। এমনিভাবে মুবাল্লিগেরও উচিৎ এ-ব্যাপারে চিন্তিত থাকা এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করা। তারা মুখের ভাষায় দাওয়াত দেবে, পাশাপাশি নামায পড়ে, তাহাজ্জুদ পড়ে এবং যিকির ও মুরাকাবা করে আল্লাহ তা'আলার সামনে কান্নাকাটি করে দু'আ করবে। আর সবার জন্য রাতের বেলা দু'আ করা জরুরি। শিক্ষক, মুবাল্লিগ, নর-নারী প্রত্যেকের জন্য রাতে জেগে দু'আ করা একটি বড় নেয়ামত।

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سحر گاہی

'আত্তার হোন, রুমি হোন, রাযি হোন, গাযযালি হোন

কিছুই তাতে আসে না রাতের শেষ প্রহরে ক্রন্দন ছাড়া।'

আল্লাহওয়ালাদের এটি-ই অভ্যাস যে, তারা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর কাছে কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করেন এবং দিনের বেলায় আল্লাহর সৃষ্টজীবের ওপর মেহনত করেন, যার বদৌলতে তারা আমল করার তাওফীক প্রাপ্ত হন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনজন বিশেষ শাগরেদ ছিলেন। এই তিনজনেরই নাম ছিল আবদুল্লাহ। তাঁরা সকলেই আল্লাহর এমন বান্দা (গোলাম) ছিলেন যে, প্রত্যেকে খেদমতের ক্ষেত্রে অপর থেকে অগ্রগণ্য হওয়ার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় বন্ধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রতি এত খুশী ছিলেন যে, তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর কখনও-কখনও তাদের জন্য তাঁদের নাম নিয়ে দু'আ করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর ফল এই হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তিনজনকে তাঁদের নিজ-নিজ বিষয়ের ইমাম বানিয়ে দিলেন। তাই তো–

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) মুফাসসিরগণের ইমাম হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মুহাদ্দিছগণের ইমাম হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ফকীহগণের ইমাম হলেন।

শিক্ষিকাগণ নিজেদের অন্তরের দিকে খেয়াল করে দেখুন, আপনারা ছাত্রীদের পড়ান এবং তিরস্কার-ভর্ৎসনাও করেন। রাতে কি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করেন? কখনও কি তাদের জন্য আল্লাহর সামনে কেঁদে-কেঁদে অশ্রু ঝরিয়েছেন। যদি অন্তরে চিন্তা থাকত, তাহলে এমনি-এমনি রাতে হাত উঠত এবং অশ্রু ঝরত।

৬. আল্লাহর যিকির করতে থাকা : যিকির করা আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজের জন্য জরুরি। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ.) কে নবুওয়ত দান করলেন, তখন ইরশাদ করলেন–

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ

'তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে যাও এবং তোমরা উভয়ে আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।'[৮১]

আল্লাহ তা'আলা দ্বি-বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবার দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাশকীল করেছেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

'(হে মূসা!) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'[৮২]

তারপর নির্দেশনা দিয়ে মূসা (আ.)কে বলেছেন–

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ

'তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে যাও এবং তোমরা উভয়ে আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।'[৮৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের নবুওয়তি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদানের সাথে-সাথে তাঁর যিকিরের বেলায় শৈথিল্য প্রদর্শন না করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। চিন্তা করুন, নবুওয়তের চেয়ে বেশি যিকিরের কী গুরুত্ব থাকতে পারে? যিকির এই কাজে সহায়ক। এজন্য ইল্‌ম ও যিকির দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, যিকির ব্যতীত মানুষের অন্তর শূন্য থাকে।

---

৮১. সূরা তাহা : আয়াত ৪২

৮২. সূরা তাহা : আয়াত ২৪

৮৩. সূরা তাহা : আয়াত ৪২

আল্লাহ তা'আলার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّه وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ رَبَّه كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

'যে তার প্রভুর যিকির করে আর যে যিকির করে না, এই দুজনের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের মতো।'

একটা বস্তু আছে নলখাগড়া। আরেকটা বস্তু আছে আখ। নলখাগড়া দিয়ে শিশুরা কলম তৈরি করে। মোটা নলখাগড়া এবং চিকন আখ দুটি আকৃতিতে একই রকম দেখায়। কিন্তু দুটির মূল ভিন্ন। নলখাগড়া ভেতরে থেকে শুকনা পানসে এবং অস্বাদু হয়। অপরদিকে আখ চুষলে ভেতরে থেকে তারল্য আসে এবং মিষ্টতা বের হয় এবং সুস্বাদুও হয়। এমনিভাবে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা ভেতরে থেকে শুকনো হয়ে যায়। যিকিরের সাথে তাদের কোনো স্পর্শ হয় না। এজন্য তাদের ভাষায় মিষ্টতা বলতে থাকে না।

৭. অন্তর জ্বালা-যন্ত্রণায় পূর্ণ ব্যাকুল থাকা : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় উম্মতের জন্য এত চিন্তিত হতেন যে, তাঁর অন্তর জ্বালা-যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে যেত। আমাদের এ-ধরনের চিন্তা-ফিকির নিয়ে অন্যদের দাওয়াত দেওয়া চাই। আমার একজন আলেম বন্ধু আছেন। তাঁর সাথে এবার ওমরা করার সময় সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাঁর মেয়ের ঘটনা শোনালেন। তিনি বলেন, একবার আমার মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, জান্নাতে কারা যাবে? আমি উত্তর দিলাম, মুমিনগণ জান্নাতে যাবেন। সে জিজ্ঞাসা করল, কাফেররা কি জান্নাতে যাবে না? আমি উত্তর দিলাম, তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, হাজার বছর পরও কি তারা জান্নাতে যাবে না? আমি বললাম, যাবে না। এবার সে বলল, আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু, কখনও না কখনও তো তিনি তাদেরও জান্নাতে পাঠাবেন। আমি বললাম, পাঠাবেন না। সে হয়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আব্বু! তারা কেন জান্নাতে যাবে না? আমি বললাম, আল্লাম তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِه

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে (মোশরেকদের) ক্ষমা করবেন না।'[৮৪]

---

৮৪. সূরা নিসা : আয়াত ৪৮

তারপর সে প্রশ্ন করল, তারা কি অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবে? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। এটি এত বড় গুনাহ যে, এ কারণে তারা অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলবে।

মেয়ে একথা শুনে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু আমি দেখলাম, কিছুক্ষণ পর সে হাতে টিস্যু নিল। তারপর তার দিকে তাকালে দেখতে পেলাম, সে অশ্রু মুছছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মা! কেন কাঁদছ? সে কেঁদে-কেঁদে উত্তর দিল, কাফের ও মোশরেক লোকদের সংখ্যা তো অনেক বেশি। তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে। আমি চিন্তা করছিলাম, এরূপ হতে পারে কি-না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে একা জাহান্নামে দেবেন আর তাদের সবাইকে মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহু আকবার! এই ছোট মেয়েটির চিন্তাভাবনা দেখুন। আমার বন্ধু বলেন, এদিন আমার সেই আয়াতটি মনে পড়ে গেল, যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বলেন–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ

'হয়তোবা আপনি এই মর্মবেদনায় যে, এসব মানুষ ঈমান আনয়ন করছে না নিজে নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন।'[৮৫]

৮. অন্তরে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) সৃষ্টি করা : দাওয়াতের এই কাজে ইখলাস খুবই জরুরি। স্মরণ রাখবেন, দীনের কাজ ইখলাস ছাড়া সামনে অগ্রসর হয় না। আপনারা কি দেখতে পান না, দুনিয়াতে কত মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পর বিল্ডিংয়ের ইট খসে-খসে পড়ে যায় এবং সেখানে যাতায়াতকারী কেউই থাকে না। আবার কিছুসংখ্যক মাদরাসাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে কবুল করে নেন যে, শত-শত বছর পর্যন্ত তিনি এই মাদরাসাগুলোর ইল্‌মি ফয়েজ ছড়াতে থাকেন এবং হাজারো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

মানুষ কীভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমি দীনের কাজ ইখলাসের সাথে করছি কিনা? এই বিষয়টি আমি আমার বড়দের থেকে শুনেছি এবং একে আমি হীরা মনে করি। আমি হীরা ও মোতিসমতুল্য কথা আজ এসব ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করছি। তারা একে আমার পক্ষ থেকে উক্ত মাহফিলের হাদিয়া মনে করবে।

---

৮৫. সূরা শু'আরা : আয়াত ৩

আমাদের আকাবিরীনে কেরাম বলেছেন, দীনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে ইখলাস আছে কি-না এভাবে যাঁচাই করবে যে, যখন দীনের কাজ করা অবস্থায় অন্য যারা দীনের কাজ করেন, তাদের সাথে সদাচরণ করার স্পৃহা অন্তরে থাকবে এবং তাদের প্রতি অন্তরে সহমর্মিতা থাকবে, তারা আমাকে ইহসান বা অনুগ্রহ করছে এই মনোভাব থাকবে, তখন মনে করবে ইখলাসের সাথে কাজ করছি। তারা যে পদ্ধতিতেই দীনের কাজ করছেন, যদি তাদের ব্যাপারে অন্তরে এ-ধরনের অনুভূতি থাকে যে, যেন তারা আমার প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহ করছেন, তাহলে এটি-ই ইখলাস। হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, যদি রাস্তার এক পার্শ্বে একটি মসজিদ থাকাবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তি রাস্তার অপর পার্শ্বে সরাসরি এই মসজিদের সামনে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে ফেলে এবং পূর্বের মসজিদের আলেম মনে-মনে আনন্দিত হন যে, আলহামদু লিল্লাহ! পূর্বে আমি একা দীনের কাজ করছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা আরও এক ব্যক্তিকে কর্মী বানিয়ে দিয়েছেন, তাহলে এই আনন্দিত হওয়ায় তিনি মুখলিস তথা একনিষ্ঠ গণ্য হবেন। আর যদি অন্তরে সংকোচ থাকে, তাহলে এর মর্ম দাঁড়াবে, এখনও তার মধ্যে ইখলাস আসেনি।

যদি কেউ এরূপ মনে করে যে, দীনের কর্মীগণ যদি আমার পদ্ধতিতে কাজ করে, তাহলেই কেবল দীনের কর্মী, তাহলে এর ব্যাখ্যা দাঁড়াবে, এখনও তার মধ্যে ইখলাস আসেনি। দেখুন–

মাদরাসাগুলোও একটি পদ্ধতি।

দাওয়াত-তাবলীগও একটি পদ্ধতি এবং

খানকাহসমূহও একটি পদ্ধতি।

তারা সকলেই গোনাহে লিপ্ত মানুষদের তাদের প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করছে এবং মানুষের জীবন পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, যেব্যক্তি কোনো এক পদ্ধতিতে দীনের কাজ করছে, যদি সে নিজের কাজও করতে থাকে এবং অন্য কর্মীদের ব্যাপারে অন্তরে ইহসান করার অনুভূতি থাকে, তাহলে কি সে তাদের জন্য দু'আ করবে না? অবশ্যই করবে। সুতরাং ইখলাসের পরিচায়ক হলো, সে নিজেও দীনের কাজ করে এবং অন্য যারা অন্যান্য শাখা ও পদ্ধতিতে দীনের কাজ করছে, তাদেরও জন্য দু'আ করে।

ছাত্রীদের কাজ করার দুটি পদ্ধতি

পড়ালেখা সমাপণকারিণী ছাত্রীরা দীনের কাজ করার জন্য যদিও নিজেরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়, তবুও কোনো-না-কোনো পদ্ধতিতে তারা দীনের কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে। এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা–

১. একটি পদ্ধতি তো হচ্ছে, নিজ-নিজ বাসাবাড়িতে থেকে পরিবারের সন্তান ও মহিলাদের, আত্মীয় ও প্রতিবেশী মহিলাদের দীনের দিকে ধাবিত করবে। এর সর্বোত্তম রূপরেখা হলো, সর্বপ্রথম তাজবীদের সাথে শুদ্ধ করে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া শুরু করবে। এমনটি চিন্তা করবে না যে, আমি একজন আলেমা; কীভাবে আমি কুরআন শরীফ নাজেরা পড়াব। প্রথমে তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়ার দিকে আকৃষ্ট করবে। কিছুদিন পর দেখবে, কুরআন মাজীদের আকর্ষণ যুবতি মেয়ে এবং বয়স্কা মহিলাদের আপনাদের প্রতি টেনে আনবে। তারা কুরআন মাজীদ শিক্ষা করার জন্য আপনাদের কাছে আসতে শুরু করবে। তারা তাজবীদের নিয়মকানুন অনুযায়ী শুদ্ধভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত আয়ত্ত করে নেওয়ার পর কুরআনে কারীমের অনুবাদ পড়ানো শুরু করে দেবে। তাদের বলবে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী। আমরা এতদিন যাবত পড়ছি; কিন্তু এর অর্থ সম্পর্ক আমাদের কোনো খবরই নেই। কেন আমরা এর অর্থও বুঝব না? মহিলারা দীন থেকে যতই দূরে থাক না কেন, তারা কুরআনের অনুবাদ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে অবশ্যই আপনাদের কাছে আসবে। এমনকি বেনামাযী মহিলাও বলবে, হ্যাঁ, আমি কুরআনে কারীমের অনুবাদ পড়তে আগ্রহী।

কুরআন মাজীদের অনুবাদ পড়ার নামে যখন তারা আপনাদের কাছে আসা শুরু করবে, তখন তাদের মধ্যে যেসব তরুণী যোগ্যতা রাখে এবং সময়ও বের করতে পারবে এবং তাদের পিতামাতাও তাদের অনুমতি দেবে, তাদেরকে আপনারা সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাশকীল করবেন। তাদেরকে মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত করে দেবেন। মহিলা মাদরাসা তো মাশাআল্লাহ প্রায় প্রত্যেক বড়-বড় মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, কাছাকাছি কোনো মাদরাসা না পেলে নিজেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাদের পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করে নেবেন। প্রথমে ইট দ্বারাই ঘর নির্মাণ শুরু হয়। আমরা দেখেছি, একজন শিক্ষিকা একটা বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়ে যায়।

আপনি যদি ঘরোয়া পরিবেশে কুরআনে কারীমের অনুবাদ পড়ানোর নামে কাজ শুরু না করেন, তাহলে কোনো মাদরাসায় শিক্ষিকা হিসেবে কাজ

করুন। কোনো-না-কোনো পদ্ধতিতে নিজেকে অবশ্যই সম্পৃক্ত করেন। এই চিন্তা করা বৃথা যে, কেউ আমাদের প্রস্তাব দিলে আমরা পড়াব। এটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং নিজেকে কোনো-না-কোনো কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করি। আমরা দেখেছি, যে ছাত্রী কিছু না কিছু চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেষ্টার মধ্যে বরকত ঢেলে দেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঘরেও মাদরাসা বানিয়ে দেন এবং মাদরাসাতেও রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

৯. প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা : এই কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে পারেন। উদাহরণত, আপনি যদি বিবাহিতা হন এবং ইখলাসের সাথে দীনের কাজ করতে থাকেন, তাহলে হতে পারে, শাশুড়ি আপনার সম্পর্কে ব্যতিক্রম কোনো উক্তি করে বসল। বলে বসল, সে বড় হতে ঘুরে ফিরছে অথবা তার বড় হওয়ার লালসা রয়েছে। এ পর্যায়ে শাশুড়ির এ-ধরনের ছোট উক্তি যেন আপনার মনোবল ভেঙে না দেয়। এ-সময় আপনি চিন্তা করবেন, দাওয়াতি কাজ যারা করেন, তাদের সামনে এ-জাতীয় প্রতিকূল অবস্থা আসতেই থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কত প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে হয়েছে। পূর্ব যুগে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। বর্তমান যুগে উক্তির পাথর নিক্ষেপ করা হয়। শাশুড়ি যখন বলে, সে বড় হতে লালায়িতা, তখন মনে করবেন, তিনি পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পূর্ণ হলো। এ কারণে অন্তর সংকীর্ণ করা যাবে না। কেননা, এসব না হলে উন্নতি হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় ছোট-বড় কষ্টকর অনেক ঘটনা-ই ঘটে। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা এই মক্কি অবস্থার পর মাদানি অবস্থার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ব্যবস্থাপনা সেই একই, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় হয়েছিল।

হতে পারে, কখনও স্বামী নিজেই বিদ্রূপ করবে অথবা হতে পারে আপনি কাজ করছেন, তো পিতামাতা এরূপ কথা বলে বসল কিংবা কখনও ভাই কোনো ব্যঙ্গ করল। এসব ছোট-ছোট কথায় নিশ্চুপ হয়ে বসে যাওয়া এবং কাজ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের তো কাজ ইখলাসের সাথে মানুষকে উপকৃত করা। এর মধ্যে যদি কখনও নিজেকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাহেল তা আল্লাহর জন্য সহ্য করবেন। কেননা, মুমিন ব্যক্তির একটি নিদর্শন এ-ও যে–

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

'তারা ভয় করে না নিন্দুকের নিন্দাকে।'[৮৬]

আবুল হাসান নূরি (রহ.)-এর ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তিনি মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আল্লাহর নামে আমাকে দাও'। লোকজন দিতে শুরু করল। যখন তার একজন অনুসারী দেখল, এত বড় শাইখ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছেন, তখন সে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হলো। লোকটি জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, এত বড় শাইখ; তিনি কিনা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছেন। জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বললেন, আচ্ছা; তুমি যাও; আমার পক্ষ থেকে তাঁকে এই টাকাগুলো দাও। লোকটি গিয়ে তাঁকে টাকাগুলো দিল। তারপর প্রস্থান করে জুনায়েদ বাগদাদিকে (রহ.) বলল, তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন, এবার তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, হযরত! আপনি এই অর্থ কেন নিচ্ছেন? লোকটি তাঁর কাছে আবার গেল।

আবুল হাসান নূরি (রহ.) যখন সব শেষে সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেন লোকদের থেকে অর্থ নিচ্ছিলেন? হযরত বললেন, আজকে আমার অন্তরে ইলহাম হলো, তুমি আমার নামের ওপর লোকদের কাছে অর্থ চাও এবং যা তুমি পাবে, তা গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দাও। আজকে যারা তোমার সাথে ভালো আচরণ করবে, আমি প্রভু সেই দাতাদের কয়েকগুণ বেশি দান করব। যখন আমাকে এই ইলহাম করা হলো, তখন তাতে আমি নিজের অসম্মান বোধ করিনি। বরং আমার ভাইদের উপকারের স্বার্থে জামে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়া শুরু করে দিলাম।

তো ভাই! যেমনিভাবে কারও কাছে হাত না পাতা শ্রেয়, তেমনিভাবে কখনও আল্লাহর জন্য হাত পাতাও ফযীলতের কাজ। এর দ্বারাও আত্মগরিমা দূর হয়। কাজেই এ-জাতীয় পরিস্থিতির কারণে মানুষের বিচলিত না হওয়া চাই। এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন।

১০. দাওয়াতের কাজ করতে পারার ওপর শোকর আদায় করা : আমরা যদি সরকারি কাজ না করি, তাহলে সরকার অন্য কারও দ্বারা কাজ নেবেন।

---

৮৬. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'এবং তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য এমন লোকদের নিয়ে আসবেন, যারা তোমাদের মতো হবে না।'[৮৭]

আমরা আল্লাহর ওপর খোঁটা না দেই যে, আমরা দাওয়াতের কাজ করছি, মাদরাসায় পড়াচ্ছি এবং কুরআনের দরস দিচ্ছি।

منت منے کہ خدمتِ سلطان می کنی

منت از و شناس کہ در خدمتِ سلطان گزاشتن

'তুমি বাদশাহের ওপর খোঁটা দিও না যে, তুমি বাদশাহর খেদমত করছ। বরং (বাদশাহর খেদমতকারী তো লাখো আছে) তোমার ওপর বাদশাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে তার খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন।'

যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের কাজের জন্য মনোনীত করেন, তাহলে তাঁর সামনে শোকরানা সেজদা আদায় করা চাই এই বলে যে, হে মনিব! আপনার শোকর, আপনি যে আমাকে আপনার দীনের কাজের জন্য কবুল করেছেন। মোটকথা, আপনারা আপনাদের অর্জিত ইল্মকে অলংকারের আদলে নিজেদের ওপর সাজান এবং তা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর নিয়তও করে নিন এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।'[৮৮]

তোমরা সেই উম্মত, উপাধি যাদের 'খাইরুল উমাম' (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত)।

আজও যদি আমরা কামনা করি, দীনের কাজ সামনে অগ্রসর হোক এবং মুসলমানদের হারানো সেই শান-শওকত অর্জিত হোক, তাহলে আমাদের প্রত্যেককে নিজ-নিজ যোগ্যতা ও অবস্থান অনুযায়ী দীনের দাওয়াতি কাজ করতে হবে।

---

৮৭. সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৩৮

৮৮. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১১০

মুবাল্লিগের কাজে আল্লাহ্ তা'আলার পৃষ্ঠপোষকতা

এখন সর্বশেষ একটি কথা মনোযোগের সাথে শুনুন! যখন আপনারা দীনের কাজ করবেন, তখন আপনাদের কাজের সকল প্রতিবন্ধকতা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দেবেন। আপনারা উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এটা কীভাবে হবে? ওটা কীভাবে হবে? যেহেতু কাজই মহান প্রভুর, তাই আমরা সকল উপকরণ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে মহান প্রভুর প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে দীনের কাজ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব। মহান প্রভু নিজেই সকল উপকরণের ব্যবস্থা করে যাবেন। কেননা, মুবাল্লিগ যখন ইখলাসের সাথে কাজ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণরূপে তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ছাত্রীদের জন্য শিক্ষণীয় একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। খেয়াল করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন, তখন তাঁকে বললেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও; সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'[৮৯]

তখন হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে স্বভাবজাত এক ধরনের ভীতি সঞ্চার হলো। যে, আমি ফেরাউনের কাছে যাব? তার রয়েছে মজবুত প্রশাসন, শক্তিশালী বাহিনী, বিশাল সাম্রাজ্য এবং অনেক বড় সম্প্রদায়। সবকিছুই তার সঙ্গ দেবে। অপর দিকে আমরা শুধু দুজন মানুষ তার কাছে যাচ্ছি। এ-সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)কে আশ্বস্ত করতে গিয়ে তাঁদের সম্বোধন করে বললেন–

لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

'তোমরা ভয় করো না। অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনছি ও অবলোকন করছি।'[৯০]

অর্থাৎ– ফেরাউন তোমাদের যা-যা বলবে, আমি সবই শুনব এবং তোমাদের সাথে যা আচরণ করবে, আমি তা দেখব। যখন আমি সর্বপ্রত্যক্ষকারী এবং সর্বশ্রোতা প্রভু তোমাদের সাথে আছি, তখন তোমাদের ঘবড়ানোর দরকার কী।

---

৮৯. সূরা তাহা : আয়াত ৪৩

৯০. সূরা তাহা : আয়াত ৪৬

এমনিভাবে দীনের দাওয়াতি কাজে জড়িত ব্যক্তি যখন আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পদক্ষেপ নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সহযোগী হয়ে যান, তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান, তার প্রকৃত সাহায্যকারী হয়ে যান। এমনকি দীনের কাজে যেকোনো বস্তুর জরুরত দেখা দেয়, আল্লাহ তা'আলা মুবাল্লিগকে তা ব্যবস্থা করে দেন। কুরআনে কারীম থেকে এর প্রমাণ মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে বললেন, ফেরাউনের কাছে যাও, তখন হযরত মূসা (আ.) ভাবলেন, আমার তো বাকজড়তা আছে এবং আমি তত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে পারি না। তাই তিনি এ-সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন–

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○

'তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন, আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, এবং আমার পরিবারবর্গ থেকে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত করে দিন। (অর্থাৎ) আমার ভাই হারূনকে।'[৯১]

এবার দেখুন! যখন মুবাল্লিগ ইখলাসের সাথে আল্লাহর নির্দেশের ওপর লাব্বাইক বলে অগ্রসর হয়, তখন তিনি যদি এই দু'আও করেন যে, হে আল্লাহ! আমার ভাইকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই ভাইকেও নবুওয়ত দান করে দেন। সুতরাং দীনের কাজে নিয়োজিত কোনো ছাত্রী যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করে যে, হে আল্লাহ! এই দ্বীনি কাজে আমার পিতা প্রতিবন্ধক, আমার মা প্রতিবন্ধক, আমার স্বামী প্রতিবন্ধক, আমার ভাই প্রতিবন্ধক, হে আল্লাহ! তাদেরকে এই কাজে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন, তাহলে কি ইখলাসের সাথে কাজকারী সেই ছাত্রীর দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না? যে প্রভু নবুওয়তের মর্যাদা দান করেন, সেই প্রভু প্রয়োজনে বেলায়াত কেন দান করবেন না? এজন্য এরূপ বলা উচিৎ নয় যে, আমি তো কোনোমতে হলেও পড়েছি, কিন্তু আমার স্বামী তো সঠিক পথে আসছে না। আপনারা দীনের কাজ করুন এবং ইখলাসের সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তা'আলা

---

[৯১]. সূরা তাহা : আয়াত ২৫-৩০

হৃদয়রাজ্য পরিবর্তন করে দেখিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিকূল অবস্থাকে আপনাদের অনুকূল করে দেবেন। আপনারা কি দেখছেন না, হযরত মূসা (আ.)-এর সকল বিরুদ্ধাচরণ নিশ্চিহ্ন হয়েছিল কিনা? তাঁর সকল বিরোধিতার এমন অবসান ঘটল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ○

'(আল্লাহ) বললেন, আমি অবশ্যই তোমার বাহুটা শক্তিশালী করছি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে এবং আমি তোমাদেরকে এক বিশেষ প্রভাব প্রদান করছি যে, তারা তোমাদের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। (তোমরা উভয়ে যাও) আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে। তোমরা আর তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।'[৯২]

আল্লাহ তা'আলা করুণাময়। তিনি নিজেই দাওয়াতি কাজে নিয়োজিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আরও চিন্তা করুন! ফেরাউন তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ না করায় তার পরিণতি কী হয়েছে। একসময় আল্লাহ তা'আলা তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করলেন। সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া অবস্থায় সে বলতে শুরু করল–

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

'আমি ঈমান আনলাম এই মর্মে যে, বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।'[৯৩]

আল্লাহ তা'আলা বললেন–

آلْآنَ

'এখন?'

এখন তোমার চোখ খুলল? এখন তো অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ○ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

---

৯২. সূরা কাসাস : আয়াত ৩৫

৯৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ৫৭-৫৯

'সুতরাং আমি তাদেরকে বের করে দিলাম বাগান ও ঝর্ণাসমূহ থেকে। আর ধনভান্ডার এবং উৎকৃষ্ট স্থান থেকেও। আমি এমনটিই করলাম এবং বনী ইসরাঈলকে সেসব কিছুর ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম।'[৯৪]

যদি আপনাদেরও একাজে বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হয় আর আপনারা দীনের কাজ করতে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকল বাধাবিপত্তি অপসারণ করে দেবেন এবং উক্ত কাজে আপনাদেরকে মর্যাদার সাথে সফলতা দান করবেন।

সুতরাং দু'আ রইল, যেসব ছাত্রী আজ দাওরায়ে হাদীছের সর্বশেষ হাদীছ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করল, আল্লাহ তা'আলা তাদের ভবিষ্যত জীবনে দীনের কাজ করার তাওফীক দান করুন। দীনের খাদেমা হয়ে বাকি সারা জীবন কাটানোর তাওফীক দান করুন– দীনের আলেমা হয়ে নয়। কেননা, অনেক ছাত্রীর বেলায় দেখা গেছে, কতিপয় শব্দ পড়ে তারা নিজেদেরকে না জানি কী ভাবতে শুরু করে। অন্য মহিলাদের হেয় দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তাই আলেমা হয়ে নয়; বরং খাদেমা হয়ে সারা জীবন একাজ করে যাবেন। তারপর দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের কীভাবে সফলতা ও খ্যাতি দান করেন।

আল্লাহর কাছে দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামের কবুলিয়াত

হযরত মাদানি (রহ.)-এর শিষ্যদের দেখুন! হযরত গাঙ্গোহি (রহ.)-এর শিষ্যদের দেখুন! হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর শিষ্যদের দেখুন। তাঁদের শিষ্যদের কোনো একজনকেও অযথা বসে আছেন এমন দেখতে পাবেন না। প্রত্যেক শিষ্য কাজ করেছেন। আপনারা শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর কোনো একজন ছাত্রের নাম বলুন দেখি, যিনি হযরতের কাছে পড়ালেখা করেছেন আর দীনের কাজ করেননি।

একবার দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীছের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সেখানে বোখারি শরীফ পড়ান। আমি তাঁর কাছে সেই ছাত্রজামানার মতো প্রশ্ন করলাম, হযরত! আপনি মারকাজে অবস্থান করছেন এবং প্রতি বছর অসংখ্য ছাত্র হাদীছ শরীফ পড়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। আপনি বলুন, এই কেন্দ্রস্থলে বসা অবস্থায় এমন কোনো দৃষ্টান্ত কি কখনও আপনার দৃষ্টিতে পড়েছে যে, কোনো ছাত্র হযরত শাইখুল হিন্দ

---

৯৪. সূরা শু'আরা : আয়াত ৫৭-৫৯

(রহ.)-এর কাছে পড়েছে আর সে দীনের কাজ করেনি? তিনি উত্তর দিলেন, শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর এমন কোনো ছাত্র আমার দৃষ্টিতে পড়ে না, যিনি দীনের কোনো কাজ করেননি। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর কবুলিয়াতের প্রমাণ। সুবহানাল্লাহ! আমাদের আকাবিরগণ এমন ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের শিষ্যদেরও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল করিয়ে নিতেন।

একটি চমৎকার দু'আ

একবার এই অধম আখুড়াখটকে অবস্থিত জামেয়া হাক্কানিয়া মাদরাসায় শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। হযরত প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত অনেক নসীহত ও আলোচনা করলেন। তিনি সেসব নসীহতের মধ্যে একটা বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আমি হজে গেলাম এবং দু'আ কবুলের বিশেষ একটি স্থানে পৌঁছলাম (তিনি স্থানের নামটিও বলেছেন)। সেখানে আমি কেবল একটি দু'আই করলাম। মজলিসে উপস্থিত আমরা সকলেই অত্যন্ত মনোযোগী হলাম যে, কোনো বড় দু'আ হবে, যা এত বড় শাইখুল হাদীছ করেছিলেন। সুতরাং আমরা খুব আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! কী দু'আ করেছিলেন? হযরত বললেন, আমি একটা দু'আ-ই করলাম, 'হে আল্লাহ! আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে-ছাত্রই লেখাপড়া করে বের হচ্ছে, তাকে আপনার নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।'

এজন্য সেই এলাকায় যাতায়াতের সময় যখনই উক্ত জামেয়ার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখন কুরআন মাজীদের একটি আয়াত আমার মনে পড়ে যায়। আয়াতটি হলো–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ.

'সেটি একটি ঝরন, যা থেকে (আল্লাহ তা'আলার) নৈকট্যশীল বান্দাগণ পান করবে।'[৯৫]

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমন ইল্‌মি ঝরনা বানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর বড়-বড় বান্দাগণ ইল্‌মের ফয়েজ পাচ্ছেন।

---

৯৫. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ২৮

এই উদ্যান সমৃদ্ধ হবে তাওহীদের স্বরমাধুর্য দ্বারা

যদি উম্মতের সকল ছাত্রী নিজ-নিজ ঘরকে দীনের মাদরাসায় পরিণত করে এবং নিজেদের সন্তানাদিকে ভালোভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে শুরু করে, দীনের প্রতি আকৃষ্ট করতে শুরু করে এবং পরিবারে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহের বাস্তবায়ন শুরু করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেক ঘরে দীনের প্রদীপ, ইল্‌মের প্রদীপ এবং নূরের প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে। তারপর দেখবেন, এই বদদীনি ও কুফর-শিরকের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। পরিশেষে এই হেদায়েতের নূর সমগ্র বিশ্বে প্রবল হয়ে যাবে।

আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন–

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام سجود
پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا توحید سے

আকাশ হবে প্রভাতের আলোয় আলোকিত
রাতের অন্ধকার হবে দূরীভূত।
পরে সেজদার বার্তা মনে পড়ে যাবে
ললাট হারামের মাটির সাথে পরিচিত হবে।
রাতের সমাপ্তি ঘটবে শেষে সূর্যের দ্যুতি দ্বারা
এই উদ্যান সমৃদ্ধ হবে তাওহীদের স্বর দ্বারা।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানের জীবন নসিব করুন এবং তাওহীদের মধুর সুর আমাদের অন্তরসমূহে সাজিয়ে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মাহরাম পুরুষদের সংশোধন

'মহিলারা চার প্রকার ভালোবাসা পেয়ে থাকে।

১. মা হিসেবে। ২. স্ত্রী হিসেবে। ৩. বোন হিসেবে। ৪. মেয়ে হিসেবে।

মহিলারা এই সবগুলো ভালোবাসার সুবাদে নিজের নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষদের নিজের কথা মানিয়ে থাকেন। মায়ের কথা সন্তান মেনে নেয়। স্ত্রীর কথা স্বামী মেনে নেয়। বোনের কথা ভাই মেনে নেয়। মেয়ের কথা পিতা মেনে নেয়। যদি তাদের পার্থিব কথা পুরুষরা মেনে নিতে পারে, তাহলে দীনের কথা দরদের সাথে তাদের সামনে উপস্থাপন করলে কেন মেনে নেবে না?'

মাহরাম পুরুষদের সংশোধন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

বিরাট এক কাজের দাওয়াত

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা পরস্পর একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজে আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।'[৯৬]

উক্ত আয়াতে বিরাট এক কাজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ঈমানদার নর-নারী পরস্পর একে অপরকে সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। বস্তুত উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর দুটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। একটি হচ্ছে, নিজে শরীয়তের ওপর আমল করা। আপরটি হচ্ছে, শরীয়তের বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এই দায়িত্ব পুরুষদেরও, নারীদেরও। নারীরা নিজেদের কর্মপরিধির মধ্যে থেকে প্রতিবেশী মহিলাদের এবং পরিবারের মাহরাম পুরুষদের দীনের দাওয়াত দিতে পারে।

---

৯৬. সূরা তাওবা : আয়াত ৭১

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকদায়িত্বশীলকেই নিজ-নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْمَرْءَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا

'নারী তার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের (সন্তান) ব্যাপারে দায়িত্বশীল।'

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, কেয়ামতের দিন মহিলাকে তার নিজের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের সৎকাজের আদেশ কতটুকু করেছিল এবং অসৎকাজ থেকে বেঁচে থাকতে কতটুকু গুরুত্বারোপ করেছিল এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।

এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্য হলো, আমাদেরকে দীনের ব্যাপারে দুটি কাজ করতে হবে। একটি হলো নিজেও শরীয়ত পালন করা। শরীয়তের শিক্ষা অর্জনের জন্য আপনারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। অল্প কদিনে শরীয়ত ও সুন্নাতের কতিপয় মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেছেন। এর মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় দীনের জ্ঞান আপনাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এখন আমল করত আল্লাহ তা'আলার অধিক নৈকট্যশীল হয়ে যাবেন। দ্বিতীয় ভূমিকা হলো, এখন এই ইল্‌ম অন্যদের কাছেও পৌঁছাতে হবে। উক্ত দুই কাজকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য বানাবেন।

চিন্তার পার্থক্য

অধিকাংশ মহিলা বলে থাকেন, আমরা ঘরে থেকে কিছু করতে পারি না। অথচ তারা ঘরের ভেতরে থেকেই দীনের কাজ করতে পারেন। আর তাদের থেকে এতটুকুই চাওয়া। চিন্তাভাবনার পার্থক্য হয়। মহিলাদের মানসপটে যখন দুনিয়া বসে যায়, তখন তারা নিজ সন্তানদের পার্থিব জীবন ভালো করার জন্য মানসিকভাবে তাদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে। পক্ষান্তরে যখন তাদের অন্তরে পরকালীন মঙ্গলচিন্তা বসে যায়, তখন তারা তাদের সন্তানাদির পরকাল সুন্দর করার জন্য তাদেরকে খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করে। যেন চিন্তার ধারা দুটি।

১. একটি ধারা হলো, আমাদের ইন্তিকালের পর সন্তানদের কী অবস্থা হবে? এই চিন্তাভাবনা সকল মহিলার স্মৃতিতে থাকে। তারা প্রত্যহ চিন্তা করে, আমি তাদের জন্য কিছু করে যাই, ছেলেমেয়ের বিয়ে-শাদী নিজে দেখে যাই, ছেলেমেয়েকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যাই। এ-পর্যন্ত চিন্তা তো সকল মহিলাই করে। কিন্তু এসব থেকে আরও সামনের একটা ভাবনা আছে। সেই ভাবনা কোনো-কোনো মহিলা ভাবেন। সেই ভাবনাটি হলো–

২. সন্তান মারা যাওয়ার পর তাদের কী অবস্থা হবে? আমরা যদি এই ভাবনাও ভাবতে শুরু করি, তাহলে আমাদের জীবনে একটি ভারসাম্য আসবে। আমরা কেবল দুনিয়ার পেছনেই ছুটব না। বরং আমরা দীন-দুনিয়া দুটিরই জন্য মেহনতী হয়ে যাব।

মহিলারা চার প্রকার ভালোবাসা পেয়ে থাকেন

১. মা হিসেবে। ২. স্ত্রী হিসেবে। ৩. বোন হিসেবে। ৪. মেয়ে হিসেবে।

মহিলারা এই সবগুলো ভালোবাসার সুবাদে নিজের নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষদের নিজের কথা মানিয়ে থাকেন। মায়ের কথা সন্তান মেনে নেয়। স্ত্রীর কথা স্বামী মেনে নেয়। বোনের কথা ভাই মেনে নেয়। মেয়ের কথা পিতা মেনে নেয়। যদি তাদের পার্থিব কথা পুরুষরা মেনে নিতে পারে, তাহলে দীনের কথা দরদের সাথে তাদের সামনে উপস্থাপন করলে কেন মেনে নেবে না? এতটুকুই আজকের আলোচনার সারসংক্ষেপ। এবার এটুকুরই কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব।

সন্তানের অন্তরে মায়ের ভালোবাসা

স্বাভাবিকভাবে সন্তানদের সাথে মায়ের সময় বেশি ব্যয় হয়। যদ্দরুন সন্তানদের অন্তরে পিতার তুলনায় মায়ের মহব্বত-ভালোবাসা বেশি থাকে। আপনারা দেখে থাকবেন, লোকজন জানোয়ার পোষে। কিছু মানুষ বাঘ পোষে। কিছু মানুষ হাতি পোষে। আবার কিছু মানুষ সাপ পোষে। এগুলো খুবই বিপজ্জনক প্রাণী। তবে এগুলো তাদের কাছে অবস্থানকারীদের মান্য করে। উদাহরণত–

সার্কাসের তামাশায় দেখানো হয়, বাঘ মুখ হাঁ করল আর তার রক্ষক মেয়ে নিজের মাথা বাঘের মুখে দিয়ে দিল। বাঘ তাকে বিন্দুমাত্রও কষ্ট দিল না।

জার্মানে হাতি পোষেন এমন আট-দশজন লোক লাইন ধরে শুয়ে পড়ল। প্রত্যেকের মাঝে দূরত্ব ছিল। হাতি তাদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল এবং শয়িত ব্যক্তিদের কারও ওপর পা ফেলল না।

অজগর কত বিষাক্ত! কিন্তু যেব্যক্তি তাকে পোষে, তাকে মান্য করে এবং তাকে কিছুই করে না।

যদি হিংস্র জন্তু তার লালনপালনকারীকে মূল্যায়ন করে, তাহলে মানুষ তো আর যাই হোক মানুষ বটে। তাই সন্তান নিজের মাকে খুব মূল্যায়ন করে। তার অন্তর মায়ের মহব্বত-ভালোবাসায় সিক্ত থাকে। এটা ভিন্ন বিষয় যে, বর্তমানের নব্যশিক্ষা সন্তানদের মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে, তাদেরকে পাপাচারী ও বদকার বানিয়ে দেয় এবং তাদের মধ্যে পিতামাতার অবস্থান ও মর্যাদার কোনো অনুভূতিই থাকে না। অন্যথায় সুস্থ বিবেকবান মানুষ নিজের মায়ের সাথে সর্বদা মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখবে। এই মহব্বত কৃত্রিম ও লৌকিকতাপূর্ণ হবে না। বরং স্বভাবজাত মহব্বত হবে। ইমাম শাফেয়ী (রাহ) বলতেন–

وَالْبَنَاتُ اِلَى الْاُمَّهَاتِ اَمْيَلُ وَلِقَوْلِهِنَّ اَرْغَبُ

'মেয়েরা মায়েদের প্রতি ছেলেদের অপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট এবং তাদের কথার প্রতি অধিক আগ্রহী (তাদের কথা অতি দ্রুত কবুল করে নেয়)।'

তাই তো পার্থিব জগতে সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি মায়ের চোখ থেকে নির্গত অশ্রু। অশ্রু এমন কাজ করে দেখাতে পারে, যা তরবারি দ্বারাও করা যায় না। তাই তো মেয়ে বিয়ের প্রস্তাবদাতাকে পছন্দ না করলে মা যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে অশ্রু ফেলে, তখন মায়ের চোখের অশ্রু দেখে সে এত বিগলিত হয় যে, নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং বলে, মা! আপনারা যেমনটি চান, আমি তাই করব। এমনিভাবে অনেক সময় ছেলেরা কোনো বিষয়ের জিদ করে থাকে। কিন্তু মা যদি তাদের নম্র ও মিষ্টি ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাহলে নম্র ভাষা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তৎক্ষণাৎ তারা জেদ পরিহার করে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাই তো বলা হয়ে থাকে, সন্তানের ভেতরের সম্পর্কে মা অবগত থাকে। যেহেতু সন্তানদের সম্পর্কে মা এত জানেন এবং তাদের অন্তরে মায়ের এত মর্যাদা থাকে, তাই নিজ সন্তানদের দীনের প্রতি আহ্বান করা মায়ের একান্ত কর্তব্য। আমি কী করব, আমার কথা তো তারা মান্য করে না, শুধু এতটুকু বলার দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না। যখন সন্তান স্কুল-কলেজে যেতে চায় না, তখন মা

কত হীলা-বাহানা এবং পন্থা অবলম্বন করে তাদের চাপ সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত তারা যেতে সম্মত হয়ে যায়। কখনও কথা বলা বন্ধ করে দেয়, কখনও খানাপিনা ছেড়ে দেয়, আরও কত কী করে।

যদি প্রার্থিব জীবনের লক্ষ্যে এতসব হীলা-বাহানা এবং পন্থা অবলম্বন হতে পারে, তাহলে দীনের জন্য কেন হতে পারে না। যাহোক, সন্তানদের সৎ ও দীনদার বানানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো মায়ের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হযরত আনাস (রাযি.) ছোট্ট শিশু ছিলেন। তাঁর পিতামাতা তখনও মুসলমান হননি। মাতা ছিলেন উম্মে সুলাইম (রাযি.)। পিতা ছিলেন মালিক ইবনে নযর (রাযি.)। তার পিতা কোথায় সফরে গেছেন। তারপর তার মা কোনো মজলিসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশবাণী শ্রবণের সুযোগ পেলেন। নসীহতগুলো তাঁর অন্তরে এমন ক্রিয়া করল যে, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে শিরক থেকে তাওবা করে কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল করে নিলেন। মালিক ইবনে নযর যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন উম্মে সুলাইম (রাযি.) তাকে বললেন, আমি মুসলমান হয়েছি। মালিক ইবনে নযর তা শুনে দুঃখ ও অস্থিরতা প্রকাশ করে বলল, তুমি আমাকে না জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত কিভাবে নিলে? তিনি বললেন, আমি আমার মৃত্যুর ভয় করছিলাম এবং শিরক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে চাচ্ছিলাম না। মনে চিন্তা জাগল, হয়তো আপনি আসতে বিলম্ব হবে এবং আপনি আসার পূর্বেই আমার মৃত্যুর সময় চলে আসবে। এ অবস্থায় শিরকের ওপর যেন আমার মৃত্যু না হয়, তাই আমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছি।

মালিক ইবনে নযর বললেন, তুমি মুসলমান হয়েছ; আমি কিন্তু মুসলমান হব না। উম্মে সুলাইম (রাযি.) বললেন, আচ্ছা, আমি আমার ছেলেকে তো মুসলমান বানাব। এবার পিতা কচি শিশু আনাসকে বলল, বৎস! তুমি কালেমা পড়ো না। উম্মে সুলাইম (রাযি.)ও বললেন, বৎস! তুমি কালেমা পড়ো। ছেলে একবার পিতার দিকে তাকাল এবং একবার মায়ের দিকে তাকাল। তারপর মায়ের সামনে এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা যদি সন্তানকে দীনের প্রতি ভালোভাবে আহ্বান করে, তাহলে সন্তান সেই আহ্বানে সাড়া দেয়।

জিহাদের স্পৃহা সৃষ্টির বিরল পদ্ধতি

একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর চারজন ছেলে ছিল। তিনি যখন ছেলেদের আহার করানোর জন্য বসাতেন, তখন বলতেন, বাছারা! না আমি তোমাদের মামাদের লজ্জিত করেছি, না তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ছেলেরা কথাটি বুঝতে পাচ্ছিল না। একদা তারা মাকে জিজ্ঞাসা করল, মা! আপনি কী বলেন? মা উত্তর দেন, বাছারা! আমি এমন একজন মহিলা, যে পূতঃপবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন করেছে। যখন আমি কুমারী ছিলাম, তখন এমন কোনো কাজ করিনি, যা দ্বারা তোমাদের মামাদের অপমান হতে পারে এবং আমার বিয়ে হওয়ার পর তোমাদের পিতার বিছানায় কাউকে আসতে দেইনি। অর্থাৎ আমি তোমাদের পিতার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

ছেলেরা বলল, মা! আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? মা জবাবে বললেন, আমার মনোবাসনা হচ্ছে, তোমরা যখন যুবক হবে, তখন সকলেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং সকলেই শহীদ হয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, শহীদদের মায়েরা কোথায়? তখন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর উপস্থিতিতে প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার গৌরব আমার ভাগ্যে জুটবে। সাথে-সাথে তিনি এও বললেন, বাছারা! তোমরা খুব বীরত্ব ও বাহাদুরির সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা যদি আমার জীবদ্দশায় শহীদ হও, তাহলে আমি উপস্থিত হয়ে তোমাদের লাশ দেখব। যদি তোমাদের বুকে আঘাত থাকে, তাহলে আমি তোমাদের জন্য অনেক দু'আ করব। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের পিঠে আঘাত থাকে, তাহলে আমি কখনও আমার হক মাফ করব না। যখন মায়েরা ছেলেদের মধ্যে এ-ধরনের স্পৃহা জাগিয়ে তুলতেন, তখন ছেলেরা বড় হয়ে বাস্তবেই দীনের মুজাহিদ হতো।

আসমা বিনতে আবীবকর (রাযি.)কর্তৃক স্বীয় ছেলেকে নসীহত

হযরত আসমা বিনতে আবীবকর (রাযি.) সায়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বড় বোন ছিলেন। তিনি বৃদ্ধা ছিলেন। তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় থাকতেন। এই দিনগুলোতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কিছু উল্টা-পাল্টা কাজ করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করে দিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তা জানতে পেরে, বড়

এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমায় চলে এল এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.)-এর বাড়ি ঘেরাও করল। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে হাজ্জাজের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। লোকসংখ্যা কম থাকায় তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না, তাদের শহীদ করে দেওয়া হলো। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) নিজ ঘরের কাছাকাছি ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, শত্রু বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি ফিরে ঘরে চলে এলেন। তিনি মায়ের কাছে এসে বললেন–

'মা! আমাকে অল্প কিছুক্ষণ পরই শহীদ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি এই কাজ দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে করিনি; বরং আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য করেছি। এখন আপনি বলুন! আপনার পরামর্শ কী?'

দেখুন! কেমন অনুগত ছেলে ছিলেন তিনি। এমন মুহূর্তেও মা থেকে পরামর্শ নিচ্ছিলেন। যাক, তিনি যখন মায়ের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন মা হযরত আসমা (রাযি.) বললেন–

'বৎস! এখন দুটি পথ। হয় তুমি হকের ওপর আছ অথবা হকের ওপর নও। যদি তুমি হকের ওপর না থাক, তাহলে পৃথিবীতে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো মানুষ নেই; যে কিনা না-হকের ওপর থেকে শত্রুদের হাতে নিজের আত্মীয়-পরিজনদের হত্যা করে বেড়াচ্ছে। আর যদি তুমি হকের ওপর থাক, তাহলে মৃত্যু তো তোমার এমনিতে আসবেই; যদি এখনই এসে যায়, তাহলে শাহাদাতের মৃত্যু হবে। সুতরাং ঘাবড়ানোর কী আছে?

তিনি মায়ের নসীহতপূর্ণ কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন–

মা! ইচ্ছে তো আমারও এটিই ছিল যে, আমি বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করব এবং শহীদ হয়ে যাব। কিন্তু ভাবলাম, আপনার থেকে দু'আ নিয়ে নিই।'

এতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আসমা (রাযি.) শোওয়া ছিলেন। ছেলের কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন, ছেলের মাথায় চুমু দিলেন এবং নিজ ছেলেকে আল্লাহর সোপর্দ করত চমৎকার অনেক দু'আ করলেন। দু'আর মধ্যে তিনি বললেন–

হে আল্লাহ! আপনি জানেন! আমার এই ছেলে রাতে আপনার সামনে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করত। হে আল্লাহ! আপনি জানেন! আমার এই ছেলে আপনার ভালোবাসায় সেজদায় গিয়ে ক্রন্দন করত। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার এই ছেলে হেজাজের প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও আপনার মহব্বতে

দিনে রোযা রাখত। হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার এই ছেলে তার পিতামাতার অনুগত ও খেদমতকারী ছিল। হে আল্লাহ! আমি আমার ছেলেকে আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আপনি আমাকে এর ওপর সবর ও শোকর দুটিরই বিনিময় দান করুন।

মা থেকে দু'আ নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) বের হলেন এবং মোকাবেলা করলেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুরা তাঁকে বন্দি করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। তাদের ভাষায় লোকজন যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে এ উদ্দেশ্যে তারা তা করেছে। পুলিশ সেখানে পাহারা দিত। তাঁর লাশ নিচে নামানোর মতো কেউ ছিল না। পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর লাশ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে থাকল। এমনকি নিচ দিকে টানের কারণে তার গর্দান লম্বা হয়ে গেল।

হযরত আসমা (রাযি.) যখন শুনলেন, আমার ছেলের লাশ আজ পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলছে, তখন তিনি লাঠিতে ভর করে বের হলেন এবং সেই জায়গায় এলেন, যেখানে তাঁর ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। তিনি নিজ ছেলের লাশ দেখে বলতে লাগলেন–

'কেউ আছে কি এই আরোহীকে সওয়ারি থেকে নামানোর মতো, যিনি চল্লিশ দিন যাবত নিজ সওয়ারিতে আরোহণ করে আছেন?'

তাঁর কথা শোনার পর লোকদের চোখে অশ্রু এসে গেল। অবশেষে লোকজন চেষ্টা করে তার লাশ নিচে নামাল এবং দাফন করল। আল্লাহু আকবার! মায়েরা এরূপ সাহসিনী হতেন যে, নিজ সন্তানদের আত্মত্যাগ দেখেও এ-জাতীয় সাহসিকতাপূর্ণ কথা বলতেন।

মাতাপিতার মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকবে

মাতাপিতার মতবিরোধের কারণে পিতার উপদেশাবলি সন্তানের ওপর কোনো ক্রিয়া করে না। পিতা যতই সৎ, পবিত্র ও দীনদার হোন না কেন, যদি তাদের মাঝে মতবিরোধ থাকে, তাহলে তিনি তার সন্তানদের দীনদার বানাতে পারবেন না। পিতা সন্তানকে ওয়ায-নসীহত করে ঘর থেকে বাইরে বের হবেন। এদিকে মা শুধু এতটুকু বলে দেবে যে, তোমাদের পিতার তো দেমাগ নষ্ট। তখন সন্তানরা বলবে, মা ঠিকই বলছেন। তাই সন্তানদের সৎ বানানোর জন্য মাতাপিতার চিন্তাচেতনা ও মতামত এক হওয়া সীমাহীন জরুরি।

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম লিখেছেন, হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে পিতার কথা অমান্য করার মূল কারণ ছিল, তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীর মতপার্থক্য ছিল। সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের সহধর্মিণীগণ নিষ্কলুষ ছিলেন। চারিত্রিকভাবে সতী ছিলেন। কিন্তু কতিপয় নবী-রাসূল এমন ছিলেন, যাদের সহধর্মিণীদের মধ্যে মতের অমিল ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রীও তাঁর মতামত সমর্থন করত না। যদ্দরুন তাঁর ছেলে তাঁর কথা মানেনি এবং পিতার চোখের সামনে সেই ছেলে প্রলয়ে নিমজ্জিত হয়ে গেল। কাজেই যেসব মায়েরা কামনা করেন, আমাদের সন্তানরা সৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদের উচিৎ প্রথমে নিজের স্বামীকে নিজের মতাদর্শী বানানো। তারপর উভয়ে সম্মিলিতভাবে সন্তানদের দীনের দিকে ধাবিত করবেন। এভাবে সন্তানরা অতি দ্রুত দীনের দিকে চলে আসবে।

স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর অবস্থান

মায়ের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে স্ত্রী। স্ত্রী স্বামী থেকে ভালোবাসা পায়। প্রত্যেক রমণী স্বামীকে নিজের কথা এবং দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য করে। কেউ পছন্দসই কাপড়চোপড়, জুতা ইত্যাদি সামগ্রী ক্রয় করে দিতে স্বামীকে বাধ্য করে। কেউ নিজ পছন্দমতো বাড়ি নির্মাণ করিয়ে নেয়। কেউ জায়গাজমি নিজের নামে করিয়ে নেয়। এভাবে স্ত্রী স্বামী থেকে কী আদায় করবে, কী করিয়ে নেবে এটা স্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

গুলশানআরা বেগম নামে একজন রানি ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে দিয়ে দিল্লীতে শালামার উদ্যানের মতো অনেক বিশাল উদ্যান বানালেন।

নূর জাহান সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী ছিলেন। তিনি তার স্বামীকে দিয়ে একটি কবরস্তান বানালেন। বর্তমানে সেই জায়গাটি এত বিজন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে যে, সেখানে দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখা যায়।

মমতাজ মহলও একজন রানি ছিলেন। তিনি স্বামীর মাধ্যমে তাজমহল বানালেন। সেই তাজমহলকে বিশ্বের এক অত্যাশ্চর্য বলা হয়। কিন্তু তিনি এ থেকে কী উপকার পেলেন? এ থেকে তার কোনো উপকার হয়নি।

জুবায়দা খাতুনও একজন রানি ছিলেন। তিনি স্বামীকে বললেন, হজের সফরে হাজীদের পানির কষ্ট হয়। আপনি তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ফোরাত নদী থেকে শুরু করে আরাফার ময়দান পর্যন্ত খাল তৈরি করে দিন। স্ত্রীর আবদার পূর্ণ করা হলো। সেই খাল থেকে লাখ-লাখ মানুষ ও জীবজন্তু পানি পান করল এবং সেটি রানির জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে গেল।

চিন্তা করুন, চারজনের সকলেই রানি ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজন এমন কাজ করালেন, যা তাদের পরকালীন জীবনে কোনো কাজে এল না। আর একজন এমন কাজ করালেন, যা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে গেল।

স্বামী স্ত্রীদের কথা এবং দাবিদাওয়া মেনে নেন এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদেও প্রমাণ রয়েছে। ফেরাউন এত বড় অত্যাচারী ছিল যে, সে বনী ইসরাঈলের ছেলে শিশুদের হত্যা করাচ্ছিল। সে হাজারো ছেলে শিশুকে হত্যা করাল। কিন্তু শিশু মূসা যখন একটি বন্ধ সিন্দুকে ভাসতে-ভাসতে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল, তখন তার স্ত্রী আছিয়া সিন্দুক খুলে শিশু মূসাকে দেখে স্বামী ফেরাউনকে বললেন–

لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

'শিশুটিকে হত্যা করো না, হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে আমাদের ছেলে বানিয়ে নেবো।'[৯৭]

এবার দেখুন, যে চরম অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ হাজার-হাজার নিষ্পাপ শিশুকে জবাই করিয়েছিল, সেও তার স্ত্রীর কথা এমনভাবে মেনে নিল যে, সঙ্গে-সঙ্গে সে রাজি হয়ে বলল, ঠিক আছে আমরা এই শিশুকে হত্যা করব না।

মোটকথা, গৃহসচিবের এত শক্তি-সামর্থ্য যে, স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক থাকলে তার দ্বারা নিজের পক্ষে বড়-বড় সিদ্ধান্ত করিয়ে নিতে পারেন। বাস্তব কথা হলো, শরয়ী বিধানাবলির দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রী তার স্বামীর অধীন ও অনুগত আর স্বামী প্রেম-ভালোবাসার কারণে তার স্ত্রীর অধীন ও অনুগত। সৎ ও দীনদার স্ত্রী এমন সেবা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যার বদৌলতে তার স্বামী শুধু সম্বোধনেই স্বামী থাকে। বাকি বাস্তবে স্বামী স্ত্রীর কথা মান্যকারী এবং তার অধীন ও অনুগত হয়ে যায়।

হযরত আবূতালহা (রাযি.) কীভাবে মুসলমান হলেন?

মালিক ইবনে নযর মারা গেলে হযরত আনাস (রাযি.)-এর মা উম্মে সুলাইম (রাযি.) বিধবা হয়ে যান। মদীনা মুনাওয়ারার একজন বাসিন্দা আবু তালহা। তিনি যুবক ছিলেন এবং সুন্দরও ছিলেন। তাঁর ধনসম্পদ ছিল

---

৯৭. সূরা কাসাস : আয়াত ৯

অঢেল। তাঁর এত মান-মর্যাদা ছিল যে, তাঁর মতামতকে খুবই গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হতো। তিনি উম্মে সুলাইম (রাযি.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তারা পরস্পর নিকটাত্মীয় হওয়ায়, আবু তালহা (রাযি.) উম্মে সুলাইম (রাযি.)-এর কাছে সরাসরি প্রস্তাব পাঠালেন, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এই প্রস্তাব এমন ছিল যে, কেউ এর বিরোধিতা করতে সক্ষম ছিল না। হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) জানতেন, আবু তালহা এখনও মুসলমান হয়নি। তাই তিনি তাঁর সাথে দীনের আলোচনা চালিয়ে গেলেন। উম্মে সুলাইম (রাযি.) তাঁকে বললেন, আবু তালহা! আপনি এমন এক ব্যক্তি, যেকানো মহিলাকে আপনি বিয়ের প্রস্তাব দেবেন, আপনার প্রস্তাব কখনও প্রত্যাখ্যান করা হবে না। কিন্তু আপনি কাফের, আমি মুসলমান। আপনি কাঠের তৈরি মূর্তির পূজা করেন আর আমি সর্বজান্তা সত্তার ইবাদাত করি। সুতরাং আমার সাথে আপনার সম্পর্ক কীভাবে হতে পারে?

হযরত উম্মে সুলাইম (রাযি.) এত কোমলভাবে দীনের কথা বললেন যে, শেষ পর্যন্ত আবু তালহা নরম হয়ে গেলেন। উম্মে সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা নরম হয়েছে, তখন তিনি বললেন, 'আমি আপনার বিয়ের প্রস্তাব কবুল করতে রাজী আছি এই শর্তে যে, আমার বিয়ের মোহর আপনাকেই দিতে হবে এবং আমার মোহর হবে, আপনি ইসলাম কবুল করবেন।

একথা শুনে আবু তালহা কালেমা পড়ে ইসলাম কবুল করে নিলেন। তারপর তাদের পরস্পরে বিয়ে হলো। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, দুনিয়াতে উম্মে সুলাইম (রাযি.)-এর মোহরের হক থেকে উত্তম কোনো মহিলার মোহরের হক নেই। তিনি নিজের মোহরের হকের বেলায় স্বামীকে বললেন, আপনি মুসলমান হয়ে যান, এটাই আমার মোহরের হক।

হযরত ইকরামা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ইকরামা (রাযি.) আবুজাহলের ছেলে ছিলেন। তিনি মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, মুসলমানদের রাসূল আমাকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে দেয় কিনা? তাই তিনি মক্কা থেকে পালিয়ে দূরে কোথাও চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকীম (রাযি.) বড় বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন, কালেমা পড়লেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর বললেন–

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অত্যন্ত নরম মনের অধিকারী এবং মহৎ চরিত্রবান, আমি আপনার কাছে আমার স্বামীর নিরাপত্তা চাচ্ছি।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আমি তোমার স্বামীকে নিরাপত্তা দিলাম'।

উম্মে হাকীম (রাযি.) খুবই আনন্দিত হলেন এবং স্বামীর অনুসন্ধানে বের হলেন। দীর্ঘ সফর করে একস্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন, তাঁর স্বামী নদী পাড়ি দিয়ে অন্যদিকে যাচ্ছেন। সুতরাং তিনিও একটা নৌকা ভাড়া নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন এবং নদীর মাঝখানে গিয়ে স্বামীর নৌকার নাগাল পেলেন। তিনি সেখানেই তাঁর নৌকা স্বামীর নৌকার সাথে মিলিয়ে স্বামীকে ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনার নিরাপত্তা চেয়ে নিয়েছি। আপনি ফিরে চলুন, আমরা মক্কাতেই বসবাস করব। তারপর তাঁর স্বামী তাঁর নৌকায় চলে এলেন এবং নৌকা ঘুরিয়ে নদীর তীরে এসে তাঁরা উভয়ে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

পথে এক জায়গায় রাত হয়ে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী রাতটা সেখানেই কাটাল। বেশকিছু দিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এজন্য এই নির্জনে স্বামী তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইল। উম্মে হাকীম এত জ্ঞানী ছিলেন যে, তিনি বললেন, 'দেখুন, আমি মুসলমান হয়েছি। আর আপনি এখনও কালেমা পড়ে মুসলমান হননি। তাই আমি আপনার স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এখন আপনার জন্য বৈধ নই। তবে আপনি অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আপনি কালেমা পড়ে নেবেন।

এ-সময় স্বামী কালেমা পড়ল না। তাদের মিলনও হলো না। অবশেষে তিনি স্বামীকে নিয়ে মক্কায় এলেন। পরবর্তী কালে স্বামী কালেমা পড়ার পর তাদের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলো। এই ঘটনা থেকে অনুমান করুন, সেই যুগের স্ত্রীগণ দ্বীনি বিষয়াদিতে কত সুদৃঢ় ছিলেন। বর্তমানে তো সামান্য কথার ওপর ভিত্তি করে নারীরা বাহানা তৈরি করে ফেলে। সমস্যা হলো নিজেদের ভেতরে; কিন্তু বলে স্বামী পর্দা করতে দেয় না। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর অন্তরে চোর থাকে আর বলে, আমি কী করব? স্ত্রী মানতে রাজী নয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নাম ব্যবহার করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তাদের নিজেদের ভেতরেই আবর্জনা আছে, যা শরীয়তপরিপন্থী কাজ করতে তাদের বাধ্য করে যাচ্ছে। স্ত্রী যেমন পার্থিব বিষয়াদিতে স্বামীকে নিজের কথা এবং দাবি-দাওয়া মানাতে পারে, স্মরণ

রাখবেন তেমনি ভালো স্বামী দ্বীনি বিষয়াদিতেও নিজ স্ত্রীর ভালো কথাগুলো গ্রহণ করে থাকেন।

ইয়ারমুক যুদ্ধে নারীদের অবদান

ইয়ারমুক যদ্ধে রোমীয় সৈনিকদের সংখ্যা ছিল লাখ-লাখ। তাদের বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে, একটা সাদা ঘোড়ার মাথায় যেমন সামান্য কালো দাগ থাকে, এমনই ছিল রোমীয় বাহিনীর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা। রোমীয়দের যেসব সৈনিক ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তারা পেছনে চলে আসত আর তাদের স্থানে অন্য সতেজ সৈনিক দাঁড়িয়ে যেত। তাদের মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনী দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেল। অবশেষে যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন ডান পার্শ্বের মুসলিম সৈনিকরা পেছনে সরে আসতে শুরু করল। মুসলমান মহিলারা তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন, মুসলিম বাহিনী পিছু হটছে, তখন এক মহিলা সাহাবী সাওদা বিনতে আসেম (রাযি.) একটা টিলায় চড়ে অন্য মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'আরে! আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত তাঁবুতে বসে থাকবেন। আপনাদের পুরুষরা তো পেছনে সরে আসছে।'

একথা শুনে সমস্ত মহিলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন লুবনা বিনতে জারীর (রাযি.) বলতে শুরু করলেন, 'হে আরব মহিলারা! আপনারা নিজেদের নিষ্পাপ সন্তানদের হাতে নিয়ে নিন এবং নিজ-নিজ পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। আর তাদের বলুন, আমাদের ও আমাদের নিষ্পাপ সন্ত ানদের অনারব কাফেরদের অধীন করে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

তারপর মুসলমান মহিলারা বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করলেন। নিজ-নিজ নিষ্পাপ শিশুদের হাতে নিয়ে ওপরে তুলে ধরলেন এবং স্বামীদের দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমাদের এবং আমাদের নিষ্পাপ এসব সন্তানদের কাফেরদের অধীন করে আপনারা কোথায় যাবেন? মুসলিম সৈনিকরা তাদের নিষ্পাপ সন্তানদের দেখে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেল এবং রোমীয়দের ওপর জোরদার আক্রমণ চালাল।

তখন হিন্দ বিনতে উতবা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন–

نَحْنُ بَنَاتُ الطَّارِقِ نَمْشِيْ عَلَى النَّمَارِقِ
اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقْ اَوْ تُدْبِرُوْا نُفَارِقْ

'আমরা নক্ষত্রকন্যা; আমরা বিচরণ করি নরম গদিতে। তোমরা যদি সামনে অগ্রসর হও, লড়াই কর তাহলে আমরা তোমাদের সাথে মু'আনাকা করব। আর যদি তোমরা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।'

পঙ্‌ক্তিদুটি বলে তিনি বলতে থাকেন–

'হে আমাদের স্বামীগণ! আপনারা যদি সামনে অগ্রসর হয়ে কৃতকার্য হন, তাহলে আমরা আপনাদের জন্য বিছানা বিছাব এবং আপনাদের সংবর্ধিত করব। আর যদি আপনারা পলায়ন করেন, তাহলে স্মরণ রাখবেন, তারপর কাফেররা আমাদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবে এবং আপনাদের আত্মমর্যাদার জানাযা বের হয়ে যাবে।'

তারপর তিনি তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, 'হে ইবনে হার্‌ব! দেখুন, আপনি আপনার কুফরের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। আজ সেগুলোর ক্ষতিপূরণের দিন। সামনে অগ্রসর হোন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে সফল হেয় যান।'

মুসলিম মহিলারা এমন বীরত্বপূর্ণ ও চমৎকার কথা বলেছেন যে, মুসলিম বাহিনী তাদের কথাগুলো শ্রবণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেল এবং এমন আক্রমণ করল যে, পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইয়ারমুক যুদ্ধে বিজয় দান করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলিম মহিলাদের এটি এমন এক বীরত্বগাথা অবদান, ইতিহাস যার দৃষ্টান্ত পেশ করতে অপারগ।

ভাইদের দৃষ্টিতে বোনদের অবস্থান ও মর্যাদা

এবার ভাইদের দৃষ্টিতে বোনদের অবস্থান ও মর্যাদা কতটুকু এ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করছি। এর অনুমান তখন করবেন, যখন বিয়ের পর বোনকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার যাত্রা করা হয়। তখন ভাই অশ্রুসজল হয়ে যায় এবং এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। তার চোখ থেকে কেন অশ্রু ঝরে? এজন্য যে, বোনের সাথে ভাইয়ের মহব্বত থাকে। কেননা, তারা একই মাতাপিতার সন্তান এবং একই ঘরে লালিত-পালিত। তাই যখন

বোনকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন ভাইয়ের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে, এখন আমার বোন আমার থেকে দূরে চলে গেল। আল্লাহ্ করুন! যেন সে ইজ্জত-সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে পারে। জানি না, আমার বোনের সাথে কে কিরূপ আচরণ করবে। এসব চিন্তা করে বোনের বিদায় যাত্রার সময় কেঁদে থাকে।

দুধবোনের প্রতি ভক্তি-সম্মান

সাহাবায়ে কেরাম হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করলে, তাদের কিছু নারী-পুরুষ বন্দি হয়। বন্দিদের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধা এক মহিলা ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে বললেন, 'আমি তোমাদের সাথির বোন। কাজেই তোমরা আমাকে তোমাদের সাথির কাছে নিয়ে চলো।' তারপর সাহাবায়ে কেরাম তাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। বৃদ্ধা আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি আপনার দুধবোন এবং হালীমা সা'দিয়ার মেয়ে শীমা। আমি ছাগল চরাতে আপনাকে সাথে নিয়ে যেতাম। আপনাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতাম। একবার আপনি আঘাত পেয়েছিলেন। এখনও হয়তো সেই আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ক্ষতচিহ্ন দেখলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধা বাস্তবেই আমার বোন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি তার অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার জন্য চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি আমার এই চাদরে বসুন!'

এ-সময় সাহাবায়ে কেরাম অনুভব করলেন ভাইয়ের দৃষ্টিতে বোনের মর্যাদা কতটুকু। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি আপনি এখানে থাকতে চান, তাহলে আমি আপনার সমস্ত প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখব। আর যদি আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনের কারণে নিজ গোত্রে চলে যেতে চান, তাহলে আপনার যাওয়ার অনুমতি আছে।'

বৃদ্ধা নিজ গোত্রে চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনজন গোলাম হাদিয়া দিলেন। সেবা করার জন্য একজন দাসি দিলেন এবং ছাগলের একটি পালও দিলেন। এভাবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বোনকে ভক্তি ও সম্মানের

সাথে বিদায় দিলেন। উক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করুন, সৎকর্মপরায়ণশীল ভাইদের অন্তরে তার বোনদের মর্যাদা কতটুকু থাকে। যেহেতু ভাইদের অন্তরে বোনদের এত উঁচু অবস্থান ও মর্যাদা থাকে, তাই বোনেরা দীনি বিষয়াদিতেও ভাইদের নসীহত করতে পারে।

ভাইদের ওপর নেক কাজের তালীমের প্রভাব

সাইয়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবীবকর তাঁকে দেখতে তাঁর ঘরে এলেন। তিনি এসে উজু করলেন। উজু শেষ করার পর দেখা গেল, তাঁর পায়ের গোড়ালিতে কিছু অংশ শুকনা রয়ে গেছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বললেন, 'ভাই! আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যেব্যক্তির পায়ের সামান্য অংশও উজুতে শুকনা থেকে যাবে, কেয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে।' বোনের একথা শুনে ভাই দ্বিতীয়বার উজু করলেন এবং মসজিদে চলে গেলেন। উক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মহিলা সাহাবীগণ নিজেদের ভাইদেরও নেক কাজের তা'লীম দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব না। বরং পড়া ও পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকব। তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযি.) যখন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'ভাই! আপনি এখনও যৌবনকালে আছেন। বিয়ে করার ইচ্ছে আপনি কেন বর্জন করলেন? যদি আপনি বিয়ে করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সন্তানের জনক বানাবেন। আর সন্তান ঈমানদার হলে তার জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের বিনিময়ে তার মাতাপিতার আমলনামায় একটা করে নেকি লেখা হয়। আপনি এই সদকায়ে জারিয়া থেকে কেন বঞ্চিত হতে চাচ্ছেন?'

তিনি এত সুন্দর করে কথা বললেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বৈবাহিক জীবন যাপন করলেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, পূর্ব যুগের বোনেরা তাদের ভাইদের দীনের দিকে ধাবিত করতেন।

পিতার দৃষ্টিতে কন্যার অবস্থান

পিতার দৃষ্টিতে তার কন্যাদের অবস্থান অনেক বড় হয়ে থাকে। আপনারা দেখে থাকবেন, বিয়ের সময় পিতা নিজের জীবনের সমস্ত উপার্জন যৌতুক

হিসেবে দিয়ে দেন। পরে যখন তাকে শশুরালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদায় দেওয়া হয়, তখন পিতার চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে থাকে। এমনটা কেন হয়? দেখতে তো তার বোঝা কমে গেল এবং দায়িত্ব পূর্ণ হলো। কিন্তু না, তার কলিজার টুকরা পৃথক হয়ে যাচ্ছে। তার অন্তর এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে যে, কি জানি, আমার কন্যাকে তারা এমন মহব্বত করবে কিনা যেমন মহব্বত আমরা করছিলাম। এই চিন্তায় তার অন্তরের বিস্ময়কর অবস্থা হয়ে যায় এবং কন্যার বিচ্ছেদে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। পিতার অন্তরে কন্যার মহব্বত-ভালোবাসা কতটুকু থাকে তারও প্রমাণ হাদীছ শরীফ থেকে পাওয়া যায়। যথা–

যখন বদরের বন্দিদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হলো, তখন আবুল আসও বন্দি হিসেবে ছিলেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় কন্যা সাইয়্যিদা হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর স্বামী ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি হযরত যয়নাবকে (রাযি.) বলেছিলেন, তুমি যদি মক্কা থেকে মদীনায় যেতে চাও, তাহলে চলে যাও, আমি ইসলাম গ্রহণ করছি না। তারপর তিনি বদর যুদ্ধের পর হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। পথে কাফেররা বলল, তুমি মুহাম্মাদের কন্যা হয়েও নিরাপদে কীভাবে যেতে পারছ? এজন্য তারা তাকে ধাক্কা দিল এবং তিনি উট থেকে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর গর্ভও নষ্ট হয়ে গেল এবং কোমরে ব্যথাও লাগল। পরবর্তী কালে তিনি বহু কষ্টে সময় কাটিয়েছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কলিজার টুকরোর কষ্ট দেখে কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন, আমার এই কন্যাকে দীনের জন্য কত কষ্ট দেওয়া হয়েছে!

মক্কা মুকাররমায় যখন হযরত যয়নাব (রাযি.) অবগত হলেন, তাঁর স্বামী মদীনা মুনাওয়ারায় বন্দি হয়েছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনিও তাঁর স্বর্ণের হার মুক্তিপণ হিসেবে পাঠালেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছিলেন। যখন নিজকন্যার সেই হার তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল, যে হার তিনি স্বীয় কন্যা হযরত যয়নাবকে উপঢৌকন হিসেবে পরিয়েছিলেন, তখন তাঁর চোখদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানসপটে নিজ কন্যার দুঃখ-কষ্ট ভেসে উঠল। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে বললেন, যদি তোমরা আমার পরামর্শ কবুল কর, তাহলে এই হারটাও ফিরিয়ে দাও আর এই ব্যক্তিকেও মুক্ত করে দাও। সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ কবুল করে নিলেন। এ থেকে অনুমিত হয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজকন্যাকে কত ভালোবাসতেন। এই মহব্বত প্রত্যেক পিতাই নিজ কন্যাকে করে থাকেন। যদি পিতার অন্তরে কন্যাদের এত মহব্বত থাকে, তাহলে কন্যারাও শ্রদ্ধা-ভক্তি ও মান-অভিমান দ্বারা স্বীয় পিতাকে দীনের প্রতি ধাবিত করতে পারেন। তারপর দেখবেন, পিতা তার কন্যার দ্বীনি কথা কীভাবে কবুল করেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে শুধু কন্যাদের নয় বরং কন্যাদের কন্যা তথা নাতনিদের মহব্বতও ছিল। একবার রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তাশরীফ আনলেন। এ-সময় তাঁর কন্যা হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর কন্যা উমামা বিনতে আবিল আস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিল। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামত করার সময় তাকে নিজ স্কন্ধে বসিয়ে নিলেন এবং ইমামত শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম পেছনে নামায পড়ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকুতে যেতেন, তখন নাতনিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে কাছেই দাঁড় করিয়ে দিতেন। তারপর সেজদা করতেন এবং সেজদা থেকে যখন দাঁড়াতে শুরু করতেন, তখন নাতনিকে আবার স্কন্ধে বসিয়ে নিতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ নামায এ অবস্থায় পড়ালেন যে, তাঁর নাতনি তাঁর স্কন্ধে আরোহী ছিল। যখন কন্যাদের সন্তানদের প্রতিও মহব্বত থাকে, তখন কন্যাদের প্রতি কতটুকু মহব্বত থাকবে?

কন্যাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

কন্যাদের ওপর এই দায়িত্ব রয়েছে যে, তারা তাদের পিতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং মহব্বত দ্বারা দীনের দিকে ধাবিত করবে। জরুরি নয় যে, একবার কথা বলার পর দ্বিতীয়বার লড়াই করে কথা বলবে। বিনয়ের সাথে বারবার বলতে থাকবে। এর ক্রিয়া বেশি হয়। আপনারা কি দেখেননি, পানির নল থেকে পানির ফোঁটা টপটপ পড়তে থাকে। নিচে পাথর থাকে এবং এই পাথরেও ছিদ্র হয়ে যায়। যদি পানির ফোটা পাথরের ভেতরেও রাস্তা বানিয়ে নেয়, তাহলে কন্যার চোখ থেকে নির্গত অশ্রুফোঁটা স্বীয় পিতার অন্তরে কেন রাস্তা

বানাতে পারবে না। কেয়ামতের দিন মহিলাদের নিজেদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তোমরা নিজেরা কী পরিমাণ আমল করেছ এবং নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষদের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তোমরা তোমাদের মাহরাম পুরুষদের দীনের প্রতি কতটুকু আহ্বান করেছ?

একটু চিন্তা করুন, পূর্বেকার মহিলারা নিজেদের মাহরাম পুরুষদের শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে ফেলতেন। কিন্তু বর্তমানের স্ত্রীরা স্বামীদের মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে পারে না, নামাযের স্থানে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করতে পারে না, সুন্নাত পোশাক পরিধানের জন্য প্রস্তুত করতে পারে না। ঈমান কত দুর্বল হয়েছে! তখন তো জীবনের বাজি লেগে যেত। আর এখন কেবল নিজের মনোবাসনাও ত্যাগ করা যায় না। স্ত্রী বলে, স্বামী দাড়ি রাখলে কেমন দেখা যাবে। এ-জাতীয় চিন্তাভাবনা কখনও করবেন না। বরং অন্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেরও চিন্তা থাকা চাই।

সুতরাং যারা মুত্তাকী মহিলা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আধ্যাত্মিক পিতা। বর্তমানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। নববী সুন্নাতসমূহকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। এখন কন্যাদের উচিত, তাদের আধ্যাত্মিক পিতার সুন্নাতসমূহ নির্বাসিত হওয়ার ওপর ব্যথিত হওয়া, যন্ত্রণায় ছটফট করা এবং নিজেদের পরিবারগুলোকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করা।

একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন। বিপদের মুহূর্তে বিপদগ্রস্তকে যদি কেউ মিষ্টি কথা বলেও পাশে দাঁড়ায়, তাহলে সারা জীবন তার স্মরণ থাকে যে, অমুক ব্যক্তি কঠিন পরিস্থিতিতে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল। বর্তমানে ইসলাম কঠিন বিপদাপন্ন। চতুর্দিকে উলঙ্গপনা আর বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। ফ্যাশনপূজার মচ্ছব চলছে। শুরুর দিকে টেলিভিশন এবং ভি. সি. আর ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল। তারপর ক্যাবল লাইন এসে গেল। আর এখন অবশিষ্ট যা ছিল ইন্টারনেট এসে সব ধ্বংস করে দিল। এখন তো এই Inter netও Enter net হয়ে গেছে। Enter অর্থ হলো, 'প্রবেশ করা' এবং net অর্থ হলো জাল। যেন যেব্যক্তি ইন্টারনেটে বসবে, সে পাখির মতো জালে আটকা পড়ে যাবে। এই ইন্টারনেট এত বড় মসিবতে নিক্ষেপ করেছে যে, বর্তমানে তরুণ-তরুণীরা এতে বসে পরস্পরে একে অপরের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা

গাল-গল্প করে থাকে। তাদের দ্বীনি জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দীনের এই দুরবস্থায় উৎকণ্ঠিত এবং বিচলিত হওয়ার মতো কেউ আছে কি?

ভাবুন তো, যখন ঘরে আগুন লেগে যায় এবং পুরুষের সংখ্যা কম থাকে কিংবা তাদের দ্বারা আগুন নেভানো সম্ভব না হয়, তখন মহিলারাও পানি ভরে দেয়। যার ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, আমরা পানি ভরে দিয়ে আপনাদের সহয়োগিতা করছি, আপনার দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনুন। ঠিক তদ্রূপ বর্তমানে পৃথিবীতে গুনাহের আগুন লেগেছে। পুরুষেরা মাদরাসার মাধ্যমে, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে, আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরের মাজলিসের মাধ্যমে সেই আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু শুধু তাদের দ্বারা গুনাহের এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য নেককার কন্যা, নেককার স্ত্রী এবং নেককার মায়েদের ওপর জরুরি, তারা যেন তাদের মাহরাম পুরুষদের সাহায্যকারী হয়ে যায়, গুনাহের আগুন নেভানোর কাজে তাদের সহায়ক হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

কাজেই যেসব মেয়ে এখানে দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, তারা অন্তরে এই স্পৃহা সৃষ্টি করে নেবে যে, কেয়ামতের দিন আমরা শুধু একজন মেয়ে অথবা মহিলা হিসেবে দণ্ডায়মান হতে চাই না; বরং দীনের আলেমা এবং দীনের মুবাল্লিগ হিসেবে দাঁড়াতে চাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে উম্মতের সাধারণ লোকজন হাউজে কাউছারের কাছে যাবে, তখন ফেরেশতাগণ তাদের কাউছারের পেয়ালা পান করাবেন। কিন্তু যখন উম্মতের ওলামায়ে কেরাম সেখানে যাবেন, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পবিত্র হাতে পেয়ালা ভরে তাদের পান করাবেন।

এর উদাহরণ এরূপ– বাসাবাড়িতে যখন সাধারণ লোকজন আসে, তখন কর্মচারীরা তাদের শরবত পান করিয়ে থাকে আর যখন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসেন, তখন মেজবান নিজহাতে পেয়ালা ভরে তাকে পান করান। সুবহানাল্লাহ! তারা কত-ই না সৌভাগ্যবান হবে, যাদের আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজহাতে কাউছারের পেয়ালা ভরে পান করাবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা পান করাবেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا

'এবং তাদের প্রভু তাদের অতি পবিত্র শরবত পান করাবেন।'[৯৮]

কিতাবাদিতে লেখা আছে, ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার বক্ষকে ইল্‌মের জন্য নির্বাচন করেছিলাম। এখন লোকজনের সামনে তোমার হিসাব-নিকাশ নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। চলো, আমি তোমার গুনাহসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দিলাম।

এমনিভাবে অন্য সকল মুখলিস ওলামায়ে কেরামকেও আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমিই তোমাদের বক্ষকে ইল্‌মের জন্য নির্বাচন করেছি, তাই তোমাদের হিসাব-নিকাশ নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাত দিয়ে দেবেন। যেসব মেয়ে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে, তারাও মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাদের পিতামাতা ও নিকটাত্মীয় স্বজনও মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। যে শিক্ষিকা পড়িয়েছেন, তিনিও মুবারকবাদের যোগ্য। যে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবা এই আয়োজন করেছেন এবং মাদরাসার যত সাহায্য-সহযোগিতাকারী আছেন সকলেই মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এখন এই মেয়েরা তাদের বাসাবাড়িতে যাবে এবং নিজ-নিজ বাসাবাড়িতে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবে।

কেউ আছে বোন, সে ভাইকে দাওয়াত দেবে।

কেউ আছে কন্যা, সে পিতাকে দাওয়াত দেবে।

কেউ আছে স্ত্রী, সে স্বামীকে দাওয়াত দেবে।

কেউ আছেন মা, তিনি সন্তানদের দাওয়াত দেবেন।

আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীছের আলোকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি যে, কেয়ামতের দিন আপনাদের এসব নিকটাত্মীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই যিম্মাদারি পূর্ণ করার তাওফীক দান করুন।

---

৯৮. সূরা দাহর : আয়াত ২২

আলোচনা সারাংশ

আলোচনার সারাংশের জন্য একটি উদাহরণের ওপর সামান্য মনোযোগ দিন। যদি আপনি একজন মা হোন এবং জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পান, রাস্তায় আপনার ছেলেকে সন্ত্রাসীরা ধরেছে। সন্ত্রাসীরা তাকে টানাহ্যাঁচড়া করছে, কিল-ঘুষি মারছে, মাথায় জুতা দিয়ে আঘাত করছে, তাহলে মা হিসেবে আপনার অন্তরের ওপর দিয়ে কী বয়ে যাবে? আপনি কি আরামে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? না। বরং কান্না শুরু করে দেবেন, চিৎকার করবেন, ছুটে চলবেন, দৌড়াবেন; এবং বলবেন আমার ছেলের শরীরে হাত তুলেছে কে? কিন্তু কেয়ামতের দিন আপনি কিছুই করতে পারবেন না। মা দাঁড়িয়ে থাকবে, তার সামনেই তার বেনামাযী ছেলেকে, সুদখোর ছেলেকে, অবাধ্য ছেলেকে ফেরেশতারা ধাক্কা মেরে-মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। এ-সময় যখন মা তা দেখবে, চিন্তা করুন, তখন তার অন্তরের ওপর দিয়ে কী বয়ে যাবে?

এমনিভাবে আপনি যদি হোন কারও স্ত্রী, এবং দেখতে পান, আপনার স্বামীকে কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করছে, তাহলে আপনার অন্তরের ওপর দিয়ে কী বয়ে যাবে? কেয়ামতের দিন স্ত্রীর সামনে তার স্বামীকে গুর্জ মারা হবে, তখন তার অন্তরের কী অবস্থা হবে?

আপনি যদি হোন কারও বোন এবং দেখতে পান, রাস্তায় কেউ আপনার বোনের কামিজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, তার কাপড় জামা ছিঁড়ে ফেলছে, তখন আপনার অন্তরের কী অবস্থা হবে? হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে বেপর্দা চলাফেরাকারী মহিলাদের কেয়ামতের দিন যখন একে-একে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন তার শরীরের পোশাক এমনি-এমনি শরীর থেকে খসে পড়বে। এ-সময় আল্লাহ তা'আলা তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন এবং বলবেন, এই পর্দাহীন উলঙ্গ মহিলাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তখন আপনার অন্তরের কী অবস্থা হবে? হায়! আমি যদি দুনিয়াতে আমার বোনকে পর্দা করতে বলতাম এবং সে পর্দা করত, তাহলে আজকে সকলের সামনে তাকে উলঙ্গ হতে হতো না এবং উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতো না।

আজকে যদি দুনিয়াতে কেউ তার কোনো নিকটাত্মীয়কে লাঞ্ছিত হতে দেখে, তাহলে তার অন্তরে যেন ছুরি বিদ্ধ হয়েছে এমন অবস্থা হয়ে যায়; যদি কেয়ামতের দিন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে কী অবস্থা

দাঁড়াবে? সুতরাং নিকটতম লোকদের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং ভালোবাসার সম্পর্কের দাবি পূরণের এখনই সময়। কাজেই দীনের ওপর নিজেরাও আমল করুন এবং নিকটতম পুরুষদেরও দীনের দিকে ধাবিত করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সৎ, তাকওয়া এবং পরহেযগারির জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

বরকতম জুমার ফযীলত

'পৃথিবী সৃষ্টির কাজ রবিবার দিন শুরু হয়, জুমার দিন (শুক্রবার) পূর্ণতা পায়। যেহেতু এই কাজ রবিবার দিন শুরু হয়েছে, তাই খৃষ্টানরা রবিবার দিনকেই তাদের ঈদ তথা সপ্তাহিক আনন্দের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য তাদের আরাধনা হয় রবিবার দিন। আপনারা বিশ্বের যেখানেই যাবেন, দেখবেন খৃষ্টানরা রবিবার দিন গির্জায় সমবেত হয়ে আরাধনা করে। যখন পৃথিবী সৃষ্টির কাজ পূর্ণতা পায়, তখন ছিল জুমার দিন (শুক্রবার)। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এই দিনকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ঈদ তথা সাপ্তাহিক আনন্দের দিন সাব্যস্ত করেছেন। তাই মুসলমানদের জন্য জুমার দিন (শুক্রবার) ঈদের দিনের মতো। জুমার পর শনিবার দিন ছুটির দিন ছিল, এজন্য ইহুদি সম্প্রদায় এই দিনকে তাদের জন্য ঈদের দিন সাব্যস্ত করে নিয়েছে।'

বরকতময় জুমার ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

পৃথিবীর সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

'ছয় দিনে।'[৯৯]

তন্মধ্যে ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে লেগেছে দুদিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ

'তিনি ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে।'[১০০]

তারপর আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। আল্লাহ তা'আলা চার দিনে মানবজাতির জন্য ভূমণ্ডলে বরকত ও প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছেন।

---

৯৯. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৪

১০০. সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ৯

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَبَارَكَ فِيهَا

'এবং তিনি তাতে বরকত দান করেছেন চার দিনে।'[১০১]

এর মধ্যে সৃষ্টজীবের জন্য রিযিক রেখেছেন। এভাবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টিতে মোট ছয়দিন সময় লেগেছে।

পৃথিবী সৃষ্টির কাজ রবিবার দিন শুরু হয়, জুমার দিন (শুক্রবার) পূর্ণতা পায়। যেহেতু এই কাজ রবিবার দিন শুরু হয়েছে, তাই খৃষ্টানরা রবিবার দিনকেই তাদের ঈদ তথা সাপ্তাহিক আনন্দের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য তাদের আরাধনা হয় রবিবার দিন। আপনারা বিশ্বের যেখানেই যাবেন, দেখবেন, খৃষ্টানরা রবিবার দিন গির্জায় সমবেত হয়ে আরাধনা করে। যখন পৃথিবী সৃষ্টির কাজ পূর্ণতা পায়, তখন ছিল জুমার দিন (শুক্রবার)। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এই দিনকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ঈদ তথা সাপ্তাহিক আনন্দের দিন সাব্যস্ত করেছেন। তাই মুসলমানদের জন্য জুমার দিন (শুক্রবার) ঈদের দিনের মতো। জুমার পর শনিবার দিন ছুটির দিন ছিল, এজন্য ইহুদি সম্প্রদায় এই দিনকে তাদের জন্য ঈদের দিন সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তাই তারা শনিবার দিন তাদের ইবাদাত করে। এদিন তারা কোনো কিছুতে আরোহণও করে না। শুধু পদব্রজে চলে। নিজ হাতে আগুনও জ্বালায় না। এদিন তারা তাদের উপাসনালয়ে যায় এবং নিজেদের আরাধনা করে।

মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রকৃতিতে পার্থক্য

আলোচনার এ পর্যায়ে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝা জরুরি। কিছুসংখ্যক মানুষ যখন কোনো কাজের সূচনা হয়, তখন আনন্দ উদযাপন করে। আবার কিছুসংখ্যক মানুষ যেদিন কোনো কাজের সমাপ্তি ঘটে, সেদিন আনন্দ উদযাপন করে। খৃষ্টানদের প্রকৃতি হলো, যখন তারা কাজ শুরু করে, তখন আনন্দ উদযাপন করে। এজন্য যেদিন সন্তান ভূমিষ্ট হয়, সেদিনটাকে তারা বার্থডে (জন্মদিবস) বলে এবং খুব জাঁকজমকের সাথে তারা জন্মদিবস পালন করে। তারা তাদের জন্মতারিখ সবসময় স্মরণ রাখে এবং জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একে অপরকে উপহার প্রদান করে। যদি কেউ তার কোনো বন্ধুর জন্মতারিখ ভুলে যায়, তাহলে সম্ভবত তাদের কাছে এর চেয়ে বড় অপরাধ

---

১০১. সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ১০

দ্বিতীয়টি নেই। মোটকথা, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজের সূচনায় আনন্দ উদযাপনের রীতি রয়েছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃতি ভিন্ন। মুসলিম উম্মাহের মধ্যে যেদিন কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। সুতরাং আপনারা দেখবেন, যেদিন বড় কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেই দিনটিকে উম্মতে মুসলিমার জন্য স্মরণীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের মুসলিম সমাজে যেদিন কোনো ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়, সেই দিনটি তার জন্য দুনিয়া থেকে ইজ্জত-সম্মানের সাথে ঈমান নিয়ে বিদায় হওয়ার দিন। তাই আমরা জন্মতারিখ স্মরণ না রেখে দুনিয়া থেকে বিদায়ের দিনটি স্মরণ রাখি। আমরা সীরাতুন্নবী মাহফিল করি। আর যাদের প্রকৃতি ভিন্নরকম তারা ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করে।

অমুসলিম বিশ্ব ও জুমার দিন

অমুসলিম বিশ্ব এই দিনটিকে অন্যান্য দিনগুলোর মতো বিভিন্ন শিরকি নামে স্মরণ করে। উদাহরণত–

হিন্দুরা এই দিনটিকে شُكْرْوَار 'শুক্করওয়ার' বলে। 'শীন' পেশ বিশিষ্ট এবং 'কাফ' তাশদীদযুক্ত। شُكْرْ এবং وار এই দুই শব্দ দ্বারা গঠিত এটি। شُكْر (শুক্কর) অর্থ রূপ ও সৌন্দর্য দানকারী দেবতা। এই দেবতাকেই তারা যুহরাও বলে। আর وار (ওয়ার) অর্থ দিন। সব মিলিয়ে অর্থ হলো, যুহরা অথবা শুক্কর দেবতার পূজার দিন। বিস্ময়ের বিষয় হলো, হিন্দুরা এই দেবতাকে মানা সত্ত্বেও শুক্রবার আসাকে অমঙ্গল মনে করে এবং তারা এদিন কোনো ভালো কাজ করে না।

ইংরেজি ভাষায় এই দিনটিকে Fri-day (ফ্রাই ডে) বলে। এটিও দুটি শব্দ Fri ও day এর সমন্বয়ে ঘটিত। ফ্রাই অর্থ ফ্রীকা দেবী, যাকে Wooden God (উডেন গড)- এর স্ত্রী মনে করা হয়। আর ডে অর্থ দিন। সম্মিলিত অর্থ দাড়ায়, 'ফ্রীকা দেবীর পূজার দিন'। উডেন গডের স্ত্রী রোমীয়দের কাছে প্রেম-ভালোবাসার দেবী হিসেবে গণ্য।

মুসলিম বিশ্ব ও জুমার দিন

মুসলমানদের কাছে জুমার দিন অন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা অধিকতর বরকতময় দিন। এজন্যই জুমার দিনকে 'সাইয়্যিদুল আইয়াম' অর্থাৎ দিনসমূহের সর্দার বলা হয়েছে।

সুতরাং হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَفْضَلُ الْاَيَّامِ جُمُعَةٌ

'জুমার দিন দিনসমুহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।'

ইতিহাসে এদিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। যেমন–

হযরত আউস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'নিঃসন্দেহে তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিন। এই দিন হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এদিনই তাঁর ইন্তিকালও হয়েছে।'

এই জুমার দিনই হযরত আদমকে জান্নাত থেকে অবতরণ করানো হয়।

আল্লাহ তা'আলা জুমার দিনেই ফেরেশ্তাদের হযরত আদম (আ.)-এর সেজদা করিয়েছেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা তো আপনারা অনেক শুনে থাকবেন। যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বললেন, এই বস্তুগুলোর নাম বলো, তখন তারা নিজেদের অপারগতা স্বীকার করল এবং বলল–

سُبْحٰنَكَ لا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

'আপনার গুণকীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এতদ্ব্যতিরিক্ত কোনো জ্ঞান আমাদের নেই; নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'[১০২]

তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে তাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং তাঁকে বললেন–

اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ

'তাদেরকে এই বস্তুগুলোর নাম বলে দাও!'[১০৩]

তখন বড়ই চমকপ্রদ একটি অবস্থার সৃষ্টি হলো। একদিকে লাখ-লাখ বছর যাবত ইবাদাতে লিপ্ত ফেরেশ্তাদের জামাত। অপরদিকে গতকাল সৃষ্ট হযরত আদম আলাইহিস সালাম। কিন্তু হযরত আদম (আ.) ময়দানে বিজয়ী হলেন। এর মূল ভিত্তি কী ছিল? এর মূল ভিত্তি এই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা

---

১০২. সূরা বাকারা : আয়াত ৩২

১০৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৩

হযরত আদম (আ.)কে বস্তুগুলোর জ্ঞান দান করেছিলেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষ যে-শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তা ইল্‌মের নূরের বদৌলতে লাভ হয়।

হযরত আদম (আ.) যখন ময়দানে বিজয়ী হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের নির্দেশ দিলেন, আমার এই খলীফাকে সকল ফেরেশ্‌তার সামনে হাজির করো। তারপর তাঁকে সিংহাসনে বসানো হলো এবং সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করানো হলো। হ্যাঁ, যখন কেউ ময়দানে বিজয়ী হয়, তখন পৃথিবীতেও সকল জনগণকে দেখানো হয় যে, দেখো, ইনি ময়দানে বিজয়ী হয়েছেন। সুতরাং যখন হযরত আদম (আ.)কে সমস্ত আকাশে ভ্রমণ করানো হলো, সকল ফেরেশতারা তাঁকে দেখলেন। তারপর নিয়ম হলো, যখন কোনো ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়, তখন তাকে এমন পুরস্কার দেওয়া হয়, যা তার জন্য স্মরণীয়। আপনারাও যখন দাওরায়ে হাদীছের পরীক্ষা দেবেন, তখন আপনাদেরও একটি করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এই সার্টিফিকেটও সেই পরম্পরার একটি কড়া। যার অর্থ হলো, আপনি স্মরণ রাখবেন, আপনি অমুক বছর দাওরায়ে হাদীছের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন। আর যে-ছাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তাকে মাদরাসার পক্ষ থেকে ভিন্ন পুরস্কারও প্রদান করা হয়, যাতে সে নিজবাড়িতে গিয়ে সেখানে এই পুরস্কার সাজিয়ে স্মরণীয় করে রাখে। খেলায় প্রথম হলে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়, যেন সে তা নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখে। মোটকথা, সার্বজনীন রীতি হলো, বিজয়ীদের আকর্ষণীয় ও স্মরণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। যখন হযরত আদম (আ.) ফেরেশ্‌তাদের সাথে মোকাবেলায় বিজয়ী হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে স্মরণীয় পুরস্কার দিলেন।

সেই পুরস্কারটি কী ছিল? সেই পুরস্কারটি ছিল সেজদা, যা শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা অল্পক্ষণের জন্য হযরত আদম (আ.)-এর বেলায় তা বৈধ করে দিলেন এবং ফেরেশ্‌তাকুলকে বললেন–

اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

'তোমরা আদমকে সেজদা করো।'[১০৪]

এক হচ্ছে ইবাদাতের সেজদা। আরেকটা হচ্ছে, তা'যীমি তথা সম্মানসূচক সেজদা। এই সেজদা ছিল তা'যীমি তথা সম্মানসূচক সেজদা।

---

১০৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪

এটি হযরত আদম (আ.)-এর জন্য কত বড় মর্যাদা ও সৌভাগ্য যে, সকল ফেরেশ্‌তা তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁকে সেজদা করেছে। আল্লাহু আকবার!

কতিপয় কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ইসরাফীল (আ.) হযরত আদম (আ.)কে সেজদা করেছেন। দ্বিতীয় নম্বরে হযরত জিবরাঈল (আ.) সেজদা করেছেন। হযরত আদম (আ.)কে সেজদাকরণে অগ্রগণ্যতার দরুন আল্লাহ তা'আলা এই দুই ফেরেশ্‌তাকেও পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছে করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে কেরামকে পুরস্কার দান করবেন, তেমনিভাবে তাদের ইজ্জত-সম্মানকারীদেরও পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা সম্মান্বিত করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর মাথার ওপর কুরআন মাজীদ লিখিয়েছেন। এটা তাঁর মর্যাদা। এছাড়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে যে, তুমি সিঙ্গায় ফুঁ দেবে আর আমি এই বিশ্বব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত করে দেব।

তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)কেও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে আগমন করবে, তুমি তাঁদের কাছে আমার বার্তা ও বাণী নিয়ে যাবে এবং তাঁদের সাহায্য করবে।

আযাযীল এ-সময় সেজদা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ কুরআন মাজীদে এমর্মে বলেন–

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

'সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'[১০৫]

যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি সেজদা করলে না কেন? তখন সে বলল–

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ।'[১০৬]

---

১০৫. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৪

১০৬. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২

ফেরেশ্‌তাদের সকলেই সেজদা করলেন। কিন্তু আযাযীল দাঁড়িয়ে রইল। সে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং এভাবেই সে পৃথিবীর সর্বপ্রথম গাইরে মুকাল্লিদে পরিণত হলো। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, যেহেতু তুমি আদেশ অমান্য করেছ, তাই–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

'বের হয়ে যা এখান থেকে! কেননা, তুই বিতাড়িত।'[১০৭]

তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে জুমার দিনেই পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন এবং এদিনেই তাঁর দু'আ কবুল করেন।

জুমার দিন হযরত ইদরীস (আ.)কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা জুমার দিন তীরে ভিড়ে।

হাদীসের নামে জালিয়াতি ২৩৫ পৃ:

জুমার দিন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্ম হয়।

সাইয়িদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যেদিন নমরুদের অগ্নি থেকে বের করা হলো, সেই দিনটি ছিল জুমার দিন।

যেদিন হযরত ইবরাহীম (আ.) বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণকাজ শুরু করেন, সেই দিনটিও ছিল জুমার দিন।

জুমার দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

হযরত ইসমাঈল (আ.)কে যেদিন আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেওয়ার আয়োজন করা হয়, সেটিও ছিল যিলহজ মাসের দশ তারিখ জুমার দিন।

হযরত ইউসুফ (আ.)কে বণিক কাফেলা যেদিন কূপ থেকে উত্তোলন করে, সেই দিনটি ছিল জুমার দিন। তাঁকে সিরিয়ার কাছে একটি কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে দিয়ে তাদের পিতার কাছে ফিরে আসার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

'তারা রাতে ঈশার সময় কাঁদতে-কাঁদতে পিতার কাছে এল।'[১০৮]

সেই রাতটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য খুবই কষ্টকর রাত ছিল। এক তো একাকিত্ব। দ্বিতীয়ত, নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। তৃতীয়ত, ঘোর

---

১০৭. সূরা হিজর : আয়াত ৩৪

১০৮. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৬

অন্ধকার। রাতে তো এমনিতেই অন্ধকার থাকে। আর কূপের ভেতরে তো আরও নিকষ অন্ধকার। বর্ণিত আছে, যখন সুবেহ সাদেক হলো এবং কিঞ্চিত আলো কূপের ভেতরে প্রবেশ করল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) আশান্বিত হলেন, হয়তো দিনের আলোতে আমাকে বের করার মতো কেউ আসবে। তারপর তিনি দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার বিপদও সহজ করে দিন এবং পৃথিবীতে আরও যারা বিপদগ্রস্ত আছে, সকলের বিপদ সহজ করে দিন!'

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দু'আ কবুল করলেন। তাই আপনারা দেখবেন, মানুষ যতই বিপদগ্রস্ত হোক, রাতে সামান্য ঘুমালে সকালে তার মন-মানসিকতা পূর্বের তুলনায় কিছুটা হালকা থাকে। অসুস্থদের দেখুন, সারা দিন তারা অসুস্থতার দরুন ছটফট করে। কিন্তু সকালে তাদের অসুস্থতা কিছুটা হালকা বোধ হয়। এটি মূলত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দু'আর ফল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহওয়ালাদের দু'আ কবুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দু'আর উসিলায় অনেক বিপদগ্রস্তের বিপদ সহজ করে দেন।

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসে জুমার দিন।

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় এবং তিনি সুস্থতা লাভ করেন, সেটিও ছিল জুমার দিন।

জুমার দিনই হযরত মূসা (আ.) নদী অতিক্রম করেন আর ফেরাউন সেথায় নিমজ্জিত হয়।

হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুল মার্জনা করা হয় এই জুমার দিন।

হযরত সুলাইমান (আ.)কে রাজত্ব প্রদান করা হয় জুমার দিন।

হযরত ইউনুস (আ.) যেদিন মাছের পেট থেকে বের হন, সেই দিনটিও ছিল জুমার দিন।

হযরত ঈসা (আ.) জুমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন এবং এদিনই তাঁকে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়।

যেদিন মক্কা মুকাররমা বিজয় হয় এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন তাঁর অবস্থা ছিল আশ্চর্যকর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি একক। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। সেই একক সত্তাই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।'

সেটিও ছিল জুমার দিন।

যেদিন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ সাহায্য দ্বারা মুসলমানদের ধন্য করেন এবং বিজয়ী করেন, সেই দিনটিও ছিল জুমার দিন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহায্যের আলোচনা এভাবে করেছেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'অবশ্যই আল্লাহ বদরে তোমাদের সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল।'[১০৯]

জুমার দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

জুমার দিনের নামকরণের হেতু

ইসলামপূর্ব যুগে জুমার দিনটিকে يَوْمُ الْعَرُوْبَةِ (ইয়াউমুল আরূবাহ) বলা হতো। যার ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'মহত্ত্বের অধিকারী উন্মুক্ত দিন'। ইসলাম এই দিনটির নাম يَوْمُ الْجُمُعَةِ (জুমার দিন) রেখেছে। الجمعة শব্দটি جَمْعٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে অনেক কিছুর সমাবেশ বা একত্রিকরণ। এই দিনে বেশ কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক কিছুর সমাবেশ ঘটার বাস্তবতা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ–

জুমার দিনের নামকরণের হেতু সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِيْهِ جُمِعَتْ طِيْنَةُ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ

'এই দিন তোমাদের পিতা আদমের মাটি একত্রিত করা হয়।'

এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করেন, হে সালমান! জুমার দিন কী? তিনি নিবেদন করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এটি সেই দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাতাপিতা হযরত আদম ও হযরত হাওয়াকে পৃথিবীতে একত্রিত করেন।

---

১০৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩

জুমার প্রতি গুরুত্বারোপের ফযীলত

জুমার দিন মহল্লার সকল মুসলমান এক জায়গায় সমবেত হয়ে জুমার নামায আদায় করেন। আল্লাহ তা'আলা এই সমবেত হওয়াকে এত পছন্দ করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

'হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের (নামায) দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে দাও।'[১১০]

লক্ষ্য করুন, ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কাজ। তারপরও এ সম্পর্কে বলে দেওয়া হয়েছে, যখন আযান হয়ে যায়, তখন এসব কাজ বর্জন করে মসজিদে যাও। যদি না যাও, তাহলে বৈধ কাজও তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাই জুমার দিন মসজিদে আগমনের এত ফযীলত। যারা জুমার নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি খুবই খুশি হন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি জুমার নামায গুরুত্বসহকারে আদায় করে, গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত তার দ্বারা সংঘটিত সকল গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। স্মরণ রাখবেন, জুমার নামাযের আযান হওয়ার পূর্বেই নখ কেটে এবং শরীরের অবাঞ্ছিত পশম পরিষ্কার করে গোসল সম্পন্ন করা, নতুন কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধ ব্যবহার করা এবং সময় হওয়ার আগেই মসজিদে চলে আসাকে জুমার নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ বলা হয়।

কবুলের মুহূর্ত

আল্লাহ তা'আলা জুমার দিন কবুলিয়াতের একটি মুহূর্ত রেখেছেন, যাতে ইবাদাতগুজার লোকজন এদিন খুব ইবাদাত করে। আল্লাহ তা'আলা কবুলিয়াতের সেই মুহূর্তটুকু গোপন রেখেছেন। যদি গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে মানুষের মধ্যে অগ্রগণ্যতা লাভ এবং অনুসন্ধানের স্পৃহা থাকত না। এজন্য তিনি তা গোপন রেখেছেন। আর এ কারণেই সেই মুহূর্তটির বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে।

---

১১০. সূরা জুমু'আ : আয়াত ৯

যেমন–

কোনো-কোনো বর্ণনায় এসেছে, খতীব সাহেব দুই খুতবার মাঝে যখন বসেন, সেই সময়টি দু'আ কবুলের সময়। অর্থাৎ– এ-সময় যেকোনো দু'আ করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন।

সাইয়্যিদা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাযি.) বলেন, জুমার দিন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টুকু দু'আ কবুলের সময়। শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন, এই বর্ণনাটি সহীহ যে, হযরত ফাতেমা (রাযি.) জুমার দিন এক সেবিকাকে নির্দেশ দিতেন, যখন জুমার দিন শেষ হতে চলে, তখন যেন তাঁকে অবহিত করে, যাতে তিনি এ-সময় যিকির ও দু'আয় লিপ্ত হতে পারেন।

'শারহু সাফারিস সা'আদাত' কিতাবে কবুলিয়াতের মুহূর্ত সম্পর্কে চল্লিশটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তবে তন্মধ্যে দুটি উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে, খুতবা শুরু থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দিনের শেষ ভাগ। এই দ্বিতীয় উক্তিটি ওলামায়ে কেরামের অনেকেই গ্রহণ করেছেন এবং অনেক সহীহ হাদীছ এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

এবার বলুন, আমাদের জন্য বিষয়টি কত সহজ হয়ে গেল। আমরা যারা পূর্ণ সপ্তাহ হয়রান-পেরেশান হয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি, আমরা কি জুমার দিন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়টুকু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের কাজে লাগাতে পারি না?

জুমার বিশেষ পোশাক

হাদীছের প্রসিদ্ধ কিতাব সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রহ.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদের মধ্যে কারও কি কোনো অসুবিধে আছে যদি সে প্রত্যহ পরিহিত পোশাকের বাইরে দুটি কাপড় জুমার জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের কাজের সময় ব্যবহৃত চাদর পরিহিত দেখতে পান, তখন এ কথা বললেন। ইরশাদ করলেন, যদি তোমাদের মধ্যে সামর্থ্য থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তা করবে।

জুমার নামাযের পর ব্যবসায় বরকত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

'যখন নামায আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো।'[১১১]

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, যখন ঈরাক ইবনে মালিক (রহ.) জুমার নামাযান্তে মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এই দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِيْ فَارْزُقْنِيْ مِنْ فَضْلِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি এবং আপনার ফরজ নামায আদায় করেছি এবং আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমি বের হলাম। সুতরাং আপনি আপনার অনুগ্রহে আমাকে রিযিক দান করুন। আপনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।'

তারপর শফী সাহেব বলেন, কতিপয় সালফে সালিহীন বলেছেন, যেব্যক্তি জুমার নামাযের পর ব্যবসা-বাণিজ্য করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাযিল করেন।

জুমার নামাযপড়ুয়াদের নাম অন্তর্ভুক্তি

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন জুমার দিন শুরু হয়, তখন মসজিদের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতা এসে যান এবং মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের নাম ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। ইমাম আসা পর্যন্ত এই লেখা চলতে থাকে। যখন ইমাম চলে আসেন, তখন তাঁরা লেখা বন্ধ করে কাগজ ভাঁজ করে ফেলেন এবং খুতবা শোনেন। নামাযের জন্য প্রথম যে আসে সে এমন যেমন উট কুরবানিকারী। দ্বিতীয়জন গাভি কুরবানিকারীর মতো। এমনকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরগি ও ডিমের কথাও উল্লেখ করেছেন।

---

১১১. সূরা জুমু'আ : আয়াত ১০

অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ার হুকুম

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যেব্যক্তি জুমার দিন আছর নামায আদায়ের পর স্থান ত্যাগ না করে, আশিবার একটি দরূদ পড়বে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং আশি বছরের ইবাদাতের ছাওয়াব তার আমলনামায় যোগ হবে। দরূদ শরীফটি হলো এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ يَوْمِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ صَاعِقَةٌ, فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ.

'তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমার দিন। এদিনই হযরত আদম সৃজিত হয়েছেন। এ দিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, এদিনই সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এদিনই কেয়ামত হবে এবং তিনি পুনরুত্থিত হবেন। সুতরাং (এ দিন) আমার ওপর বেশি-বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করো।'

সুতরাং জুমার দিন বেশি-বেশি দরূদ শরীফ পড়া চাই। এটা খুবই সহজ কাজ। আমরা অভ্যাস করে নেব, সপ্তাহে একদিন তথা জুমার দিন আসর নামাযের পর পুরুষগণ মসজিদে, মহিলা ও মেয়েরা ঘরে আশিবার দরূদ শরীফও পড়ব এবং তারপর মাগরিব পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে দু'আ করব।

আমাদের অবস্থা হলো, যদি আমরা সামান্যতম দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হই, তাহলে কখনও ঝাড়-ফুঁককারীদের কাছে ছুটে যাই; কখনও জাদুটোনার লোকদের পেছনে ছুটে চলি। এভাবে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো নিজেদের ঈমান বিনষ্ট করে বসি। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষকে ছোট খোদা (নাউজুবিল্লাহ) মনে করবেন না। কিছুসংখ্যক লোক তো এত আহম্মক যে, বলে থাকে, কেউ আমার রিযিক বেঁধে ফেলেছে। (নাউজুবিল্লাহ)। হে আল্লাহর বান্দা! রিযিকদাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কারও সামর্থ্য আছে এই রিযিকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? অনেকে বলে থাকে, কেউ আমার মেয়ের বিয়ে বাঁধ দিয়েছে। মানুষ এসব বিষয়ে নিজের ঈমান কীভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে! মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো সৃষ্টি কখনওই কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ

'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, সকল কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।'[১১২]

আমাদের নিজেদের মন্দ কার্যকলাপের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে ওঠানামা করে। আর আমরা বলে বেড়াই, কেউ আমাদের ব্যবসায় বাঁধ দিয়েছে। অতএব ঝাড়-ফুঁক ও জাদুটোনার লোকদের কাছে কখনও যাবেন না। বরং দু'আ কবুল হওয়ার যে মুহূর্তগুলো আছে, সেগুলোতে নিজেদের প্রভুর কাছে ভালোভাবে প্রার্থনা করবেন। তারপর দেখবেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিপদাপদ কীভাবে দূর করেন।

জুমা ও জুমার রাতের বরকত

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– জুমার দিন উজ্জ্বল ললাটবিশিষ্ট দিন এবং জুমার রাত দীপ্যমান রাত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন, জুমার রাতের ফযীলত কদরের রাত অপেক্ষা বেশি। কেননা, এই রাতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র মাতৃগর্ভে আগমন করেন। আর তাঁর আগমন ইহকাল এবং পরকালে এত কল্যাণ ও বরকতের মাধ্যম হয়, যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন, প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের সময় জাহান্নামকে তীব্র করা হয়। তবে জুমার বরকতে জুমার দিন তা করা হয় না।

জুমার দিন সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াতের ফযীলত

জুমার দিন সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেতনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকবে। যদি এর মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাহলে দাজ্জালের ফেতনা থেকেও নিরাপদ থাকবে। কোনো বর্ণনায় এসেছে, যেব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করবে, তার পা থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কেয়ামতের দিন আলো দেবে এবং পূর্বের জুমা থেকে উক্ত জুমা পর্যন্ত তার দ্বারা সংঘটিত সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

---

১১২. সূরা নিসা : আয়াত ৭৮

জুমার খুতবার ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা চান, সকল মানুষ জুমার দিন মসজিদে আসুক এবং খতীবের খুতবা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুক। খতীব যে খুতবা দেন, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে এত প্রিয় যে, তিনি তাঁর প্রাপ্য চার রাকাত – যা আমরা প্রত্যহ যোহরের সময় আদায় করি – কমিয়ে দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন, হে আমার বান্দারা! আজ তোমরা চার রাকাত ফরজের স্থানে দুই রাকাত ফরজ পড়বে। বাকি দুই রাকাতের পরিবর্তে মনোযোগের সাথে খতীবের খুতবা শ্রবণ করবে। আমি এর ওপরই সন্তুষ্ট হয়ে যাব। এর কারণ হলো, জুমায় অনেক মানুষ একত্রিত হওয়ার ভিন্ন একটি মর্যাদা রয়েছে। একস্থানে সমবেত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

সুলতান মাহমুদ ও তাঁর গোলাম আয়ায একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেল
না কেউ গোলাম থাকল, না কেউ মনিব থাকল।
গোলাম ও মনিব, মুখাপেক্ষী ও ধনী সব হয়ে গেল এক
আপনার দরবারে পৌঁছলে সবাই হয়ে যায় এক।

জুমার খুতবার সারনির্যাস

খতীব সাহেব জুমার খুতবায় যে আলোচনা করেন, খুতবার শেষ পর্যায়ে এর সারনির্যাস অতি সংক্ষেপে এই উপস্থাপন করেন–

وَلَذِكْرُ اللهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَجَلُّ وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

'আল্লাহ তা'আলার যিকির সর্বাপেক্ষা উঁচু, সর্বোত্তম, মহিমান্বিত, পূর্ণতম, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সুমহান। আল্লাহ তা'আলা তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।'

অনুমান করুন, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতকে স্মরণের গুরুত্ব কত!

খতীবের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার মূল্যবান পুরস্কার

দেখুন, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে। রুকূতে দু-পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। বৈঠকের মধ্যে নিজ কোলে দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে। শরীয়ত দৃষ্টিপাতের বিষয়টিকে এভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছে এজন্য যে, নামাযে একাগ্রতা এবং ছাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে এগুলো তোমাদের জন্য খুবই উপকারী। এমনিভাবে বলা হয়েছে, খতীব সাহেব যখন খুতবা পড়েন, তখন তোমাদের উচিত খতীব সাহেবের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন তোমাদের অনন্য এক নেয়ামত (আল্লাহর দিদার) দান করা হবে।

اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں

سنا ہے کل ترے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا

'অনুমতি হলে আমিও তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাব

শুনেছি আগামী কাল তোমার দরজায় প্রেমিকদের ভিড় হবে।'

সেই নেয়ামতটি কী? একটু লক্ষ্য করুন। জুমার খুতবার এত গুরুত্ব এজন্য যে, এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা পরকালের নমুনা পেশ করেছেন। উদাহরণ–

এই পৃথিবীর ঘর পরকালের ঘরের নমুনা। পরকালের ঘর পৃথিবীর ঘরের মতোই হবে। যদিও প্রশস্ততা ও গুণগত মানে সেগুলোর দৃষ্টান্ত কেবল সেগুলোই। আমাদের পক্ষে তার কল্পনা করাও অসম্ভব। লাল ইয়াকূত ও স্বর্ণ-রুপার ইট দ্বারা নির্মিত হবে। ইট গাঁথায় সিমেন্ট-বালুর জায়গায় মশকের মশলা লাগানো হবে। অত্যন্ত মনোরম হবে। এগুলো সবই নিজ-নিজ স্থানে সঠিক। কিন্তু ঘরগুলো এমন হবে যে, সেগুলোতে আরাম-আয়েশ করার জায়গাও থাকবে এবং মেহমানখানাও থাকবে।

ফলের বিষয়টিও এমনই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

'এবং তাদের সাদৃশ্যপূর্ণ ফল প্রদান করা হবে।'[১১৩]

---

১১৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫

জান্নাতের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। ডালিমের আকৃতি, দুনিয়ার ডালিমের মতোই হবে। নাশপাতি, আপেল এবং কলাও একই রকম হবে। কিন্তু এগুলোর স্বাদ ও গুণগত মানের কল্পনাও আমরা করতে পারব না।

পরকালের রমণীগণ ইহকালের রমণীদের মতোই হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবকিছু একই থাকবে। যদিও পরকালের রমণীদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য ব্যতিক্রম হবে। এমনিভাবে দুনিয়ার রমণীগণ যখন জান্নাতে যাবে, তখন তাদের রূপ-লাবণ্য জান্নাতি হুরদের চেয়ে বেড়ে যাবে। কিন্তু চেহারা-সুরতে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

দুনিয়াতে যখন দস্তরখান বিছানো হয়, তখন এর পদ্ধতি হয়, প্রথমে তাতে পানির পাত্র-পেয়ালা রাখা হয়। তারপর ফলফ্রুট পরিবেশন করা হয়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ.

'এবং পছন্দনীয় ফলফলাদি।'[১১৪]

সুতরাং দেখুন, দস্তরখানে পানির পর শুকনো ফলফলাদির আইটেম আসে। তারপর দুনিয়াতে রান্না করা খাবার আসে, খাবারের ডিস আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

'এবং পাখির গোশ্ত, যা তাদের মনঃপূত হবে।'[১১৫]

মাশাআল্লাহ এবার রান্না করা খাবার এসে গেল।

দুনিয়াতে দাওয়াত খাওয়ার পর মুমিনগণ নিজ-নিজ বাসাবাড়ি গিয়ে স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা পরকালের ব্যাপারে সামনে বলছেন–

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

'আরও থাকবে ডাগরনয়না হুর। তারা দেখতে যেন স্তরে-স্তরে সাজানো সংরক্ষিত মণি-মুক্তার মতো।'[১১৬]

---

১১৪. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ২০
১১৫. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ২০
১১৬. সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত ২২, ২৩

সুতরাং যে-বিন্যাস এবং ব্যবস্থা ইহকালে রয়েছে, সেই বিন্যাস-ব্যবস্থাই আল্লাহ তা'আলা পরকালে রেখেছেন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত ও কুদরত দ্বারা যেসব নেয়ামত ঈমানদারদের পরকালে দেবেন, তিনি সেগুলোর প্রতিচ্ছায়া ইহকালেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

জান্নাতের যেসব নেয়ামতের প্রতিচ্ছায়া আল্লাহ তা'আলা ইহকালে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেগুলোর বাইরে আরও একটি নেয়ামত অর্জিত হবে। সেটি হলো, মুমিনগণ মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। বরঞ্চ মন তো চায় এখনই দেখতে। তাই কবি বলেন–

کبھی اے حقیقت منتظر! نظر آ لباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبیں نیاز میں

'এই বান্দার মন চায়, আমার সুযোগ মিলে যাক এবং এখনই আমি সেজদা করি; হাজারো সেজদা ছটফট করছে আমার ললাটে।'

نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے

دل نادان کی خواہش ہے یہیں ہوتی ابھی ہوتی

'তিনি দেখা দেওয়ার ওয়াদা করেননি, হাশরের পূর্বে

নির্বোধ মনের বাসনা, দেখা এখানেই হতো এবং এখনই হতো।'

মন তো চায় মাওলার দিদার এখানেই হতো এবং এখনই হতো। কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই। অবশ্য যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে, তখন জান্নাতিগণ বলবেন, ইয়া আল্লাহ! এখন তো আমরা মিলনস্থলে (জান্নাত) পৌঁছে গেছি। আর নিয়ম হলো, মিলনস্থলে পৌঁছে গেলে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ লাভ হয়। সুতরাং এখন দুনিয়ার রীতিও আছে, ওয়াদাও আছে, নিয়মও আছে। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর করুণা করুন এবং আপনার দিদার দান করুন। মুমিনদের এই নিবেদন কবুল করে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে ঈমানদারগণ! তোমারা আমার দিদার লাভের জন্য প্রস্তুতি নাও।

আল্লাহর দিদার

ইহজগতে মানুষ যেমন বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়– গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং ভালো পোশাক পরিধান করে বিয়ে ও অলিমার দাওয়াতে

আসে, ঠিক তেমনিভাবে জান্নাতেও জান্নাতিগণ প্রস্তুতি নেবেন। জান্নাতিগণ একটা বাজারে যাবেন, সেখানে গিয়ে তারা নিজ-নিজ মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী রূপ-লাবণ্য এবং সৌন্দর্য লাভ করবেন। ইহজগতে তো আল্লাহ তা'আলা যে অবয়ব দিয়ে প্রেরণ করেন, তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যায় না। ছোট চোখ বড় করা যায় না এবং বড় চোখ ছোট করা যায় না। লম্বা চেহারা গোল করা যায় না এবং গোলগাল চেহারা লম্বা করা যায় না। কিন্তু সেই বাজারে জান্নাতিগণ নিজ চেহারার আকর্ষণ ও সৌন্দর্যের জন্য যেমনটি ভাববে তৎক্ষণাৎ তেমনটি হয়ে যাবে। যেমন চেহারা কামনা করবে, তেমনই হয়ে যাবে। তাতে সৌন্দর্যের যত আকর্ষণীয় উপকরণ কামনা করবে, সবই হয়ে যাবে। এমনকি চোখ, চোখের পাতা, ভ্রূ, ঠোঁট এবং দাঁতও তাদের পছন্দমতো হয়ে যাবে। এবার একটু চিন্তা করুন, কেউ যদি কাল্পনিক এবং ধারণা মোতাবেক সৌন্দর্য পেয়ে যায়, তাহলে সেই সৌন্দর্য কত চমকপ্রদ হবে।

বড় ময়দানে উপস্থিতি

জান্নাতিগণ পোশাক পরিধান করে নিজ-নিজ মনোবাসনা মতো সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য লাভ করার পর জান্নাতের সেই স্থানে পৌঁছবে, যেখানে আল্লাহর দিদার লাভ হবে। সেথায় একটি সমুদ্র থাকবে। সমুদ্রতীরে দাওয়াতের ব্যবস্থা থাকবে। সেথায় নূরের তৈরি আসন ও চেয়ার থাকবে। সেগুলোতে আল্লাহর দিদার পাওয়ার জন্য জান্নাতিদের বসানো হবে। প্রথমে বসবেন নবীগণ, তারপর সিদ্দীকগণ, তারপর শহীদগণ এবং তারপর সৎকর্মপরায়ণশীল উম্মতগণ। প্রথমে হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনাবেন তারপর সাইয়িদুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনাবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজ বাণী থেকে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে শোনাবেন। আল্লাহু আকবার! কিঞ্চিত কল্পনা করুন, এটা কেমন চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বিষয়। মানুষ কল্পনা করে ব্যাকুল হয়ে যায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলার দিদার হবে। যেহেতু এই অনুষ্ঠান জান্নাতের বড় ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে আল্লাহ তা'আলা দিদার লাভ হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইহজগতে জুমার সমাবেশকে জান্নাতি সেই সমাবেশের নমুনা বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যেসব মুমিন ইহজগতে জুমার নামায যথাযথভাবে আদায় করবে, তারা এর মূল্যবান প্রতিদান পাবেন।

দিদার লাভের সময়কার অবস্থা

হযরত কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যব সাহেব (রহ.) একটি চমৎকার বিষয় লিখেছেন। তিনি বলেন, যে-মুমিন কামনা করবে, জুমার নামাযে আমার যে অবস্থা হবে, এই অবস্থায়ই আমি জান্নাতের সেই দিনে দিদার লাভের সময় আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হব। তার জন্য উচিত, সে যেন প্রত্যেক জুমার দিন সময় হওয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করে এবং যথাসম্ভব খতীবের একেবারে কাছাকাছি বসে। যিনি জুমার মজলিসে খতীব সাহেবের যত কাছে বসার যেমন চেষ্টা করবেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিশাল ময়দানে সেই অনুপাতে তাকে কাছে বসাবেন। তাই আপনারা জুমার নামাযে এমন স্পৃহা নিয়ে আসবেন, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের জান্নাতের বিশাল ময়দানে তাঁর দিদার দানের জন্য ডেকেছেন এবং প্রেমাস্পদের দিদারের জন্য আমাদের সর্বাগ্রে গিয়ে বসতে হবে। খতীব সাহেবের চেহারার প্রতি মনোযোগী হয়ে বসবেন। কেননা, আমরা যদি জুমার খুতবার সময় খতীব সাহেবের চেহারার দিকে মনোনিবেশ করে থাকি, তাহলে জান্নাতের বিশাল ময়দানে দিদারের মজলিসেও আল্লাহ তা'আলা আমাদের এভাবেই তাঁর দিদার লাভের তাওফীক দান করবেন।

এ বিষয়ে ইমামে রাব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) একটি চমৎকার সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, দুনিয়াতে মানুষ যেমন নামায আদায় করবে, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভের অবস্থাও হুবহু তেমনই হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নামাযে যাদের এদিক-সেদিক খেয়াল আসবে; কিন্তু তারা সেসব খেয়াল দূরীভূত করে দুনিয়ার ধ্যান-খেয়ালমুক্ত অবস্থায় নামায পড়ার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদের কোনো পর্দা ছাড়াই দিদার দান করবেন। আর যারা দুনিয়ার ধ্যান-খেয়াল দূর করার চেষ্টা করবে না; বরং এ অবস্থায়ই নামায পড়বে, জান্নাতে যখন তাদের দিদার লাভ হবে, তখন মাঝখানে নূরের কিছু পর্দা পড়ে যাবে এবং পর্দাহীন অবস্থায় তারা আল্লাহর দিদার পাবে না। এজন্য প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন নামায পড়ার তাওফীক দান করুন, যে নামাযে আমার অন্তরে দুনিয়াবি কোনো ধ্যান-খেয়াল না আসে। এই নেয়ামত লাভ করা যদিও বড়ই কঠিন; কিন্তু যারা চেষ্টা চালিয়ে যান, তাদের আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দেন। আপনারা ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে

আলফেছানী (রহ.)-এর কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। যেব্যক্তি দুনিয়াতে এরূপ নামায পড়ার চেষ্টায় লেগে থাকবে, সে যদি উক্ত নেয়ামত পেয়ে যায়, তাহলে তো উত্তম। আর যদি না-ও পায়, তাহলে চেষ্টা করার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাকে বঞ্চিত করবেন না। সুতরাং যেব্যক্তি দুনিয়াতে এরূপ নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাকে কোনো পর্দা ছাড়াই তাঁর দিদার নসিব করবেন। তিনি আবরণহীন দিদার পাবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, সেই দিদার হবে দিকহীন, সাদৃশ্যহীন, আকৃতিহীন, দৃষ্টান্তহীন। সেই দিদার কেমন হবে এ সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারব না।

আল্লাহর দিদারের পরিচিতি

আল্লাহর দিদার সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বিস্ময়কর অনেক বিষয় লিখেছেন। একটি বিষয় তো এই লিখেছেন যে, জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জান্নাতি সৃষ্টজীবের (হুর-গেলমান তথা সেবক-সেবিকা) সৌন্দর্য অবলোকন করবে, তখন তারা এত বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করতে থাকবে যে, সময় বয়ে যাওয়ার অনুভূতিও তাদের থাকবে না। এমনকি সত্তর বছর পর্যন্ত তারা হতভম্ব হয়ে তাদের দেখতে থাকবে। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা বিশাল ময়দানে তাদের তাঁর দিদার দান করবেন, তখন ধূলিঝড় এলে যেমন সবকিছুতে মাটির আস্তর পড়ে যায়, তেমনি জান্নাতিদের ওপর নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তাদের চেহারায় নূরের স্তর বসে যাবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পাবে যে, তারা প্রস্থান করে নিজ-নিজ ঘরে আসার পর সেসব জান্নাতি সৃষ্টজীব (হুর-গেলমান) যখন তাদের দেখবে, তখন তারা এত বিস্মিত হবে যে, সত্তর বছর পর্যন্ত তারাও হতভম্ব হয়ে তাদের দেখতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ! জান্নাতবাসীদের রূপ-লাবণ্য এবং সৌন্দর্য এত বৃদ্ধি পাবে!

নিয়মও তাই। খাদেম খাদেমের মতোই হয় এবং মনিব মনিবের মতোই হয়। সেখানকার হুর ও গেলমান যারা জান্নাতবাসীদের খাদেম-খাদেমা তারা যদি এত সুন্দর-সুন্দরী হয়, তাহলে মুমিন যারা জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানকার মনিব হবেন, তাদের রূপ-সৌন্দর্যের কী অবস্থা হবে!

এবার ভাবুন! যে মহান সত্তা রূপ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজের রূপ-সৌন্দর্য কেমন হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اللّٰهُ جَمِيلٌ

'আল্লাহ তা'আলা অতিশয় সুন্দর।'

ইয়া আল্লাহ! তারা কত সৌভাগ্যবান হবে, যারা আপনার দিদার পাবে। সেই চোখ কত সৌভাগ্যবান হবে, যে চোখ জান্নাতে আপনাকে অবলোকন করবে!

حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن

جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ

'আপনার দিদার লাভের দিন অবস্থা কী হবে তাদের

আপনার নাম শুনে আবেগাপ্লুত হয় যাদের অন্তর।'

হে আল্লাহ! আপনার নাম শুনে যারা দুনিয়াতে ছটফট করতে থাকে, যখন তারা জান্নাতে আপনাকে সরাসরি অবলোকন করবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে?

এ-বিষয়ে হযরত আকদাস থানভী (রহ.) একটি চমৎকার বিষয় লিখেছেন। সেটি পড়ে অন্তর প্রসন্ন হয়ে যায়। হযরত লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা দিদার করাবেন আর জান্নাতিগণ দিদার লাভ করবেন। এখন এখানে প্রশ্ন জাগে, এই দিদার কীভাবে সমাপ্ত হবে? প্রশ্ন এ কারণে জাগে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা নিজে দিদার করানো শেষ করে দেন, তাহলে এতে কৃপণতার সাদৃশ্য হয়ে যায় যে, দিদার লাভকারীগণ তো দেখছিলেন; কিন্তু দিদার করানেওয়ালা নিজেই আবৃত হয়ে গেলেন। আর যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দিদার করাতে থাকবেন; কিন্তু জান্নাতিগণ দিদার লাভ করা বন্ধ করে দেবেন, তাহলে ইহা মুমিনদের জন্য তিরস্কারের কারণ হবে যে, তারা কেমন প্রেমিক, প্রেমাস্পদ আত্মপ্রকাশ করেছেন আর তারা অন্য কিছুর দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেছে? হযরত থানভী (রহ.) বলেন, একটু চিন্তা করুন, যখন একটা মাছি কোনো দোকানে মিষ্টির ওপর বসে, তখন মিষ্টির মালিক মাছিটাকে বারবার উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাছি এই মিষ্টির দোকান থেকে পিছু সরে না।

تو خواہی آفتیں افشاں و خواہی دامن اندر کش

مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی

'তুমি চাইলে বিপদে ফেলো আর চাইলে মুত্যুর মুখে ফেলো
মাছি কখনও মিষ্টির দোকান থেকে সরবে না।'

যদি মধুমক্ষিকা মিষ্টি ও মিষ্টির ঘর ছাড়তে প্রস্তুত না হয়, তাহলে আল্লাহর প্রেমিক মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ করা কীভাবে ছেড়ে দেবেন?

হযরত আকদাস থানভী (রহ.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামকে তার মারেফাত তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন। তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লি তথা জ্যোতি দু-ধরনের। একটি জালালি তাজাল্লি তথা ভীতিকর জ্যোতি; অরপরটি জামালি তাজাল্লি তথা সৌন্দর্যের জ্যোতি। আল্লাহ তা'আলা যখন জামালি তাজাল্লি তথা সৌন্দর্যের জ্যোতি ছড়াবেন, তখন সকল মুমিন তাঁর দিদার লাভে ব্যস্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছে করবেন, তখন জালালি তাজাল্লি তথা ভীতিকর জ্যোতি ছড়াবেন, তখন সকল মুমিন জান্নাতের নেয়ামত অবলোকনে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তারপর আবার যখন আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্যের জ্যোতি ছড়াবেন, তখন আবার জান্নাতের নেয়ামত থেকে সরে আল্লাহর দিদার লাভে ব্যস্ত হবে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিদার দিতে থাকবেন।

কাউকে আল্লাহ তা'আলা বছরে একবার তাঁর দিদার দান করবেন। কাউকে প্রত্যেক জুমার দিন দিদার নসিব করবেন। আবার একদল জান্নাতি এমন থাকবেন, যাদের প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার দিদার নসিব হবে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এক ব্যক্তি এমন হবে, যে দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে আল্লাহ তা'আলার বণ্টনের ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং সৎ ও তাকওয়ার জীবন যাপন করে। এই অন্ধকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে সর্বক্ষণ তাঁর দিদার নসিব করাবেন এবং বলবেন, এই ব্যক্তি আমার সেই বান্দা, যে ইহজগতে আমি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখেনি। সুতরাং সে আজ প্রাণভরে আমার দিদার লাভ করবে। সুবহানাল্লাহ!

মাঅরাউন্নাহার এলাকার ওলামায়ে কেরামের আমলি অভ্যাস

আমরা মাঅরাউন্নাহার অর্থাৎ বুখারা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ওলামায়ে কেরামের এই আমল দেখেছি যে, তাঁরা জুমার দিন দশটার সময় মসজিদে

এসে যান। এক জুমা আমার পড়ানোর কথা ছিল। আমি সফর থেকে সেখানে ফিরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছিলাম। এজন্য চিন্তা করলাম, মাত্র সকাল আটটা বাজে। তাই নাস্তা করে ঘুমিয়ে যাই। সুতরাং নাস্তা করে ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর যখন দশটা বাজল, তখন জাগ্রত হয়ে উজু করার জন্য রুম থেকে বের হই। বের হয়ে দেখি, পূর্ণ মসজিদ লোকে ভরে গেছে। এ দৃশ্য দেখে আমি এই ভেবে বিচলিত হই যে, না জানি কী হয়েছে। আমার খেয়াল হলো, হতে পারে কেউ ইন্তিকাল করেছে অথবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। তারপর আমি মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজকে লোকজন দশটা বাজে মসজিদে সমবেত হয়ে গেল কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের এখানখার এটিই নিয়ম। এখানকার ওলামায়ে কেরাম জুমার দিনকে জান্নাতে দিদার লাভের সেই দিনের প্রতিচ্ছবি মনে করে আসছেন এবং তারা বলেন, যেন আজ আল্লাহ তা'আলার দিদার হবে। যদি আজকে আমরা সময়ের পূর্বে মসজিদে চলে যাই, তাহলে জান্নাতেও দিদার লাভের বিশাল ময়দানে আমাদের এভাবে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে। সুবহানাল্লাহ!

এ-সময় আমাদের দেশের যুবকদের কথা আমার মনে পড়ল। যদি একটা বাজে জুমার জামাত শুরু হয়, তাহলে তারা বলে, ১২টা ৫৫মিনিটে ঘর থেকে বের হব, পাঁচ মিনিটে মসজিদে পৌঁছে যাব এবং নামায পড়েই ফিরে আসব। মুফতী সাহেব বললেন, এসব লোক ১০টা বাজে মসজিদে পৌঁছে যান। এভাবে দুই-তিন ঘন্টা আগে এসে তারা নফল নামায পড়েন, তেলাওয়াত করেন, দরূদ শরীফ পড়েন, সালাতুত্ তাসবীহ পড়েন এবং অনুতাপ-অনুশোচনার সাথে এস্তেগফার করতে থাকেন। তারপর জুমার নামায শেষ হলে নিজ-নিজ বাসাবাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমাদেরও এত উত্তমভাবে জুমার নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

[খুতুবাতে যুলফিকার ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত]

খুতুবাতে যুলফিকার
চতুর্দশ খণ্ড

আল্লাহর সাথে উন্মাতাল সম্পর্ক

'আল্লাহ তা'আলা কী চান? আল্লাহ তা'আলা চান, আমার সাথে আমার বান্দার উন্মত্ত তথা পাগলামি জাতীয় সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাক। এ কথা আমি নিজ থেকে বলছি না। সত্যবাদী সংবাদদাতা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করে এ কথা বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন–

اُذْكُرُوا اللّٰهَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّهُ مَجْنُوْنٌ

'তোমরা আল্লাহর এত যিকির করো, যেন লোকজন বলে, সে তো পাগল।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দা থেকে তাঁর সাথে পাগলামি ধরনের সম্পর্ক চান। আর উন্মত্ত সম্পর্ক স্থাপনের পর ফরজ আদায়ের মাধ্যমে স্বাদ পূর্ণ হয় না। বরং ফরজের পর ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং তারপর মুরাকাবায় বসতেও অন্তর পাগল হয়ে যায়।'

আল্লাহর সাথে উন্মাতাল সম্পর্ক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

মহব্বতের বীজ

محبت (মহব্বত) আরবি শব্দ। কতিপয় ওলামায়ে কেরামের মতে محبت শব্দ حبة (হাব্বাহ) শব্দ থেকে উদ্‌গত। حبة (হাব্বাহ) অর্থ হলো বীজ। সকলেই জানেন, যেকোনো বীজ যদি উপযোগী জমিন এবং উপযোগী পরিবেশ পেয়ে যায়, তাহলে চারা জন্মে ফুল-ফল উৎপন্ন করে। এমনিভাবে মহব্বতের স্পৃহা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বভাবগতভাবে বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার গ্রহণের দিন মানবজাতির মধ্যে এই বীজ রেখেছিলেন। সেই দিনকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত রূহ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সমস্ত রূহ উত্তরে বলেছে, হ্যাঁ। অর্থাৎ হে প্রভু! হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু।

মহব্বত কীভাবে হয়?

মহব্বত দুভাবে হয়। কখনও দেখার মাধ্যমে হয় এবং কখনও কথার মাধ্যমে হয়। দেখাও মহব্বত সৃষ্টির মাধ্যম হয়, কথাও মহব্বত সৃষ্টির মাধ্যম

হয়। এজন্যই যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেননি। কেবল হযরত মূসা (আ.) স্বতন্ত্র। তিনি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন–

رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ

'হে প্রভু! আমি আপনাকে দেখতে চাচ্ছি।'

সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালামের মধ্যে শেষ দিকে হযরত মূসা (আ.) এরূপ কেন বললেন? ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) ছিলেন 'কালীমুল্লাহ' (আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী)। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কথা বলতেন। আর যখনই কারও সাথে সরাসরি কথোপকথন হয়, তখন তাকে দেখার এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা জাগে। মোটকথা, কথার মাধ্যমে মহব্বত সৃষ্টি হয়। সাথে-সাথে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে মহব্বত গাঢ় ও গভীর হয়।

মহব্বত সৃষ্টির উভয় মাধ্যম তথা নেয়ামত মানবজাতি সেই দিন লাভ করেছে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত রূহের সামনে তাঁর জ্যোতি ছড়ালেন কোনো পর্দা ও আবরণ ছাড়া। আবরণহীন জ্যোতি যখন রূহসমূহের ওপর পড়ে, তখন তাদের আল্লাহর দিদার নসিব হয় এবং اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) এর মাধ্যমে সরাসরি কথা হয়। তাই এই উভয় নেয়ামত সমস্ত রূহ সেদিন অর্জন করেছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে মহব্বতের চেতনা দান করেছেন। আর তিনি স্বয়ং কথা বলে জ্ঞানের নেশা দান করেছেন। এই উভয় নেয়ামত মানুষ সেদিনই পেয়ে গেল। জ্ঞানের নেশাও পেল, মহব্বতের চেতনাও পেল।

মহব্বতের স্বভাবজাত আবেগ

মোটকথা, স্বভাবগতভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে মহব্বতের বীজ বিদ্যমান। এজন্যই সকল মানুষ স্বাভাবিকভাবেই উত্তম গুণ এবং সৌন্দর্যের মূল্যায়নকারী। মনোরম দৃশ্য দেখবে, ভালো লাগবে। উন্নতমানের বিল্ডিং দেখবে, ভালো লাগবে। সুন্দর গাছ দেখবে, ভালো লাগবে। গুণী মানুষ দেখবে, ভালো লাগবে। যে বস্তুর মধ্যেই উত্তম গুণ ও সৌন্দর্য থাকবে, মানুষের অন্তর সেদিকে আকর্ষিত হবে। এটি সৃষ্টিগত ও স্বাভাবগত বিষয়। এটাকেই কবিগণ নিজ-নিজ শব্দমালায় বর্ণনা করেছেন। কোনো কবি বলেছেন–

بس ایک بجلی سی پہلے کوندی
پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے
مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں
تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے

'শুধু একটি বিদ্যুৎ-চমকের ফলে
পরবর্তী ভবিষ্যত জ্ঞান উধাও
তবে বাহু দেখতে পায় যে
তার তো অন্তর উধাও, কলিজা উধাও।'

আল্লাহ তা'আলা সেদিন যে জ্যোতি ছড়ালেন; এর মাধ্যমে তিনি মানবজাতি থেকে অন্তর কেড়ে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে মহব্বতের সেই বীজ স্থাপন করেছেন। যেমনটি জনৈক কবি বলেছেন–

شاید بزم ازل میں اک نگاہ ناز سے
عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا

'সম্ভবত অনাদি সমাবেশে একবার দৃষ্টিপাতের বদৌলতে
মহব্বতকে এই দৃশ্যপটে দৃশ্যমান করে দিয়েছে।'

একবার দৃষ্টি ফেলে তিনি সৃষ্টজীবের মধ্যে মহব্বতের এই ধারা জারি করে দিয়েছেন। অন্য কবি বলেন–

پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے
کیا جانیں ہم ہیں کب سے کسی پر مرے ہوئے؟

'জন্মের সময় হাত থাকে কলিজায়
আমরা জানি কি কখন কে মরে থাকবে?'

কেউ এরূপ বলেছেন–

میری طفلی میں شانِ عشق بازی آشکارا تھی
اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا

'আমার শৈশবে মহব্বতের খেলা দৃশ্যমান ছিল,
যদি শৈশবে খেলা খেলে তাহলে চোখ ইশারার।'

অন্য এক কবি এরূপ বলেন–

کہیں کون و مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل!
غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی

'মহব্বতের স্ফুলিঙ্গ, যা বস্তু, স্থান কোথাও রাখা যাচ্ছিল না হে অন্তর!
মহব্বতের সেই স্ফুলিঙ্গ আমার মাটিতে শামিল ছিল।'

অর্থাৎ– মহব্বতের স্ফুলিঙ্গ যা বস্তু-স্থান কোথাও রাখা যাচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সেই স্ফুলিঙ্গকে আমার অন্তরের মাটিতে শামিল করে দিলেন।

মহব্বত আর অপকর্ম

মোটকথা, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ মহব্বতে পড়ে। সেটা স্রষ্টার মহব্বতও হতে পারে, সৃষ্টজীবের মহব্বতও হতে পারে। স্রষ্টার মহব্বতে পড়লে সেটি তার মধ্যে নূর হবে। সৃষ্টজীবের শয়তানি, নাফসানি ও প্রবৃত্তির মহব্বতে পড়লে তার মধ্যে অন্ধকার হবে। স্রষ্টার মহব্বত পুণ্য। সৃষ্টজীবের মহব্বত যা প্রবৃত্তির তাড়নায় হয়, সেটা গুনাহ। এজন্য আল্লাহ তা'আলার মহব্বতকে عِشق (ইশ্ক) তথা ভালোবাসা বলা চাই। আর সৃষ্টজীবের প্রবৃত্তিমূলক সম্পর্ককে فِسق (ফিস্ক) তথা অপকর্ম বলা চাই। এটা মূলত ইশ্ক তথা মহব্বত-ভালোবাসা হয় না, হয় অপকর্ম।

پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو
آتا نہیں ہے چین محبت کئے بغیر

'পাথরের সাথে হোক, আল্লাহর সাথে হোক কিংবা যেকোনো কিছুর সাথে হোক; চিত্তের প্রশান্তি আসে না মহব্বত ছাড়া।'

অন্য এক কবি বলেন–

دل بحر محبت ہے محبت یہ کرے گا
لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا

'অন্তর মহব্বতের দরিয়া, মহব্বত সে করবেই
লাখোজন তাকে বাঁচালে সে কারও ওপর তো মরবেই।'

অন্তর যখন মহব্বত করবেই, তাহলে হে মানবজাতি! কেন নিজের প্রভুর সাথে মহব্বত করছ না? মাখলুকের সাথে মহব্বতের ফলাফল কী হবে? অবশেষে একদিন তো তার থেকে পৃথক হতেই হবে। সুতরাং স্মরণ রাখবেন, যেব্যক্তি, কোনো মাখলুকের সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করল, একদিন না একদিন সেই মাখলুক থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবেই। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করল, একদিন না একদিন আল্লাহ তা'আলার সাথে তাকে মুলাকাত করানো হবেই।

মনোবিজ্ঞানীদের জীবন দর্শন

বিশ্বের বিজ্ঞানীগণ, মনোবিজ্ঞানীগণ মানুষের জীবন সংক্রান্ত গবেষণাকাজে সারা জীবন ব্যয় করে দিয়েছেন। বিশ্বে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক বড়-বড় মনোবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী গত হয়েছেন। তাঁরা তাদের জীবনের সকল পরিশ্রমের সারনির্যাস বের করেছেন। তাদের বের করা সারনির্যাস সঠিক ছিল কিনা সেটা ভিন্ন কথা।

কার্লমার্কসের দর্শন

উদাহরণত কার্লমার্কস তার সারা জীবনের পরিশ্রমের সারনির্যাস এই বের করেছেন যে, মানবজীবনের সকল কার্যক্রমের চাবিকাঠি তাদের পানাহার। তিনি রুটি-পানিকে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপের মূল সাব্যস্ত করেছে। তার মতে মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম রুটি-পানির চারপাশে চক্কর খায়। দুনিয়ার যত ব্যবসাবাণিজ্য, হাটবাজার, অন্যান্য কার্যকলাপ ও পেশা দৃষ্টিগোচর হয়, সবই রুটি-পানির চক্রবৃত্ত। তিনি রুটি-পানিকে মানবাজীবনের সকল কার্যক্রমের চাবিকাঠি ও মূল সাব্যস্ত করেছে।

আলফ্রেড এ্যাডলরের দৃষ্টিভঙ্গি

আর এক খ্যাতিমান ব্যক্তি আলফ্রেড এ্যাডলর বলেন, অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং বিজয়ী হওয়ার স্পৃহাই মানুষের সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষ পৃথিবীতে যেকোনো কাজ করে সে শ্রেষ্ঠত্ব চায়। অন্যদের থেকে অগ্রগণ্যতা চায়। অন্যদের ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব চায়। সুতরাং তিনি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং বিজয়ী হওয়ার স্পৃহাকে মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের মূল চাবিকাঠি সাব্যস্ত করেছেন।

ফ্রাইড-এর দৃষ্টিভঙ্গি

তৃতীয় আরেক বিজ্ঞানী ছিলেন ফ্রাইড। তিনি যৌনচাহিদাকে মানবজাতির সকল কার্যক্রমের মূল চাবিকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, রুটি-পানির অবস্থান এক প্রান্তে। মানুষের মধ্যে যৌনচাহিদা চরিতার্থ করার মতো তীব্র বাসনা বিদ্যমান যে, সমগ্র বিশ্ব এর চারপাশেই চক্কর খাচ্ছে। নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী হয় তাদের এই যৌনচাহিদা পূরণার্থেই। তারপর যেহেতু সন্তানাদি হয়, তাই বাকি দায়দায়িত্ব তার যিম্মায় পড়ে যায়। তিনি যৌনচাহিদাকে মানবজীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ও মেরুদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম আগমন করে ঘোষণা দিল, মানবজাতি! তোমরা প্রতারিত হয়েছ। তোমাদের ভুল হয়েছে। তোমরা অন্ধকারে তীর-বর্শা নিক্ষেপ করে চলছ। তোমরা হাতির পাকে খুঁটি মনে করেছ। তোমরা মূল বিষয় উপলব্ধি করার চেষ্টা তো করেছ, কিন্তু জ্ঞান যেহেতু অসম্পূর্ণ ছিল, তাই পূর্ণ বিষয় তোমরা উপলব্ধি করতে পারনি। দীন ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মহব্বতকে যাবতীয় কার্যক্রমের মূল চাবিকাঠি সাব্যস্ত করেছে। এজন্য যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন, দুনিয়ায় সেসব মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা কোনো-না-কোনো পন্থায় খোদাকে মানে। এক আল্লাহকে মানুক অথবা শত শত খোদা মানুক। খোদাকে মানে অবশ্যই।

মক্কার মোশরেকরাও ৩৬০টি মূর্তি রেখেছিল। প্রতিদিনকার নতুন খোদা, কোনোটা লাকড়ির খোদা, কোনোটা পাথরের খোদা, কোনোটা লোহার খোদা, কোনোটা মোটা খোদা, কোনোটা ছোট খোদা; মূলত সব মিথ্যে খোদা। তবে খোদার ধারণা ও কল্পনা তাদের স্মৃতি ও অন্তরে সর্বাবস্থায়ই ছিল। বিশ্বের যে কটি বড়-বড় ধর্মের মানুষ আছে– মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান এছাড়া যদি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ তাদেরও দেখেন, তাহলে দেখবেন, সকলেই কোনো-না-কোনো পন্থায় খোদার ধারণা পোষণ করেছে, করছে ও করবে। পার্থক্য এতটুকু যে, আমরা আল্লাহ তা'আলাকে একক খোদা মানি আর হিন্দুরা তাদের খোদাকে রাম বলে। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো বড় সত্তাকে তারা মান্য করছে। তাদের বিপদাপদে নিশ্চয়ই কারও না কারও সামনে সাহায্যের জন্য হাত উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন নদীতে বা সাগরে নৌকা, লঞ্চ তলিয়ে যেতে থাকে, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে কুরআন

মাজীদ বলছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, তারা সাহায্যের জন্য কাকে ডাকছে? এ মুহূর্তে তারা যাকে ডাকছে, তিনিই তাদের প্রতিপালক।

বিজ্ঞানীদের ধোঁকায় পড়া

কিন্তু বিশ্বের বিজ্ঞানীরা প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে না পারার কারণে ধোঁকা খেয়েছে। মেধার ওপর ভিত্তি করে যা হয়, তা সব সময়ই ভঙ্গুর হয়।

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا

'নড়বড়ে শাখায় পাখির যে বাসা নির্মিত হবে, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

সুতরাং কাফের সম্প্রদায় যখন প্রত্যক্ষ করল, মানবকার্যক্রমের মূলে রয়েছে যৌনচাহিদা কিংবা রুটি-পানি, তখন তারা মানুষকে যৌনচাহিদা চরিতার্থ করা এবং রুটি-পানির ব্যবস্থাপনার পেছনেই লাগিয়ে দিল। কিন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত মহব্বতের যে আবেগ ও স্পৃহা তাদের মধ্যে ছিল, তা খানাপিনা করে এবং যৌনচাহিদা চরিতার্থ করে পূর্ণ হয়নি। কেননা, সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত মহব্বতের সেই স্পৃহা আপন স্থানে বহাল ছিল। ফলে কাফের সম্প্রদায় বিপথগামী হলো। মহব্বতের স্পৃহা পূর্ণ করার জন্য তারা সৃষ্টজীবের সাথে মহব্বত করা শুরু করল। তাই কাফের সম্প্রদায়ের মধ্যে খানাপিনা জীবনের মূল লক্ষ্য আর বাকি জীবন তাদের সৃষ্টজীবের মহব্বতের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের কাছে মহব্বতের (Love) মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলন। এজন্য তারা সমস্ত চাহিদা ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করেও অসম্পূর্ণ জীবন যাপন করে এবং তাদের নিজেদের দৃষ্টিতেই নিজেদের শূন্য মনে হয়, বিরান-বিরান অনুভূত হয়। সত্যের সন্ধানে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই তারা বলে–

We are in search of truth

'আমরা সত্যের সন্ধানে ঘুরপাক খাচ্ছি।'

সত্য কী?

সত্য কী? সত্য হলো, যা ইসলাম বলেছে– হে মানবজাতি! তোমাদের একজন প্রতিপালক আছেন। তিনি অনেকগুলো অনন্য গুণের অধিকারী। নিজেদের সেই একক স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মনিবের সাথে তোমাদের উন্মত্ত মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করা চাই। জীবনের মূলমন্ত্র এটি হলে তোমাদের

সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত আবেগ-স্পৃহা, স্থিরতা, শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে। তাই দীন ইসলাম একটি চূড়ান্ত কথা বলেছে– হে মানবজাতি! তোমাদের অন্তরে প্রভুর মহব্বত সৃষ্টি করো, জীবনের সকল পেরেশানি ও জটিলতার সমাধান পেয়ে যাবে। তোমাদের জীবনের পেরেশানি, জটিলতা ও সমস্যার সমাধান না আছে রুটি-রুজিতে, না আছে পোশাক-পরিচ্ছদে, না আছে ঘরবাড়ি আর জায়গাজমিতে। কোনো কিছুতেই এসবের সমাধান নেই। সকল কিছুর সমাধান নিহিত আছে একমাত্র একক মহান স্রষ্টা ও প্রভুর মহব্বত অর্জনের মধ্যে। যদি অন্তরে তাঁর মহব্বত বিরাজমান থাকে, তাহলে তোমরা ক্ষুধার্ত থেকেও জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে থাকবে। তোমরা বিরান এলাকায় থেকেও মজলিসে বসে থাকার স্বাদ অনুভব করবে।

মহব্বতের হাকীকত

ইসলাম মহব্বতের হাকীকত অত্যন্ত চমৎকারভাবে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। বলেছে, মহব্বত হলো অন্তরের বিশেষ একটি অবস্থা। এর বীজ সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বভাব ও চরিত্রে রেখে দেওয়া হয়েছে। অনুকূল ও উপযোগী পরিবেশ পেলে, সেই বীজ ফুল ও ফলদার হয় এবং তাতে সৎকাজের ফুল-ফল উদ্গত হয়। এজন্য দুনিয়ার যত বড় গুনাহগার ও দীনের ব্যাপারে যত উদাসীন ব্যক্তি হোক না কেন, তাকে ভালো পরিবেশে নিয়ে এলে তার মধ্যে সেই সৃষ্টিগত বীজ ফুল ও ফলদার হয়ে যায়।

তাই তো বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে, ইবনে ছুবাত যুগের কত বড় ডাকাত ছিল। তখনকার সরকার ও বিচারব্যবস্থা তাকে শাস্তি প্রদানে কোনো ত্রুটি করেনি। তার হাতও কর্তন করেছে। তাকে দশ বছর পর্যন্ত জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠেও রেখেছে। কিন্তু দশ বছর পর জেল থেকে বের হয়েই আবার ডাকাতি শুরু করে দিল। অবশেষে জুনাইদ বাগদাদি (রহ.)-এর সাথে কোনোভাবে তার সম্পর্ক হলে তাঁর এক দৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই ডাকাতের অন্তর পরিবর্তন করে দিলেন। এমনকি পরবর্তী কালে তিনি সে যুগের অলি হয়ে যান এবং জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) থেকে অনুমতি ও খেলাফত লাভ করেন।

সুতরাং মানুষ যত বেপরোয়াই হোক না কেন, আল্লাহওয়ালাদের সংশ্রবে সেই উপযুক্ত পরিবেশ এবং ক্ষেত্র পেয়ে যায়, যেখানে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে সুপ্ত অন্তর আল্লাহর মহব্বতের হাই তোলে এবং এই অন্তরই তাকে

সৎপথে আসতে বাধ্য করে। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের এক একটি মজলিস অনেক মানুষের জীবনের গতি পরিবর্তনের মাধ্যম হয়ে থাকে।

دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے
تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے

'অনাদি জগত থেকে অন্তর প্রেমিক একজনার
পুরাতন যে এক ঝলক ছিল, তা উস্কে উঠল।'

রূহজগতে আল্লাহকর্তৃক রূহসমূহ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন প্রত্যেক রূহের ওপর মহব্বতের যে ঝলক পড়েছিল, আল্লাহওয়ালাদের মজলিসগুলোতে সেই ঝলক আবার উত্থিত হয়। আবার সেই মহব্বতের ব্যথা অন্তরে দৃশ্যমান হয়ে যায়। তারপর মানুষ নিজে নিজেকে আল্লাহর নিকটতম অনুভব করে।

এজন্য এক কবি খুশি হয়ে নিজের সম্পর্কেই বললেন–

نازم با چشم خود کہ جمالے تو دیدہ است
افتم با پائے خود کہ بہ کوئیدر سیدہ است

'আমি আমার চোখের জন্য খুবই গর্ববোধ করি,
সে তোমার সৌন্দর্য দেখেছে।
আমি আমার পদতলে নত, সেই খুশিতে যে
সে তোমার বলয়ের ভেতরে চলে গেছে।'

ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خویش را
کو دامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است

'প্রতি মুহূর্ত আমি নিজ হাতে হাজারো চুমু খাই
এজন্য যে, সে তোমার বাহু ধরে তোমাকে নিজের দিকে টেনেছে।'

যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহব্বত লাভ হয়, তখন মানুষের কাছে নিজেকেও প্রিয় মনে হয় যে, আমি কত ভালো কাজ করেছি, আল্লাহর মহব্বত আমার অন্তরে ধারণ করেছি; আমি কত ভালো রাস্তা পেয়ে গেছি; আমি প্রকৃত প্রেমাস্পদের মহব্বতকে জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়েছি।

আল্লাহর মহব্বতের মিষ্টি

আমার বন্ধুগণ! মিষ্টি প্রস্তুতকারীর দোকানে মাছি বসে। দোকানি মাছিগুলোকে তাড়িয়েও থাকে। কিন্তু মাছি যায় না। সরে গিয়ে লাড্ডুতে বসে। আবার তাড়ালে সরে গিয়ে অন্য মিষ্টিতে বসে। মিষ্টির শিরাতে বসে। একেবারে চলে যায় না। শতবার তাড়াও তবুও আবার এসে বসবে। সর্বশেষ কথা কী? মিষ্টি মাছিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। আল্লাহওয়ালাদের মাহফিলগুলোতে আল্লাহর মহব্বতের মিষ্টি থাকে, যা মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। কারও ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগাদা থাকে, কারও ঘরবাড়ির প্রয়োজন থাকে, কারও সুস্থতার বিষয় থাকে, এরূপ শত শত প্রয়োজন থাকে, যা লোকজনকে মাহফিল থেকে নিয়ে যেতে জোর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সকল তাগাদা আর প্রয়োজন চাপা দিয়ে তারা মাহফিলে বসে থাকে। মাহফিলগুলোতে ভর্ৎসনাও করা হয়, হুমকি-ধমকিও দেওয়া হয়, বোঝানোও হয়, আদব-শিষ্টাচার শেখানো হয়। আর যখন দীক্ষা দেওয়া হয়, তখন কখনও মমতা ও করুণার সাথে, কখনও রাগান্বিত হয়ে ভয়ভীতি ও সুন্দরভাবে উভয় পন্থায়ই লোকজনের দীক্ষা হয়। মাতাপিতাও তো তা-ই করেন। কখনও সন্তানকে আদর-সোহাগের সাথে বোঝান এবং কখনও রাগান্বিত হয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে বোঝান। এমনিভাবে সালেকীনদেরকে এখানে কতবার একটা বিষয়ের ওপর তিরষ্কার করা হয়, ভর্ৎসনা করা হয়, বিরত রাখা হয়, হুমকি-ধমকিও দেওয়া হয়, তারপরও তারা কাছে আসে। মিষ্টির দোকানের মাছির মতো তারা একেবারে দূরে সরে যায় না। আল্লাহর মহব্বতের এই মিষ্টিও এরূপই– অন্তরকে একবার তার দিকে আকৃষ্ট করে নিলে অন্তর আর দূরে যেতে চায় না।

এজতেমার দু'আর দিন বিভিন্ন প্রয়োজনের কারণে কত মানুষের চলে যেতে হয়, কিন্তু তাদের পায়ের অবস্থা এমন হয় যেন জমি আঁকড়ে রেখেছে। তারা বলেন, জানি না কী আকর্ষণ রয়েছে; এখান থেকে পা ওঠে না। তাদেরকে বলতে হয়, ভাই! আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন, আপনারা যান। সেটি কী জিনিস? সেটি মূলত আল্লাহ মহব্বত।

ইশক-মহব্বতের দোকান ও ইশক-মহব্বতের পুরিয়া

যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ইশক-মহব্বত উদ্বেলিত হয়, তারা ইশক-মহব্বতের দোকান অনুসন্ধান করে বেড়ায়। দুনিয়াতে যেমন মিষ্টির

দোকান আছে, তেমন ইশক-মহব্বতেরও দোকান আছে। আল্লাহওয়ালাগণ যেসব জায়গায় থাকেন, তাদের যে খানকাসমূহ রয়েছে, সেগুলো ইশক-মহব্বতের দোকান। সেখানে আল্লাহর ইশক-মহব্বতের পুরিয়া পাওয়া যায়। হাকীম-কবিরাজের কাছে গেলে, দৈহিক রোগের পুরিয়া পাওয়া যাবে। এসব আত্মার ডাক্তারদের কাছে এলে আত্মার ব্যাধির পুরিয়া পাওয়া যাবে। আল্লাহর ইশক-মহব্বত লাভকারী ব্যক্তিবর্গ এমন এক পুরিয়া প্রদান করেন, যার বদৌলতে অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাধির পরিপূর্ণ সুস্থতা অর্জন হয়ে যায়। এটি-ই অন্তরের চিকিৎসা, যা নেওয়ার জন্য আপনারা এখানে আসেন এবং নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেন। সালেকদের এই এজতেমা অন্তরের সেই চিকিৎসা পাওয়ার জন্যই। এখানে উপস্থিত সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে কামনাকারী।

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے

اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

'আমরা, তোমরা, আমীর যা-ই হলাম

তাঁর মহব্বতের কাছে সকলেই বন্দি হলাম।'

সকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাশী, সকলেই তাঁর পাগল। তাঁরই মহব্বতে ব্যাকুল হয়ে এই স্থানগুলোতে আসে।

ঈমানের শর্ত

দুনিয়াতে ইসলামের গুণ এবং সৌন্দর্য দেখুন। ইসলাম আল্লাহর মহব্বতকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করেছে। আবুরজী' (রাযি.) নামক এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমান কী? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّمَّا سِوَاهُمَا.

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে যাওয়াই হলো ঈমান।'

সুতরাং এটি ঈমানে শর্ত। কুরআনে কারীমেও আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ.

'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, ভাই, স্ত্রী, বংশীয় লোকজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কর এবং পছন্দনীয় বাসস্থান তোমাদের কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করো।'[১১৭]

দেখুন, সকল কিছু থেকে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অগ্রগণ্য হতে হবে। তবেই ঈমানদার হওয়া যাবে। নতুবা আযাবের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

অন্তর ও মস্তিষ্কের পার্থক্য

আমার বন্ধুগণ! মানবজাতির কাছে দুটি নেয়ামত রয়েছে। একটি অন্তর, অপরটি মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক আল্লাহ তা'আলার ইল্‌মের পাত্র। অন্তর আল্লাহ তা'আলার ইশক-মহব্বতের পাত্র। তবে দুটির মধ্যে পার্থক্য অনেক। কারণ কী? কারণ হলো, মস্তিষ্ক সাত ভাষাভাষী; অন্তর এক ভাষাভাষী।

সাত ভাষায় কবিতা

সাত ভাষা তো অনেক মানুষই জানে। চলুন, আপনাদের সাত ভাষায় কবিতা শোনাচ্ছি–

উর্দূ ভাষায় কবি আল্লামা ইকবাল বলেন–

عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولین ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات

জ্ঞান, অন্তর ও দৃষ্টির সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক হলো ইশক-মহব্বত।

ইশক-মহব্বত না থাকলে শরীয়ত ও দীন ধ্যান-ধারণার মন্দির হয়ে যায়।

---

১১৭. সূরা তাওবা : আয়াত ২৪

আল্লাহ মহব্বত ছেড়ে দিলে পেছনে কী থাকল?

এক ফারসি কবি বলেন–

یابہ مورہ یابم جستجوئے می کنم

حاصل آید یانہ آید آرزوئے می کنم

'আমি তাঁকে পাই বা না পাই, তাঁর সন্ধান করেই যাব

অর্জিত হোক বা না হোক, আমি তাঁর কামনা করেই যাব।'

আরবিতেও কবিতা রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি কত-ই না সুন্দর কবিতা বলেছেন–

تَرَكْتُ لَاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا

كَذٰلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

'আমি বর্জন করেছি লাত ও মানাত সর্বোতভাবে

এরূপই করেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।'

কখনও-কখনও নির্জনে নিজের আত্মাকে সম্বোধন করে এই পঙ্‌ক্তিদুটি পড়া চাই। মানুষের অন্তরে এই যে সৃষ্টজীবের মহব্বত চেপে আছে, মামাত-ফুফাত বোনের মহব্বত, প্রতিবেশীনির মহব্বত এসবই বর্তমান যুগের লাত ও মানাত। সুতরাং নিজ আত্মাকে বলা চাই–

تَرَكْتُ لَاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا

كَذٰلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

'আমি বর্জন করেছি লাত ও মানাত সর্বোতভাবে

এরূপই করেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।'

ইংলিশ ভাষাভাষী লোকেরাও আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে তাদের ভাষায় চমৎকার কথা বলেছেন–

Oh Allah! Sweet is your memory,
Dear is your name,
Deep in my heart you always remain.
'হে আল্লাহ! অনেক মিষ্ট আপনার যিকির,
আপনার নাম বড়ই মধুর

আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে সদাসর্বদা থাকবেন।

সারাইকি ভাষায়ও আল্লাহর মহব্বতে অনেক কবি কবিতা বলেছেন–

ہور کہانی مول نہ بہانی

الف لئم دل کہس دے میاں جی

'ب' 'ت' دی میکوں لوڑ نہ کائی

الف کیتم بے دس دے میاں جی

'আল্লাহ! অন্য কোনো কথা আমার ভালো লাগে না, এক আলিফ আল্লাহ তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। আলিফ আমার থেকে আমার অন্তর ছিনিয়ে নিয়েছে।'

আল্লাহু আকবার কাবীরা!

পাঞ্জাবি ভাষায় হযরত বাহু (রহ.) কত চমৎকার কবিতা বলেছেন–

الف اللہ چنبے دی بوٹ

من مرشد میرے وچ لائی ہو

نفی اثبات دا پانی ملیا

ہر رگے ہر جائی ہو

اندر بوٹی مشک آئی مچایا

جان پھلن تے آئی ہو

جیوے مرشد کامل باہو

جیں اے بوٹی لائی ہو

আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে পশ্তু (আফগান) ভাষার লোকজনও কবিতা বলেন। আমি ভালোভাবে বলতে পারি না। তবুও আপনাদের শোনাচ্ছি।

چہ اللہ در سرہ مل نہ دی رحمانہ

کہ بلبنکرے در سرہ دی یک تنہائے

'যদি তুমি আল্লাহকে না পাও, তাহলে হে রাহমান! আপনার কাছে বাহিনীও আছে; আর তুমি সঙ্গীহীন, একা।'

অন্তরের ভাষা

মানুষের মস্তিষ্ক সাত ভাষাভাষী। পক্ষান্তরে অন্তর এক ভাষাভাষী। অন্তর মাত্র একটি ভাষা জানে। সেই ভাষার নাম মহব্বত। অন্তর শুধু মহব্বতের ভাষা জানে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিন; দেখবেন, অন্তর কম্পিত হবে, স্পন্দিত হবে।

عقل عیار ہے سو بھیس بنالیتی ہے
عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب

'আকল-জ্ঞান চালবাজ, তাই মহিষী বানিয়ে ফেলে
ইশক-মহব্বত বেচারা না মোল্লা, না ওয়াযকারী, না খতীব।'

তো মস্তিষ্ক সাত ভাষাভাষী। অন্তর এক ভাষাভাষী। অন্তর শুধু মহব্বতের ভাষা জানে। তাই তো বক্তা বলেন–

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

'ভালো যদি অন্তরের কাছে থাকে, তার পাহারাদার আকল-জ্ঞান
কিন্তু কখনও-কখনও তাকে একাকিও ছেড়ে দেয়।'

আকল বা জ্ঞান এক বস্তু, অন্তর ভিন্ন আরেক বস্তু। আল্লামা ইকবাল মহব্বত ও জ্ঞানের সুন্দর বৈপরীত্ব লিখেছেন–

نالہ ہے بلبل شوریدہ خام ابھی
اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی
پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل
عشق ہو مصلحت اندیش تو ہ خام ابھی
عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل

عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

'কেঁদেছে বুলবুল সে অনভিজ্ঞ প্রেমিক এখনও
তার বক্ষে রয়েছে সেই কান্নার কিছু ঝাঁকুনি।
দৃঢ়তা লাভ করে যদি জ্ঞান হয় কল্যাণকর
মহব্বত কল্যাণকর হলেও তা অপরিপক্ব এখনও।
মহব্বত বলেছে দূতকে আমলের ব্যবধান কম
আকল বুঝতেই পারেনি বার্তার অর্থ এখনও।
মহব্বত নির্ভয়ে লাফিয়ে পড়ল নমরুদের অগ্নিতে
আকল মোহগ্রস্ত অট্টালিকার ওপরকার তামাশায় এখনও।'

জ্ঞান বলে এদিকে রাস্তা-ই নেই। মহব্বত বলে, এই রাস্তায় আমি বন্ধুর সাথে হাজারবার সাক্ষাৎ করে এসেছি।

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے
لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے

'ইল্‌মের দিগন্ত থেকে বহুদূরে মুমিন বান্দার জন্য,
ভালোবাসার স্বাদও আছে, দিদারের নেয়ামতও আছে।'

এজন্যই

لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے
تا بہ منزل صرف دیوانے گئے

'ফিরে এল জ্ঞানবলে যারা ময়দান অতিক্রম করতে গেল
পাগল যারা তারাই কেবল লক্ষ্য পানে চলা অব্যাহত রাখল।'

জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে যারা এই রাস্তা অতিক্রম করছে, তাদের ফারযানা বলা হয়। তাদের কেউ-ই লক্ষ্যপানে চলা অব্যাহত রাখতে পারে না। যাদের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু পেয়ে যাওয়ার পাগলামি থাকে, তারা অবশেষে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়। তাদের জন্য লক্ষ্যস্থল নিকবর্তী হয়।

অন্তরের কাজ

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গের কাজও ভিন্ন-ভিন্ন রয়েছে। চোখের কাজ দেখা। জিহ্বার কাজ বলা। কানের কাজ শ্রবণ করা। অন্তরের কাজ মহব্বত করা। দেখা ছাড়া চোখের ভাবনা নেই। শ্রবণ ছাড়া কানের ভাবনা নেই। এমনিভাবে মহব্বত ছাড়া অন্তরের কোনো ভাবনা নেই। অন্তর মহব্বতের পাত্র। মহব্বত সেখানে থাকে। স্রষ্টার মহব্বত থাকে নাকি সৃষ্টজীবের মহব্বত থাকে সেটা ভিন্ন কথা। যারা আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্যে এসে যায়, তাদের অন্তর থেকে সৃষ্টজীবের মহব্বত বের হয়ে যায়। আল্লাহর মহব্বতে তাদের অন্তর ভরপুর হয়ে যায়। তারা আল্লাহর ইশ্‌ক-মহব্বতের পথে চলে। অন্যরা পাপ ও অপকর্মের পথে চলে।

অঙ্গসমূহের স্বাদ

একটি বিষয় স্মরণ রাখবেন। মানবদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের নিজস্ব স্বাদ রয়েছে।

চোখের স্বাদ

মানুষ জীবনের কিছু স্বাদ চোখদ্বয় থেকে পায়। আকর্ষণীয় দৃশ্য দেখলে এত ভালো লাগে, কখনও-কখনও স্থান ত্যাগ করতে মন সায় দেয় না। কখনও দেখে থাকবেন, যারা হজ ও ওমরা করতে যায়, তারা যখন সকল কার্যক্রম শেষে বাইতুল্লাহ থেকে পৃথক হতে থাকেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফের ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তখন তাদের জন্য সেখান থেকে চলে আসা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অন্তর কোনোমতেই সায় দিতে চায় না যে, বাইতুল্লাহ শরীফ সামনে, এ অবস্থায় বান্দা সেই স্থান ত্যাগ করুক এবং বাইতুল্লাহ শরীফকে দৃষ্টির আড়াল করে দেক। বড় এক নেয়ামত, যা বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা দ্বারা অর্জন হয়ে থাকে। মন চায়, অপলক নেত্রে আল্লাহর ঘরের দিদার লাভ করতে থাকি। এভাবে দেখার মাধ্যমে কিছু স্বাদ উপভোগ হয়। কিছু স্বাদ মানুষ শ্রবণের মাধ্যমে ভোগ করে। যেমন সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত কতই-না শ্রুতিমধুর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কবিতা পাঠ শুনতে কতই-না স্বাদ অনুভূত হয়। কিছুক্ষণ হয় আমার প্রিয়পাত্র আযহার ইকবাল আপনাদের সামনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে না'ত পাঠ করছিল। আমি সমাবেশের অনেক লোককে দেখেছি, তাদের চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরছিল। সেটার

পেছনে কী ছিল? সুললিত কণ্ঠে প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান গাওয়া হলে অন্তর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। অশ্রুর ভাষায় সে তার বার্তা লিখতে শুরু করে। কলম তো কালি দ্বারা লেখে। আর অন্তর চোখের অশ্রুজলে বার্তা লিখে থাকে।

নাকের স্বাদ

এমনিভাবে কিছু স্বাদ মানুষ নাকের মাধ্যমে উপভোগ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আম্বর শুঁকলে এক স্বাদ, উদ শুঁকলে আরেক স্বাদ, কস্তুরি শুঁকলে ভিন্ন স্বাদ। একবার এক আরব বন্ধু আমাকে কস্তুরি এনে দিলেন। অনেক বছর পূর্বের কথা। তখনও বিয়ে করিনি। তার ঘ্রাণ ছিল চমৎকার। আল্লাহর শান যে, এক-দু মাস পর আমার কাছের এক বন্ধুর বিয়ে হলো। আমি বিয়েতে তাকে সেই কস্তুরি হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিলাম। তিনি এক মাস ছুটি কাটিয়ে আমার কাছে এলে কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই সুগন্ধিটা কেমল ছিল? তিনি বললেন, খুব ভালো; কিন্তু সেটা তো ঝগড়া সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি খুব চিন্তিত হলাম, হে আল্লাহ! মঙ্গল করুন! তিনি বললেন, আমি সেই সুগন্ধি আমার স্ত্রীকে হাদিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী সেটা তার কাপড়ে লাগাল। তারপর বংশের যত যুবতি মেয়ে ছিল, সকলেই তার চারপাশে জড়ো হয়ে বলতে লাগল, আমাদেরও এই সুগন্ধি দিন। বেচারী সব ভাগ করে দিয়ে দিল। তারা বলছে, আপনি গোপন করে রেখেছেন, আমাদের আরও দিন। যাদের দিল তারা তো খুশি হলো। যাদের দিতে পারল না, তারা অসন্তুষ্ট হলো। এখনও তারা সেটা স্মরণ করে এবং সরবরাহ করে দিতে বলে। সুতরাং অনেক সুগন্ধি এরূপ হয়। বাস্তবেই সেটি এত উন্নত মানের ছিল যে, এই অধম নিজের কাপড় নিজ হাতে ধুয়েছে। তারপরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত কাপড় থেকে কস্তুরির সুঘ্রাণ আসছিল। এভাবে কিছু স্বাদ মানুষ নাকের মাধ্যমে ভোগ করে।

জিহ্বার স্বাদ

কিছু স্বাদ মানুষ জিহ্বার মাধ্যমে ভোগ করে। এই যে আহার ও পানীয়ের স্বাদ অনেক সময় মানুষকে মোহিত করে। তাই তো দেখা যায়, মানুষ কত বলে, আমার পেট ভরে গেছে, আমার পেট ভরে গেছে; কিন্তু তাকে যদি কোনো মিষ্টান্ন দেখানো হয়, আইস্ক্রীমের স্বাদগন্ধ শুঁকিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার জিহ্বায় পানি এসে যাবে। এবার বলবে, না, এটা তো

আমাকে খেতেই হবে। যাদের ডায়াবেটিস আছে, তারা বলবে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে খেয়ে নিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি হবে না। এভাবে মিষ্টান্ন খাওয়া বাহানা তালাশ করে। আমার মাহফিলে যেসব বন্ধুবান্ধব আসেন, তাদের যেহেতু জানা আছে, এ-জাতীয় রোগীদের ব্যাপারে আমি কিছুটা কঠোরতা করি, তাই যারা ইতিপূর্বে খেতে থাকে, তারা আমার অগোচরে চুপিচুপি খানাপিনা করে। ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু পানাহার থেকে বিরত থাকতে পারে না। এভাবে কিছু স্বাদ মানুষ জিহ্বার সাহায্যে উপভোগ করে।

গোপনাঙ্গের স্বাদ

কিছু স্বাদ মানুষ শরীরের গোপনাঙ্গের মাধ্যমে ভোগ করে। সেটা যৌবনের স্বাদ। বিবাহিত সকলেই জানেন, এই স্বাদের সামনে পানাহারের স্বাদের কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

অন্তরের স্বাদ

প্রত্যেক অঙ্গের স্বাদ ভিন্ন-ভিন্ন। এক অঙ্গ অপেক্ষা অপর অঙ্গের স্বাদ বেশি। সকল অঙ্গের সর্দার হলো অন্তর। এই অন্তরের মাধ্যমেও মানুষ আলাদা একটা স্বাদ ভোগ করে। এই স্বাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের স্বাদ। সর্বাপেক্ষা বড় স্বাদ এটা। আল্লাহর যে বান্দা মাবুদের মহব্বতের এই স্বাদ পেয়ে যায়, তার সামনে জৈবিক সকল স্বাদ অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی

'উভয় জাহান থেকে সম্পর্কহীন হয় অন্তর
বন্ধুত্বের স্বাদ বড় বিস্ময়কর।'

আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের এই স্বাদও বিস্ময়কর। এই সেই স্বাদ, যা আল্লাহওয়ালাদের তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত করে, যা সমস্ত রাত মানুষকে নামাযের স্থানে বসিয়ে রাখে, যা মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা মুরাকাবায় বসিয়ে রাখে, যা একান্ত নির্জনেও মানুষকে ভারাক্রান্ত হতে দেয় না। এটি অন্তরের স্বাদ। যারা আল্লাহওয়ালা, তারা অন্তরের এই স্বাদ ভোগ করেন। এজন্যই

যারা আল্লাহওয়ালাদের মাহফিলে আসে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে কাতুকুতু দেন। দেখুন ভাইসব! শরীরে কেউ কাতুকুতু দিলে, কত আশ্চর্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়; স্বাদ অনুভূত হয়; টিকে থাকা যায় না। শরীরের কাতুকুতুতেই এত স্বাদ, যদি অন্তরে কাতুকুতু দেওয়া হয়, তাহলে কত স্বাদ অনুভূত হবে! আল্লাহর কথা, আল্লাহর আলোচনা এবং আল্লাহর যিকির সালেক তথা তরিকতভুক্ত লোকদের অন্তরকে কাতুকুতু দিয়ে থাকে। এতে তাদের স্বাদ উপভোগ হয়, আত্মতৃপ্তি নসিব হয়।

আইনানুগ সম্পর্ক

একটি কথা অন্তরে গেঁথে রাখবেন। একটা হচ্ছে আইনানুগ সম্পর্ক, আরেকটা হচ্ছে উন্মত্ত সম্পর্ক। খুবই সূক্ষ্ম কথা, বুঝবার মতো কথা। একটা হচ্ছে আইনানুগ সম্পর্ক, আরেকটা হচ্ছে উন্মত্ত সম্পর্ক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সম্পর্কে তো স্বামী-স্ত্রী; কিন্তু তাদের মাঝে বনিবনা একেবারেই হয় না। যদ্দরুন প্রত্যহ কলহ-বিবাদ লেগেই থাকে। কলহ-বিবাদ হতে-হতে একটা সময় এমন আসে, একে অপরের ছায়া পর্যন্ত দেখতে চায় না। স্বামী-স্ত্রীকে একজন অপরজনের জীবনসঙ্গী বলা হয়। স্বামী উপার্জন করে। স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদান করে। স্ত্রী খাবার তৈরি করে। ঘরোয়া কার্যাবলি সম্পাদন করে। এভাবে উভয়ে সংসার চালাতে থাকে। কিন্তু তাদের মাঝে কোন পর্যায়ের সম্পর্ক বিরাজ করে? আইনানুগ সম্পর্ক বিরাজ করে। তারা ভাবে স্বামী-স্ত্রী যখন হয়েছে, এখন সময় তো পাড়ি দিতে হবে। তাই স্বামী কখনও স্ত্রীর সাথে বসে একত্রে পানাহার করে না। স্ত্রী অসুস্থ হয়, স্বামী কখনও জিজ্ঞাসা করে না, চিকিৎসা লাগবে কিনা? কেননা, তারা আইনানুগ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। অন্তরে মহব্বত নেই। লোকদেখানো সম্পর্ক। লোকদেখানো সম্পর্কের কারণেই রাতে অনেক বিলম্ব করে বাসায় আসে। কখনও মুচকি হাসি দিয়ে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। সামান্য সুযোগ পেলেই, হুমকি-ধমকি শুরু করে দেয়। জনসম্মুখে তাকে লাঞ্ছিত করে আনন্দ পায়। তার ছোট-ছোট ভুল-ত্রুটিগুলোকেও বড়-বড় অপকর্মের রূপ দিয়ে লোকজনের সামনে প্রকাশ করে। স্ত্রী স্বামীর ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান করে বেড়ায়। স্বামী স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করে বেড়ায়। পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক; কিন্তু অন্তরে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা এত বেশি যে, যদি স্ত্রীর হাতে লাঠি দেওয়া হয়, তাহলে সে সর্বপ্রথম স্বামীর মাথায় আঘাত করবে। অপরদিকে স্বামীর হাতে লাঠি দিলে সে সর্বপ্রথম স্ত্রীর মাথায় আঘাত করবে। এ-জাতীয় সম্পর্ককে আইনানুগ সম্পর্ক বলা হয়।

উন্মত্ত সম্পর্ক

আরেকটি হচ্ছে উন্মত্ত সম্পর্ক। যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উন্মত্ত সম্পর্ক থাকে, তখন স্বামী অফিস থেকেও বাহানা দিয়ে দ্রুত বাসায় চলে আসে। বাইরে কেউ খানা খেতে বললে বলে, না, আমার তবিয়ত ভালো না; বাসায় গিয়ে খাব। এর মর্ম হলো, যে-খেদমত বাসায় গিয়ে পাব, তা কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। বাসার বাইরে রাত্রি যাপন বিপজ্জনক মনে হয়। অফিসে ডিউটি চলাকালেও ছলছুতায় স্ত্রীকে ফোন করে থাকে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কী রান্না করেছ? ছুটির সময়গুলোতে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করার প্রোগ্রাম বানানো হয়। বিয়েবার্ষিকি উদযাপন করে। এদিন পরস্পরে উপঢৌকন আদান-প্রদান করে। এভাবে দুজন একত্রে সময় কাটানোর বাহানা তালাশ করে। একে উন্মত্ত সম্পর্ক বলা হয়।

লোকজন বলাবলি করে, এই যে দেখুন, স্বামী স্ত্রীর মুরীদ হয়ে গেছে। তারা তা এক কান দিয়ে শ্রবণ করে, অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। এমনও দেখেছি, জীবনে এত বাড়াবাড়ি এবং এত শিথিলতা এসে যায় যে, মানুষ নিজ মাতাপিতাকেও তেমন মহব্বত করে না, যেমনটি স্ত্রীকে করে। এ-জাতীয় সম্পর্ককে কী বলা হয়? উন্মত্ত সম্পর্ক বলা হয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর অত্যন্ত রোমাঞ্চকর জীবন যাপন করে। সুতরাং একটা হলো আইনানুগ সম্পর্ক, আরেকটা হলো উন্মত্ত সম্পর্ক।

বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা

আপনারা যদি উল্লিখিত উদাহরণ ভালোভাবে বুঝে থাকেন, তাহলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাধারণ মুসলমানদের কেবল আইনানুগ সম্পর্ক বজায় আছে। আল্লাহ তা'আলার সাথে বর্তমান সাধারণ মুসলমানদের কোন প্রকারের সম্পর্ক বজায় আছে? আইনানুগ সম্পর্ক। এজন্যই তারা জিজ্ঞাসা করে, এটি তো সুন্নাতই, না? কোনো ওয়াজিব, ফরজ তো নয়। জি, আমি ওয়াজিব ও ফরজ আদায় করে নিয়েছি; আর কী করব? আইনানুগ সম্পর্ক, তাই শুধু ফরজ আদায় করেই দ্রুত ছুটে চলল; নফলও হলো না, তেলাওয়াতও হলো না, যিকিরও হলো না, মুস্তাহাবও হলো না। কেবল আইনানুগ সম্পর্ক বজায় রাখছে। কখনও যদি যাকাত দেয়, তাহলে অন্তর ভারাক্রান্ত করে দেয়। আল্লাহর রাস্তায় এক পয়সাও খরচ করার তাওফীক হয় না। মসজিদে আসা বিপজ্জনক মনে হয়।

তখন আসে যখন ইমাম সাহেব দ্বিতীয় খুতবার শেষ শব্দ কটি পড়েন। পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে এবং ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর সাথে-সাথে সেখান থেকে সোজা ফিরে চলে। মসজিদ থেকে বের হয়ে এমনভাবে নিজের কাপড় পরিপাটি করে, যেমন কেউ জেলখানা থেকে বের হয়ে এল। এ-ধরনের সম্পর্ক আইনানুগ সম্পর্ক। যেন ধরে-বেঁধে আমল করানো হচ্ছে। যতটুকু জান বাঁচানো যায়, ততটুকু বাঁচানোর চেষ্টা করছে। একেই বলা হয় আল্লাহ তা'আলার সাথে আইনানুগ সম্পর্ক। কালেমা পড়েছে, আল্লাহকে মাবুদ মেনে নিয়েছে, কাজেই এখন কিছু না কিছু তো করতেই হয়, তাই করছে। যেমন বিবাহ পড়ানো হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, কাজেই তাকে বেতন উঠিয়ে কিছু খোরপোষ তো দিতে হয়। ঠিক তদ্রূপ বর্তমানের মুসলমানগণও আল্লাহ তা'আলার সাথে আইনানুগ সম্পর্ক রেখে চলছে।

আল্লাহ তা'আলার সাথে উন্মত্ত সম্পর্ক কাম্য

আল্লাহ তা'আলা কী চান? আল্লাহ তা'আলা চান, আমার সাথে আমার বান্দার উন্মত্ত তথা পাগলামির সম্পর্ক থাকা চাই। একথা আমি নিজ থেকে বলছি না। সত্যবাদী সংবাদদাতা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করে এ কথা বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন–

اُذْكُرُوا اللّٰهَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّهٗ مَجْنُوْنٌ

'তোমরা আল্লাহর এত যিকির করো, যেন লোকজন বলে, সে তো পাগল।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দা থেকে তাঁর সাথে উন্মত্ত বা পাগলামি সম্পর্ক চান। আর উন্মত্ত সম্পর্ক স্থাপনের পর ফরজ আদায়ের মাধ্যমে স্বাদ পূর্ণ হয় না। বরং ফরজের পর ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং তারপর মুরাকাবায় বসতেও অন্তর পাগল হয়ে যায়। তারপর রাতে ঘুম থেকে জেগে মুলাকাত করতেও মন চায়। আল্লাহ তা'আলার স্মরণে কুরআন মাজীদের দীর্ঘ তেলাওয়াত করতেও মনে আগ্রহ জাগে।

এভাবে মানুষ ইবাদাত করার বাহানা তালাশ করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার নাম শুনে কম্পিত হয়। আল্লাহর রাস্তায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, সেই প্রতিবন্ধকতা দু'পায়ে দলে সামনে এগিয়ে চলে। এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তার উন্মত্ত সম্পর্ক। যখন এই উন্মত্ত সম্পর্ক সৃষ্টি

হয়, তখন জীবনে প্রেমাস্পদেরই প্রাধান্য থাকে। দেখুন, জুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল। সেই মহব্বত উন্মত্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সেই উন্মত মহব্বত কেমন ছিল? এমন ছিল যে, এক বক্তা বলেন–

چوں زلیخا کف سپندہ پابہ عور

نام جملہ چیز یوسف کردبود

'জুলায়খার অবস্থা দেখো। সে এখান থেকে সেখান পর্যন্ত সকল বস্তুর নাম ইউসুফ রেখে দিয়েছে।'

যেকোনো বস্তু জুলায়খার দৃষ্টিগোচর হতো, তাকে সে ইউসুফ বলে সম্বোধন করত। এটাও ইউসুফ, সেটাও ইউসুফ, তার দৃষ্টিতে সবকিছুই ইউসুফ মনে হতো। যেমন– মানুষে মানুষে শয়তানি মহব্বতের মধ্যে উন্মত্ত সম্পর্ক হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সাথেও উন্মত্ত সম্পর্ক হয়। যখন আল্লাহর সাথে উন্মত্ত সম্পর্ক হয়, তখন মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বিজয়ী হয়। তারপর কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না। নামায পড়া ছাড়া স্থির থাকা যায় না। এ-পর্যায়ের ব্যক্তি ইমাম রাযি (রহ.)-এর মতো বলে–

'দিবস ভালো কাটে না তোমার স্মরণ ছাড়া; রাত ভালো কাটে না তোমার সাথে প্রেমালাপ ছাড়া।'

তারপর সে বলে–

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے اپنے ہی کام سے

تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے تیرے نام سے

'কারও কাছে নেই কোনো চাওয়া, নেই কোনো সম্পর্ক, আপনার কাজই আমার কাজ।

আপনার যিকির, আপনার ফিকির, আপনার স্মরণ, আপনার নামের সাথেই কেবল আমার সম্পর্ক।'

আল্লাহ তা'আলা চান বান্দার মহব্বতের সম্পর্ক আমার সাথে হোক। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মজবুত।'[১১৮]

ঈমানদারগণ নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসে।

প্রেমাস্পদের প্রতিটি বস্তু ও কাজ ভালো লাগে

কারও সাথে মহব্বতের সম্পর্ক হলে তার সকল কিছুর সাথেই মহব্বত হয়ে যায়। কোনো এক মায়ের ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই মা ছেলের কাপড় দেখে কান্নাকাটি করছিল। ছেলের কক্ষে গিয়ে কান্নাকাটি করছিল। যে বস্তুর ওপরই তার দৃষ্টি পড়ত, ছেলেকে মনে পড়ে যেত আর ক্রন্দন শুরু করত। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন মুমিনের মহব্বত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন যাবতীয় বিষয়ের সাথে তার মহব্বত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর নিদর্শনবলির সাথে তার মহব্বত হয়, আল্লাহর বাণীর সাথে মহব্বত হয়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বত হয়, বাইতুল্লাহ শরীফের সাথে মহব্বত হয়, আল্লাহর অলিদের সাথে মহব্বত হয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো ভালো লাগা তাঁর সাথে মহব্বত হওয়ার নিদর্শন। কারও সাথে মহব্বত হলে তার সংস্রব ভালো লাগে, তার সাথে কথোপকথন ভালো লাগে, তাকে দেখতে ভালো লাগে এবং তার সাথে ওঠাবসা ভালো লাগে।

আল্লাহর যিকির দ্বারা মুমিনের অন্তর আন্দোলিত হয়

একই অবস্থা মুমিনের হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা মুমিনগণ আল্লাহর সঙ্গ পেয়ে থাকে। বিষয়টি হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي

'যারা আমার যিকির করে, আমি তাদের সাথে উপবিষ্ট থাকি।'

যেহেতু যিকিরের মধ্যে বান্দার সাথে আল্লাহ তা'আলার সাহচর্য থাকে, তাই যিকির অবস্থায় আল্লাহর সাহচর্য বান্দার কাছে খুব ভালো লাগে। সে আল্লাহর স্মরণে নিজের সময় ব্যয় করে। আল্লাহর এই সাহচর্য তার ভালো

---

১১৮. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

লাগে। আল্লাহর যিকিরের মধ্যে সে স্বাদ পায়। আল্লাহর নাম শুনে তার অন্তর আন্দোলিত হয়। এ কথাটিই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

'মুমিন তো কেবল তারা, যখন আল্লাহর আলোচনা হয়, তখন তাদের অন্তর আন্দোলিত হয়।'[১১৯]

আল্লাহ তা'আলার নাম শুনলে মুমিনের অন্তরে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। এখন এই وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (তাদের অন্তর আন্দোলিত হয় তথা গলে যায়) একটা ভিন্নভাবে বুঝুন!

জনৈক মহব্বতের রোগীর ঘটনা

একটি ঘটনা শুনুন। জনৈক বাদশাহ একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তিনি তাকে রাজমহলে রাখেন। কিন্তু মেয়েটি দিন-দিন নীরব দুর্বল হতে লাগল। তার স্বাস্থের অবনতি ঘটতে লাগল। অবয়ব দেখে সহজেই অনুমিত হতো যে, সে সুখী নয়; খুবই বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্ত। বাদশাহ বড়-বড় চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করালেন। কোনো চিকিৎসাই সামান্যতমও কাজে আসেনি। একজন ডাক্তার, যিনি মানসিক বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি বাদশাহকে বললেন, বাদশাহ সালামত! আমি তার চিকিৎসা করতে পারি যদি আপনি আমাকে অনুমতি দেন এবং তাকে তার দাসির সাথে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। বাদশাহ বললেন, খুব ভালো। তারপর তিনি তাকে সেই ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তার সেই মেয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন। বিয়ের পর যেদিক দিয়ে এসেছিল, কে-কে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং কে-কে তার বিয়ের প্রত্যাশী ছিল সকল তত্ত্ব তিনি জমা করলেন। ডাক্তার সাহেব মেয়েকে বসিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, শারীরিক কোনো রোগ তার মধ্যে নেই। তার কোনো ভেতরগত রোগ আছে। তারপর তিনি মেয়েটির শিরায় হাত রেখে তার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। কথা বলতে-বলতে তিনি সেসব লোকদের নাম নিতে থাকেন, যারা তাকে বিয়ের প্রত্যাশী ছিল। এক পর্যায়ে তিনি যখন সেই লোকটির নাম নিলেন, যে মেয়েটির খালাত ভাই ছিল এবং তার সাথে তার গোপন প্রেম ছিল, তার শিরা দ্রুত চলতে লাগল।

---

১১৯. সূরা আনফাল : আয়াত ২

মেয়েটি মূলত এই খালাত ভাইয়ের কাছে বিয়ে বসতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু মাতাপিতা তখনকার বাদশাহের কাছে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর থেকে মেয়েটি অন্তরে স্থান দিয়ে রেখেছিল সেই খালাত ভাইকে আর ঘর করছিল বাদশাহর।

ডাক্তার যখন দেখলেন, শিরা দ্রুত চলছে, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলো, তোমার অন্তরের দুঃখ-কষ্ট এই নয় কি যে, তোমার পছন্দ ছিল তোমার এই খালাত ভাইয়ের কাছে বিয়ে বসবে আর হয়ে গেছে বাদশাহের সাথে? জবাবে তাকে তার গোপন ভেদ প্রকাশ করতে হলো।

আল্লাহর যিকির দ্বারা মুমিনের শিরা দ্রুত চলমান হয়ে যায়

ঘটনাটি স্মরণ রেখে এবার এই আয়াতের তাফসীর বোঝার চেষ্টা করুন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

কেবল সেসব লোকই মুমিন,

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম আসে,

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

তখন তাদের শিরা দ্রুত চলমান হয়ে যায়।

আল্লাহর নাম শুনলে, মুমিনের শিরা দ্রুত চলে। মহান আল্লাহর সাথে তার অন্তরের সংযোগ থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে অবস্থান করেন। আল্লাহর মহব্বতে তার অন্তর ভরপুর এবং সিক্ত থাকে। এজন্য আল্লাহর নাম শুনে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং কম্পিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মুমিন বান্দা যারা, তারা আমার নাম শুনলে, তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়। তাদের হৃৎকম্পন বেড়ে যায়। হায়! আল্লাহ আমাদেরও তাঁর সাথে এরূপ সম্পর্ক নসিব করুন।

তেলাওয়াতে কুরআন আল্লাহর সাথে কথোপকথন

এভাবে যিকির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাহচর্য লাভ হয়। আর তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন নসিব হয়। কারও সাথে ফোনে কথোপকথন হলে যদি দুজনের মাঝে মহব্বতের উন্মত্ত সম্পর্ক থাকে, তাহলে কখন পাঁচ মিনিট চলে যায় খবর থাকে না; কোন দিক

দিয়ে দশ মিনিট গত হয়ে যায় তারও খবর থাকে না। ছেলে যদি বলে, মা! আমি সৌদি আরব থেকে ফোনে কথা বলছি এবং আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, তখন মা বলে, বৎস! আমি তো মাত্র দুটি কথাই বললাম। এটা মায়ের উন্মত্ত সম্পর্ক। আধা ঘন্টা ছেলের সাথে কথা বলল আর তাঁর কাছে মনে হচ্ছে দুটি কথা বলেছে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন মুমিনের উন্মত্ত সম্পর্ক হয়, তখন ঘন্টার পর ঘন্টা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার পরও তার কাছে অনুভূত হয়, আমি তো সামান্য সময়ই কুরআন তেলাওয়াত করলাম। এভাবে কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয় না। অন্তরের বাসনা থাকে, আরও তেলাওয়াত করতে, আরও তেলাওয়াত করতে। সে তেলাওয়াত করতে থাকে এবং প্রেমাস্পদের সাথে কথোপকথন করতে-করতে তার অন্তরে কম্পন এসে যায়। তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে এই অবস্থাকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

'যখন তারা শ্রবণ করে, যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু প্রবাহিত করতে দেখবেন; এজন্য যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের সাক্ষ্য দানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'[১২০]

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ

'আমাদের কী অপারগতা আছে যে, আমরা ঈমান আনব না আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তার ওপর; আর এ আশা করব না যে, আমাদের প্রভু আমাদের সৎ লোকদের মধ্যে শামিল করবেন?'[১২১]

· মুমিনগণ যখন এমন হৃৎকম্পন নিয়ে কথা বলে, তখন আল্লাহ বলেন–

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ

'অতএব, তাদের এসব কথার বদৌলতে আল্লাহ তাদের জান্নাত দান করবেন।'[১২২]

---

১২০. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৩

১২১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৪

১২২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৫

যারা এরূপ হৃৎস্পন্দন নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পার্থনা করে, তিনি তাদের যথাযথ প্রতিদানে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়ে দেন। তারপর আল্লাহর সাথে তাদের কথোপকথন ভালো লাগে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুলাকাত তাদের ভালো লাগে।

নামায আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুলাকাত

নামায আল্লাহ তা'আলার সাথে মুলাকাত। এজন্যই তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

أَرِحْنِيْ يَا بِلَالُ

'হে বেলাল! আমাকে ঠান্ডা করো; পরিতৃপ্ত করো।'

কী উদ্দেশ্য? আযান দাও। আমার অন্তর ঠান্ডা এবং পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। আমি আমার প্রভুর সাথে মুলাকাত করে নেব।

সাইয়্যিদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا وَنُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে আলোচনা করতেন, আমরাও তাঁর সাথে আলোচনা করতাম। ইতোমধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলে অবস্থা এমন হয়ে যেত, যেন তিনি আমাদের চেনেন না, আমরাও তাঁকে চিনি না।'

আয়েশা (রাযি.) বলেন, নামাযের সময় হয়ে গেলে বাস্তবিকই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন হয়ে যেতেন যে, তিনি আমাদের চিনতেন না। তিনি বলেন, একবার আযানের আওয়াজ শোনামাত্র আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, আমি আয়েশা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা কে? আমি উত্তর দিলাম, আবুবকর (রাযি.)-এর কন্যা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবুবকর কে? আমি বললাম, আবুকুহাফার ছেলে। এবার তিনি বললেন, আবুকুহাফা কে? আয়েশা (রাযি.) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, আবুকুহাফা কে? তখন আমি ঘাবড়ে গেলাম যে, তিনি এখন কাউকে চিনবেন না। আমি পেছনে সরে এলাম। পরবর্তী কালে একদা

স্বাভাবিক অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা!

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ

'আল্লাহর সাথে আমার একটা বিশেষ সময় আছে।'

তিনি বলেন, কোনো নবী-রাসূল ও আল্লাহর কোনো ফেরেশতা সে-সময় আমার ও আল্লাহর মাঝে অন্তরায় হতে পারে না। তারপর আল্লাহর সাথে মুলাকাত করতে অন্তর ব্যাকুল হয়ে যায়। আর এই নামায আল্লাহ তা'আলার সাথে মুলাকাতের মাধ্যম হয়ে যায়। তারপর মুমিনের অন্তর নামাযমুক্ত থাকে না। ফরজ পড়ার পর খুব যত্নসহকারে ওয়াজিবও পড়ে, সুন্নাতও পড়ে, নফলও পড়ে। তারপর নফল দ্বারাও অন্তর পরিতৃপ্ত হয় না, তাই প্রভুর সামনে দীর্ঘ কিয়াম করে, দীর্ঘ সেজদাও করে। এভাবেই আল্লাহর সাথে মুলাকাত হয়ে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন–

وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আযান শুনতেন, তখন তিনি এমন হয়ে যেতেন, যেন কাউকে চিনতেন না।'

এখন প্রভু ডাক দিয়েছেন। যেমন বরের বিয়ে হয়েছে; তাকে এখন বাসায় যেতে হবে। এ-সময় কোনো বন্ধু ডাক দিল, এসো বন্ধু! তোমাকে কোক পান করাব। জবাবে বর বলবে, আজ তো তোমার কোক আমার গলায় আটকে যাবে। আজকে আমি কোক পান করব না। আমাকে দ্রুত বাসায় যেতে হবে। মুমিনের অবস্থাও এরূপই হয়। যখন সে আযানের আওয়াজ শুনতে পায়, তখন মসজিদপানে যাওয়া ছাড়া কোনো কিছুতে তার মন বসে না। তাই তো হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'যেব্যক্তি বাসায় উজু করে মসজিদের দিকে যায়, সে সেই হাজীদের মতো, যারা ইহরাম বেঁধে প্রতিপালকের ঘরের দিদার লাভ করতে যাচ্ছে। মহব্বতের এরূপ সম্পর্ক আমাদেরও নসিব হোক। তো মানুষ নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর এই মুলাকাত পেয়ে থাকে।

মৃত্যু মুমিনের সওগাত

তারপর এমন একটা মুহূর্ত আসে, যখন অন্তর প্রেমাস্পদকে দেখতে চায়। মুমিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। তারপর কী

হয়? তারপর মুমিন কামনা করে, হে আল্লাহ! এখন পার্থিব এই জগত থেকে আমার খাতিমা বিল খাইর তথা শুভ বিদায় নসিব হয়ে যাক। তখন তার কাছে মৃত্যু ভালো লাগে। তাই তো বলা হয়–

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

'মুমিনের সওগাত হলো মৃত্যু।'

জনৈক বক্তা বলেন–

اَلْمَوْتُ جِسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ

'মৃত্যু এমন একটি সেতু, যা এক বন্ধুর সাথে আরেক বন্ধুর মিলন ঘটিয়ে দেয়।'

তারপর মুমিন অপেক্ষায় থাকে, কখন আমি ইহজগত থেকে বিদায় হব এবং আমার প্রকৃত মনিবের সাথে গিয়ে মিলিত হব। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَه

'যেব্যক্তি আল্লাহর মুলাকাতকে প্রিয় মনে করে, আল্লাহ তা'আলাও তার মুলাকাতকে প্রিয় মনে করেন।'

তারপর আল্লাহ তা'আলার সাথে মুলাকাত করে মুমিনগণ পরিতৃপ্ত হবে।

দিদারের মাহফিল

কেয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভ করবেন। এই দিদার দ্বারা এত শান্তি এবং এত স্বাদ অনুভূত হবে যে, মুমিনগণ সেখান থেকে জান্নাতেও যেতে চাইবে না। ফেরেশ্তাগণকে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাদের জান্নাতে নিয়ে যাও। অবস্থাটা এমন হবে, যেমন পীর সাহেব বলে দেন, ভাই! এখন আপনারা এখান থেকে চলে যান! তখন আশেক লোকদের অবস্থা এই হয় যে, তারা সেখান থেকে যেতে চায় না। তারা বলে থাকে, জানি না কী যে আকর্ষণ! মাটি থেকে পদযুগল উঠাতে মন সায় দেয় না। পীর সাহেব বলে থাকেন, মাহফিল শেষ হয়ে গেছে; আপনারা চলে যান। তারপরও যাদের মধ্যে মহব্বত রয়েছে, তারা বসে থাকে। তাদের বারবার বলে বিদায় করতে হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের অনুনয়বিনয় করে থাকেন এবং হাত বুলিয়ে বলে থাকেন, ঠিক আছে, এখন যান; আবার আসবেন! এভাবে অনেক কষ্টে তাদের পাঠাতে হয়। ঠিক তদ্রূপ কেয়ামতের দিন

মুমিনদের বলে দেওয়া হবে, জান্নাতে চলে যাও! ফেরেশ্‌তাগণ তাদের মিনতি করবেন। মুমিনগণ সেখানে আল্লাহর দিদারে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আশ্চর্যবোধ করছি, সেসব লোকদের প্রতি যাদের কেয়ামতের দিন ফেরেশ্‌তাগণ নূরের জিঞ্জিরে বেঁধে টেনে-টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আল্লাহর দিদারে তারা এতই নিমজ্জিত থাকবে যে, তাদের মন জান্নাতেও যেতে চাইবে না। এটাই মহব্বত। এরূপ মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ নামাযের স্বাদ পায়, তেলাওয়াতের স্বাদ পায়, সর্বোপরি জীবনের স্বাদ পায়।

اللہ! وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو
دائمی رحمت کی تیری جس پر نظر ہو
دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا
محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو

'আল্লাহ! সেই অন্তর দাও, যা তোমার মহব্বতের ঘর হয়
যার ওপর তোমার স্থায়ী রহমতের দৃষ্টি থাকে।
এমন অন্তর দাও, তোমার মহব্বতে যার এই অবস্থা হয়
হাশরে যদি হট্টগোলও হয়, তবুও তার হুঁশ না থাকে।'

হে আল্লাহ! এমন অন্তর দান করুন, যাতে আপনার মহব্বত এমনভাবে বসে যায় যে, হাশরমাঠে হট্টগোল হলেও সে ব্যাপারে তার হুঁশ না থাকে। আমি আল্লাহর মহব্বতে এমন আত্মহারা থাকি। আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত আমাদের এই নেয়ামত নসিব করুন।

আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত অর্জন

এবার আসুন! আল্লাহর এই মহব্বত আমরা কীভাবে অর্জন করতে পারি? এর জন্য আমাদের মাশায়েখগণ কয়েকটি পদ্ধতি বলেছেন। শুনুন এবং মনের কানে শুনুন।

১. তলবে সাদিক (সত্যিকার কামনা ও চাওয়া) : এখানে আপনাদের আগমন এ বিষয়ের প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সৌভাগ্যবান করতে চান। এজন্য যে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে কোনো বস্তু না দেওয়ার ইচ্ছে করেন, তখন তিনি সেই বস্তুর কামনা-বাসনা বান্দাকে দেন

না। নতুবা এটি দানশীল সত্তার শান এবং মর্যাদার পরিপন্থী যে, প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করবে আর তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। বিশেষ করে আল্লাহর শানে এটা কীভাবে হতে পারে? তাই সহজেই অনুমেয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে কামনা ও চাওয়ার তাওফীক পরে দেন। বান্দাকে দেওয়ার ইচ্ছে আগে করেন। তাই তো বলা হয়–

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ

'যে কামনা ও অন্বেষণ করেছে, সে পেয়ে গেছে।'

আপনারা আজকে খাঁটি মনে সমস্ত নফসানি, শয়তানি ও প্রবৃত্তির মহব্বতকে অন্তর থেকে বিতাড়িত করার দৃঢ় অঙ্গীকার করুন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মহব্বত কামনা ও প্রার্থনা করুন। তারপর দেখুন, তাঁর মহব্বত আপনাদের অন্তরকে কীভাবে উষ্ণ করে। দেখুন, আল্লাহর মহব্বত আপনাদের অন্তরকে কীভাবে ভরপুর করে দেয়। মহব্বতের এই পাত্র সম্পূর্ণরূপে ভরে যাবে। কিন্তু তাতে যদি পূর্ব থেকে নাপাকি আর ময়লা-আবর্জনা থাকে, তাহলে প্রথমে এসব নাপাকি ও ময়লা-আবর্জনা অন্তর থেকে বের করতে হবে। অন্তরকে এসব থেকে পবিত্র করতে হবে। যেহেতু অনেকে এসব অপবিত্রতা থেকে যথাযথভাবে তাওবা করে না, তাই তারা মহব্বতের সেই শিরা ও সালসা পায় না, যা পাওয়া চাই। সুতরাং মাশায়েখগণ আল্লাহর মহব্বত লাভের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।

একটি পদ্ধতির বর্ণনা তো হাদীছ শরীফে এসেছে। মিশকাত শরীফের হাদীছ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করা এবং অধিক পরিমাণে তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অর্জিত হয়।

২. মৃত্যুর স্মরণ : মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করার উদ্দেশ্য কী? বেশি-বেশি মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা পার্থিব অভিলাষ, কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা দূর হয়। মানুষের অন্তরে যেসব আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করে, যা সে মনেপ্রাণে লালন করে; বরং এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে যুবকে পরিণত করে রাখে; জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, 'এখনও তো আমি যুবক'। কাছে থাকা এক বৃদ্ধ তা শুনে বলে উঠল, 'আমি তো এখনও নওজোয়ান'। এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা হ্রাস পায়। এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اُذْكُرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ لِلَّذَّاتِ الْمَوْتَ

'আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ দূরকারী মৃত্যুর কথা স্মরণ করো।'

মোটকথা, মৃত্যুর বেশি-বেশি স্মরণ দ্বারা মানুষের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ দূর হয়। যারা প্রকৃত মানুষ, তারা হিসাব-নিকাশ করে নিজেকে উপার্জন ও ভোগের মধ্যে লিপ্ত রাখে। এমন হিসাব ছাড়া কাজ করে না যে, নামাযর সুযোগই পাবে না। এমন হিসাব ছাড়া কাজ করে না যে, তাহাজ্জুদের তাওফীক পাবে না। তারা জাগতিক কাজকর্ম এমনভাবে করে, যেন সাথে-সাথে পরকালের আমলও করতে পারে। সুতরাং মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করা চাই এবং বেশি-বেশি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা চাই।

৩. আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ সামনে রাখা : এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহ সামনে উপস্থিত করা। মুরাকাবা করা। চিন্তা করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কত নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন। মুরাকাবায় বসে চিন্তা করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন, সুস্থতা দিয়েছেন, বাড়িঘর দিয়েছেন, জীবনসঙ্গীনি দিয়েছেন, সন্তানসন্ততি দিয়েছেন, ইজ্জতসম্মান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে কত কত নেয়ামত দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ যত বেশি স্মরণ করবেন, আল্লাহর মহব্বত অন্তরে তত বেশি জায়গা করে নেবে। কেননা, অনুগ্রহকারীর সাথে মানুষের স্বভাবজাত মহব্বত হয়ে যায়। আমরা যখন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করব, তখন তাঁর সাথে কুদরতি মহব্বত হয়ে যাবে। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন–

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

'অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন-কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করা চাই। এরূপ চিন্তা করবেন, যদি আমার ব্যবসা অচল হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? তারপর উপলব্ধি হবে ব্যবসা কত বড় নেয়ামত ছিল। যদি আমার সন্তান হারিয়ে যায়, তাহলে কী হবে? তখন উপলব্ধি হবে সন্তান কত বড় নেয়ামত ছিল। যদি স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? আমার স্বামী মারা গেলে, আমার কী অবস্থা হবে? যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, যা দ্বারা জনসম্মুখে আমাকে অপদস্ত হতে হয়, তাহলে কী হবে? যদি আমার

ব্লাডক্যান্সার হয়ে যায়, তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে অবস্থা কী হবে? এভাবে সমস্ত নেয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা করবেন, যদি এগুলো হারিয়ে যায়, তাহলে অবস্থা কিরূপ হবে? এরূপ চিন্তাভাবনার পর মন বলবে, না, এসব নেয়ামতের প্রতি আমি মুখাপেক্ষী; এগুলো বিদ্যমান থাকা আমার জন্য খুবই জরুরি। এতে করে প্রকৃত নেয়ামতদাতার সাথে মহব্বত হবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ স্মরণ করবেন। যদি নেয়ামতসমূহ স্মরন না আসে, তাহলে আল্লাহওয়ালাদের কাছে গিয়ে বলবেন, জি, আল্লাহর নেয়ামতের কথা আমার মনে পড়ে না। তখন তাঁরা গুনে-গুনে দেখিয়ে দেবেন, মানুষের ওপর আল্লাহর কী-কী নেয়ামত রয়েছে।

৪. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত করা : হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ সেসব লোকদের ওপর আমার মহব্বত ওয়াজিব, যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং এর মাধ্যমেও আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে মহব্বত করা চাই। ওস্তাদ-ছাত্রের মহব্বত আল্লাহর দীনের খাতিরে, পীর-মুরীদের মহব্বত আল্লাহর দীনের উদ্দেশ্যে। তাই এই মহব্বতও আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করার উপকরণ হয়।

৫. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা : অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেসব লোকের ওপর আমার মহব্বত ওয়াজিব, যারা আমার রাস্তায় খরচ করে।

৬. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা : এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, সেসব লোকদের ওপর আমার মহব্বত অবধারিত, যারা আমার জন্য পরস্পর আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করে। অর্থাৎ– আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে।

যাক হাদীছ শরীফে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে মহব্বত করা, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা। কাজেই আমাদের জন্য জরুরি, আমরা যেন তিনটি কাজেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করি। সুতরাং মোট সাতটি কাজ পাওয়া গেল। ১. সত্যিকার তলব বা কামনা, ২. বেশি-বেশি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা, ৩. মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করা, ৪. আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা, ৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে মহব্বত করা, ৬. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, ৭. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। এই সাতটি কাজ যদি আমরা যত্নসহকারে

পালন করি, তাহলে দেখবেন, আল্লাহর মহব্বত অন্তরে বৃদ্ধি পাবে এবং এর আকর্ষণ নিজেরাই অনুভব করবেন।

আকর্ষণকারী মহব্বত

দেখুন, মহব্বত তো সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু আকর্ষণকারী মহব্বত নেই। আকর্ষণকারী মহব্বত অর্জন করা চাই। যে মহব্বত মানুষকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করে, এমন মহব্বত আমাদের সকলেরই নসিব হয়ে যাক। আল্লাহ তা'আলাও চান, আমার বান্দাগণ আমার এরূপ মহব্বত লাভ করুক। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মজবুত।'[১২৩]

অর্থাৎ– আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের প্রবল মহব্বত থাকে।

ভাই! যখন আল্লাহর প্রতি মানুষের মহব্বত থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলারও তো মানুষের প্রতি মহব্বত থাকে। মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রচণ্ড মহব্বত রয়েছে। দুনিয়ার সকল মায়ের সমস্ত মহব্বত যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে মানুষের প্রতি আল্লাহর যে মহব্বত রয়েছে, তার সত্তর ভাগের এক ভাগও হবে না। আল্লাহর এত মহব্বতই রয়েছে মানুষের সাথে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ

'শপথ তীন ও যাইতুনের। শপথ সিনাই পর্বতের।'[১২৪]

সূরা তীনের তাফসীরে মুফাস্সিরীনে কেরাম লিখেছেন, উক্ত সূরায় আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তূর পর্বতের কসম খেয়েছেন। এর মূল রসহ্য হলো, এই তূর পর্বতে আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বতকারী এক প্রেমিক হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথন করতেন, মুলাকাত করতেন। মহব্বত হওয়ার পর প্রেমাস্পদের সাথে যেস্থানে মুলাকাত হয়, সেই স্থানও প্রিয় হয়ে যায়। মহিলারা বিয়ের পর পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে এসে প্রথম

---

১২৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

১২৪. সূরা তীন : আয়াত ১, ২

যে-ঘরে অবস্থান করেন, সেই ঘরের সাথে তাদের কুদরতি মহব্বত জন্মে যায়। সেই ঘর ত্যাগ করতে তাদের মন সায় দেয় না। এটি মানবজাতির স্বভাবজাত বিষয়। কেননা, এখানে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। আল্লাহ তা'আলাকে দেখুন, মহব্বতের স্থান এত প্রিয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে সেই স্থানের কসম খেয়েছেন। সুতরাং উপলব্ধি করুন, মহব্বত আল্লাহ তা'আলার কাছে কত প্রিয় ও পছন্দনীয়।

আল্লাহর মহব্বতের পরিধি

আল্লাহর কাছে মহব্বত এত প্রিয় বলেই তিনি ঘোষণা করেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহর বিধানাবলি পালন না কর, শরীয়তের অনুকরণে অবহেলা কর, তাহলে আমি তোমাদের অপসারিত করে তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি নিয়ে আসব–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ

'আল্লাহ তাদের মহব্বত করবেন এবং তারাও আল্লাহকে মহব্বত করবে।'[১২৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে يُحِبُّهُمْ বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মহব্বত করবেন। তারপর বলেছেন,وَيُحِبُّوْنَه অর্থাৎ বান্দারাও তাঁকে মহব্বত করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মহব্বত এত প্রিয় যে, তিনি মহব্বতের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনি নিজে মহব্বত করার কথা বলেছেন। বান্দারাও মহব্বত করবে একথা পরে বলেছেন। আহ! আমার মনিব! আপনার বান্দাদের সাথে আপনার কত মহব্বত?

আল্লাহর মহব্বত জীবন নামক গাড়ির পেট্রোল

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহর মহব্বতের বৈশিষ্ট্য গাড়ির পেট্রোলের মতো। গাড়ি যেমন ডিজেল ও পেট্রোল দ্বারা চলে, তেমনি আল্লাহর মহব্বত আমাদের জীবন গাড়ির ডিজেল-পেট্রোল। পেট্রোলবিহীন গাড়ি যেমনভাবে চলতে-চলতে বন্ধ হয়ে যায়, তেমনিভাবে আল্লাহর মহব্বত না থাকলে মানুষের জীবনগাড়িও চলতে-চলতে বন্ধ হয়ে যায়।

---

১২৫. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

আল্লাহর মহব্বতের মর্যাদা ও মূল্য

অন্তরে যদি আল্লাহর মহব্বতের মর্যাদা ও মূল্য থাকে, তাহলে মানুষ এই মহব্বতের খাতিরে নিজের জীবনও বিলিয়ে দেয়। তারপরও চিন্তা করে, আমি এই মহব্বত সস্তায় পেয়েছি।

متاع وصل جاناں بس گراں است

گرایں سودا بجا بودے کہ بودے

যদি এই সওদা সম্পদের বিনিময়েও অর্জন হয়ে যায়, তবুও সস্তায় অর্জিত হলো। আল্লাহর মহব্বত যদি আমি জীবন বিসর্জন করেও পেয়ে যাই, তবুও তা অনেক বড় নেয়ামত। কেননা, আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর মহব্বত পেয়ে গেলাম।

জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে নিজের সমস্ত ধনদৌলত ব্যয় করে দেন। তারপর তিনি স্বপ্নে দেখেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইশারা করা হয়েছে, হে আমার বান্দা! তুমি যখন এত কিছু আমার রাস্তায় ব্যয় করেছ, এর প্রতিদানস্বরূপ আমি তোমাকে আমার মহব্বত দান করলাম। তারপর নিদ্রা থেকে জেগে তিনি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদুটি আবৃত্তি করেন–

جماد چندم دازم جاں خریدم

بحمد للہ عجب ارزاں خریدم

আমি কয়েকটি টুকরা দিলাম, সামান্য পয়সা ব্যয় করলাম, বিনিময়ে জান কিনে নিলাম। আল্লাহর কসম! আমি মহা মূল্যবান বস্তু ক্রয় করলাম।

সুতরাং জীবন উৎসর্গ করেও যদি আল্লাহর মহব্বত লাভ করা যায়, তাহলে বন্ধুগণ! এটা নিতান্তই সস্তা সওদা। তাই তো জনৈক বক্তা কতই-না চমৎকার কথা বলেছেন! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার কাবীরা! তিনি বলেন–

جان دیتن بردی و در جانی ہنوز

در دہا دادی و در مانی ہنوز

আমার প্রেমাস্পদ আমার দেহ থেকে আমার প্রাণ বের করে নিয়েছেন। আর এখন আমার প্রাণে তিনি বিরাজমান। আমার সমস্ত রোগব্যাধি তিনিই দিয়েছেন এবং সকল রোগব্যাধির ওষুধও তাঁরই কাছে।

قیمت خود ہر دو عالم گفتہ ای

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

আপনি বলেছেন, আপনার মূল্য উভয় জাহান। হে আমার বান্দারা! আমাকে যদি পেতে চাও, তাহলে উভয় জাহান উৎসর্গ করে দাও।

তোমাদের না থাক ইহজগতের আকাঙ্ক্ষা, না পরজগতের আকাঙ্ক্ষা; আমাকে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা বানিয়ে নাও! হে আমার বান্দারা! আমাকে পাওয়ার জন্য তোমরা উভয় জগত থেকে বিমুখ হয়ে যাও!

হে আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদ! মূল্য বৃদ্ধি করে দিন, এই লেনদেন তো আপনি অনেক সস্তা বলেছেন, আল্লাহু আকবার।

আল্লাহর মহব্বতের জন্য মুনাজাত

সুতরাং অদ্য এই মাহফিলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মহব্বত প্রার্থনা করুন। যত ইচ্ছে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনাকারীগণ তো বলেন–

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں

میری سادگی دیکھ! کیا چاہتا ہوں

'তোমার মহব্বতের সর্বশেষ প্রার্থনা করছি,
আমার সরলতা দেখুন, আমি কী চাচ্ছি।'

আজকে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মহব্বতের সর্বশেষ প্রার্থনা করব। হে আল্লাহ! আমি উভয় জগত বিসর্জন দিয়ে আপনাকে পেতে প্রস্তুত। হে আমার মনিব! আমি এজন্যই তো উপস্থিত হয়েছি। হে মালিক! আমি অন্ত করণে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছি, হে আল্লাহ! আজকে আমি আপনার মহব্বত অন্তরে ধারণ করব। আপনার মহব্বত দ্বারা অন্তর ভরে নেব। হে মালিক! সৃষ্টজীবের মহব্বতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হে আল্লাহ! আমি দ্বারে-দ্বারে করাঘাত করে-করে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। হে আল্লাহ! আমি বহু জায়গায় উপস্থিত হয়েছি, দরখাস্ত করেছি, অনুতাপ আর দুঃখ ছাড়া কিছুই পাইনি। হে আল্লাহ! একমাত্র তোমার দ্বারই তো আছে, যেখানে প্রকৃত মহব্বত পাওয়া যায়। হে আল্লাহ! আজকে খাঁটি মহব্বত পাওয়ার জন্য আমি এখানে এসে বসেছি। আমার মনিব! আমি আঁচল বিছিয়েছি, আমাকে দান করুন! পরম করুণাময় প্রভু! আমি ওলামায়ে কেরাম থেকে শুনেছি, এক ভিক্ষুক জনৈক

হাকিমের কাছে পাঁচ দিনার চেয়েছিল। হাকিম তাকে পাঁচশো দীনার দিয়ে দিলেন। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করলেন, ভিক্ষুক চাইল পাঁচ দিনার, হাকিম পাঁচশো দিনার দিলেন কেন? উত্তরদাতা বললেন, ওটা প্রার্থনাকারীর ভাণ্ড ছিল; আর এটা দাতার ভাণ্ড।

আল্লাহ! আজ আমরা আপনার মহব্বত প্রার্থনা করছি। এটা প্রার্থনাকারীর ভাণ্ড। আল্লাহ! আপনি দাতা, আপনার ভাণ্ড অনেক বড়। আপনার ভান্ডার অত্যন্ত প্রশস্ত। হে মালিক! আজকে আপনার ভান্ডারসমূহের দরজা খুলে দিন। আমাদের অন্তরগুলোতে মহব্বত ঢেলে দিন। একটি সন্তুষ্টির দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ! আমাদের অন্তরগুলোকে আন্দোলিত করে দিন। আল্লাহ! আজ আমাদের ইবাদাতের স্বাদ নসিব করুন। তেলাওয়াতের মজা দান করুন। স্বাদহীন সেজদা কতকাল পর্যন্ত করতে থাকব! সুখহীন নামায কতদিন পর্যন্ত পড়তে থাকব! আমার মালিক! আজকে আমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনার সামনে মাথা নত করে বসে আছি। ইয়া আকরামাল আকরামীন! ইয়া আহকামাল হাকিমীন! ইয়া হান্নানু! ইয়া মান্নানু! আজকে আমরা নিঃস্ব অসহায়দের প্রতি আপনার রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! আজ আমরা আমাদের জীবনের বেচাকেনা করতে চাই। হে মনিব! আজকে আমরা আপনার সমীপে আপনার মহব্বত তলব করছি। হে আল্লাহ! কোনো দুনিয়াদারের কাছে হাত পাতলে মনে জাগত, 'জানা নেই দেবে কি-না'? আজকে তো আমরা আপনার দরবারে হাত তুলেছি। হে মনিব! আপনি প্রার্থনাকারীদের প্রদান করে খুশি হন। হে আল্লাহ! আপনার মহব্বত আমাদের দান করুন। অন্তরসমূহকে আপনার মহব্বত দ্বারা ভরপুর করে দিন। অন্য সকল কিছুর মহব্বত থেকে মুক্তি দান করুন। আল্লাহ! অন্ত রগুলো ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিন। হে মালিক! আমাদেরকে আপনার পাগল বানিয়ে নিন পরম করুণাময় প্রভু!

شراب محبت پلادے مجھے
تو دیوانہ اپنا بنالے مجھے
تیرے جلوے کو دیکھ کر جان دوں
مروں تو تیرے فضل سے یوں مروں
رہوں گور میں بھی دوا نہ تیرا

نہ موقوف ہو منہ دکھانا تیرا
اٹوں تو تیری یاد میں پھر اٹھوں
غرض عشق ہی میں جیوں اور مروں

'হে আল্লাহ! তোমার মহব্বতের শরাব পান করাও আমায়
আপনার পাগল বানিয়ে নাও আমায়।
যেন তোমার দ্যুতি দেখে জীবন উৎসর্গ করি,
মৃত্যুবরণ করলে তোমার দয়ায় এভাবেই মরি।
কবরেও থাকি পাগল হয়ে তোমার,
বন্ধ না হয়ে যাক দিদার তোমার।
তোমার স্মরণেই আবার পুনরুজ্জীবিত হই আমি
মোটকথা, তোমার মহব্বতেই বাঁচি-মরি আমি।'

অর্থাৎ– আল্লাহ! আপনার এমন মহব্বত দান করুন, যেন সেই মহব্বতে আমরা জীবন যাপন করি, সেই মহব্বতে মৃত্যুবরণ করি এবং কেয়ামতের দিন সেই মহব্বতেই আমাদের পুনরুত্থিত করা হয়। আল্লাহ! তারপর আপনি আমাদের দেখে মুচকি হাসবেন, আমরা আপনাকে দেকে মুচকি হাসব। আল্লাহ! এটা সম্ভব নয়, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তো অবশ্যই করতে পারি আল্লাহ!

مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے
مگر اپنے دل کو میں کیا کروں؟ اسے پھر بھی شوق وصال ہے

'আমার নিজের দুর্বলতা ও নীচুতার লজ্জা রয়েছে,
তোমার উঁচু শানের ধারণা রয়েছে,
কিন্তু আমার অন্তরকে কী করব?
সে তবুও সাক্ষাৎ লাভে লালায়িত।'

আল্লাহ! নিজের অপত্রিতা সত্ত্বেও, নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, নিজের অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও হে মালিক! আমরা আপনার হতে চাই। আল্লাহ! এ উদ্দেশ্যেই বাড়িঘর ছেড়েছি, জন্মভূমি ছেড়েছি, আত্মীয়-স্বজন ছেড়েছি, স্ত্রী-সন্তান ছেড়েছি, আল্লাহ! বহু দূর সফর করে এখানে তোমার সন্ধানে এসেছি।

میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں.

হে আল্লাহ! আপনার দিদারের সন্ধানে আমি কত কত সফর করেছি! কেউ বাসে অনেক ধাক্কা খেয়ে এসেছে, কেউ গাড়িতে রাত জেগে এসেছে, কেউ বিমানে সফর করে এসেছে। আল্লাহ! এটি আপনার বান্দাদের সমাবেশ। এটি আপনাকে তালাশকারীদের সমাবেশ। আল্লাহ! সকলেই আপনাকে চায়। আমার মনিব! এই বান্দাগুলোকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আল্লাহ! তাদের অন্তর আপনার মহব্বত দ্বারা ভরে দিন। আল্লাহ! জানা নেই, এই মুহূর্ত জীবনে আর কখন ভাগ্যে জুটবে? আল্লাহ! আজকে এই মাহফিলে আমাদের তাওবাও কবুল করে নিন। আল্লাহ! আমার অন্তরগুলোকে আপনি ব্যতীত অন্য সকল কিছুর মহব্বত থেকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন এবং আপনার মহব্বত দ্বারা ভরপুর করে দিন এবং আমাদেরকে আপনার দেওয়ানা বানিয়ে দিন।

আল্লাহ আমাদেরকে وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ [যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মজবুত] এবং وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ (তাদের অন্তর আন্দোলিত হয় তথা গলে যায়)- এর পাত্র বানিয়ে দিন। আল্লাহ! এমন অন্তর দান করুন, যা আপনার নাম শুনে কেঁপে ওঠে, আযানের আওয়াজ শুনে আন্দোলিত হয়। যত নামাযই পড়া হয়, যে অন্তর ভরে না, যত তেলাওয়াতই করা হয়, যে অন্তর আরও তেলাওয়াত করতে চায়, এমন অন্তর আমাদের দান করুন। এমন অন্তর দান করুন, যা সর্বক্ষণ আপনার স্মরণে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ! আমাদের সকলকে আপনার পরিপূর্ণ মহব্বতময় জীবন দান করুন।

وَآخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

বিশ্বজগতের প্রেমাস্পদ

'যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জগতের প্রেমাস্পদ, তাই তিনি জড়জগতেরও প্রেমাস্পদ, উদ্ভিদ জগতেরও প্রেমাস্পদ, জীব-জানোয়ারেরও প্রেমাস্পদ, মানবজাতিরও প্রেমাস্পদ বরং সকল কিছুরই প্রেমাস্পদ।'

সমগ্র জগতের প্রেমাস্পদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ○ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ○ الَّذِيْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ○ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জগতের মাহবূব তথা প্রেমাস্পদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমনসব নেয়ামত, সৌন্দর্য ও পূর্ণতা ধন্য করেছেন যে, সকল মানুষ তাঁকে নিজ জীবনের আদর্শ বানাতে পারে। মানুষ শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, প্রাচ্যে অবস্থান করুক বা পাশ্চাত্যে অবস্থান করুক, বিজ্ঞানী হোক, প্রকৌশলী হোক, ডাক্তার হোক, কৃষক হোক, বিচারক হোক, সৈনিক হোক, জেনারেল হোক, মুজাহিদ হোক, বক্তা হোক কিংবা আর যাই হোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জীবনে তার জন্য সর্বোত্তম নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান আছে।

রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী ছিলেন যে, মানবেতিহাসে এরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। আপনারা বড়-বড় বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়ে দেখুন, লোকজন তাদের প্রশংসা করছে– নিউটন এই মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন,

আইনস্টাইন অমুক ক্ষেত্রে বড় সফলতা অর্জন করেছেন এবং অমুক এই এই করেছেন; কিন্তু পর্যাপ্ত সময় পায়নি, যদি জীবিত থাকত, তাহলে আরও কিছু করে দেখাত। এ কথার মর্ম কী? মর্ম হলো, তাদের জীবন অসম্পূর্ণ ছিল। যুগের বড় থেকে বড় জেনারেল বা সেনাপতিদের দেখুন, লোকজন তাদের জীবনী লিখছে, তিনি অনেক বিজয় অর্জন করেছেন; কিন্তু তার জীবনে শেষ করতে পারেননি। যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকতেন, তাহলে আরও অনেক অঞ্চল দখল করে নিতেন। অর্থাৎ তাদের জীবনও অসম্পূর্ণ। এমনিভাবে যাদের জীবনীই আপনারা অধ্যয়ন করবেন, আপনাদের দৃষ্টিতে তাদের জীবন অসম্পূর্ণই মনে হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, তারা কেউই মনোবাসনা ও জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

তবে মানবেতিহাসে একটিমাত্র স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা দ্বারা অনুমিত হয়, এমন একজন ব্যক্তিও গত হয়েছেন, যাঁর জীবন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ছিল। সেই মহান ব্যক্তি হলেন, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রিয় বন্ধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবার সমাবেশে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– 'লোকসকল! যে উদ্দেশ্যে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি, আমি কি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি? আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছি?'

এর উত্তরে সমাবেশে উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, আপনি সেই আমানত পৌঁছানোর হক আদায় করে দিয়েছেন। এ-সময় আল্লাহর প্রিয় হাবীব আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী বানিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি একথার ওপর সাক্ষী থাকুন যে, আমি আমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি। পূর্ণ মানবেতিহাসে এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত। এতদ্ভিন্ন আর কোনো দৃষ্টান্ত আপনারা উপস্থিত করতে পারবেন না। মানুষ একেকজন একেকজনকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। ভাই! যদি কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করো। যাদের জীবন অসম্পূর্ণ, যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ, যাদের কাজকর্ম অসম্পূর্ণ তারা কীভাবে আদর্শ হতে পারে?

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর পাত্র

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেন, তখন তিনটি দু'আ করেছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন।'[১২৬]

অর্থাৎ– হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! আমরা আপনার ঘর নির্মাণ করেছি; এখন আপনি ইল্‌ম পাঠদানকারী পাঠিয়ে দিন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করে স্বীয় মাহবুব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দু'আর পাত্র বানিয়ে বিশ্বজগতে প্রেরণ করেন।

ঘর নির্মিত হচ্ছে বাইতুল্লাহ।

নির্মাণকারী ইবরাহীম খলীলুল্লাহ।

সহযোগিতাকারী ইসমাঈল যবীহুল্লাহ।

যে-ঘর নির্মিত হচ্ছে, তার নাম বাইতুল্লাহ।

যাঁর কাছে দু'আ করা হচ্ছে, তাঁর নাম আল্লাহ।

যিনি আসবেন, তার নাম মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় নির্বাচনে হেকমত

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। আল্লাহ তা'আলা এমন একটি সময় পছন্দ করেছেন, যখন অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে। এটি মানবজাতির নামে একটি বার্তা ছিল যে, হে মানবকুল! এখন দুনিয়া থেকে শির্‌ক ও কুফরের অন্ধকার চিরতরে বিদায় হলো এবং হেদায়েতের আলো উদ্ভাসিত হলো। সুতরাং এখন সূর্য উদিত হলো, যা সমগ্র পৃথিবীতে ঈমান ও তাওহীদ পৌঁছে দেবে।

পারস্য রাজপ্রাসাদের গম্বুজ ধসে পড়ার রহস্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে শুভাগমনের সময় সিরিয়ার পর্বতসমূহে আলোকচ্ছটা দৃশ্যমান হয়।

---

১২৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৯

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, যতদূর পর্যন্ত সেই আলোকচ্ছটা দেখা গেল, সেই জায়গা পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল। যেন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আলোকরশ্মির মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন, আমার মাহবুবের জীবদ্দশায় সেখান পর্যন্ত দীন সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তী কালে একটা সময় এমন আসবে, যখন প্রতিটি পাকা এবং কাঁচা ঘরে ইসলাম পৌঁছে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের সময় পারস্য রাজপ্রাসাদের গম্বুজ ভেঙে গেল। এর রহস্য কী ছিল? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, সে-সময় পারস্য রাজপ্রাসাদের যতসংখ্যক গম্বুজ ভেঙেছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তখনকার সমসংখ্যক বাদশাহর মুকুট তাঁর পদতলে এসেছিল।

সম্মানিত পিতার মৃত্যুতে হেকমত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভজন্মের পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবদুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। তাতেও হেকমত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাঁর মাথা থেকে পিতৃচ্ছায়া সরিয়ে দিলেন। দেখুন, পিতা সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেন। লোকজন বলে থাকে, পিতার শিক্ষা-দীক্ষার কারণে ছেলে এই মহৎ কাজটি আঞ্জাম দিতে পেরেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমি নিজে আমার প্রিয় বন্ধুকে সকল কামালাত তথা পূর্ণতা ও উৎকর্ষ দান করেছি। ভবিষ্যতে এই পূর্ণতা ও উৎকর্ষ অন্য করো দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হয় এবং সকলেই এরূপ বলে যে, তিনি ছিলেন এতিম, কিন্তু মহামহিম পালনকর্তা তাঁকে এতসব মর্যাদা দান করেছেন বলেই তিনি সকল উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করেছেন, যার কল্পনাও অন্য কোনো মানুষ করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ! নিজে অশিক্ষিত। কিন্তু পৃথিবী ও সমগ্র জগতের সকল জ্ঞান তাঁর আয়ত্ত।

امی و دقیقہ دان عالم

بے سایہ و سائبان عالم

'অশিক্ষিত; অথচ জগতের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞাত
ছায়াহীন অথচ জগতের ছায়ানীড়।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাহ্যত ছায়াহীন করেছেন; কিন্তু বস্তুত সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁকে ছায়ানীড় করে প্রেরণ করেছেন।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, যতদূর পর্যন্ত সেই আলোকচ্ছটা দেখা গেল, সেই জায়গা পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম বিস্তৃত হয়েছিল। যেন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আলোকরশ্মির মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন, আমার মাহবুবের জীবদ্দশায় সেখান পর্যন্ত দীন সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তী কালে একটা সময় এমন আসবে, যখন প্রতিটি পাকা এবং কাঁচা ঘরে ইসলাম পৌঁছে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের সময় পারস্য রাজপ্রাসাদের গম্বুজ ভেঙে গেল। এর রহস্য কী ছিল? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, সে-সময় পারস্য রাজপ্রাসাদের যতসংখ্যক গম্বুজ ভেঙেছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তখনকার সমসংখ্যক বাদশাহর মুকুট তাঁর পদতলে এসেছিল।

সম্মানিত পিতার মৃত্যুতে হেকমত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভজন্মের পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবদুল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। তাতেও হেকমত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত তাঁর মাথা থেকে পিতৃচ্ছায়া সরিয়ে দিলেন। দেখুন, পিতা সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে বড় করেন। লোকজন বলে থাকে, পিতার শিক্ষা-দীক্ষার কারণে ছেলে এই মহৎ কাজটি আঞ্জাম দিতে পেরেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমি নিজে আমার প্রিয় বন্ধুকে সকল কামালাত তথা পূর্ণতা ও উৎকর্ষ দান করেছি। ভবিষ্যতে এই পূর্ণতা ও উৎকর্ষ অন্য করো দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হয় এবং সকলেই এরূপ বলে যে, তিনি ছিলেন এতিম, কিন্তু মহামহিম পালনকর্তা তাঁকে এতসব মর্যাদা দান করেছেন বলেই তিনি সকল উৎকর্ষ ও পূর্ণতা লাভ করেছেন, যার কল্পনাও অন্য কোনো মানুষ করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ! নিজে অশিক্ষিত। কিন্তু পৃথিবী ও সমগ্র জগতের সকল জ্ঞান তাঁর আয়ত্ত।

امی و دقیقہ دان عالم

بے سایہ و سائبان عالم

'অশিক্ষিত; অথচ জগতের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞাত

ছায়াহীন অথচ জগতের ছায়ানীড়।'

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাহ্যত ছায়াহীন করেছেন; কিন্তু বস্তুত সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁকে ছায়ানীড় করে প্রেরণ করেছেন।

গর্ভের সময় বহু বরকত প্রকাশ

এখনও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হননি, মাতৃগর্ভে আছেন, তাঁর সম্মানিতা মাতা সাইয়্যিদা আমেনা বলেন, যখন আমি পানি সংগ্রহের জন্য যমযম কূপে যেতাম, তখন মাটির স্তর থেকে পানি কূপের ওপর কিনারায় চলে আসত এবং আমি অতি সহজেই পানি ভরে নিতাম। আমি যখন ফিরে যেতাম, তখন আবার পানি নিচের স্তরে নেমে যেত। তিনি বলেন, গর্ভাবস্থায় আমার কোনোরূপ কষ্ট অনুভব হয়নি। এমনিভাবে অন্যান্য সমস্যা যা গর্ভের সময় সাধারণত মহিলাদের হয়ে থাকে, তার কোনোটিই আমার হয়নি।

হালীমা সা'দিয়ার অঙ্গনে রহমতের প্রাচুর্য

তখনকার যুগে লালনপালনের জন্য সন্তানদের গ্রামাঞ্চলের ধাত্রীদের কাছে সোপর্দ করা হতো, যাতে শিশু উন্মুক্ত পরিবেশে লালিতপালিত হয় এবং বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। তাই গ্রামাঞ্চল থেকে ধাত্রীরা আসত এবং শিশুদের নিয়ে যেত এবং শিশুর পিতা থেকে বিনিময় নিয়ে তাদের লালনপালন করত। সেই সময় বনু সাঈদ নামে একটি গোত্র ছিল। এই গোত্রের মহিলা ছিলেন হযরত হালীমা সা'দিয়া। তাঁর সংসারে চরম অস্বচ্ছলতা বিরাজ করছিল। তাঁর দুধের জানোয়ার দুধ দিচ্ছিল না, যেন দুর্ভিক্ষ চলছে। অন্য মহিলাদের সাথে তিনিও মক্কা মুকাররমার দিকে চললেন। উদ্দেশ্য কোনো শিশু নিয়ে লালনপালন করে কিছু বিনিময় অর্জন করা। কিন্তু তার বাহনের জন্তুটি অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছিল। ফলে অন্য মহিলারা তাঁকে পেছনে ফেলে তাঁর অনেক আগেই মক্কায় পৌঁছে যায় এবং তারা ধনাঢ্যদের সন্তানদের নিয়ে নেয়।

হালীমা সা'দিয়া মক্কায় পৌঁছে অবগত হন, ধনাঢ্যদের সন্তানদের তাঁর আগে চলে আসা মহিলারা নিয়ে চলে গেছে। অবশ্য একটি এতিম শিশু এখনও রয়ে গেছে। তিনি মনে-মনে ভাবলেন, শিশুটির তো পিতা বেঁচে নেই, যিনি লালনপালনের বিনিময়ে আমাকে কিছু দেবেন। তিনি বলেন, এরূপ চিন্তাভাবনার পরও আমার অন্তরে জাগল, যাওয়া যাক, গিয়ে দেখি শিশুটি দেখতে কেমন? আমি সেখানে গিয়ে দেখি শিশু মুহাম্মাদ শোওয়া; তাঁর ওপরে একটি চাদর জড়ানো। আমি তার ওপর থেকে চাদরটি সরালে সে আমাকে দেখে মুচকি হাসি দিল। তিনি বলেন, তাঁর হাসিতে এমন আকর্ষণ ছিল যে, আমার মন বলল, হালীমা! তুমি অর্থকড়ি পাও বা না পাও এই শিশুর যে মুচকি হাসি

তুমি পাবে, সেটা তোমার অন্তর প্রশান্তিতে ভরে দেবে। আমি চেতনাহীনের মতো শিশু মুহাম্মাদকে বুকে জড়িয়ে নিলাম। এখন তাকে নিচে শোওয়াতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। তাই আমি আমার স্বামীকে বললাম, নিয়ে চললাম। তিনিও বললেন, ঠিক আছে।

এবার আমরা গ্রামে ফিরে আসব। আমাদের বাহন জন্তুটি মাটিতে বসা ছিল। এ অবস্থায়ই আমি সেটির ওপর বসে গেলাম। আমার স্বামী সেটিকে চালানোর জন্য আমার সামনে বসলেন। কিন্তু এ-সময় একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। আমার স্বামী সামনে বসে জন্তুটিকে উঠানোর জন্য লাগাম টান দিলে সেটি বসা থেকে উঠতে রাজি হলো না। তিনি জন্তুটিকে পেটাতে শুরু করলেন। তারপরও সেটি উঠতে সম্মত হয়নি। অথচ ইতিপূর্বে ইশারায় উঠে যেত। এ অবস্থায় পেরেশান হয়ে তিনি জন্তুটির ওপর থেকে নেমে পড়লে সেটি বসা থেকে উঠে পড়ে। তারপর আবার আমার স্বামী সামনে বসলে জন্তুটি মাটিতে বসে পড়ে। তিনি সেটিকে উঠাতে প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এবারও তিনি পেরেশান হয়ে নিচে অবতরণ করতেই জন্তুটি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেল। এমনটি আরও বেশ কয়েকবার ঘটল, তিনি যখনই সামনে বসতেন সাথে-সাথে জন্তুটি বসে যেত, আবার যখন নেমে যেতেন, তখন সেটি চলতে শুরু করত। এই পেরেশানির মধ্যে অবশেষে আমার স্বামী বললেন, হালীমা! তুমি কিছুটা সামনে বসে যাও! আমি পেছনে বসছি। সম্ভবত কোনো সমস্যা হচ্ছে।

তারপর হালীমা সা'দিয়া শিশু মুহাম্মাদকে কোলে নিয়ে সামনে বসলেন, তার স্বামী বসলেন পেছনে। এবার জন্তুটিকে ইশারা করার সাথে-সাথে সেটি উঠে দ্রুত চলতে শুরু করল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাচ্ছিলেন না, হালীমার স্বামী এমন স্থানে বসুক, যেখানে তার পিঠ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে থাকে। হালীমার স্বামী সামনে বসাতে যেহেতু তেমনটি হয়ে যাচ্ছিল, তাই জন্তুটি কীভাবে চলতে পারে? তারপর সমগ্র জগতের এই সরদারকে যখন সামনে বসানো হলো, তখন জন্তুটি চলতে শুরু করল।

হালীমা সা'দিয়া বলেন, তারপর আমার জন্তুটি এত দ্রুতবেগে চলতে থাকে যে, অন্য ধাত্রীগণ যারা আমাকে পেছনে ফেলে অনেক দূর চলে গিয়েছিল, তাদেরও অতিক্রম করে ফেলল। যখন আমারা তাদের অতিক্রম করছিলাম, তখন এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হালীমা! তুমি তো

আমাদের অনেক পরে মক্কায় পৌঁছেছিলে, এখন দ্রুত আমাদের আগে চলে যাচ্ছ। তুমি কি জন্তু পরিবর্তন করেছ? তিনি বলেন, আমি উত্তর দিলাম, 'আমি জন্তু পরিবর্তন করিনি, অবশ্য জন্তুর পিঠের আরোহী পরিবর্তন হয়েছে।' এভাবে আমরা অন্যদের আগেই বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

আমরা বাড়ি পৌঁছে দেখি, বকরিগুলোর স্তন দুধে ভরপুর। এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। তারপর প্রতিদিন বকরিগুলোর স্তন দুধে ভরপুর থাকত। প্রতিবেশী মহিলারা এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করত, হালীমা! আপনি আপনার বকরিগুলো চরানোর জন্য কোথায় পাঠান? আমরাও সেখানে পাঠাব, আমাদের বকরিগুলোও বেশি ঘাস খাবে এবং বেশি দুধ দেবে। তারপর তাদের বকরিও আমার বকরির সাথে চরানো হতো। কিন্তু তাদের বকরিগুলো সেই পরিমাণ দুধ দিত না, যে-পরিমাণ দিত আমার বকরিগুলো। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর প্রিয় বন্ধুর আগমনের বদৌলতে হালীমার ঘরে বরকত আর বরকত এবং আনন্দ আর আনন্দ বিরাজ করছিল। এসব বরকতের মধ্যেই আল্লাহর প্রিয় বন্ধু সেই ঘরে লালিতপালিত হন।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.)-এর চিত্তাকর্ষক গান

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুগ্ধ করার জন্য অত্যন্ত চমৎকার এবং চিত্তাকর্ষক গান গাইতেন। তিনি বলতেন–

يَا رَبِّ إِذَا أَعْطَيْتَهُ فَأَبْقِهْ.

হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক! আপনি যখন আমাকে এই নেয়ামত (শিশু মুহাম্মাদ) দান করেছেন, তো এখন (অনুগ্রহপূর্বক) এই উপঢৌকনকে স্থায়িত্ব দান করুন।

وَاعْلِهِ إِلَى الْعَلَاءِ وَارْقِهْ

এবং তাঁকে (শিশু মুহাম্মাদের মর্যাদা ও অবস্থান উঁচু পর্যায়ে বহু গুণ) উন্নীত করে উচ্চাসনের সর্বোচ্চ স্তরে আসীন করুন।

وَاخْزِ أَبَاطِيلَ الْعُدَى بِحَقِّهِ

এবং শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকে তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও হকের প্রভাব দ্বারা ক্রিয়াহীন করে দিন।

হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) বকরি চরানোর জন্য নিজ কন্যা শীমাকে বকরির সাথে পাঠাতেন। তখনও সে বালেগা হয়নি, তাই তাকে বকরি চরাতে পাঠাতেন।

একদা হালীমা সা'দিয়া শীমাকে বললেন, অনেক বিলম্ব হয়ে গেল, এখনও তুমি বকরি চরাতে যাওনি? সে বলল, মা! আমি একা, বকরি অনেক। আমার একার পক্ষে সবগুলো সামলানো সম্ভব হয় না। আমার সাথে আরও কাউকে পাঠান। আমি গরমের মধ্যে সারা দিন ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে যাই। হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) বললেন, কন্যা! ঘরে তো আর কেউ নেই, যাকে তোমার সাথে পাঠাব। তাই তোমাকে একাই যেতে হবে। শীমা বলল, মা! আমার একার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, আমি একা বকরিগুলো সামলাতে পারি না। যখন মা বাধ্য করল, তখন শীমা বলল, মা! আমি একটি শর্তে বকরি চরাতে যাব। মা বললেন, কন্যা! কী শর্ত? শীমা বলল, আপনি আমার সাথে আমার ছোট ভাই মুহাম্মাদকে দেন, তাহলেই আমি বকরির সাথে চলে যাব।

মা বললেন, একদিকে বকরি চরানো, আরেকদিকে শিশু দেখভাল করা এই দুই কাজ তুমি একসাথে কীভাবে করবে? শীমা বলল, মা! যদি একা যাই, তাহলে বকরি সামলাতে পারব না। আর যদি সাথে ভাইকে নিয়ে যাই, তাহলে সামলাতে পারব। এবার হালীমা (রাযি.) বললেন, শীমা! তুমি কী বলতে চাচ্ছ খুলে বলো? জবাবে শীমা বলল, ইতিপূর্বে একবার আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম, বকরিগুলো অল্প সময়ে দ্রুত ঘাস খেয়ে পেট ভরে ফেলল এবং যে-স্থানটায় আমি আমার ভাইকে কোলে নিয়ে বসে ছিলাম, সেখানে আমার সামনে এসে বসে গেল। বাকি সময় আমিও ভাইয়ের চেহারা দেখতে থাকি আর বকরিগুলোও ভাইয়ের চেহারা দেখতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার প্রেমাস্পদ সমগ্র জাহানের প্রেমাস্পদ।

اے ازل کے حسین! اے ابد کے حسین

تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں

'হে অনাদির সুন্দর! হে অনন্তের সুন্দর

আপনার মতো কেউ নেই, আপনার মতো কেউ নেই।'

নুবওয়তের ঘোষণার পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সম্প্রদায়ে এমনভাবে যৌবনকালে পদার্পণ করেছেন যে, মানবতায় তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম, চরিত্রে তাঁর থেকে উত্তম, সদাচরণে তাঁর থেকে ভদ্র, বন্ধুত্বে তিনি অপেক্ষা ভালো, সহনশীলতায় তাঁর চেয়ে মহান, সততা ও বিশ্বস্ততায় তিনি অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ ছিল না। তিনি অশ্লীল, মন্দ ও কটু কথা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ছিলেন। তাঁকে কখনও কোনোদিন কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে দেখা যায়নি। এজন্যই আল্লাহর প্রিয় বন্ধুকে সম্প্রদায়ের সকলেই সাদিক এবং আমীন (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত।

কুরাইশ সম্প্রদায় যখন কা'বাঘর পুনঃনির্মাণ করে এবং হাজরে আসওয়াদ স্বস্থানে রাখার সময় হয়, তখন লোকদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রত্যেক গোত্রপ্রধান চাচ্ছিল, তিনি সেটি রাখবেন। তারপর তারা এর ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে যে, আগামীকাল যেব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিতে পড়বেন, তিনি এ সমস্যার সমাধান দেবেন। আল্লাহর শান! পরদিন সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ে। অথচ তখন তিনি তেমন বয়স্ক ছিলেন না। লোকজন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আবেদন করল, আপনি আমাদের এই বিরোধ মিটিয়ে দিন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তাতে হাজরে আসওয়াদটি রাখলেন এবং চাদরের চারটা কোণ চার গোত্রপ্রধানের হাতে দিয়ে বললেন, আপনারা পাথরটি স্থাপনের জায়গায় নিয়ে চলুন। তারা পাথরটি সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজহাতে হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে স্থাপন করে দেন। সুবহানাল্লাহ!

অন্তর সওদাকারী

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত নিজ বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন দীপ্তি ও সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাঁর পবিত্র চেহারায় যে-কেউ দৃষ্টিপাত করত, সে নিজ অন্তর তাঁকে সঁপে দিত। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদিদের বড় একজন আলেম ছিলেন। তাঁকে ইহুদিরা বলল, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে গিয়ে তাঁকে এই এই বিষয়

জিজ্ঞাসা করুন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে এলেন। কিন্তু তিনি যখন আল্লাহর প্রিয় রাসূলের যেয়ারত লাভ করলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসাবাদের পরিবর্তে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কালেমা পড়িয়ে দিন!

সুবহানাল্লাহ!

ইহুদিরা এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বলল, আমরা বাছাই করে আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি এত বড় আলেম হওয়া সত্তেও আমাদের নাক কেটে দিয়েছেন। আপনি এটা কী করলেন? আপনিও তাঁর অনুগত ও তাঁকে প্রত্যাশাকারী হয়ে গেলেন। উত্তরে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশারা করে বললেন, 'তাঁর চেহারাটা একটু দেখুন তো! এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদী ব্যক্তির চেহারা বলে মনে হয় না।'

আল্লামা কুরতুবি (রহ.) লিখেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দৃশ্যমান করা হয়নি। নতুবা মানুষ তাঁকে দেখার উষ্ণতা সৈহ্য করতে পারত না।

আরবের চাঁদ

জনৈক সাহাবী বলেন, একবার রাতে আমি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হই। সেখানে আমি দেখতে পাই, সামনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছেন। সেই রাতে পূর্ণিমার চাঁদ তার পূর্ণ আলো ও দীপ্তিসহ চমকাচ্ছিল। এ-সময় আমি যখন নিচে দৃষ্টিপাত করি, তখন আরবের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। আর যখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আকাশের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি বলেন, আমি ক্ষণিকের জন্য থেমে গেলাম। আমি খানিক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার নূরের দিকে তাকিয়ে থাকি, খানিক আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি আর চিন্তা করি, আরবের চাঁদ অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল, নাকি আকাশের চাঁদ। পরিশেষে আমার অন্তর সিদ্ধান্তে পৌঁছে, হে আকাশের চাঁদ! তুমি বড় সুন্দর ঠিকই, দুনিয়াতে তোমার সৌন্দর্যের অনেক সুনামও আছে; কিন্তু সত্য কথা হলো, যে দীপ্তি ও সৌন্দর্য আমার সরদারের পবিত্র চেহারায় রয়েছে, তা তোমার কাছে নেই।

چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے

چاند پر ہیں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے

'চাঁদের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া এখানে ইনসাফ কোথায়
চাঁদে কালো দাগ রয়েছে, আমার মাদানি প্রেমাস্পদের চেহারা দাগমুক্ত।'

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভে ব্যাকুলতা

সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার আশেক ছিলেন। কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম রাতে নিজ-নিজ ঘরে ফেরার পর খুবই উদাস ও ভারাক্রান্ত থাকতেন। তাঁদের অন্তর রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে ব্যাকুল হয়ে যেত। তাই তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সন্নিকটে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, কখন তিনি বের হবেন আর তাঁরা তাঁর নূর দেখে তাঁদের দিবস শুরু করবেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, সাহাবায়ে কেরাম দোজাহানের সরদার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নজর দেখতে উদ্‌গ্রীব থাকতেন।

তাঁর প্রত্যাশীগণ এরূপও ছিলেন

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী অনেক দূর থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হতেন। তিনি এসে কিছুক্ষণ রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন, তাঁর কথা শুনতেন, তারপর চলে যেতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো কথাও বলেননি এবং কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করেননি।

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকলেই কোনো-না-কোনো বিষয় আমার কাছে জানতে চায়; কিন্তু আপনি আসেন, মজলিসে বসেন, তারপর চলে যান, কোনো কথা বলেন না। এর কারণ কী? সাহাবী জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তরে আপনার মহব্বত এত বেশি যে, আমি যখন ঘর থেকে বের হই, তখন কেবল আপনাকে দেখার নিয়তে

বের হই এবং এখানে উপস্থিত হয়ে আপনার নূরানি চেহারায় দৃষ্টি বুলিয়ে আমার চোখদ্বয় শীতল করে ফিরে যাই।

একথা শুনে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়াতে যেব্যক্তি যার সাথে মহব্বত রাখবে, সে জান্নাতে তারই সাথে থাকবে। (আল্লাহ তা'আলা তাঁরা দুজনকে জান্নাতে একত্রিত করুন!) সেই সাহাবী বলেন, এই পবিত্র হাদীছ থেকে আমি যতটুকু আনন্দ পাই, এত আনন্দ আমি আর কখনও অন্য কোনো সংবাদে পাইনি। আল্লাহর প্রেমাস্পদ সমগ্র জগতের প্রেমাস্পদ।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অনন্ত মহব্বত

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, জুলায়খা! তোমার সখীগণ ইউসুফকে দেখে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। তারা যদি কখনও আমার মনিবের চিত্তাকর্ষক ললাট দেখতে পেত, তাহলে তাদের অন্তর টুকরো-টুকরো করে ফেলত।

جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا
وہ دلربائے زلیخا تو شاہد ستار
رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت
نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار

'আপনার সৌন্দর্য কখন ইউসুফের সৌন্দর্য অতিক্রম করেছে,
তিনি ছিলেন জুলায়খার প্রেমাস্পদ, আপনি আল্লাহর প্রিয়জন।
আপনার সৌন্দর্যে রয়েছে, মনুষ্যত্বের আবরণ
আরও না জানি কত কিছু আল্লাহ ছাড়া কতজন।

এরূপ অর্থেই কে যেন পাঞ্জাবি ভাষায় নিম্নোক্ত শ্লোক বলেছেন–

دیکھیا جے یوسف نوں انگلیاں کٹیاں
آ قادے دیوانیاں نے جاناں وار سٹیاں
عشق دی اخیر دیکھی اوہدے عاشقین دی
جگ دے حسیناں کولوں ودہ کے حسین دی

একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, 'আমি পবিত্র মদীনার কুমারী মেয়েদের চোখেও সেই লজ্জা দেখিনি, যা আমি আমার মনিব রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক চক্ষুদ্বয়ে দেখতাম।'

রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর মহব্বত ছিল তুলনাহীন। তিনি স্বীয় মনিব ও স্বামীর শানে শ্লোক বলেছেন। দেখুন, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মহব্বতে আত্মহারা হয়ে কেমন কবিতা গাইছেন–

لَنَا شَمْسٌ وَّلِلْآفَاقِ شَمْسٌ

وَشَمْسِيْ خَيْرٌ مِّنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ

وَشَمْسِيْ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

'আকাশেরও একটি সূর্য আছে এবং আমাদেরও একটি সূর্য আছে,
কিন্তু আমার সূর্য আকাশের সূর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম।
কেননা, আকাশের সূর্য উদিত হয় ফজরের পর,
আর আমার সূর্য উদিত হয় ঈশার পর।'

রাসূলের সৌন্দর্যের প্রশংসায় রাসূলের কবি

সাইয়্যিদুনা হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়ব ও সৌন্দর্যের এমন প্রশংসা করেছেন যে, মানুষ তা শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তিনি বলেন–

وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ

(হে প্রিয়জন!) আপনি অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট অবয়ব দেখেনি কখনও কোনো চোখ।

وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

এবং আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর সন্তান প্রসব করেনি কোনো নারী।

خُلِقْتَ مُبَرَّءً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ

আপনি সর্বপ্রকার খুঁত থেকে মুক্ত হয়ে সৃজিত হয়েছেন।

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

যেন যেমনটি আপনি চেয়েছেন তেমনভাবেই সৃজিত হয়েছেন।

ইমাম বোমিরি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য

ইমাম বোমিরি (রহ.) তাঁর খ্যাতনামা কবিতাগ্রন্থ 'কাসীদায়ে বুরদাহ' শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন–

فَهُوَ الَّذِيْ تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُه

তিনি সেই সত্তা, যাঁর অবয়ব ও চরিত্র সর্বোচ্চ পূর্ণতায় পৌঁছেছে।

ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيْبًا بَارِئُ النَّسَمِ

তারপর সৃষ্টিকর্তা তাঁকে তাঁর প্রিয় বন্ধু হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِيْ مَحَاسِنِه

তাঁর সৌন্দর্যে সমকক্ষ থেকে তিনি মুক্ত।

فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

সুতরাং তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের এমন এক উপাদান রয়েছে, যা অবণ্টনীয়।

জড় জগতের প্রিয়জন

যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জগতের প্রিয়জন, তাই তিনি জড়জগতেরও প্রিয়জন, উদ্ভিদ জগতেরও প্রিয়জন, জীব-জানোয়ারেরও প্রিয়জন, মানবজাতিরও প্রিয়জন বরং সকল কিছুরই প্রিয়জন।

জড়জগতের প্রিয়জন কিভাবে?

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর গৃহে দুটি পাথর ছিল। একটির নাম ছিল মুতাকাল্লিম, অপরটির নাম মুত্তাকী। একটিকে মুতাকাল্লিম বলার হেতু ছিল, যখনই রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে আসতেন এবং পাথরটি তাঁকে দেখত, তখনই সেটি তাঁকে সালাম দিত। এ কারণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরটির নাম রেখে দেন মুতাকাল্লিম। অপর পাথরটিকে বালিশ হিসেবে

ব্যবহার করে সেটির সাথে টেক লাগিয়ে বসতেন। এজন্য অপরটির নাম রাখেন মুত্তাকী তথা টেক লাগানোর উপকরণ।

উদ্ভিদ জগতের প্রিয়জন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্ভিদ জগতেরও প্রিয়জন ছিলেন। তাই তো সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতাম, আল্লাহ তা'আলার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক স্থানে গিয়ে দাঁড়াতেন আর বৃক্ষ এসে তাঁকে সালাম করত। বরং একটি বর্ণনা এরূপও আছে, বৃক্ষ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সেজদাবনত হয়ে ফিরে যেত।

আল্লাহর প্রিয় বন্ধু রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের একটি কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা পড়তেন। হযরত তামীমদারি (রাযি.) মুসলমান হলে, তিনি একটি মিম্বার তৈরি করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে পেশ করলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উক্ত মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করুন।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, যখন রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরা শিশুর মতো কান্নার শব্দ শুনতে পাই। এতে আমরা খুব বিচলিত হই। এ-সময় আমরা দেখতে পাই, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। তারপর যে খেজুরকাণ্ডে ঠেস দিয়ে তিনি খুতবা প্রদান করতেন, সেটির কাছে এলেন এবং তাতে হাত রাখলেন। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরকাণ্ডের ওপর হাত রাখার সাথে-সাথে সেটি এমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেল, যেমন ক্রন্দনরত শিশু হেঁচকি দিয়ে চুপ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! খেজুরকাণ্ড এজন্য কাঁদছিল যে, মনিব! মিম্বর তৈরী হয়েছে। এখন আপনি তাতে আসীন হয়ে খুতবা প্রদান করবেন আর এখন আমাকে আপনার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সৈহ্য করতে হবে।

আল্লাহু আকবার! ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেই কাণ্ডটির মিত্রতা হয়ে গিয়েছিল, তাই সেটির সাথে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ!

تنے نے محبت میں آنسو بہائے

یوں جنت میں پایا مقام اللہ اللہ

'খেজুরশাখা মহব্বতে অশ্রু ঝরাল
এভাবেই জান্নাতে স্থান পেল আল্লাহ্-আল্লাহ।'

জীব-জানোয়ারের প্রিয়জন

আল্লাহর প্রেমাস্পদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জানোয়ারেরও প্রিয়জন ছিলেন। তাই তো হাদীছ শরীফে এসেছে, বিদায় হজের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর নিক্ষেপের আমল সম্পন্ন করে কুরবানি করতে প্রস্তুত হলেন। কুরবানির জন্য বেশ কিছু উট আনা হলো। প্রতিটি উট অন্যগুলোর আগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করছিল। প্রত্যেকটি উট চাচ্ছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম আমার গলায় আপনার পবিত্র হাতে ছুরি চালান।

এক বর্ণনায় এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখেন, জনৈক ইহুদি একটি হরিণি আটকে রেখেছে। হরিণি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ফরিয়াদ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পাহাড়ের পাদদেশে আমার একটি শাবক আছে। এখন শাবকটিকে দুধ পান করানোর সময় হয়েছে। লোকটি যদি আমাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে আমি শাবককে দুধ পান করিয়ে আবার চলে আসব। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিকে বিষয়টি বললেন। ইহুদি রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী হরিণিকে ছেড়ে দিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। খানিক পর হরিণি তার শাবককে দুধ পান করিয়ে ফিরে এল। ইহুদি তা দেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

মানবজাতির প্রিয়জন

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিরও প্রিয়জন ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের জামাত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকীনের জামাত ছিল। তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁদের ঈমান বেড়ে যেত।

জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা

জনৈক সাহাবী জিহাদের ময়দানে এত আহত হয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়ার উপক্রম। এমন মুহূর্তে অপর এক সাহাবী তাঁর কাছে পৌঁছলেন। তিনি আহত সাহাবীকে জিজ্ঞাস করলেন, আপনার কোনো জরুরত আছে কি? আহত সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। আগন্তুক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, কী জরুরত? আহত সাহাবী বললেন, আমার মন চাচ্ছে, জীবনের অন্তিম মহূর্তে আমার মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারা দেখে যাই। তারপর আগন্তুক সাহাবী তাঁকে নিজের কাঁধে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পান, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একস্থানে অবস্থানে করছেন। তিনি রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, আল্লাহর প্রিয়রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সামনেই আছেন। মুজাহিদ সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শ্রবণের সাথে-সাথে চোখ খুললেন এবং তাঁকে প্রাণভরে দেখে নিলেন। তারপর নিজের প্রাণ আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিলেন।

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے

یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হোক আপনার পদতলে

এটিই অন্তরের বাসনা, এটিই চাওয়া-পাওয়া

জনৈক কবি তার ভাষায় বিষয়টি এরূপ বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন, সেই সাহাবী যেন এই বার্তা দিতে চাচ্ছিলেন যে, হে মনিব!

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

আপনার মি'রাজে আপনি লৌহকলম পর্যন্ত পৌঁছেছেন,

আমার মি'রাজে আমি আপনার মুবারক পদযুগল পর্যন্ত পৌঁছলাম।

নবীজির অনুরূপ হওয়ার অভিলাষ

জনৈক সাহাবী হাবশার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল খাড়া। তিনি যখনই গোসল করতেন, তখনই চুল আঁচড়াতেন। কিন্তু তাঁর চুল শক্ত ও

খাড়া ছিল বিধায় মাথার মাঝখানে সিঁথি উঠত না। তিনি প্রতিদিন আক্ষেপ করতেন, আমার মাথায় সিঁথি ওঠে না কেন? তাঁর কাছে নিজের মাথা ভালো লাগত না। কেননা, তিনি চিন্তা করতেন, আমার মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সিঁথি করেন; কিন্তু আর মাথায় তো সিঁথি হয় না। তাঁর অন্তরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই কামনা-বাসনা বিরাজ করে। আল্লাহর শান দেখুন! একবার তিনি একটা লৌহদণ্ড আগুনে দিয়ে ভালোভাবে গরম করলেন। তারপর নিজের মাথার মধ্যভাগে সেটি দিয়ে একটি দাগ বানালেন। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড লেগে মাথার চামড়া পুড়ে গেল। লোকজন জিজ্ঞাসা করল, এ আপনি কী করলেন? তিনি বললেন, আমার এই যন্ত্রণাও দূর হয়ে যাবে এবং ক্ষতও শুকিয়ে যাবে। কিন্তু উক্ত জায়গার চামড়া পুড়ে যাওয়ায় সেখানে চুল থাকবে না। ভবিষ্যতে যখনই আমি আমার মাথা দেখব, তখন আমার মাথা নবীজির মাথার মতো দেখতে পাব।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের মহব্বত

আপনি যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের পরাকাষ্ঠা দেখতে চান, তাহলে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর জীবনী দেখুন। তিনি মহব্বতের ইমাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বন্ধুসুলভ মহব্বত ছিল। যেমন বর্ণিত আছে–

একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমার কাছে তিনটি বস্তু সর্বাপেক্ষা প্রিয়। প্রথমটি সুগন্ধ, দ্বিতীয়টি পুণ্যবতী স্ত্রী, তৃতীয়টি আমার চোখের শীতলতা নামায। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সাথে-সাথে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছেও তিনটি বস্তু সর্বাধিক প্রিয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে কোন তিন বস্তু সর্বাধিক প্রিয়? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) আরজ করলেন, ১. ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নূরানি চেহারা দেখতে থাকা। ২. আপনার ওপর আমার ধনসম্পদ খরচ করা। ৩. এই যে আমার কন্যা আপনার বিবাহ বন্ধনে আছে অর্থাৎ আমার সন্তানাদি আপনার খেদমতে থাকা।

এবার দেখুন, মানুষের কাছে জান, মাল ও সময় মূল্যবান এই তিনটি বস্তুই থাকে। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) মূল্যবান এই তিন বস্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর উৎসর্গ করে দিলেন।

রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘোষণা দিলেন, জিহাদে খরচ করার জন্য তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ জমা করো, তখন সকলেই নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সম্পদ জমা দিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) মনে-মনে ভাবলেন, আবুবকর সব সময় আমার থেকে এগিয়ে থাকেন। আজকে আমার কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তাই আমি আল্লাহর রাস্তায় আবুবকরের চেয়েও বেশি জমা দেব।

তিনি পুলকিত হয়ে গৃহে এলেন এবং নিজের কাছে থাকা সম্পদের অর্ধেক পরিবারবর্গের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক নিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদতলে সঁপে দিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর! পরিবারবর্গের জন্য কী রেখে এসেছেন! তিনি বললেন, সমস্ত সম্পদের অর্ধেক গৃহে রেখে এসেছি, বাকি অর্ধেক এখানে নিয়ে এসেছি। তারপর যখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সম্পদ নিয়ে এলেন, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবারবর্গের জন্য কী রেখে এসেছেন? তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার গৃহে গিয়ে যা পেয়েছি সবই এনে আপনার পদতলে সোপর্দ করে দিয়েছি। এমনকি আমি ঘরের বেড়ায় হাত দিয়ে তালাশ করেছি, যদি কোনো সুঁই পাওয়া যায়, তাহলে সেটিও নিয়ে আসব, হতে পারে কোনো মুজাহিদের উপকারে আসবে। আমি নিজে চটের তৈরী এই পোশাক পরে নিয়েছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আমার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

پروانے کے لئے شمع، بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

'পোকার জন্য আগুন, বুলবুলের জন্য ফুল যথেষ্ট
আবুবকর সিদ্দীকের জন্য আল্লাহ ওআল্লাহর রাসূল যথেষ্ট।'

এ হচ্ছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত!

عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ
یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ

ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ

اسی کا ہے مرنا, اسی کا ہے جینا

চমকপ্রদ বস্তু মদীনার বাদশাহের মহব্বত

এটাই তো প্রকৃত মহব্বতের সৌন্দর্য

এই মহব্বত দ্বারা যার অন্তর পরিপূর্ণ

তাঁরই তো মরণ, তাঁরই তো জীবন।

জীবনের স্বাদ তো এই মহব্বতের সাথেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ মহব্বত থাকা চাই যে, সকল কাজ তাঁর বরকতময় তরিকা অনুযায়ী করতে অন্তর উদ্‌গ্রীব থাকে। সর্বক্ষণ এই চিন্ত াভাবনা লেগেই থাকে যে, আমার পোশাক, পানাহার, পরিধান, চলাফেরা, আলাপচারিতা, চরিত্র সবই সুন্নাত মোতাবেক হয়ে যায়। যদি এ-ধরনের মহব্বত ভাগে জুটে যায়, তাহলে আমাদেরও ভাগ্য খুলে যাবে। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ভাগ্যে এরূপ মহব্বতই জুটেছিল।

হযরত শাইখুল হাদীছ (রহ.) লিখেছেন, যে-মজলিসে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁর সম্পদ কুরবানি করেন, তিনি তখনও সেই মজলিসে চটের তৈরী কাপড় পরিহিত অবস্থায় বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) আগমন করেন। তিনিও চটের তৈরী কাপড় পরিহিত ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! আজ আপনি চটের তৈরী পোশাক পরিধান করেছেন কেন? হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকে আবুবকরের এই আমলের ওপর আল্লাহ তা'আলা এত খুশি হয়েছেন যে, সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, তোমরাও আবুবকরের মতো চটের পোশাক পরিধান করো! ওপরন্তু আল্লাহ তা'আলা আবুবকরের প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কত মূল্যায়নকারী!

হিজরতের রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে স্বীয় ঘর থেকে বের হয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর গৃহে যান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইমাত্র তাঁর দরজায় করাঘাত করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বের হয়ে আসেন। মনে হচ্ছিল, যেন তিনি এজন্য পূর্ব থেকেই জেগে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আবুবকর! আপনি পূর্ব

থেকেই সজাগ ছিলেন, নাকি আমি শব্দ করার পর সজাগ হয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পূর্ব থেকেই সজাগ ছিলাম। কেননা, আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছিল, আপনি যখন হিজরত করবেন, তখন এই খাদেমকেও সাথে নিয়ে যাবেন। সুতরাং যখন মনে এ বিষয়টি উদয় হয়েছে, তখন থেকে আবুবকর রাতের নিদ্রা বর্জন করেছে, যেন আমার প্রিয় মনিবকে আমার ঘরের দরজায় এসে আবুবকরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

একবার হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) মসজিদে বসে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করছিলেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এই ভেবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, তাঁর কী হয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকটবর্তী হয়ে শুনলেন, তিনি দু'আ করছেন, ইয়া আল্লাহ! রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বলেছেন। আমিও খরচ করতে চাই। কিন্তু আপনার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। তাই এটা শিষ্টাচার পরিপন্থী যে, আমি দেব আর তিনি গ্রহণ করবেন। কাজেই আমি এই বেয়াদবি করতে চাই না। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার প্রিয়নবীর অন্তরে ঢেলে দিন, তিনি যেন আবুবকরের সম্পদ নিজের সম্পদ মনে করে ব্যবহার করেন। আল্লাহু আকবার!

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, তারপর থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় এমনভাবে খরচ করতেন, যেমনভাবে মানুষ নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ খরচ করে থাকে।

হিজরতের সফরে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) কখনও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে, কখনও বামে, কখনও সামনে, কখনও পেছনে পথ অতিক্রম করছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেরেশান হয়ে বললেন, আবুবকর! আপনি একদিকে চলুন, হয় ডানে, নয়তো বামে। কখনও সামনে, কখনও পেছনে, কখনও ডানে, কখনও বামে এভাবে চলার প্রয়োজন কী? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমি আপনার পেছনে থাকি, তখন আমার মনে শঙ্কা জাগে, শত্রুরা না আবার ডান দিক থেকে আক্রমণ করে বসে। তাই আমি তখন আপনার ডান পার্শ্বে চলে যাই। কোনো তীর এলে যেন আবুবকরের দেহে বিদ্ধ হয় এবং আমার প্রিয়জন নিরাপদ থাকেন। তারপর আবার সামনে থেকে তীর চলে আসে কিনা এই আশঙ্কায় আমি আপনার

সামনে চলে যাই। মূলত এ কারণেই আমি কখনও আপনার ডানে, কখনও বামে, কখনও সামনে, কখনও পেছনে যাচ্ছি।

সুবহানাল্লাহ! যেমন পতঙ্গ প্রদীপের চারপাশে চক্কর দিতে থাকে, তেমনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) নবুওয়তের প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে সফর করছিলেন।

যখন ছাওর পর্বতের গুহার দ্বারে পৌঁছেন, তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) প্রথমে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দেন। বন্ধ করার কোনো মাধ্যম না থাকায় একটি ছিদ্র খোলা থেকে যায়। সেটি বন্ধ করার জন্য তিনি ছিদ্রমুখে নিজের পা রেখে বসে যান। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করে নিন। এখানে বিছানা তো নেই, আল্লাহর জমিন বিছানা হবে। অবশ্য বালিশের জন্য আবুবকরের কোল উপস্থিত।

দুনিয়াতে দুটি কোলকে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদা দিয়েছেন। একটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কোল। দ্বিতীয়টি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কোল। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর মুবারক মাথা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কোলে ছিল। ছাওর পর্বতের গুহায় তিনি আবুবকর (রাযি.)-এর কোলে মাথা রাখলেন, আল্লাহ তাঁকে (রাযি.) 'সিদ্দীক' মাকাম দান করলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কোলে মাথা রাখলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'সিদ্দীকা' মাকাম দান করলেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

আল্লাহর প্রিয় বন্ধু আরাম করছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁর দীপ্তিময় চেহারা প্রাণভরে দেখছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) একটি সূক্ষ্ম বিষয় লিখেছেন। তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে সম্বোধন করে বললেন, 'আবুবকর (রাযি.)! যখন আপনি বসা ছিলেন, আপনার কোলে ছিল রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক মাথা। আপনি তাঁর চেহারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে, আপনার কোল একটি রেহালের মতো। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীপ্তিময় চেহারা কুরআন মাজীদের মতো। আর আবুবকর! আপনি যেন একজন তেলাওয়াতকারী;

বসে সেই কুরআন দেখে-দেখে তেলাওয়াত করছেন।' সুবহানাল্লাহ! একদিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য। অপরদিকে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মহব্বত।

এখনকার অনেক ছাত্র বলে থাকে, অমুকের সাথে আমার সম্পর্ক। আমি যখনই কিতাব খুলি, তার অবয়ব আমার দৃষ্টিতে ভেসে উঠে। সে বলে–

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

'কিতাব খুলে বসি, তখন চোখ ক্রন্দন করতে থাকে

পাতায়-পাতায় তোমার চেহারা দেখা যেতে থাকে।'

ছাওর গুহায় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কোলে মাথা রেখে আরাম করছেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়জন রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি প্রিয়জনের নূরানি চেহারার উজ্জ্বলতা দেখে নিজের চোখদ্বয় জুড়িয়ে নিচ্ছেন। কতই-না হৃদয়গ্রাহী আবহ। কোনো এক কবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন–

یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے!

رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے

'এটি সৌন্দর্যের সাথে নিরুত্তর মহব্বত,

স্থাপিত রেহালে আল্লাহর কিতাব।'

এ-সময় সেই গুহায় একটি সাপ ছিল। সাপটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে চাচ্ছিল। গর্ত থেকে বের হওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় অগত্যা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) যে গর্তমুখে পা রেখেছিলেন। সাপটি সেখানে এসে তাঁর পায়ে দংশন করল। বিষাক্ত সাপের বিষ তাঁর শরীরে প্রবেশ করায় অসহনীয় যন্ত্রণার তীব্রতার কারণে হযরত আবুবকরি সিদ্দীক (রাযি.)-এর চোখদ্বয় অশ্রুতে ভিজে গেল। সেই অশ্রু তাঁর গণ্ড বেয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক চেহারায় পড়ল। যদ্দরুন তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–

مَا يُبْكِيكَ يَا اَبَا بَكْرٍ؟

'হে আবুবকর! আপনি কাঁদছেন কেন?'

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এরূপ কষ্ট হয়েছে, ফলে অসাবধনতাবশত চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে। জনৈক কবি এই দৃশ্যটি অত্যন্ত সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন–

آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر

قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر

'অশ্রু ঝরেছে রাসূলে পাকের চেহারায়

উৎসর্গ হতে এসেছে ভ্রমর গোলাপ ফুলে।'

মদীনা তায়্যিবার সন্নিকটে এক বৃদ্ধা বাস করতেন। তার গৃহে কতগুলো ছাগি ছিল। ছাগিগুলো বেশি বয়সের কারণে দুধ দিত না। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) তার কাছে গিয়ে বললেন, মা! আমি এই ছাগিগুলোর দুধ দোহন করে নিতে পারি কি? বৃদ্ধা বললেন, হে অপরিচিত আগন্তুক! এগুলো তো দুধ দেয় না। আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, মা! আপনি অনুমতি দিন! বৃদ্ধা বললেন, আপনাকে অনুমতি দেওয়া হলো। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন ছাগিগুলোর কাছে এসে বসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর স্তন দুধে ভরে দিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) সতর্কতামূলক দুধের পাত্র কাপড় দ্বারা ঢেকে নিলেন, যেন দুধে ধুলোবালি না পড়ে। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করার পর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) একটি চমৎকার কথা বললেন–

فَشَرِبَ شَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ.

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলেন যে, আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল।'

সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অমুক পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করে খুশি হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে ঘটল ব্যতিক্রম। হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, আমার মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দুধ পান করলেন, এত দুধ পান করলেন যে, আমার অন্তর খুশিতে ভরে গেল। একেই বলে মহব্বত।

হযরত আবুবকর (রাযি.) বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সকল দিক থেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ্য পেয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁরা পবিত্র মদীনায় পৌঁছলে, সেখানকার জ্ঞানী-গুণী লোকজন

তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে যখন দুই মহান ব্যক্তি অগ্রসর হতে দেখেন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে যান যে, দুজনের চলনভঙ্গি একই রকম, তাঁদের পোশাক একই রকম, উভয়ের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত। তারা চিন্তায় পড়ে গেলেন, দুজনের মধ্যে আল্লাহর রাসূল কে? দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন মনিব, অপরজন খাদেম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আসল, অপরজন তাঁর নকল। কিন্তু নকল আসলের এত কাছাকাছি অবস্থান অর্জন করেছিলেন যে, মদীনাবাসী আসল আর নকলের মাঝে পার্থক্য বিধান করতে সক্ষম হলো না। তারা বুঝতে পারলেন না, মনিব কে, খাদেম কে। অনুসারী কে, অনুসৃত কে। তাই তারা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে মুসাফাহা করতে শুরু করলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন; আমিও এই নিয়তে তাদের সাথে মুসাফাহা করতে থাকি যে, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। যদি উপস্থিত সকলের সাথে তিনি মুসাফাহা করেন, তাহলে তাঁর কষ্ট হবে। তাই মুসাফাহা যখন শেষ হবে, তখন আমি তাদের বলে দেব। সুতরাং মুসাফাহা শেষে যখন তারা বসে গেল, অপরদিকে সূর্য নিজ চেহারা প্রদর্শন করল, তখন তারা কী দেখতে পেল? দেখতে পেল, তারা যাঁকে নবী মনে করে মুসাফাহা করেছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর মনিবের মাথায় ছায়া দিচ্ছেন। এ-সময় মদীনাবাসী বুঝতে পারল মনিব কে, খাদেম কে। হাদীছ শরীফে বিবৃত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের মজলিসের ঔজ্জ্বল্য এত বেশি ছিল যে, লোকজন যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসত, তাদের জিজ্ঞাসা করতে হতো, আপনাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ কে? তাদের সকলের চেহারায় এত দীপ্তি থাকত।

হযরত আসমা (রাযি.)-এর অন্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত

ছোট-ছোট মেয়েদের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এত বেশি ছিল যে, হযরত আসমা (রাযি.) যিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর বড় কন্যা ছিলেন; তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাওর গুহায় অবস্থানকালে তিনি ঘর থেকে সেখানে খানা পৌঁছে দেবেন। কেননা, তিনি তখন এত ছোট ছিলেন যে, কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপই করবে না তিনি কী করছেন। তিনি খানা দিয়ে আসছেন কিনা? সুতরাং প্রথম দিন তিনি খানা

পৌঁছে দেন। দ্বিতীয় দিন যখন তিনি খানা নিয়ে আসেন, তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন এবং তাঁকে উদাস ও চিন্তিত দেখতে পান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আসমা! আজকে তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে, কারণ কী? আসমা উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল যখন আমি আপনাকে খানা দিয়ে প্রস্থান করছিলাম, তখন পথে আবুজাহল আমাকে দেখে ফেলে। সে আমাকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, আবুবকরের মেয়ে! তোমার জানা থাকবে তোমার পিতা কোথায়। যেখানে তোমার পিতা আছে, সেখানে মুহাম্মাদও থাকবে। বলো! তোমার জানা আছে কি? তার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি সত্য বলি দেই এবং বলি, হ্যাঁ, আমার জানা আছে...। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলিয়েছেন। তিনি যদি তখন অন্য কোনো কথা বলতেন, তাহলে লোকজন বলত, যদি এক বোন এরূপ বলতে পারে, তাহলে অন্য বোনেরাও মিথ্যে বলতে পারে। না, বরং আবুবকর সিদ্দীকের কন্যা এবং আয়েশা সিদ্দীকার বোন। সুতরাং কীভাবে মিথ্যা বলতে পারেন?

ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

'হাজারো বিপদ থাক, তবুও অন্তরের সাথি হোক জবান

অনাদি থেকে খোদা প্রেমিকদের এ পথই চলমান।'

তাই তো হযরত আসমা (রাযি.) বললেন, আমি সত্য বলে দিয়েছি এবং বলেছি হ্যাঁ, আমার জানা আছে। আবূ জাহেল বলল, বলো কোথায় আছে তাঁরা? আমি বললাম কস্মিনকালেও আমি তা বলব না। সে বলল, তুমি না বললে, আমি তোমাকে প্রচণ্ড প্রহার করব। আবূ জাহেল এভাবে প্রচণ্ড ভীতি প্রদর্শন করেছে, হুমকি-ধমকি দিয়েছে। কিন্তু আমি আমার অবস্থানে অটল থেকে বলেছি, না, আমি কখনও বলব না। তারপর সে হঠাৎ আমাকে এত জোরে এক থাপ্পর মারল যে, আমি ওপর থেকে নিচে প্রান্তরে পড়ে গেলাম, আমার মাথা থেকে রক্তপাত হলো এবং চোখে অশ্রু চলে এলো। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারপর সে আমার বাহু ধরে দাঁড় করাল এবং বলতে লাগল, আসমা! আমি তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলব, বলো! তোমাদের রাসূল কোথায়? আমি জবাব দিলাম, আবুজাহল! আমার জীবন তো এখন তোমার আওতায়, কিন্তু মুহাম্মাদ আরবিকে কখনও তোমার হাওলা করব না।

এক মহিলা সাহাবীর মহব্বত

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহিলাদেরও সীমাহীন মহব্বত ছিল। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। মদীনার প্রতিটি ঘরে-ঘরে মহিলারা তাদের পুরুষদের প্রস্তুত করছিলেন। এক ঘরে জনৈকা মহিলার সংসারে ছিল কোলের শিশু। তাঁর স্বামী ইতোপূর্বে শহীদ হয়েছিলেন। ফলে তাঁর সংসারে আর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল না, যাকে প্রস্তুত করে তিনি জিহাদে পাঠাতে পারবেন। তাই তিনি সন্তানের চেহারা দেখে কাঁদতে শুরু করেন। কাঁদতে-কাঁদতে যখন তাঁর মানসিক অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলো, তখন তিনি সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে মসজিদে নববীতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সন্তানকে তাঁর কোলে দিয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার ছেলেকে জিহাদের জন্য কবুল করুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই শিশু ছেলে কীভাবে জিহাদ করবে? মহিলা সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে মুজাহিদের হাতে ঢাল থাকবে না, আমার এই ছেলেকে তাঁর হাতে দিয়ে দেবেন। সেই মুজাহিদ যুদ্ধ করতে সামনে অগ্রসর হলে শত্রুরা সামনে থেকে তীর নিক্ষেপ করবে, তখন মুজাহিদ তীর থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমার এই ছেলেকে ঢাল হিসেবে সামনে ধরবে। এভাবে আমার এই ছেলে শত্রুপক্ষের তীর প্রতিরোধে কাজে আসতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! মহিলা সাহাবীদের অন্তরে আল্লাহর প্রিয় রাসূলের এত মহব্বত ছিল।

একটি ঘটনা যা সাহাবায়ে কেরামকে (রাযি.) নাড়া দিয়েছিল

একবার আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইরশাদ করলেন– আমি যদি কারও প্রতি অতিরঞ্জিত করে থাকি, তাহলে সে এসে আমার থেকে বদলা নিতে পারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলার পর সাহাবায়ে কেরাম নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কি তাঁর থেকে বদলা নেওয়ার দুঃসাহস করতে পারে? কিন্তু এক পাগল দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওপর আমার হক রয়েছে। তাই আমি আপনার থেকে বদলা নিতে চাই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ওপর আপনার কী হক রয়েছে? সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! একবার আপনি জিহাদের ময়দানে কাতার ঠিক করাচ্ছিলেন। তখন আপনার হাতে একটি লাঠি ছিল। আপনি সেই লাঠি দ্বারা আমাকে স্পর্শ করে বললেন, সামান্য পেছনে যান। আপনি যখন সেই লাঠি আমার শরীরে লাগিয়ে ছিলেন, তখন আমার কষ্ট হয়েছিল। কাজেই আপনার ওপর আমার হক রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি হাতে লাঠি নিন এবং আমি যেমনটি করেছিলাম, আপনিও তেমনটি করুন। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখন জুব্বা পরিহিত আর আমার শরীরের যে অংশে আপনার লাঠি লেগেছিল, তখন সেখানে কোনো কাপড় ছিল না। সুতরাং আমি বদলা নেব কীভাবে? এবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পৃষ্ঠ থেকে জুব্বা সরিয়ে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বিচলিত হয়ে পড়লেন যে, এই ব্যক্তি হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়ানো এবং বলছে, আমি বদলা নিতে চাই। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অন্তর কেঁপে উঠল। তাঁর মন চাচ্ছে, তাকে গিয়ে বলবে, ভাই! আবুবকরের দেহ উপস্থিত, যত খুশি আঘাত করো! হযরত ওমর (রাযি.) দাঁড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু আদবের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। তাঁরা বুঝতেও পারছেন না, এই পাগল কীভাবে বদলা নিতে চাচ্ছে।

সেই সাহাবী বদলা নিতে প্রস্তুত হলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বদলা দিতে প্রস্তুত হলেন। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় পৃষ্ঠ থেকে জুব্বা সরালেন, তখন সেই সাহাবী কাছে গিয়ে লাঠিটা মাটিতে ফেলে দিলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুওয়তে চুমু খেয়ে তাঁর পৃষ্ঠ নিজের সিনার সাথে জড়িয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মোহরে নবুওয়তে চুমু খাওয়ার বাসনা আমি আমার অন্তরে দীর্ঘকাল থেকে লালন করে আসছি। কিন্তু এ যাবৎ আমি কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আপনি যখন বদলা নিতে বললেন, তখন আমার অন্তরে উদয় হলো, তোর ভাগ্য খুলে গেছে। এবার মোহরে নবুওয়তে চুমু খাওয়ার সুযোগ এসে গেল। নতুবা এই গোলাম তাঁর মনিব থেকে বদলা নেওয়ার কথা বলবে, এ দুঃসাহস তার কীভাবে করতে পারে! আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে ভরপুর দু'আ

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করছিলেন। তাঁর গোলাম ছাওবান (রাযি.) তাঁর একেবারে নিকটে চলে এলেন। ছাওবান (রাযি.) শুনতে পান, তিনি দু'আর মধ্যে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আমাকে আমার মহব্বতকারীদের সাথে দ্রুত মিলিয়ে দেবেন!' দু'আ শেষ করার পর হযরত ছাওবান (রাযি.) কাছে গিয়ে একান্ত আদবের সাথে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে আপনি দু'আ করছিলেন, আমার মহব্বতকারীদের সাথে আমাকে দ্রুত মিলিয়ে দেবেন' এই দু'আর উদ্দেশ্য কী? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ছাওবান! তোমার অন্তরেও আমার সীমাহীন মহব্বত রয়েছে। কিন্তু তুমি তো জিবরাঈল আমীনকে আসতে দেখছ। কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হতে দেখছ। আমার চেহারা দেখছ। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও মদদ স্বচক্ষে দেখেছ। তোমার মহব্বতও বড় মূল্যবান। কিন্তু আমার এই উম্মতের মধ্যে একটা সময় এমনও আসবে, যখন এই দুনিয়া থেকে আমার বিদায়ের পর শত-শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। এমন লোক এ-জগতে বাস করবে, যারা আমাকে দেখবে না। তারা তাদের সময়কার ওলামায়ে কেরাম থেকে আমার কথাগুলো শুনবে, আমার অবয়ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হবে। এতে তাদের অন্তরে আমার প্রতি এত প্রবল মহব্বত সৃষ্টি হবে যে, তারা আমার মহব্বতের কারণে আনচান করবে। তারা প্রতিটি কাজ আমার তরিকা অনুযায়ী করবে এবং আমার সাথে মুলাকাতের জন্য তারা ব্যাকুল থাকবে।

হে ছাওবান! তাদের অন্তরে আমার প্রতি এত মহব্বত থাকবে, নিজেদের সন্তান বিক্রি করেও আমার সাথে মুলাকাত সম্ভব হলে, তারা তাদের সন্তান বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আমি তাদের জন্য দু'আ করছি, হে আল্লাহ! আমাকে সেসব মহব্বতকারীদের সাথে অতিদ্রুত সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

সুতরাং বর্তমানে যাদের অন্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত থাকবে এবং তাঁর এক-একটি সুন্নাতের প্রেমিক হবে, যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা-চেতনাকে নিজের চিন্তা-চেতনা বানিয়ে নেবে এবং যারা তাঁর বাণী সমগ্র বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

দু'আ তাদের সাথে থাকবে। কেয়ামতের দিন তিনি নিজ মুবারক হাতে হাউজে কাওছারের শরাব পান করাবেন এবং তাঁর পতাকাতলে আশ্রয় দেবেন। আমাদের জন্য জরুরি হলো, আমরা যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটি সুন্নাত দ্বারা আমাদের বাহ্যিক রূপকে সজ্জিত করি এবং অন্তরে তাঁর শিক্ষার নূর আনয়ন করার চেষ্টা করি। তারপর যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হব, তখন এই নিবেদন করব–

تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں

حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کے آیا ہوں

'হে প্রভু! আপনার প্রেমাস্পদের সাদৃশ্য নিয়ে এসেছি
বাস্তবে রূপায়িত করুন! আমি বাহ্যিক আকৃতি নিয়ে এসেছি।

তারপর দেখবেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলার কাছে এর কত মূল্যায়ন হবে এবং কী মর্যাদা লাভ হবে! জনৈক বক্তা বলেন–

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا! لوح، قلم تیرے ہیں

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের সাথে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন, আমরা তো আপনারই। এই সকল কিছু, লৌহ-কলম আপনারই।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও এই শিক্ষাকে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত পৌঁছানোর তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ভবিষ্যত জীবনকে শরীয়তে ইসলামি ও সুন্নাত নববী অনুযায়ী কাটানোর তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ঈমানি জীবনের দাবি

'সুতরাং প্রতীয়মান হলো, জবান দ্বারা কালেমা পড়ে নিলে মানুষ ইসলামের গণ্ডিতে তো প্রবেশ হয়ে যায়, কিন্তু অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নের জন্য আরও কিছু স্তর রয়েছে। সেই স্তরগুলো কী? সেই স্তরগুলো হলো, মানুষের অন্তরে কালেমার মহব্বত বদ্ধমূল হবে এবং স্বীকৃতি দেবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলির সামনে অস্ত্রসমর্পণ করলাম। এখন আল্লাহর হুকুম যা হবে তা-ই আমার এই দেহের ওপর সেঁটে যাবে। এ হচ্ছে অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য কিছু কষ্ট-মেহনত করতে হয়।'

ঈমানি জীবনের দাবি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه ○

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

মুমিনদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে ঈমানদারগণ!

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো।'

উক্ত আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه (তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। সুতরাং এ বিষয়টি কত বিস্ময়কর যে, কাফেরদের সম্বোধন করা হয়নি, মোশরেকদের সম্বোধন করা হয়নি, মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়নি।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اٰمِنُوْا .... يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اٰمِنُوْا... يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ نَافَقُوْا اٰمِنُوْا.

বলা হয়নি, হে মোশরেকরা! ঈমান আনো, হে কাফের সম্প্রদায়! ঈমান আনো, হে মুনাফিকরা! ঈমান আনো। সম্বোধন কাদের করা হয়েছে? ঈমানদারদের।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اٰمِنُوْا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি!

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এর অর্থ লিখেছেন اِتَّقُوْا অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করো। কতিপয় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, হে জবান দ্বারা ঈমান আনায়নকারীগণ! তোমরা অন্তকরণেও তা বিশ্বাস করে নাও! যেহেতু ঈমানের দুটি ধাপ রয়েছে। اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ জবান দ্বারা স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দ্বারা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা। কাজেই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হলো, হে জবান দ্বারা স্বীকৃতি প্রদানকারীরা! তোমরা অন্তর দ্বারা একে বিশ্বাস ও সত্যায়ন করো!

অন্তর দ্বারা বিশ্বাস ও সত্যায়নের মর্ম

জবান দ্বারা স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে তো আমরা সকলেই শামিল। কিন্তু অন্তর দ্বারা সত্যায়ন ও বিশ্বাসের ধাপটি একটু কঠিন। জবান তো বলে দেয়, আমি মেনে নিলাম, কিন্তু অন্তরে থাকে ভিন্ন অবস্থা। কোনো কবি বলেছেন–

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

'তুমি আরব হও বা অনারব, তোমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
অপরিচিত ভাষা, যতক্ষণ না তোমার অন্তর সাক্ষ দেবে।'

যতক্ষণ না অন্তর সাক্ষ দেবে, জবান থেকে বের হওয়া বাক্য অপরিচিত ভাষার মতো।

خرد نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

'কচি শিশু বলে দিল লা ইলাহা, তো কী লাভ হলো?
অন্তর ও দৃষ্টি মুসলমান হয়নি, তো কিছুই হয়নি।'

সুতরাং অন্তর সাক্ষ দেওয়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রতিটি মানুষকে মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মুমিন হতে হবে, মুসলমান হতে হবে। এই স্তরে পৌঁছতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয়।

কতিপয় গ্রাম্যলোক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে কালেমা পড়ে নিল। তারপর তারা অনুকম্পা প্রদর্শনের মতো করে বলতে শুরু করল, এখন তো আমরা মুমিন হয়ে গেলাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আয়াত অবতীর্ণ করে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিলেন। ইরশাদ করেন–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا

'গ্রাম্য লোকগুলো বলল, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি।'

وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

'বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম কবুল করেছি। এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।'[১২৭]

সুতরাং প্রতীয়মান হলো, জবান দ্বারা কালেমা পড়ে নিলে মানুষ ইসলামের গণ্ডিতে তো প্রবেশ হয়ে যায়, কিন্তু অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য আরও কিছু স্তর রয়েছে। সেই স্তর কী? সেই স্তর হলো, মানুষের অন্তরে কালেমার মহব্বত বদ্ধমূল হবে এবং অন্তর দ্বারা স্বীকৃতি দেবে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলির সামনে আত্মসমর্পণ করলাম। এখন আল্লাহর হুকুম যা হবে তাই আমার এই দেহের ওপর সেঁটে যাবে। এ হচ্ছে অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করা। এই স্তরে পৌঁছার জন্য কিছু কষ্ট-মেহনত করতে হয়।

یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

'এই সাক্ষ হচ্ছে মহব্বতে পা রাখা
মানুষ সহজ মনে করে মুসলমান হওয়া।'

ফারসিতে জনৈক কবি বলেন–

چوں می گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لاالہ را

---

১২৭. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৪

'যখন বলি আমি মুসলমান, তখন আমি কেঁপে উঠি
কেননা, আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দুর্বোধ্যতা জানি।'

সুতরাং জবান দ্বারা স্বীকৃতি প্রথম পদক্ষেপ, অন্তর দ্বারা সত্যায়ন দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

আমল অন্তরগত অবস্থার আয়না

কীভাবে বোঝা যাবে যিনি জবান দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছেন, তিনি তার কথায় সত্যবাদী কিনা? আল্লাহ তা'আলা উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁরা বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁরা এই সত্যাবাদীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

اَلْاِيْمَانُ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ.

'ঈমান হলো, জবান দ্বারা স্বীকার করা, অন্তর দ্বারা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এর ওপর আমল করা।'

এই যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলা করা, এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে যা আছে সাথে-সাথে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ঢোলের শূন্যতা প্রকাশ হয়ে যায়। দ্বিমুখো নীতি ধরা পড়ে যায়। এভাবে মানুষের আমল অন্তরের অবস্থা বুঝিয়ে দেয়।

কৃত্রিম ভয়

বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.)-এর যুগে এক ব্যক্তি বড়ই সাধক হচ্ছিল। একবার মসজিদের ইমাম সাহেব কোনো অপারগতাবশত নামাযে উপস্থিত হতে পারেননি। মুসল্লীগণ তাকে বললেন, আপনি নামায পড়ান। তিনি বললেন, আমি তো নামাযে ইমামত করি না। জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হয়, আমি নামায শুরু করলাম যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু এসে যায় এবং নামায শেষ করতে না পারি। লোকজন বলল, একই অবস্থা তো একা নামাযের ক্ষেত্রেও; এটা কোনো সমস্যা হলো?। আপনিই নামায পড়ান। তিনি সম্মত হলেন এবং বললেন, ঠিক আছে এই নামায আমি পড়াচ্ছি, পরবর্তী কালে কোনো নামায পড়াব না।

এ-সময় হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) তার জামার কলার ধরে পেছনে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি মেকি ভাব করছ। এইমাত্র বলছিলে, আমার মধ্যে ভয় এত বেশি যে, আমার আশঙ্কা হয়, নামায শুরু করে তা

সম্পন্ন করতে পারি কিনা? আর এখন বলছ, পরবর্তী নামায পড়াব না। তুমি সামনের নামায পর্যন্ত জীবিত থাকা কি নিশ্চিত?

এভাবেই মানুষের আমল তার অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে দেয়। এতে কৃত্রিমতা চলে না। এজন্যই দৈহিক আমল সাক্ষ প্রদান করে তার অন্তরের অবস্থা কী?

মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য

মুমিন ও কাফেরের মাঝে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যথা–

মুমিন না দেখেই বিশ্বাস করে, কাফের দেখার পর বিশ্বাস করে : প্রথম পার্থক্য তো হলো, মুমিন না দেখেই বিশ্বাস করে নেয়। আর কাফের না দেখে বিশ্বাস করে না, দেখার পর বিশ্বাস করে। তাই তো মুমিন তাঁর জীবনে সবকিছুই মেনে নেয়। এটা তারা কেন করে? কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের শানে ঘোষণা দিয়েছেন–

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

'তাঁরা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে।'

অর্থাৎ– না দেখেই সব বিশ্বাস করে নেয়। পক্ষান্তরে কাফের মৃত্যুর সময় যখন চোখের পর্দা অপসারিত হয়, তখন বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

'সুতরাং আমি তোমার থেকে তোমার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, তাই তোমার দৃষ্টি আজ খুবই প্রখর।'[১২৮]

তারপর যখন সে স্বচক্ষে সামনে দেখতে পায়, তখন বিশ্বাস করে এবং মেনে নেয়।

এজন্যই ফেরাউন কী করল? তার মৃত্যুর সময় বলতে শুরু করল–

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

'আমি ঈমান আনলাম যে, বনু ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।'[১২৯]

---

১২৮. সূরা কাফ : আয়াত ২২

১২৯. সূরা কাফ : আয়াত ২২

যে ফেরাউন স্বয়ং খোদা দাবি করে সারা জীবন কাটিয়েছে, এখন সে মৃত্যুর সময় ঈমান আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে বলা হলো, এখন ঈমান আনলে? অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। এখন দেখে ফেলেছ; কাজেই ঈমান আনার পর্যায় শেষ। মুশাহাদা তথা বাস্তব অভিজ্ঞতা শুরু হয়ে গেছে। ঈমান ও মুশাহাদা পরস্পর বিপরীত বিষয়। না দেখে বিশ্বাস করা এবং মেনে নেওয়াকে ঈমান বলা হয়। দেখে বিশ্বাস করা ও মানাকে মুশাহাদা বলা হয়। সুতরাং মুমিন যে বস্তু না দেখে বিশ্বাস করে এবং মেনে নেয়, কাফের সেই বস্তু দেখার পর বিশ্বাস করে থাকে। তখন সেই বিশ্বাস তার কোনো কাজে আসে না।

মুমিন আনন্দচিত্তে বিশ্বাস করে, কাফের বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করে : দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, মুমিন যে বিষয়টি এ দুনিয়াতে আনন্দচিত্তে মেনে নেয়, একটা সময় আসবে যখন কাফেররাও তা মেনে নেবে, কিন্তু অসহায় হয়ে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হলে লজ্জায় তাদের মাথা নত থাকবে এবং তারা বলবে–

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আজ আমরা স্বচক্ষে বাস্তবতা দেখলাম এবং শুনলাম, সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন! আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী।'[১৩০]

এভাবে কাফেররা কেয়ামতের দিন নিজ চোখে দেখে অপারগ হয়ে মানবে, যা মুমিনগণ দুনিয়াতেই আনন্দচিত্তে মেনে নিচ্ছে।

কেয়ামতের দিন কাফের সম্প্রদায় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হবে, মুমিনগণ আনন্দিত হবে : তৃতীয় পার্থক্য হলো, কেয়ামতের দিন যখন কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা বলবে–

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ.

'হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয়ী হয়েছে এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট জাতি।'[১৩১]

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

---

১৩০. সূরা সাজদা : আয়াত ১২

১৩১. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৬

'হে আমাদের প্রভু! আমাদের এখান থেকে বের করুন, আমরা যদি পুনরায় পাপাচারে লিপ্ত হই, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা জালিম।'[১৩২]

কেয়ামতের দিন কাফের সম্প্রদায় এভাবে সকল কিছুই মেনে নেবে, যা মুমিনগণ দুনিয়াতেই প্রফুল্লচিত্তে মেনে নেয়। তাই তো মুমিনগণ বলে থাকে, হে প্রভু!

إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا.

'(হে আল্লাহ) নিশ্চয়ই আমরা একজন ঘোষণাকারীকে শুনেছি, তিনি ঈমানের ঘোষণা করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনো! তারপর আমরা ঈমান এনেছি।'[১৩৩]

সুতরাং মুমিনের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে এজন্য এত বেশি যে, তারা না দেখেই নিঃসংকোচে সকল হাকীকত স্বীকার করে নেয়, যা কাফের সম্প্রদায় কেয়ামতের দিন নিরুপায় হয়ে ও দেখে স্বীকার করবে।

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা

তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈমানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক। বরং মানুষের মর্যাদাও তার ঈমানের সুবাদেই। ঈমান না থাকলে মানুষের কোনো মূল্যই নেই। দেখুন, মানবজাতি কতগুলো মৌলিক উপাদান দ্বারা সৃজিত। উপাদানগুলো হলো, আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি। মানুষ যেসব পদার্থের সমন্বয়ে সৃজিত, যদি আপনারা চিন্তা করেন, দেখবেন পানি, কার্বন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। এসব মৌলিক পদার্থগুলোর মূল্য যদি মার্কেট হিসাব অনুযায়ী ধরা হয়, তাহলে একজন ইংরেজ বিজ্ঞান রবার্ট পিটার্সন বলেছেন, 'মানুষের সকল মৌলিক উপাদানের মোট মূল্য সাড়ে ছয় ডলার'। অর্থাৎ– মানুষ যেসব মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট, সবগুলোর মোট মূল্য সাড়ে ছয় ডলার। যদি ঈমান না থাকে, তাহলে মানুষের মূল্য কত দাঁড়াল? সাড়ে ছয় ডলার! কত মহান সেই প্রতিপালক, যিনি এত নিম্নমূল্যের উপাদান দ্বারা এত মূল্যবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতএব, ঈমানের সুবাদেই মানুষের এত মূল্য ও মর্যাদা।

---

১৩২. সূরা মূমিনূন : আয়াত ১০৭

১৩৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৩

প্রতিপালকের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

আপনারা গাভি দেখেছেন। ঘাস খায়, পানি পান করে এবং দুধ দেয়। মানুষ এমন কোনো মেশিন আবিষ্কার করতে পেরেছে কি, যার মধ্যে ঘাস-পানি দেওয়া হয় তারপর তা থেকে দুধ বের হয়? মৌমাছি দেখেছেন? মৌমাছি ফুলের রস চোষে। তারপর সেগুলো থেকে মধু বেরিয়ে আসে। মানুষ কি এমন কোনো মেশিন আবিষ্কার করতে পেরেছে, যার মধ্যে একদিক দিয়ে ফুল দেওয়া হয়, অপরদিক দিয়ে মধু বেরিয়ে আসে? মানুষ এ কাজ করতে সক্ষম নয়। রেশমপোকাও বৃক্ষের পাতা খায়, পানি খায় তারপর সেগুলোর ভেতরে থেকে রেশম বের হয়। বকরিও ঘাস খায়, পানি পান করে তারপর দুধ দেয়। আপনারা চিন্তা করুন। এমন যন্ত্র কি মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব, যার মধ্যে একদিক দিয়ে বৃক্ষপাতা এবং ঘাস দেওয়া হবে, অপরদিক দিয়ে রেশম ও দুধ বের হয়ে আসবে? না, এটা মানুষের সাধ্যের ভেতরে নেই। মহান প্রভুর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব দেখুন, তিনি কেমন প্রাণী সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেগুলো কত নিম্নমানের বস্তু ভোগ করে। অপরদিকে কত মূল্যবান বস্তু নিজেদের দেহ থেকে নির্গত করে।

মানুষের অবস্থা

এবার মানুষের দিকে লক্ষ্য করুন। যে মানুষের মধ্যে ঈমান নেই, শুধু দেহ আছে, সে কী ভক্ষণ করে? সে ফল খায়, আরও কত সুস্বাদু খাদ্য খায়। তারপর তার দেহ থেকে কী নির্গত হয়? এমন দুর্গন্ধবিশিষ্ট বস্তু নির্গত হয় যে, মানুষ তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নির্গত হয় নাপাকি আর বর্জ্য।

এক আল্লাহওয়ালা কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে ময়লা-আবর্জনার স্তূপের কাছে পৌঁছে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, এই বর্জ্যের স্তূপ আমাকে সম্বোধন করে বলছে, হে মানব! নিজের অবস্থা সম্পর্কে একটু সচেতন হও! আমি কত সুগন্ধময়-সুস্বাদু খাবার ছিলাম, ফল ছিলাম, কত উন্নতমানের নেয়ামত ছিলাম, তুমি আমাকে ভোগ করেছ। তারপর আমি যখন তোমার দেহ থেকে নির্গত হলাম, তখন এত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলাম। তোমার সাথে স্বল্প সময়ের সংশ্রব আমাকে কী থেকে কীসে পরিণত করে দিল। সুতরাং যদি ঈমান না থাকে, তাহলে মানুষের অবস্থা কী? এত উন্নতমানের বস্তুকে কত দুর্গন্ধময় গান্ধা বস্তুতে পরিণত করে দেয়?

মুমিন আল্লাহর বন্ধু

বোঝা গেল, মানুষের মূল্য ও মর্যাদা এই ঈমানের বদৌলতেই। ঈমানের সুবাদেই মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টজীব। এর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। ঈমানের বরকতেই আল্লাহ মানুষকে মান-সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। তাই তো যারা ঈমানদার মানুষ, তারা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু।'[১৩৪]

মানবজাতি আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশস্থল

দেখুন, মানুষের মধ্যে যেসব গুণ বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেগুলো আল্লাহ তা'আলার মধ্যে বিদ্যমান বলে আমরা অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস পোষণ করি। দৃষ্টান্তস্বরূপ– আমরা দেখতে পাই, মানুষের মধ্যে শ্রবণশক্তি আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে, অন্তর আছে, ইচ্ছা আছে, অস্তিত্ব আছে। এগুলো সবই আল্লাহর মধ্যে আছে মর্মে আমরা না দেখেই স্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলার মধ্যে এই গুণগুলো বিদ্যমান আছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, মানবজাতির মধ্যে এগুলো অসম্পূর্ণভাবে আছে। আল্লাহর মধ্যে আছে সম্পূর্ণরূপে। মানব সৃষ্ট, আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা। মানবের মধ্যে এসব গুণ আছে সীমিত। আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে অসীম। মানুষ অক্ষম, আল্লাহ তা'আলা সক্ষম ও পরাক্রমশালী। মানুষের মধ্যে এই গুণগুলো ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহর মধ্যে চিরস্থায়ী। মানুষের মধ্যে এই গুণগুলো আল্লাহ প্রদত্ত, পক্ষান্তরে আল্লাহর মধ্যে সত্তাগত। মোটকথা, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রমাণ। তাই কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কেননা, মানুষ নিজেই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ। মানুষের মধ্যে যেসব গুণাবলি রয়েছে অসম্পূর্ণভাবে আমরা সেসব গুণাবলির পরিপূর্ণতার সাথে আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করি।

মানুষ নবোদ্‌গত উদ্ভিদের মতো

মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে পৃথিবীতে আসে, তখন তার অবস্থা থাকে নবোদ্‌গত উদ্ভিদের মতো। তাই শিশু পৃথিবীতে একটি অঙ্কুরের

---

১৩৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৭

মতো বিকশিত হয়। কিন্তু যখন বড় হয়, তখন তার বক্ষ আশা-আকাঙ্ক্ষার কবরস্তানে পরিণত হয়ে যায়।

দেখা গেছে, যখন কোনো ফসল চাষ করা হয়, তখন তার সাথে আগাছা জাতীয় ফসল নিজে-নিজে গজিয়ে ওঠে। এগুলো এমন ফসল, যা মানুষ চায় না। এমনি-এমনি গজায়। তাই এগুলোকে দূর করতে হয়। কৃষকরা জানে, খেতে কোনো ফসল চাষ করা হলে তাতে এক জাতীয় আগাছা এমনি-এমনি জন্ম নেয়। একটি আগাছা আছে, যাকে উর্দুতে বাথো বলা হয়। এই বাথো আগাছাও নিজে-নিজে গজায়। ইংরেজিতে এমনি-এমনি গজানো এসব আগাছাকে weed (উঈড) বলে। এসব আগাছা গজাক, কৃষক তা চায় না। কিন্তু সেগুলো নিজে-নিজে গজিয়ে ওঠে। এগুলোর বীজ জমিনে পূর্ব থেকেই থাকে। পানি ও কাদা মাটি পেলে যেখানে ফসল অঙ্কুরিত হয়, সেখানে আগাছাও অঙ্কুরিত হয়। এসব আগাছা ক্ষতিকর। কৃষক এই আগাছা গজানোকে পছন্দ করে না। কারণ, এগুলো জমির চল্লিশ থেকে ষাট শতাংশ উর্বরতা ভোগ করে। এগুলো দূর না করলে মূল ফসল দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কম হয়। তাই আগাছা দূর করা জরুরি হয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া মন্দ বিষয়াবলি

ফসলের আগাছা সম্পর্কে আপনারা যা জানতে পারলেন, এর মাধ্যমে আরও একটি বিষয় বুঝতে পারবেন। সেটি হলো, মানুষের মধ্যে কিছু গুণ রয়েছে, যা উপকারী ও প্রত্যাশিত। সাথে-সাথে মন্দ কিছু বিষয়ও মানুষের মধ্যে এসে যায়। ফসলের মধ্যে জন্মানো আগাছাকে যেমনভাবে কেমিক্যাল ব্যবহার করে বিনাশ করা হয়, এমনিভাবে মানুষের মধ্যে আগাছার মতো জন্ম নেওয়া এসব মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিনাশ করাও জরুরি। এগুলো বিনাশ না করা হলে পরবর্তী কালে মানুষের ভালো গুণগুলো এসব মন্দ বিষয়গুলোর মধ্যে হারিয়ে যায়।

পদ ও কর্তৃত্বের অহংকার

দৃষ্টান্তস্বরূপ– যেব্যক্তি পদ ও কর্তৃত্ব পায়, তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গর্ব-অহংকার চলে আসে। ক্ষমতা লাভ হলো, তো অহমিকা চলে এল। এই অহমিকার দৃষ্টান্ত ফসলে জন্মানো আগাছার মতো। তাই তো দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তারপর তার মধ্যে এমন দাম্ভিকতা চলে এল যে, সে নিজেকে খোদা দাবি করে বসল।

বলতে শুরু করল, আমি তোমাদের বড় খোদা। সে তার সৈন্যবাহিনী ও প্রজাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলা শুরু করল–

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي

'আমার নয় কি মিশরের রাজত্ব এবং এসব নদনদী, যেগুলো আমার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে?'[১৩৫]

অর্থাৎ– এসবই আমার। আমার পানির ব্যবস্থাপনা দেখো, সমুদ্রে পানির চলাচল দেখো। এভাবেই দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে থাকে। তো এই গর্ব-অহংকার মানুষের মধ্যে পদ-পদবি, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে।

সম্পদের সাথে কৃপণতা

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যখন ধনসম্পদ দান করেন, তখন কৃপণতার আগাছা নিজে-নিজেই তার মধ্যে গজিয়ে ওঠে। যাদের কাছে সম্পদ আছে, তাদের সকলের মধ্যে দানশীলতা থাকে না। যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী হয়, তাদের অধিকাংশের মধ্যে অটোমেটিক কার্পণ্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কত মানুষ আছে, যারা দৈনিক তাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স দেখে। স্মরণ রাখবেন, কিছু মানুষ সম্পদশালী হয় আর কিছু মানুষ সম্পদের চৌকিদার হয়। দুই শ্রেণির মাঝে পার্থক্য আছে। সম্পদশালীর দৃষ্টান্ত হযরত ওছমান (রাযি.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। আর তিনি দুহাতে আল্লাহর দীনের জন্য খরচ করেছেন। এভাবে তিনি সম্পদশালী হয়েছেন। আর যারা সম্পদের চৌকিদার হয়, সম্পদ কাজে লাগানো ও ভোগ করা তাদের ভাগ্যে জোটে না। তারা সম্পদ পুঞ্জিভূত করে। তারপর তাদের সন্তানরা তা উড়িয়ে দেয়। কেয়ামতের দিন সম্পদের হিসাব দেবে সে আর সম্পদ ভোগ করবে তার পরবর্তী বংশধর। এই সম্পদের উপকারিতা কী, যে সম্পদে মানুষ দুনিয়াতে সম্পদশালী; কিন্তু পরকালে নিঃস্ব।

কারুনকে দেখুন। আল্লাহ তা'আলা কী পরিমাণ সম্পদ তাকে দিয়েছিলেন! কিন্তু যাকাত দেওয়া তার কাছে বোঝা মনে হলো। তাই যাকাত দেওয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সে হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর অপবাদ আরোপের একটি ঘটনা সাজাল। পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার ধনভান্ডারসহ জমিনে ধসিয়ে দিলেন।

---

১৩৫. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫১

ইল্‌মের সাথে হিংসা ও অহংকার

এমনিভাবে যার মধ্যে ইল্‌ম আসে, সাথে-সাথে তার মধ্যে গর্ব-হিংসা ও অহংকারের আগাছাও সৃষ্টি হয়ে যায়। ইল্‌মও একটি বিস্ময়কর গুণ। যেব্যক্তির মধ্যে ইল্‌ম আসে, তার মধ্যে অহংকার এবং হিংসাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসে যায়। ইহুদি সম্প্রদায়কে দেখুন। তাদের কাছে ইল্‌ম ছিল। কিন্তু ইল্‌মের সাথে-সাথে তাদের মধ্যে হিংসা এবং গর্বও ছিল। তাই তো ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

لَوْلَا الْحَسَدُ فِي الْعُلَمَاءِ لَكَانُوْا بِمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ.

'যদি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ না থাকত, তাহলে তারা নবীদের স্তরে থাকত।'

ইল্‌ম মানুষকে এত ওপরে উন্নীত করে। কিন্তু হিংসা তাকে অধঃপতিত করে। এজন্য আপনারা দেখবেন, যেব্যক্তির মধ্যে ইল্‌ম এসেছে, তার মধ্যে হিংসা ও অহংকারের আগাছাও সৃষ্টি হয়েছে। একে অপরের সাথে বনিবনা হয় না। শিং সামলাতে পারে না। অথচ এটাই মানুষের পতনের কারণ হয়।

খ্যাতির সাথে লৌকিকতা

এমনিভাবে যেব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি লাভ করে, তার মধ্যে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার আগাছা জন্ম নেয়। আপনারা টেলিভিশনে তেলাওয়াতকারীদের অবয়ব দেখুন, বিষয়টি সহজেই পুরোপুরি বুঝে এসে যাবে। যখনই কেউ রেডিওর কারী হয়ে যায়, টেলিভিশনের কারী হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা চলে আসে। ফ্যাশন করে থাকা, কৃত্রিম সাজসজ্জা করে থাকা তাদের নিদর্শন হয়ে যায়। কী লাভ এই মডার্ন মৌলভী হয়ে, যখন সুন্নাতই বিদায় হয়ে যায়? বলা হয় আল্লামা; অথচ চেহারায় পূর্ণ সুন্নাতই দৃষ্টিতে পড়ে না। সুতরাং প্রতীয়মান হলো, যেখানে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি আসে, সেখানে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা এমনি-এমনি চলে আসে।

রূপ-সৌন্দর্যের সাথে প্রদর্শনি

এমনিভাবে যেখানে রূপ-লাবণ্য আসে, সেখানে প্রদর্শনির আগাছা জন্ম নেয়। মহিলারা বেপর্দা হয়ে কেন বাইরে চলাফেরা করে? কখনও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বের হয়? কখনও না। কীভাবে বের হয়? বের হওয়ার পূর্বে আধা ঘন্টা সময় নিয়ে প্রস্তুত হয়। তারপর যখন মনে হয়, হ্যাঁ সবকিছু ঠিকঠাক

হয়েছে, এবার যে কেউ আমাকে দেখবে ভালো না বেসে পারবে না, তখন তারা বাইরে বের হয় এবং হেলেদুলে প্রদর্শনি করে বেড়ায়। এভাবে যেখানে রূপ-লাবণ্য আসে, সাথে-সাথে সেখানে মেকি ভাব এবং প্রদর্শনিবোধও অটোমেটিক জন্ম নেয়। কাজেই বেপর্দা নারীদের বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত রাখার সহজ পদ্ধতি হলো, তাদের বলবেন, সাদা কারুকাজবিহীন কাপড় পরিধান করো। তারা ডিজাইনবিহীন সাদা কাপড় পরে কখনও বাইরে বের হবে না। রংবেরঙের এবং উন্নত মানের কাপড় যেখানে এসেছে, সেখানে পর্দাহীনতা এসেছে।

মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য

বোঝা গেল, যেখানে ভালো কিছু আসে, সেখানে আগাছা প্রকৃতির মন্দও অটোমেটিক জন্ম নেয়। কাজেই কৃষক যেমন ফসলের আগাছা বিনাশ করে, যার ফরে ফসলের ফলন ভালো হয়, ঠিক তদ্রূপ সকল মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, নিজের মধ্যে সৃষ্ট এসব আগাছা তথা মন্দ স্বভাব বিনাশ করা, এতে তার চারিত্রিক ফসল ভালো হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতকার্য হতে পারবে।

মানবজীবনের দুটি দিক

মানবজীবনের দুটি দিক আছে। দুটি দৃষ্টিকোণ আছে। একটি হলো মনচাহী, অপরটি খোদাচাহী। মনচাহী জীবনের কী উদ্দেশ্য? মনচাহী জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার বাসনা পূর্ণ হবে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। অপরদিকে খোদাচাহী জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া। সর্বযুগে মানবজীবনে এ দুটি ভিন্ন-ভিন্ন দিক থাকে। একটিকে বলা হয় Self oriented তথা নিজ বাসনাকেন্দ্রিক জীবন। অপরটিকে বলা হয়, God oriented তথা আল্লাহর সন্তুষ্টিকেন্দ্রিক জীবন। দুটি জীবনের ভিন্ন-ভিন্ন দিক। ভিন্ন-ভিন দুই দিকের ফলাফলও ভিন্ন-ভিন্ন।

উদাহরণত, মনচাহী জীবনের মধ্যে স্বার্থপরতা আসে, অভিলাষপূজা আসে, লাভের পূজা, নারীপূজা, অর্থপূজা, ব্যক্তিপূজা, যৌনপূজা ইত্যাদি সবই মনচাহী জীবনের ফলাফল। পক্ষান্তরে আল্লাহচাহী জীবনের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

পৃথিবীতে পরিশেষে বিলীন হতেই হবে

এবার দেখুন, বর্তমানে কচ্ছপের জীবন দেড়শো বছর, বড় মাছের জীবন দুইশত বছর, গাছের জীবন এক হাজার বছর (এরূপ গাছ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে), পাহাড়-পর্বতের জীবন লাখো বছর। অথচ মানুষের গড় জীবন ষাট বছর। আর এটাও আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতায় ভরপুর, দুঃখ-বেদনা ও অনুতাপে পরিপূর্ণ। তারাই জ্ঞানী, যারা এই বিষাদময় জীবন থেকে বেঁচে মনচাহী জীবন পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহচাহী জীবন অবলম্বন করে। কত তাজ্জব বিষয় সেই বস্তুর পেছনে দৌড়ানো, যার পরিণতি বিলীন হওয়া ছাড়া কিছুই নয়। একটু লক্ষ্য করুন, কত বিস্ময়ের কথা সেই বস্তু পাওয়ার পেছনে ছুটে চলা, লয় হওয়াই যার শেষ পরিণতি! মানুষ যদি জীবনে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়েও যায়, তবুও পরিশেষে এর ফলাফল হারিয়ে যাওয়া। যেব্যক্তিই জীবনে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করেছে করবে, তার পরিণতি সেগুলো লয় করা। সুতরাং বোঝা গেল তারাই জ্ঞানী, যারা পার্থিব কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, যেন আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেন।

যতক্ষণ না নিজেকে মিটাবে, ততক্ষণ পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে না

একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝুন। প্রত্যেক বীজের মধ্যে গাছ লুকায়িত থাকে। যদি উপযুক্ত পরিবেশ ও জায়গা পায়, তাহলে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তা থেকে বড়-বড় গাছ হয়ে যায়। আর উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে বীজ থেকে গাছ হতে পারে না। তাই প্রত্যেক বীজের মধ্যে গাছ জন্মানোর যোগ্যতা তো আছে, কিন্তু সকল বীজ থেকে গাছ জন্মায় না। সেই বীজ থেকেই গাছ জন্মে, যা উপযুক্ত পরিবেশ পায়। আর যে-বীজ অনুর্বর জমিতে পড়ে, সেটি সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে যেব্যক্তি প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে যায়, তার মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার বীজ তো থাকে, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার কারণে সেই বীজ বিনষ্ট হয়ে যায়। পরিপূর্ণ মানুষ সে-ই হতে পারে, যে উপযুক্ত এবং অনুকূল পরিবেশ পায়। দেখুন, যতক্ষণ-না বীজ নিজেকে না মিটায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা থেকে গাছ জন্মায় না। ঠিক তদ্রূপ যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে মিটাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণ মানুষ হতে পারে না।

আজকে সারা বিশ্ব জানে, একটি অণু, যা ক্ষুদ্রতম অংশ, তাকে এটম বলা হয়। এই এটম যখন ফাটে, তখন তার বস্তুগত শক্তি প্রকাশ পায়। এত

শক্তি যে, মানুষ এ-ব্যাপারে খুবই ভীতসন্ত্রস্ত। এটম বোমা যখন ফাটে, তখন তার এত শক্তি প্রকাশ পায় যে, বহু শহর বরবাদ করে ধূলিসাৎ করে দেয়। স্মরণ রাখবেন, যখন অণুর নিউক্লেস ফাটে, তখন তার বস্তুগত শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন মানুষের আবরণ ফাটে, তখন তা থেকে আত্মিক শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়। অণুর যেমন নিউক্লেস আছে, তেমনি মানুষেরও একটি আবরণ আছে। এই আবরণ ভেদ করা জরুরি। মানুষের এই ব্যক্তিত্ববোধ দূর করা অপরিহার্য। যিনি এই আবরণ ভেদ করেন, ব্যক্তিত্ববোধ দূর করেন, তার আধ্যাত্মিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারপর তিনি এমন কাজ করে দেখান, যা জিনরাও করতে পারে না।

জিনের শক্তির চেয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি বেশি

দেখুন, হযরত সুলাইমান (আ.) তাঁর শাহি দরবারে বসে জিনদের বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে বিলকিসের সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে? জিনদের মধ্যে একজন জবাব দিল, আপনার এই দরবার শেষ হওয়ার আগে-আগে আমি সেই সিংহাসন এনে আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারব। কুরআন মাজীদ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে–

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ

'জিনদের থেকে ইফরীত বলল, আপনি আপনার আসন ত্যাগ করার পূর্বে আমি সেটি আপনার সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম।'[১৩৬]

হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন, এটা অনেক সময়। এর চেয়েও দ্রুত চাই। তখন আসমানি কিতাবের ইল্‌ম সম্পর্কে অবগত এমন একজন বলল–

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.

'আপনার চোখের পলক পড়ার আগে আমি তা আপনার কাছে উপস্থিত করতে পারি।'[১৩৭]

فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

'তারপর সুলাইমান যখন তা নিজের সামনে উপস্থিত দেখতে পেল, তখন বলল, এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহের অংশবিশেষ।'[১৩৮]

---

১৩৬. সূরা নামল : আয়াত ৩৯

১৩৭. সূরা নামল : আয়াত ৪০

১৩৮. সূরা নামল : আয়াত ৪০

উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিত্ববোধ দমন করে, আমিত্ব খতম করে, তার আবরণ ভেদ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ-জাতীয় আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেন। সেই শক্তিতে মানুষ এমন কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে, যা জিনরাও করতে সামর্থ্য রাখে না। এই আধ্যাত্মিক শক্তি কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন থাকে না। এই শক্তি অর্জন করতে হলে নিজের বড়ত্ব, আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ববোধ সমূলে দূর করতে হবে।

جرأت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا
ہیں تیری خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے
کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار
جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے

'সাহস থাকে তো পার্থিব ধ্যান-জ্ঞান থেকে মুক্ত হও,
তোমার নিজের মধ্যেই এখনও লুকিত আছে দ্বীপ।
প্রকাশিত হবে না সেই নিস্তব্ধ সমুদ্রের ভেদ
যতক্ষণ না তুমি সেটাকে মূসার মতো আঘাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করবে।'

মানুষের বড় ভুল

আজ মানুষ নিজেকেও বুঝতে ভুল করেছে এবং প্রভুকেও বুঝতে ভুল করেছে। কী ভুল করেছে? আল্লাহ যেমন নিজেকে তেমন বুঝেছে এবং নিজে যেমন আল্লাহ তা'আলাকে তেমন বুঝেছে। আল্লাহ যেমন নিজেকে তেমন বুঝেছে কীভাবে? এভাবে যে, মানুষ চায়, আমার সমস্ত কামনা-বাসনা পূর্ণ হোক। অথচ সকল ইচ্ছে তো একমাত্র আল্লাহর পূর্ণ হয়। যেমন– অনেকে নিজ পরিবারে বলে থাকে, এখানে আমি যা ইচ্ছে করব, তা-ই হবে। আমার ইচ্ছেমতো তোমাদের চলতে হবে। দেখলেন তো নিজেকে আল্লাহর মতো মনে করছে যে, সর্বাবস্থায় আমি যা চাই, তা-ই হবে। দেখবে, আমাকে মেনে চললে তোমরা সফল হবে। এই হলো নিজেকে বোঝার মধ্যে ভুল। আল্লাহ তা'আলাকে বোঝার মধ্যে মানুষ কীভাবে ভুল করেছে? এভাবে যে, মানুষ আল্লাহকে নিজের সাথে তুলনা করে বসেছে। এরূপ বুঝে বসে আছে যে, আমি কালেমা পড়েছি, বস এতটুকুই যথেষ্ট। আমি এখন আমল যা-ই করি, আমাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করা আল্লাহর দায়িত্ব।

তাই তো আজকের মুসলমান বলে থাকে, আল্লাহর সাহায্য আসে না কেন? ভাই! আল্লাহর সাহায্য মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং তাদের আমল ও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। যখন মানুষ থেকে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল প্রকাশ পাবে, তখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্যও তাদের ওপর আসবে। আমরা বলে থাকি, যেহেতু আমাদের মুসলমান বলা হয়, তাই আল্লাহর দায়িত্ব আমাদের সাহায্য করা। তিনি কি আমাদের আত্মীয়? যেমন আত্মীয়স্বজন একে অপরকে বৈধ সহযোগিতাও করে, অবৈধ সহযোগিতাও করে, তেমনি আমরা যা খুশি করব আল্লাহকে আমাদের সাথে থাকতে হবে? না, আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্য এর সাথে সম্পকৃক্ত নয়। বরং আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক আমলের সাথে। যেব্যক্তিই আমল করবে, চাই সে গৌর বর্ণের হোক, কৃষ্ণাঙ্গ হোক, আরবি হোক, অনারাব হোক, নর হোক, নারী হোক আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির সাথে আছেন। এভাবে আমরা নিজেকে বুঝতেও ভুল করেছি, আমাদের প্রভুকে বুঝতেও ভুল করেছি।

এবার দেখুন, ইহুদি সম্প্রদায় কী বলেছিল?

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ

'আমরা আল্লাহর ছেলে এবং তার প্রিয়পাত্র।'[১৩৯]

সুতরাং আমরা যা খুশি করব।

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

'আমাদের কখনও আগুন স্পর্শ করবে না, অবশ্য অল্প কিছু দিন।'[১৪০]

এভাবে কুরআন মাজীদ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আমরা নিজেদেরও বুঝতে ভুল করেছি এবং আমাদের প্রভুকেও বুঝতে ভুল করেছি।

জাহান্নামের আমল দ্বারা জান্নাত অন্বেষণ

বিস্ময়কর বিষয় তো হলো, আল্লাহ তা'আলা পরকালের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করেছেন। আর আজ দুনিয়াতেও প্রতিটি মানুষ নিজের জান্নাত বানাতে ব্যস্ত। সকল মানুষ কিসের জন্য পরিশ্রম করছে? আমার স্ত্রী এরূপ হওয়া চাই, আমার বাড়ি এরূপ হওয়া চাই, আমার গাড়ি এরূপ হওয়া চাই, আমার

---

১৩৯. সূরা মায়েদা : আয়াত ১৮

১৪০. সূরা বাকারা : আয়াত ৮০

পোশাক-পরিচ্ছদ এরূপ হওয়া চাই। এসবের পেছনেই সকল মানুষ পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অর্থাৎ– এক জান্নাত তো আল্লাহ তা'আলা পরকালের জন্য বানিয়েছেন। আর এখন মানুষ দুনিয়াতে আরেক জান্নাত বানাতে চেষ্টা-পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এজন্যই ঘুস নিচ্ছে, এজন্যই অবৈধ সম্পদ উপার্জন করছে। কেন এসব করছে? পছন্দ মোতাবেক সকল কিছু লাভ করতে। এর নামই তো জান্নাত। তবে তাজ্জবের বিষয় হলো, সকলেই জান্নাত অনুসন্ধান করছে; কিন্তু জাহান্নামের আমল দ্বারা। এটা কীভাবে সম্ভব? জাহান্নামের আমল দ্বারা আমরা জান্নাত পেয়ে যাব; তা কীভাবে হতে পারে? স্মরণ রাখবেন, কিছু আমল আছে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার। কিছু আমল আছে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার। আজকে যারা লুটতরাজের মাধ্যমে মনচাহী জীবন যাপন করছে, তারা মূলত জাহান্নামের আমল দ্বারা জান্নাত তালাশকারীদের মধ্যে গণ্য।

সুতরাং মানুষের জন্য জরুরি নিজ আয়ুষ্কাল স্মরণ রাখা যে, অবশেষে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে। এখানে যদি আমি কাঙ্ক্ষিত সকল কিছু জমা করেও ফেলি, অবৈধ সম্পদের পাহাড়ও গড়ে ফেলি, রূপসি স্ত্রীও পেয়ে যাই, আলিশান বাড়িও করে ফেলি, সবকিছু আমার মনমতো পেয়ে যাই, তবুও তো চৌদ্দ তারিখের চাঁদনি রাতের পর অন্ধকার রাতই আসবে।

মৃত্যুকে স্মরণ রাখবেন

এজন্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন–

أُذْكُرُوا هَاذِمَ اللَّذَّاتِ الْمَوْتَ

'তোমরা ইহজগতের স্বাদ ভঙ্গকারী মৃত্যুকে স্মরণ করো!'

মৃত্যু নিজেদের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেবে। এজন্য আমাদের আকাবিরগণ পূর্ব যুগে কবরস্তানে যেতেন। কেননা, কবরস্তানে গেলে মানুষের শিক্ষা লাভ হয়। এই অধমের ধারণা, বর্তমান যুগে কবরস্তানের পরিবর্তে হাসপাতালে গেলে শিক্ষা লাভ বেশি হবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখুন, বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণের সর্বাপেক্ষা বড় নমুনা হাসপাতাল। পূর্ব যুগে তো এত বড়-বড় হাসপাতাল ছিল না। এখন একবার গিয়ে দেখুন, মানুষের অবস্থা কী? কখনও হৃদরোগ হাসপাতালে গিয়ে দেখুন, কখনও ইউরো বিভাগে গিয়ে দেখুন, কখনও কিডনি বিভাগে গিয়ে দেখুন। অনুমান হয়ে যাবে মানুষের সাথে কী ঘটছে।

কিন্তু মানুষের অন্তরের উদাসীনতা এত বেশি যে, হাসপাতালে কয়েকবার গেলেও তা দূর হয় না। প্রতিদিন রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত, এত বড়-বড় রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রত্যক্ষকারী স্বয়ং ডাক্তারগণের অন্তরও নরম হয় না। মানুষের অন্তর এতই উদাসীন।

আমলের চাবি

যারা মহান আল্লাহকে পেতে চায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তাদের জন্য জরুরি আল্লাহর সন্তুষ্টিজনক কাজ শুরু করা। যদি তা করে, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। প্রত্যেক বস্তুর চাবি থাকে, যা দ্বারা সেই বস্তু খোলা হয়। হাদীছ শরীফে বিভিন্ন আমলের চাবির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

জান্নাতের চাবি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, জান্নাতের চাবি হলো কালেমা তাইয়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলা।

নামাযের চাবি

এমনিভাবে নবীজি আরও বলেছেন, নামাযের চাবি পবিত্রতা। যেব্যক্তি সর্বদা উজু অবস্থায় থাকে, তার জন্য নামায পড়া খুবই সহজ। যেসব মহিলা বলেন, নামাযের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অলসতা চলে আসে, তারা যদি সব সময় উজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করেন, তাহলে তাদের জন্য নামায পড়া সহজ হয়ে যাবে। 'পবিত্রতা নামাযের চাবি' এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেব্যক্তি নামাযের হাকীকত পেতে চায়, তার জন্য জরুরি যত্নসহকারে উজু করা। এতে সে নামাযের হাকীকত পেয়ে যাবে।

আপনারা নোট করে রাখুন, তারাই উদাসীনতার সাথে নামায পড়ে, যারা উজুও উদাসীনতার সাথে করে। আপনারা মনোযোগের সাথে, যত্নসহকারে উজু করার অভ্যাস করে নেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে নামাযের গোপন ভেদও দান করবেন।

সৎকাজের চাবি সত্য বলা

এমনিভাবে সৎকাজের চাবি হচ্ছে সত্য বলা। যারা নেককার হতে আগ্রহী, তারা যেন সত্য বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলেই তারা নেককার

হয়ে যাবে। বস্তুত মিথ্যাই হচ্ছে সকল মন্দ কাজের মূল। বর্তমান যুগে শয়তান এর একটি সুন্দর নাম রেখেছে 'বাহানা', যাতে করে মিথ্যুকের কাছে তা মন্দ অনুভূত না হয়। বলে থাকে, আমি শুধু বাহানা করেছি। অথচ বাহানা মিথ্যা বই কিছু নয়। সরাসরি বলুন, আমি মিথ্যে বলেছি। স্ত্রী মনে করে, আমি স্বামীর সামনে বাহানা করেছি। স্বামী মনে করে, আমি স্ত্রীর সামনে বাহানা করেছি। উদ্দেশ্য কী? সোজাসুজি বলুন, আমি মিথ্যে বলেছি। যেব্যক্তি সৎ হতে চায়, তার জন্য সৎ হওয়ার চাবি হচ্ছে সত্য বলা। সত্য বলার অভ্যাস করুন, সহজেই সৎ হয়ে যাবেন। এজন্য মাশায়েখগণ বলেন, শিশুদের মোটা-মোটা যেসব বিষয় শেখানো চাই, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সর্বদা সত্য বলা। এ-ব্যাপারে শিশুদের ঢিল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শিশুর সব ভুল ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু মিথ্যে বলা ক্ষমার অযোগ্য। আপনারা শিশুদের এভাবে সত্য বলায় অভ্যস্ত করে তুলুন, তাদের মধ্যে এমনি এমনি সৎ হওয়ার প্রবণতা চলে আসবে। কেননা, মিথ্যার মাধ্যমে তারা মন্দ কাজের ওপর পর্দা ফেলে তা ঢেকে দেয়। সুতরাং যখন সত্য বলবে, তখন পাপ কাজের ওপর পর্দা ফেলতে পারল না। ফলে পাপ কাজে নিরুৎসাহিত হবে। বর্তমানে তো মানুষ একটা গুনাহ করে। সেটাকে গোপন করার জন্য একটা মিথ্যা বলে। তারপর এই মিথ্যাকে ঢাকার জন্য তাকে আরও দশটা মিথ্যা বলতে হয়। পরবর্তী কালে এই দশটা মিথ্যাকে ঢাকতে আরও একশো মিথ্যা বলতে হয়। এভাবে নতুন-নতুন মিথ্যা বলার ধারা শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষ নিজের মধ্যে একটা ব্যাধি লালন করে আর এজন্য তাকে হাজারো জায়গায় মিথ্যা বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার কাছে মিথ্যুকদের খাতায় তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

ইল্‌মের চাবি উত্তম পন্থায় জিজ্ঞাসা

ইল্‌মের চাবি হচ্ছে উত্তম পন্থায় জিজ্ঞাসা। যে ছাত্রের ভেতরে উত্তম পন্থায় জিজ্ঞাসা করার গুণ সৃষ্টি হলো, মনে করবেন আল্লাহ তা'আলা তাকে ইল্‌মের দরজা দান করেছেন।

আল্লাহর সাহায্য লাভের চাবি সবর

আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভের চাবি হচ্ছে মানুষের সবর। আমরা সবকিছুতে প্রতিশোধ নিতে চাই। ভাই! আমরা যখন প্রতিশোধ নিয়ে নেব, তখন আল্লাহর সাহায্য কীভাবে অবতীর্ণ হবে?

এক হাদীছে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে কটু কথা বলছিল। তিনি সব সহ্য করছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা শুনছিলেন। শেষ পর্যন্ত লোকটি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) জবাব দিলেন। এ-সময় রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং চলে যেতে থাকেন আর বললেন, আবুবকর! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নীরব ছিলেন, একজন ফেরেশ্‌তা আপনার পক্ষ থেকে লোকটির জবাব দিচ্ছিল। তারপর যখন আপনি নিজে জবাব দিলেন, আল্লাহর সেই ফেরেশতা চলে গেলেন এবং এখন আমিও এই মজলিস থেকে উঠে চলে যাচ্ছি। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হয়ে যান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[১৪১]

একটি সূক্ষ্ম বিষয়

দুই প্রকার ব্যক্তি আপনার প্রতিপক্ষ হতে পারে। হয়তো সৎ লোক হবে নতুবা মন্দপ্রকৃতির লোক হবে। যদি মন্দপ্রকৃতির লোক হয়, তাহলে আপনার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তার থেকে বদলা নেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলে রেখেছেন

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ.

'নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।'[১৪২]

আর যদি আপনার প্রতিপক্ষ সৎ লোক হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, আপনি অন্যায়ের ওপর আছেন। কেননা, নেককার লোকের সাথে আপনি শত্রুতা করেছেন। কাজেই আপনি নিজেকে সংশোধন করে নেবেন! সৎ লোকদের সাথে শত্রুতা করবেন না!

---

১৪১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩
১৪২. সূরা সাজদা : আয়াত ২২

আল্লাহর নেয়ামত লাভের চাবি শোকর

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত লাভের চাবি হলো শোকর আদায় করা। যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করবে, তিনি সেই ব্যক্তির জন্য তাঁর নেয়ামতের দ্বার খুলে দেবেন। এই শোকর জবান দ্বারাও করতে হবে এবং আমলের মাধ্যমেও করতে হবে। বর্তমানে জবান দ্বারা আল্লাহর শোকর আদায় খুবই কম হচ্ছে। দেখবেন, ছেলের প্রশংসা করা সহজ, স্বামীর গুণগান গাওয়া সহজ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা, তাঁর গুণকীর্তন করা খুবই কঠিন কাজ। জবান দ্বারা আল্লাহর শোকর আদায় হয়ে ওঠে না। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনার ব্যবসা কেমন চলছে? উত্তরে শুধু এতটুকু বলবে, 'জি চলছে'। অথচ তার ব্যবসা এমন যে, সে তার সাথে আরও দশটি পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এত পরিমাণ দিলেন, তার প্রয়োজনেরও অধিক দিলেন, তার অবস্থা থেকে বেশি দিলেন, কিন্তু উত্তরে কী বলবে, 'জি চলছে'। এর চেয়ে অকৃজ্ঞতা আর কী হতে পারে? জবান থেকে এর চেয়ে বেশি কেন বের হয় না? হে লোকসকল! কেন বলেন না, আল্লাহ তা'আলা আমার অবস্থা অপেক্ষা বেশি দিয়েছেন? বলুন, আল্লাহ এত দিয়েছেন যে, আমি সারা জীবন সেজদায় পড়ে থাকলেও আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে শেষ করতে পারব না। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জবান থেকে খুব একটা বের হতে চায় না। আল্লাহ তা'আলার বেশি-বেশি প্রশংসা করা চাই। আল্লাহর এমন গুণকীর্তন করা চাই, যাতে শ্রোতাদের অন্তর খুশি হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ তা'আলার মধ্যেও প্রশংসাকারীর প্রতি সহানুভূতি জাগবে যে, আমার বান্দা এরূপ প্রশংসা করল।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের চাবি যিকির

বেলায়েতের (নৈকট্য লাভ) চাবি হচ্ছে যিকির। যদি কোনো ব্যক্তি বেলায়াতের স্তরে পৌঁছতে চায়, সে যেন গুরুত্বের সাথে নিয়মিত যিকির করে। গুরুত্বের সাথে নিয়মিত যিকির করলে আল্লাহ তা'আলা অতি সহজেই বেলায়াতের স্তর (আল্লাহর নৈকট্য) দান করেন। আজ আমাদের থেকে যিকিরই হয় না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিয়মিত কী আমল করেন? উত্তরে বলবেন, মুরাকাবা করতে পারি না। তাহলে আল্লাহর বেলায়াতের (নৈকট্য লাভ) নূর কীভাবে অর্জিত হবে? ভাই! আমরা চাবি ছাড়াই তালা খুলতে চাচ্ছি। পাঁচ মিনিট মুরাকাবা হয় না। তারপর আমরা বলি, আমাদের ভেতর

থেকে ক্রোধ দূর হচ্ছে না। আমাদের দৃষ্টির হেফাযত হচ্ছে না। ভাই! এসব নেয়ামত যিকিরের আধিক্য দ্বারা অর্জিত হয়। আমরা তা করছি না। সুতরাং এই গুণ আমরা কীভাবে পাব? আওলিয়ায়ে কেরামের গুণাবলি তবেই অর্জিত হবে, যখন আমরা স্থায়ীভাবে যিকিরের আমল করব। আমাদের মাশায়েখগণ তো এমনও বলেছেন, جو دم غافل سو دم کافر (যে শ্বাস যিকিরহীন, সেই শ্বাস কাফের)। অর্থাৎ– যে মুহূর্তটুকু যিকির ব্যতীত গত হলো, তোমরা মনে করবে, যেন সেই মুহূর্তটুকু কুফরের অবস্থায় গত হলো।

সফলতার চাবি তাকওয়া

সফলতার চাবি হচ্ছে তাকওয়া। প্রত্যেকেই প্রত্যাশা করে, আমি মুক্তি লাভ করি, আমি সাফল্যমণ্ডিত হই, আমার উন্নতি হোক। সফলতা কী জিনিস? একটু চিন্তা করুন! সফলতা এমন কৃতকার্যতাকে বলে, যার পরে আর কোনো অকৃতকার্যতা থাকে না। আল্লাহর এমন নৈকট্য লাভ, যার পরে আর কোনো দূরত্ব থাকে না, এমন আনন্দ লাভ, যার পরে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকে না। একেই বলেই সফলতা। এই সফলতা তাকওয়া-পরহেযগারির মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর তাকওয়ার মাধ্যমেই মানুষ জান্নাত পাবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.

'এই সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকার করব আমার মুত্তাকী বান্দাদের।'[১৪৩]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা نُوْرِثُ শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, এই সেই জান্নাত, আমি যার ওয়ারিশ বানাব। ভাই! মানুষ তো নিজের বাপ-দাদার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়। তাই বোঝা গেল, জান্নাত আমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সম্পত্তি। আমরা যদি সত্যিকারার্থে তাঁর ওয়ারিশ হই, তাহলে পরকালে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই জান্নাত পাব।

مَنْ كَانَ تَقِيًّا

'যে মুত্তাকী হবে, সে এই উত্তরাধিকার পাবে।'

---

১৪৩. সূরা মারয়াম : আয়াত ৬৩

রিযিকের চাবি ইখলাস ও আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা

রিযিকের চাবি হচ্ছে ইখলাস ও আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা। এ বিষয়টি খুবই ব্যাপক। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখা রিযিকের চাবি'। যেব্যক্তির মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখার গুণ আছে, আল্লাহ তা'আলা যাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখতে বলেছেন, তাদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করে, আল্লাহ তা'আলা তার রিযিক বৃদ্ধি করে দেন। আজকে আমরা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে চলছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

'আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেছেন, তা তারা ছিন্ন করে।'[১৪৪]

এমনিভাবে ইখলাস মানুষের জন্য রিযিকের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। এজন্যই তো আমি এখন বলে থাকি, যখন খুলূসের (ইখলাস) কমতি থাকে না, তখন ফুলূসেরও (অর্থ) কমতি হয় না। ইখলাসের বদৌলতে এমন দিক এবং এমন জায়গা থেকে রিযিক আসে, মানুষ যার কল্পনাও করে না।

মঙ্গলময় ও বরকতময় আমল

উজুতে হায়াতের বরকত

এক হাদীছে হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– পরিপূর্ণরূপে উজু করো; হায়াত বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। যারা দীর্ঘায়ু হতে চান, বরকতময় জীবন পেতে চান, তারা যেন পরিপূর্ণরূপে উজু করুন, সর্বদা উজুর সাথে থাকার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করা হবে।

সালামের মধ্যে ঘরের বরকত

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করো, তখন তোমরা ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করো! এর ফলে ঘরে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে'। বর্তমানে কজন ভাই এমন আছেন, যারা মুচকি হাসির সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরবাসীকে সালাম করেন? আজ তো রুমে পিতা বসা থাকে, ছেলে সেখানে

---

১৪৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৭

এসে সালাম করে না। হয়তো পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, আব্বু! আপনি কেমন আছেন? কিন্তু সালাম করে না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম এত বেশি সালাম করতেন যে, বর্ণিত আছে, তারা একত্রে বসা আছেন, কেউ কোনো কাজের জন্য উঠে দেওয়ালের পেছনে যেতেন, তারপর ফিরে আসতেন, তখনও তারা সালাম বিনিময় করতেন।

তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেছেন– 'পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম করো'। তিনি আরও বলেন, 'সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও; তাহলে পুণ্যের আধিক্য দান করা হবে'। এই সুন্নাত আজকে বিদায় হতে চলেছে।

আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাশ্তের নামায পড়ো! আল্লাহওয়ালাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। তোমারা সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব

পাঁচটি কথা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছোটদের প্রতি দয়া করো, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো, তাহলে কেয়ামতের দিন আমার সঙ্গ দান করা হবে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের এর ওপর আমলা করার তাওফীক দান করুন। আমরা বড়দের সম্মান করব, ছোটদের আদর-সোহাগ করব, বিনিময়ে কী পাব? জান্নাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ। এটি কান্জুল উম্মাল কিতাবের হাদীছ।

পাঁচ ব্যক্তির যিম্মাদারি

অন্য এক হাদীছে হযরত মু'আয (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– পাঁচ প্রকার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিম্মাদারিতে থাকে। অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলা তাদের যিম্মাদার হন। যেমন সন্তানের যিম্মাদার তার পিতা, তেমনি পাঁচ প্রকার ব্যক্তি এমন আছেন, আল্লাহ তা'আলার যাদের যিম্মাদার। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, সেই আমল করা, যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদের যিম্মাদার হয়ে যাবেন।

১. আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ব্যক্তি : এক প্রকার তারা, যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হন, দীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় দেন,

আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। যারা দীনের দাওয়াতের কাজে বের হন, তারাও আল্লাহর রাস্তায়। যারা দীনী ইল্‌ম অর্জন করছে, তারাও আল্লাহর রাস্তায়। এভাবে দীনের বিভিন্ন শাখাগত কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলেই আল্লাহর রাস্তায় বিবেচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যিম্মাদার। আপনারাও নিজ-নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এখানে আসেন, নিজেদের সংশোধনের জন্য, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, কাজেই আপনারাও আল্লাহর রাস্তায় আছেন। এটি শয়তানের কোনো রাস্তা নয়। এটিও আল্লাহর রাস্তা। আল্লাহর রাস্তাকে কোনো একটি আমলের সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলা উচিৎ নয়। কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দীনের যাবতীয় আমলের সাথে যুক্ত সকলেই আল্লাহর রাস্তায় গণ্য।

২. রোগীর সেবক এবং পরিদর্শনকারী : দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি রোগীর সেবক ও পরিদর্শনকারী। হাদীছ শরীফে রোগীর সেবক ও পরিদর্শনকারীও আল্লাহর যিম্মাদারিতে থাকেন মর্মে বর্ণনা এসেছে। অথচ বস্তবতা হচ্ছে, কতিপয় ব্যক্তি নিজ পরিবারের রোগীদেরও খোঁজ রাখে না। স্ত্রী অসুস্থ; স্বামী কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। ছেলেমেয়ে অসুস্থ, তাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় না। পরিবারস্থ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে না। স্ত্রীকে এমনভাবে রাখে, যেমন কোনো সহায়হীন ব্যক্তি থাকে। আমাদের আকাবিরগণ সহায়হীনদের সহায় হতেন। স্মরণ রাখবেন, দুনিয়াতে কোনো সহায়হীনের সহায় হওয়ার উদ্দেশ্য হয়, হে আল্লাহ! আপনি সেদিন আমার সহায় হবেন, যেদিন আমার কোনো সহায় থাকবে না।

৩. সকাল-সন্ধা মসজিদে গমনকারী : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'যেব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহ তা'আলার যিম্মাদারিতে এসে যায়। একটি সময় ছিল, যখন আল্লাহর বান্দারা ফজরের নামায মসজিদে আদায় করত। তারপর ইশরাক পর্যন্ত মসজিদে বসেই আল্লাহর যিকির করত। আমাদের আকাবিরগণ দুই ঘুমের মাঝে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর বর্তমানের সূফী হযরতগণ ফজরের নামায দুই ঘুমের মাঝে আদায় করেন। অনেক কষ্টে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ফজরের নামায পড়েন এবং সালাম ফিরিয়েই আবার বিছানায় গা এলিয়ে দেন। অথচ এটি সকাল বেলা। অত্যন্ত বরকতময় সময় এটি। আমাদের পাঞ্জাবি ভাষায় একে نور پیر داویلہ বলা হয়। এর ব্যাখ্যা হলো, এ-সময় তারা পীর সাহেবের দেওয়া অজিফা আদায় করতেন। তখন তাদের ওপর আল্লাহর নূর বর্ষণ

হতো। তাই সেটা نور بيرداويله হতো। এ-সময় তারা এত বেশি তেলাওয়াত এবং যিকির করতেন যে, এই সময়ের নামই نور بيرداويله হয়ে গেছে।

৪. ইমাম সাহেবকে সাহায্য-সহযোগিতাকারী : চতুর্থ প্রকার ব্যক্তি যারা ইমাম সাহেবকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অর্থাৎ– মুসলিম উম্মাহর ইমাম তথা নেতৃত্বদানকারী, আলেম ও মসজিদের ইমাম যারা দীনের কাজ করেন, তাদেরকে দীনের কাজে সাহায্যকারীগণও আল্লাহর যিম্মায় চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও ওলামায়ে কেরামের সহযোগী ও ইজ্জতকারী বানিয়ে দিন।

আমাদের হযরত বলতেন, ওলামায়ে কেরামের প্রতি আমার এত মহব্বত, যদি আমি শুয়ে থাকি আর কোনো আলেম আমার বুকে পা রেখে অতিক্রম করেন, তাতেও আমার কোনো কষ্ট হয় না। আর বর্তমানে তো কিছু মানুষ আল্লাহর ওয়াস্তে আলেমদের সাথে শত্রুতা রাখে। অর্থাৎ– তারা আলোচনায় এরূপ বলে থাকে। নতুবা আমি তো বলব, শয়তানের কারণে শত্রুতা পোষণ করে, নফসের কারণে বৈরিতা পোষণ করে। তাদের কাছে ওলামায়ে কেরামও ভালো লাগে না, মাদরাসাও ভালো লাগে না।

৫. যারা কারও অমঙ্গল কামনা করে না : হাদীছে আছে, যেসব ব্যক্তি ঘরে বসে কারও অমঙ্গল কামনা করে না, তারাও আল্লাহর যিম্মাদারিতে এসে যায়। আজকে আমরা ঘরে বসে মানুষের গীবত করি। যারা গীবত করে, তারা মূলত অপরের অমঙ্গল প্রত্যাশা করে। এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, যারা গীবত থেকে বেঁচে থাকবে, তারা আল্লাহর যিম্মাদারিতে চলে আসবে।

গীবত থেকে বেঁচে থাকার সহজ উপায় হলো, হয়তো গীবতের মজলিস থেকে উঠে চলে যাবেন কিংবা সেই ব্যক্তির ভালো দিকগুলো উপস্থাপন করবেন। উদাহরণত, একব্যক্তি অন্য কারও সম্পর্কে বলল, 'অমুক তো বড়ই নির্বোধ'। শ্রবণকারী বলল, আমার থেকে কমই হবে। এতে আলোচনারই ইতি ঘটবে। সুতরাং আমাদেরও ভবিষ্যতে এরূপ বলা চাই। আমরা এরূপও বলতে পারি, যদিও তার মধ্যে এতসব মন্দ দিক রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে অনেক ভালো দিকও রেখে থাকবেন। আমরা এ-ও বলতে পারি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুর্বলতাও আছে, ভালোও আছে। আমরা নিজেরা যেন আগ বেড়ে কিছু না বলি। যদি এগুলো বলতে না পারি, তাহলে আমরা কোনো-না-কোনো বাহানা দিয়ে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাব। এভাবে যারা ঘরে বসে অপরের অকল্যাণ কামনা করে না, তারা আল্লাহ তা'আলার যিম্মাদারিতে চলে আসে।

পাঁচটি চোখের ওপর জাহান্নাম হারাম

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি চোখের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

১. আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত চোখ : যে-পাঁচটি চোখের ওপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো, যে-চোখ আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থাকে। যেকোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হবে এবং জাগ্রত থাকবে, মুজাহিদ হোক, তালিবে ইল্‌ম হোক, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা আল্লাহর ইবাদাতে বিনিদ্র রাত কাটান।

اس شب کی تلخیوں کا کوئی میرے دل سے پوچھے
تیری راہ تکتے تکتے مجھے صبح ہو گئی ہے

'সেই রজনীর তিক্ততা কেউ আমার অন্তরের কাছে জিজ্ঞাসা করল
আপনার রাস্তায় থাকতে থাকতে আমার সকাল হয়ে গেল।'

২. আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট হওয়া চোখ : দ্বিতীয় সেই চোখ, যা আল্লাহর রাস্তায় নষ্ট হয়। এমন চোখের ওপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। একদল মানুষ এমন আছেন, যারা আল্লাহর দীনের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেন।

ایک تیری ہی دوستی کے لئے
ساری دنیا سے دشمنی کرلی

'একমাত্র আপনার বন্ধুত্বের জন্য
সমগ্র বিশ্বের সাথে শত্রুতা করলাম।'

সমগ্র বিশ্ব তাদের শত্রুতে পরিণত হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিদের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা সেই চোখের ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

৩. আল্লাহর ভয়ে কান্নাকারী চোখ : তৃতীয় চোখের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যেব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আল্লাহর মহব্বতে ক্রন্দন করে এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরায়, তাদের চোখের ওপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে

দেন। আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর মহব্বতে ক্রন্দনের কারণে চোখ থেকে যে অশ্রু প্রবাহিত হয়, সেই অশ্রুবড় একটিা নেয়ামত। জনৈক ব্যক্তি খুব চমৎকার কবিতা বলেছেন–

اشک بہہ کر بھی کم نہیں ہوتے
آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے

'অশ্রু ঝরিয়েও কম হয় না
চোখ কত মর্যাদাবান হয়।'

আল্লাহু আকবার!

৪. বেগানা মহিলা থেকে নিবৃত্ত চোখ : চতুর্থ চোখ সম্পর্ক রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যে চোখ বেগানা তথা বেগানা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে নিবৃত্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সেই চোখের ওপরও জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। উক্ত সমাবেশে আমরা মনে-মনে দৃঢ় ওয়াদা করি যে, আমাদের দৃষ্টি কখনও কোনো বেগানা মহিলার প্রতি নিবদ্ধ হবে না, যাতে আল্লাহ আমাদের চোখকেও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

৫. আল্লাহওয়ালাদেরকে মহব্বতের সাথে অবলোকনকারী চোখ : পঞ্চম নাম্বারে যে চোখ মহব্বত ও আকীদা-বিশ্বাসের সাথে আল্লাহওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেই চোখের ওপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

পাঁচ কাজ দ্রুত সম্পাদন করো

আমাদের আকাবিরগণ বলেছেন, তাড়াহুড়া সাধারণত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু পাঁচটি কাজ এমন আছে, যা দ্রুত সম্পাদন করা অনেক ভালো।

১. সময় হলে বিলম্ব না করে নামায আদায় করে নেওয়া। অনেক মহিলা অভিযোগ করেন, নামাযে অলসতা এসে যায়। এর হেতু কী? শয়তান তাদের অন্তরে জাগিয়ে দেয়, এই কাজটি শেষ করে পড়ে নিচ্ছি। এটা খুবই মন্দ অভ্যাস। নামাযের সময় হওয়ার পর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নামায আগে পড়তে। অন্যান্য কাজ পরে করবেন।

২. দ্রুত তাওবা করা। তাওবা করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। যখনই কোনো দীনি মাহফিল দেখবেন, মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি পাবেন যখন আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়, তখন তাওবা করার মধ্যে তাড়াহুড়া করা চাই।

৩. মেহমানকে দ্রুত আপ্যায়ন করা। আমাদের আকাবিরগণ বলেছেন, কারও কাছে মেহমান এলে সে যদি সাথে-সাথে গ্লাস ভরে পানিও পরিবেশন করে, তাহলে মেহমানদারির হক আদায় হয়ে যাবে। এতটুকু তো সকলেই করতে সক্ষম।

৪. ঘরে কোনো মেয়ে যুবতি হলে তাকে দ্রুত বিয়ে দেওয়া। বর্তমানে এ কাজে অবহেলার দরুন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সমাজে অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা ছড়াচ্ছে। নির্লজ্জতা ব্যাপক আকার ধারণ করছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে তোমরা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

৫. জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত সমাহিত করা।

পাখির খাঁচা অথবা পশুর আস্তাবল

মানুষ যখন এই কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে, তখন তারা ভালো মানুষ হয়। পক্ষান্তরে যদি সম্পাদন না করে, তাহলে বিকৃত মানুষ হয়। এজন্য হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন–

هٰذِهِ الْأَجْسَادُ حَبْسٌ لِطُيُوْرٍ أَوْ إِصْطَبْلُ الدَّوَابِّ

'আমাদের এই দেহগুলো হয় পাখির খাঁচা নতুবা পশুর আস্তাবল।'

এর ভেতরে অবস্থানকারী যদি সৎ হয়, তাহলে সে জান্নাতি পাখি এবং এই দেহ তার জন্য পিঞ্জরা। যখনই মৃত্যুর সময় হবে এবং নির্দেশ হবে ارْجِعِيْ إِلٰى رَبِّكِ তুমি তোমার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তখনই পিঞ্জরা থেকে বের হয়ে উড়ে প্রভুর কাছে চলে যাবে এবং তাকে জান্নাতের পাখি বানিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি দেহের ভেতরে অবস্থানকারী মন্দ হয়, অসৎ হয়, তাহলে এই বিকৃত মানুষের দেহ তার জন্য পশুর আস্তাবল।

সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরা যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং উল্লিখিত আমলগুলো সময়মতো সম্পাদন করি, যাতে সৎ ও নেক জীবন যাপনকারীদের মধ্যে আমরাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

তাসাওউফ ও তরীকতের মেহনতের উদ্দেশ্য

আজকে অতীব প্রয়োজন নিজেকে সংশোধনের ভাবনায় লেগে যাওয়া। যে মেহনতের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই ভাবনা আসে এবং আত্মশুদ্ধির ব্যথা অনুভূত হয়, সেই মেহনতকে বর্তমানে তাসাওউফ বা তরীকত নামে স্মরণ করা হচ্ছে।

আমাদের মাশায়েখগণ বিভিন্ন শব্দে তাসাওউফের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। উপস্থিত আমার যা স্মরণ আছে, তা বর্ণনা করছি। সময় স্বল্প, তাই বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। নিজ-নিজ এলাকার ওলামায়ে কেরাম থেকে বিস্তারিত জেনে নেবেন। লক্ষ্য রাখবেন, তাসাওউফের সংজ্ঞা প্রদানের যোগ্যতা এবং হক তাদেরই আছে, যারা এর ওপর আমল করেন। কেননা, صَاحِبُ الْبَيْتِ اَدْرٰى بِمَا فِيْهَا ঘরের বাসিন্দা সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন ঘরে কী আছে?

আকাবিরগণের উক্তির আলোকে তাসাওউফ

আমাদের আকাবির হযরতগণ তাসাওউফের যে-শিক্ষা দিয়েছেন, তার কিঞ্চিত শুনুন! ওলামায়ে কেরাম যারা আছেন তারা খুব ভালোভাবে বুঝে নেবেন, ছাত্ররাও বুঝে নেবেন। সহজ আরবি। আর আমাদের মতো যারা সাধারণ মানুষ, তারা সুযোগ করে ওলামায়ে কেরাম থেকে-বুঝে নেবেন।

ইমাম আবুরহীম (রহ.) 'হিলয়াতুল আউলিয়া' কিতাবে লিখেছেন–

اَلتَّصَوُّفُ أَحْوَالُ الْقَاهِرَةِ وَأَخْلَاقُ الطَّاهِرَةِ.

'তাসাওউফ পরাক্রমশালীর অবস্থা ও নিষ্কলুষের চরিত্র।'

জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) বলেন–

اَلْخُرُوْجُ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ ظَرِيٍّ وَالدُّخُوْلُ فِيْ كُلِّ خُلُقٍ ثَنِيٍّ.

'সকল মন্দ চরিত্র থেকে বের হয়ে আসা এবং যাবতীয় প্রশংসনীয় চরিত্র অবলম্বন করার নাম তাসাওউফ।'

কেউ-কেউ বলেন–

تَفَرُّدُ الْعَبْدِ بِالصَّمَدِ الْفَرْدِ

'তাসাওউফ হলো, বান্দা এক আল্লাহর জন্য নিজেকে অন্য সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত করা।'

অর্থাৎ– তাওয়াক্কুল অবলম্বন করার নামা তাসাওউফ।

কেউ-কেউ বলেন–

طَلِيْقُ الدُّنْيَا وَالإِعْرَاضُ عَنِ الهَمِّ

'তাসাওউফ হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ত্যাগ করা এবং যাবতীয় পার্থিব অভিপ্রায় থেকে বিমুখ হওয়া।'

কোনো-কোনো শাইখ তাসাওউফ সম্পর্কে বলেছেন–

السُّكُوْنُ فِيْ الْمَصَائِبِ إِلَى الْحَبِيْبِ.

'সকল প্রতিকূলতা ও দুরবস্থায় আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার নাম তাসাওউফ।'

কেউ-কেউ বলেন–

وَقْفُ الْهَمِّ عَلَى مَوْلَى النِّعَمِ يَا ... فِيْ جَلَالِ الْقُرْبِ يَا مُوَافَقَةُ الْحَقِّ وَمُفَارَقَةُ الْخَلْقِ.

'সকল চিন্তাভাবনা আল্লাহর ওপর নিবদ্ধ করা, হকের পক্ষে ও হক পথে থাকা এবং সৃষ্টি থেকে দূরত্ব বজায় রাখাকে তাসাওউফ বলা হয়।'

কেউ-কেউ বলেন–

عَنْ مَرَاتِبِ الدُّنْيَا وَالْعُلُوُّ إِلَى الْمَكْتَبَةِ الْعُلْيَا.

'পার্থিব মর্যাদা থেকে বিমুখ হয়ে পরকালীন সুউচ্চ মর্যাদার দিকে ধাবিত হওয়াকে তাসাওউফ বলা হয়।'

কেউ-কেউ বলেন–

اَلْاِعْتِصَامُ بِالْحَقَائِقِ فِيْ اِخْتِلَافِ الطَّرَائِقِ.

'রাস্তা ও পদ্ধতির ভিন্নতায় হাকীকতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা।'

আবার কেউ-কেউ বলেন–

حَمْلُ النَّفْسِ عَلَى الشَّدَائِدِ

'নফসকে কষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ করা।'

কতিপয় মাশায়েখ বলেন–

اَلْإِسْلَامُ إِلَى مُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

'অন্তর পরিবর্তনকারীর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।'

কোনো-কোনো শাইখ বলেন–

رَغْبَةٌ إِلَى ... فِيْ دَرْكِ الْمَطْلُوْبِ.

'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা।'

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, তাসাওউফ হচ্ছে, বান্দার অবস্থা এরূপ হয়ে যাওয়া...

حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

'শেষ পর্যন্ত যখন পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তারা বুঝতে পারল, আল্লাহ থেকে কোনো আশ্রয়স্থল নেই, বরং সবকিছু থেকে একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছে আল্লাহ।'[১৪৫]

সেই অবস্থায় বান্দা উপলব্ধি করবে, আল্লাহ ব্যতীত আমার কোনো আশ্রয়স্থল ও মুক্তির জায়গা নেই। এরূপ অবস্থাকে তাসাওউফ বলা হয়।

এবার বলুন, এই তাসাওউফ অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত কিনা? কিছু মানুষ এমন আছে, যারা কারও আনুগত্য করে না। তারা বলেও থাকে, আমি কাউকে মানি না। আমি কাউকে মেনে চলতে পারব না। আমি নিজ খেয়াল-খুশি মোতাবেক চলা ব্যক্তি। তারা বলে থাকে, এই যে তাসাওউফ, এটা তো শরীয়তে নতুন উদ্ভাবিত বস্তু। মনে রাখবেন, তাসাওউফ নবউদ্ভাবিত কোনো বস্তু নয়। শরীয়তের ওপর অটল-অবিচল থেকে আমল করে যাওয়ার নামই তাসাওউফ। আর এর মাধ্যমেই বেলায়াতের (আল্লাহর নৈকট্য) নূর মানুষের ভাগ্যে জোটে।

বেলায়াতি (আল্লাহর অলি হওয়া) নূরের নিদর্শন

বেলায়াতের নূরের কিছু নির্দশন আছে। কতিপয় নিদর্শন তো বাহ্যত দেখা যায়। যেমন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর অলি কারা? জবাবে নবীজি বললেন–

اَلَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ

'যাদের দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে।'

সুতরাং কাউকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হওয়া আল্লাহর অলি হওয়ার নিদর্শন।

---

১৪৫. সূরা তাওবা : আয়াত ২৫

আমর ইবনে জামূহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– তারা আমার বান্দা ও বন্ধু, আমাকে স্মরণ করলে যাদের কথা স্মরণ হয় এবং তাদেরকে স্মরণ করলে আমার কথা স্মরণ হয়।

তদুপরি অলিদের বাহ্যিক কিছু নিদর্শনও আছে, যা ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন। যেমন–

প্রথম নিদর্শন : সারা দিন যিকির করেন। সারাক্ষণ আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকেন। হযরত আকদাস থানভী (রহ.) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন মুফতী শফী (রহ.) দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করে হযরতের খেদমতে ছিলেন। মুফতী শফী সাহেব হযরতের খাদেম ও মুরীদ ছিলেন। হযরত রাস্তায় এক জায়গায় থেমে পকেট থেকে কাগজ বের করলেন এবং তাতে কিছু লিখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ শফী! বুঝেছেন কী হয়েছে? শফী (রাহ.) বলেন, আমি আরজ করলাম, হযরত আপনিই বলে দিন। তখন তিনি বললেন, রাস্তায় চলাবস্থায় একটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় আমার অন্তরে উদয় হলো। আমি কাগজ বের করে সেটি লিখে সংরক্ষণ করে নিলাম, যাতে যখন লিখতে বসব, তখন এ নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা করতে পারি। তাই সেটি লিখে নিলাম এবং আমার অন্তরকে আল্লাহর স্মরণের জন্য অবসর করে নিলাম। আমাদের আকাবিরগণ আল্লাহর স্মরণের জন্য এমনভাবে নিজেদের অন্তরকে মুক্ত রাখতেন।

হযরত খাজা মাজযূব (রহ.) একবার কতিপয় দোস্ত-আহবাব নিয়ে বসা ছিলেন। এ-সময় তিনি লতীফা তথা চমকপ্রদ কথা শোনানো শুরু করেন। কম-বেশি এক ঘন্টা সবাইকে খুব হাসালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা ভাই! বলুন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি এক ঘন্টা হাসার পরও আল্লাহর স্মরণ থেকে বেখবর হননি? সকলেই হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, এই হাসাহাসির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ কীভাবে সম্ভব! তারপর তিনি বললেন, আমার অবস্থা এই ছিল যে, যদিও আমি এক ঘন্টা আপনাদের হাস্যরসের কথা শোনাতে থাকি, কিন্তু আমার অন্তর একটি মুহূর্তও আমার প্রভুর স্মরণ থেকে বেখবর হয়নি। এরূপ সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ আমাদেরও নসিব হোক। আমীন।

দ্বিতীয় নিদর্শন : অলিদের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, তাঁরা ফেতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকেন। তাই তাঁরা কখনও কারও সাথে বিতর্কে জড়ান না।

যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

'অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম।'[১৪৬]

অর্থাৎ– তাঁরা তাদের সালাম বলে প্রস্থান করেন। যদি কেউ বিতর্কে জড়ানোর চেষ্টাও করে, তবুও তাঁরা তাতে লিপ্ত হন না।

তৃতীয় নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বল্পেতুষ্টি দান করেন। আল্লাহ তা'আলার ভান্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন দেখুন, দেখবেন স্বল্পেতুষ্ট জীবন। একদা হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবু উবায়দা ইবনে জার্‌রাহ (রাযি.)কে দেখলেন, তিনি নিজে পানিতে রুটি ভিজিয়ে আহার করছেন। অথচ তিনি তখন প্রধান সেনাপতি।

চতুর্থ নিদর্শন : তাঁরা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন। স্মরণ রাখবেন, ইল্‌মবিহীন আমল রুগ্ন হয়। এজন্য ইল্‌মহীন আমলকে সাকীম তথা রুগ্ন বলা হয়। আর আমলবিহীন ইল্‌মকে 'আকীম' বলা হয়। আকীম বলা হয় বন্ধ্যাকে। অর্থাৎ যার সন্তান হয় না; তথা নিস্ফল ইল্‌ম। ইল্‌ম অনুযায়ী আমলকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সঠিক পথ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

পঞ্চম নিদর্শন : তাঁরা সৃষ্টির প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হন। সমগ্র বিশ্বের দরদ আমাদের অন্তরে বিরাজমান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরে এমন রহম-করম ও মারেফত ঢেলে দেন যে, এর বদৌলতে তাঁরা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে যান। আল্লাহু আকবার কাবীরা! তাই তো তাঁরা আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও করুণাশীল এবং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও করুণাশীল।

খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। একবার তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তে বিছানা ত্যাগ করেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল বিধায় নামায শেষ করে বিছানায় ফিরে আসেন। বিছানায় এসে দেখেন, একটা বিড়াল তাঁর লেপের মধ্যে ঢুকে শুয়ে আছে। তিনি বিড়ালটাকে বিছানা থেকে বের করা সমীচীন মনে করলেন না। তাই তিনি বিড়ালটার আরামের দিকে খেয়াল করে বিছানায় না শুয়ে জায়নামাযে বসে রাত কাটিয়ে দেন। তাঁর এই

---

১৪৬. সূরা ফুরকান : আয়াত ৬৩

আমলের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুরীদদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব দান করেছেন, যাঁকে মুজাদ্দিদে আলফেছানী বলা হয় থাকে।

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন বোখারি (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একবার একটি আহত কুকুর দেখতে পান। তিনি কুকুরটার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দেন। প্রতিদিন তিনি কিছু শ্রম বিক্রি করতেন। পারিশ্রমিক যা পেতেন তা পরিবারের লোকদের পেছনে ব্যয় করতেন এবং কিছু অংশ দিয়ে কুকুরটার জন্য খাদ্য নিয়ে যেতেন। আঠারো কিংবা বিশ দিন তিনি সেই কুকুরটার সেবা করেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই মর্যাদা দান করেন যে, তাঁকে সেলসেলার ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর জীবনীতে বর্ণিত আছে, একটা কুকুরের সেবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত উঁচু মাকাম দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি একটা জানোয়ারের সেবার বিনিময়ে এই মাকাম দান করতে পারেন, তাহলে আমরা যদি মানবজাতির সেবা করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কত উঁচু মাকাম দান করবেন?

ষষ্ঠ নিদর্শন : তাঁরা আল্লাহর হক, বান্দার হক সকল হক আদায়ে সবসময় সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহর হকসমূহও পূর্ণ করেন, বান্দার হকসমূহও পূর্ণ করেন।

হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি (রহ.) বলছিলেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে পূর্ণ কুরআনের সারনির্যাস এক বাক্যে বলতে বলেন, তাহলে আমি তা বলতে সক্ষম। জনৈক ব্যক্তি বলল, বলুন হযরত! তখন তিনি বললেন, এক বাক্যে পূর্ণ কুরআনে কারীমের সারনির্যাস হলো, 'ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করো, আনুগত্যের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করো এবং সেবা দানের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টজীবকে সন্তুষ্ট করে নাও! এই হচ্ছে পূর্ণ কুরআনে কারীমের এক বাক্যে সারনির্যাস।

সপ্তম নিদর্শন : তাঁদের সপ্তম নিদর্শন হচ্ছে, তাঁরা বাহ্যিকভাবে নমনীয় এবং পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ও শান্ত প্রকৃতির হয়। আপনারা কখনও তাঁদের অস্থির দেখতে পাবেন না, অহংকারী দেখতে পাবেন না। তাঁরা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিরচিত্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ব্যাকুলতা থাকে না। স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তার সাথে অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার আর কোনো সংস্পর্শ হয় না। তাঁদের মধ্যে নমনীয়তা থাকে। তাঁদের অন্তর

অবনত হয়। আজকাল মানুষ দেহ অবনত করে, তাদের অন্তর অবনত হয় না। দুনিয়াতে যাদের অন্তর আল্লাহর সামনে অবনত না হবে, কেয়ামতের দিন যখন সেজদা করার নির্দেশ করা হবে, তখন তাদের সেজদা করার তাওফীক হবে না। কেননা, দুনিয়াতে তাদের অন্তর আল্লাহর সামনে নত হয়নি।

অষ্টম নিদর্শন : তাঁদের অষ্টম নিদর্শন হলো, তাঁরা মানুষের কাছে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। মানুষের মাঝে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী ও বিধানাবলির তাবলীগের কাজে তাঁরা ব্যস্ত থাকেন। আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহমুখী করার চেষ্টা করেন।

তাই তো ইরানের বাদশাহ ও সেনাপতি রুস্তমের সামনে রবী' ইবনে আমের (রাযি.) তাঁদের ইরান আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন'। কথাগুলোর ওপর একটু চিন্তা করুন! একজন সাহাবী তাঁদের ইরান আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন। উক্ত বর্ণনায় তিনি কেমন একটি বাক্য বলেছেন! বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমরা এ জগতে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। তাই তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি যাকে চান তাকে আমরা বান্দার গোলামির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগিতে নিয়ে আসি। মানুষের পূজা থেকে বের করে মানুষের প্রতিপালকের উপাসনায় অন্তর্ভুক্ত করে দিই। ইহজগতের সংকীর্ণতা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে ইহজগতের প্রশস্তায় পৌঁছিয়ে দিই। মানবরচিত ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আনয়ন করি।

নবম নিদর্শন : নবম নিদর্শন হলো, তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকে। নিজেদের সকল বিষয়াদি তাঁরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেন। শিশু যেমনিভাবে নিজের সমস্যা মাতাপিতাকে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, তেমনিভাবে তাঁরা তাঁদের যাবতীয় বিষয়াদি আপন প্রতিপালকের সামনে উপস্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

দশন নিদর্শন : দশম নিদর্শন হলো, আল্লাহর মহব্বত-ভালোবাসার মধ্যেই তাঁরা জীবন যাপন করেন এবং আল্লাহর মহব্বত-ভালোবাসার মধ্যেই তাঁরা ইহজগত থেকে বিদায় নেন। আল্লাহর মহব্বত-ভালোবাসা যার নসিব

হয়, তিনি আল্লাহর স্মরণে, আল্লাহর কাজে নিজের মূল্যবান সময় অবলীলায় ব্যয় করেন। বর্তমানে তো দৈনিক কুরআন মাজীদের এক পারা তেলাওয়াতের তাওফীক হয় না, কুরআনে কারীমের সাথে সময় কাটানোর তাওফীক হয় না। লক্ষ্য করুন, এটা আমাদের অন্তরের জুলমত বা অন্ধকারের দলিল। কুরআন মাজীদের সাথে বেশি থেকে বেশি সময় কাটাবেন। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের পেছনে সময় ব্যয় করুন।

একটা বিষয় উপস্থাপন করছি; মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একটু বোঝার চেষ্টা করুন। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সম্পর্ক ছিল এমন যে, তিনি ثَانِيَ اثْنَيْنِ তথা দুজনের মধ্যে দ্বিতীয়জন হয়েছিলেন। এজন্য সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোড়া বা দ্বিতীয় বলা হতো। তিনি আমাদের এই সেলসেলার ইমাম। তিনি সাহেবে কুরআন তথা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোড়া বা দ্বিতীয় হয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ, আমরা যেন কুরআনে কারীমের জোড়া হয়ে যাই। কুরআন মাজীদের সাথে এত সময় ব্যয় করি, যেন লোকজন বলে, এ তো কুরআন মাজীদের জোড়া বা দ্বিতীয় হয়ে গেছে। এভাবে আমরা যখন কুরআন মাজীদের বেশি-বেশি তেলাওয়াত করব, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করব, তখন আল্লাহ তা'আলার মহব্বতময় জীবন আমাদের নসিব হবে।

মানছুর হাল্লাজ ও ফেরাউনের মাঝে পার্থক্য

ছাত্রদের জন্য একটি প্রশ্ন ও এর সুন্দর উত্তর। ফেরাউন বলেছিল, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমি তোমাদের বড় প্রভু)। এর মাধ্যমে সে অভিশপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে মানছুর হাল্লাজের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়েছিল, اَنَا الْحَقُّ (আমি হক তথা আল্লাহ)। কিন্তু আমাদের মাশায়েখগণ বলছেন, তিনি বড় অলি ছিলেন। কেননা, তাঁর জবান থেকে কোনো এক বিশেষ অবস্থায় এই উক্তি বের হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত তিনি আল্লাহর মাকবুল বান্দা ছিলেন। ভাইসব! এর পেছনে রহস্য কী? ওদিকে ফেরাউন থেকেও اَنَا (আমি) শব্দ বের হলো। এদিকে মানছুর হাল্লাজ থেকেও اَنَا (আমি) শব্দ বের হলো। কিন্তু ফেরাউন হলো অভিশপ্ত আর মানছুর হাল্লাজ হলেন আল্লাহর মাকবুল বান্দা। এখানে কী কারণে পার্থক্য হলো স্বাভাবিকভাবে তা বুঝে আসে না। আমাদের

মাশায়েখগণ এর রসহ্য উন্মোচন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ফেরাউন অভিশপ্ত হয়েছে এজন্য যে, সে اَنَا (আমি) বলেছিল আল্লাহকে মিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক)। আর মানছুর হাল্লাজ মাকবুল হয়েছেন এজন্য যে, তিনি اَنَا (আমি) বলেছিলেন, নিজেকে মিটানোর উদ্দেশ্যে। সুতরাং যেহেতু তিনি নিজেকে মিটানোর জন্য اَنَا (আমি) বলেছিলেন, তাই তিনি আল্লাহর কাছে মাকবুল হয়ে গেলেন।

জীবনধারা সোজা করা চাই

একটি বিষয় মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এক ট্রেনে দুই তিন বন্ধু বসা। সবারই বেপরোয়া জীবন। চেহারা সম্পূর্ণ মুণ্ডানো। অবয়বে সুন্নাতের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই। একজন মাওলানা সাহেব তাদের পাশে এসে বসলেন। সম্পূর্ণ সুন্নাতি অবয়ববিশিষ্ট। হাতে একটি ইংরেজি পত্রিকা। বসেই তিনি ইংরেজি পত্রিকা পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু তিনি পত্রিকাটি উল্টা ধরেছিলেন। এবার যখন তিন বন্ধু দেখল, মাওলানা সাহেব উল্টো ধরে ইংরেজি পত্রিকা পড়তে চাচ্ছেন, তখন তারা হাসতে শুরু করল, একেবারে অট্টহাসি। মাওলানা সাহেব কিছুক্ষণ তাদের হাসি শুনলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! খুব ভালো, তো আপনারা কী কারণে এত হাসছেন এবং হাসি উড়াচ্ছেন? তারা জবাবে বলল, মাওলানা সাহেব! মনে হচ্ছে আপনার ইংরেজির কোনো জ্ঞান নেই। তারপরও মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে বসেছেন। অথচ আপনার এতটুকু জ্ঞানও নেই যে, আপনি পত্রিকা উল্টো ধরে আছেন! তখন মাওলানা সাহেব বললেন, আচ্ছা! আমি পত্রিকা উল্টো করে ধরেছি। তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি পত্রিকা উল্টো ধরেছেন।

এবার মাওলানা সাহেব বলতে শুরু করেন, দেখুন, আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য এমনটি করেছি। নতুবা আমি এল এল বি করেছি। আমি একজন উকিল। ইংরেজি বলি, ইংরেজি পড়ি। আমার জানা আছে ইংরেজি পত্রিকা কীভাবে পড়তে হয়। কিন্তু আমি আপনাদের উপদেশদানের উদ্দেশ্যে পত্রিকা উল্টো ধরেছি। আমার উল্টো পত্রিকা ধরা দেখে আপনারা হাসিতে ভেঙে পড়লেন যে, আমি কীভাবে পত্রিকা ধরেছি! দেখুন, আমি পত্রিকা উল্টো ধরেছি, তা দেখে আপনারা আমাকে নিয়ে হাসি তামাশায় মেতে উঠেছেন। প্রিয় বন্ধুগণ! যখন আপনারা আপন জীবনধারার মাথা উল্টো ধরে আছেন।

মানুষের জীবন ধারা তো চাই, যা করলে পরজগতে সফলতা অর্জিত হবে। আর আপনারা এই ইহজগতেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার পেছনে মত্ত হয়ে আছেন। সুতরাং আপনারাও তো জীবনধারার মাথা উল্টো ধরেছেন। কাজেই আপনাদেরর ওপরও হাসাহাসি করা চাই। আমি তো ছোট একটি ত্রুটি বা ক্ষতি করেছি, পত্রিকা উল্টো ধরেছি। পক্ষান্তরে আপনারা পূর্ণ জীবনের মাথা উল্টো ধরে আছেন। এতদশ্রবণে যুবকদের উপলব্ধি হলো, ইনি তো বড় শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি আমাদের বিষয়টি বোঝানোর জন্য ইচ্ছে করেই এমন করেছেন।

আমরা যদি আমাদের ওপর চিন্তা করি, তাহলে আমাদেরও উপলব্ধি হবে যে, আমরা আমাদের জীবনধারা উপুড় করে ধরে আছি। সোজা মাথা হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহর পছন্দ মোতাবেক জীবন যাপন করা। আর উপুড় মাথা হচ্ছে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় এজন্য মনচাহী জীবন যাপন করা। এরূপ তো নয় যে, আমাদের অবস্থায়ও ট্রেনের সেই তিন মুসাফিরের মতো এবং আমরা জীবনধারা উপুড় করে ধরে আছি? যদি উপুড় করে ধরে থাকি, তাহলে আজকের এই মাহফিলে আমরা সত্যিকারের তাওবা করে জীবনধারা সোজা করার চেষ্টা করি। মনচাহী জীবন পরিত্যাগ করে রবচাহী জীবন যাপন করার চেষ্টা করি এবং এর পাকাপোক্ত নিয়ত করি।

এজতেমার জন্য দিকনির্দেশনা

আপনারা উক্ত এজতেমায় নিজেদের কিছু সময় নিয়ে এসেছেন। এখন এ-সময়টাকে মূল্যবান বানানো চাই। আর এজন্য কতিপয় বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি।

যিকির ও ফিকিরে সময় ব্যয় করবেন : এক তো হলো, নিজের সময় যিকির ও ফিকিরে ব্যয় করবেন। উদাসীনতায়, পরস্পর গল্পগুজবে সময় নষ্ট করবেন না। সম্পূর্ণ সময় আল্লাহর যিকির ও দীনের ফিকিরে ব্যয় করার চেষ্টা করবেন, যেন একটা মুহূর্তও আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্তর উদাসীন না হয়।

পরিপূর্ণ ধীরস্থিরতার সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করবেন : দ্বিতীয় বিষয় হলো, উক্ত এজতেমায় থাকাকালীন সবগুলো নামায পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও ধীরস্থিরতার সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক নামাযের সময় এই নিয়ত করবেন যে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে এখানে পৌঁছিয়েছেন, এখন আমি পূর্ণ একাগ্রতা ও ধীরস্থিরতার সাথে আপনার সামনে কয়েক রাকাত নামায আদায় করছি। তাড়াহুড়ার নামায পড়বেন না। প্রত্যেক নামাযের জন্য

সময়ের পূর্বেই উজু করে নেবেন। সুন্নাত পড়বেন, ফরজ পড়বেন। আরও অতিরিক্ত নফলও অত্যন্ত খুশূ-খুজুর সাথে আদায় করবেন। অন্তকরণে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমাকে এখানে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে নামায আদায় করতে হবে। এমনিভাবে মহিলাহণও তেমন নামায পড়ার চেষ্টা করুন। বাসাবাড়িতে তো সন্তানাদির বিষয় থাকে, পারিবারিক ঝামেলা থাকে, তাই মানুষ তাড়াহুড়া আর ছোটাছুটির নামায পড়ে। না, এটা করা যাবে না। এখানে নর-নারী সকলেই একাগ্রচিত্তে ধীরস্থির নামায পড়বেন। সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই যে, আমাকে এক মিনিটে বা দুই মিনিটে নামায শেষ করতে হবে। আপনারা নামাযে পনেরো মিনিটও ব্যয় করতে পারেন, আধা ঘন্টাও ব্যয় করতে পারেন।

তাহাজ্জুদের পাবন্দি করবেন : তৃতীয় কাজ হচ্ছে, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করার চেষ্টা করবেন। যদি বাসাবাড়িতে তাহাজ্জুদ নামাযে যত্নবান হওয়ার সৌভাগ্য না হয়, তাহলে এখানে যে কদিন থাকবেন, কমপক্ষে এ কদিন তো তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে পারেন। শয়তান চেষ্টা করবে, আপনারা যেন ঈশার পর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জাগ্রত থাকেন। যদি তাই করেন, তাহলে যখন বিছানায় শোবেনই রাত একটা বাজে, তখন তিনটা বাজে জাগ্রত হয়ে কে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে? অবশ্য যাকে আল্লাহ চান তিনি পারবেন। সুতরাং এজতেমার এই দিনগুলোতে নির্দিষ্ট সময় ঘুমিয়ে যাবেন এবং জাগ্রত হওয়ার সময় জাগ্রত হবেন। ঈশার পর বিলম্ব না করে ঘুমিয়ে যাবেন, ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হওয়ার তাওফীক নসিব হবে।

খাঁটি তাওবা করবেন : আরেকটি আমল এই করবেন যে, এই মাহফিলে যখন দু'আ করা হবে, তখন খাঁটি তাওবার নিয়ত নিয়ে দু'আ করবেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেন এবং ভবিষ্যতে পরহেযগারি ও সৎ জীবন যাপন করার তাওফীক দান করেন। পরস্পর কথা বলার ইচ্ছে হলে এই সেই গল্পগুজব না করে, যা বয়ান হয়, তা মুযাকারা তথা পর্যালোচনা করবেন। পর্যালোচনা এভাবে করবেন যে, বয়ানের মধ্যে একথাটি আমার এরূপ বুঝে এসেছে। ওই কথাটি আমার এরূপ স্মরণ আছে। এ থাটি আমার এত ভালো লেগেছে যে, আমাকে এর ওপর আমল করতে হবে। এভাবে বয়ানের পর্যালোচনাকে পারস্পরিক কথোপকথনের বিষয় বানিয়ে নেবেন।

কতিপয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন

খানা খাওয়ার সময় বিশৃঙ্খলা, হইহুল্লোড় আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। আপনারা যদি এখানে কিছু পাওয়ার আশায় এসে থাকেন, তাহলে খানা খাওয়ার পেছনে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না। আলহামদু লিল্লাহ! পর্যাপ্ত খাবার তৈরি করা হয়, আপনারা যত খুশি পেট ভরে খাবেন। খাবারের কোনো স্বল্পতা নেই। আল্লাহর ফজল ও করমে এত পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা আছে যে, সকলেই যত ইচ্ছে পেট ভরে খেতে পারবেন; ইনশাআল্লাহ খাবার শেষ হবে না। শোরগোল কেন? সামান্য সময়ের ব্যাপার। যদি জায়গার স্বল্পতার কারণে সকলে একসাথে বসে খেতে না পারেন, তাহলে একদল দ্বিতীয় ধাপে খাবেন। এজন্য সামান্য সময় ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করবেন। নিজ-নিজ এলাকার ওলামায়ে কেরামকে প্রাধান্য দেবেন। অপর ভাইকে প্রাধান্য দেবেন। তাদের আগে আহারের সুযোগ করে দেবেন এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলবেন। আমরা বিশেষভাবে খলীফাদের সমীপে আরজ করছি, তাঁরা যেন নিজ-নিজ এলাকার লোকদের সুশৃঙ্খলভাবে খানা খেতে বসিয়ে দেন এবং তাদের মধ্যে কেউ যেন শোরগোল ও বিশৃঙ্খলার কারণ না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করুন।

বয়ানের সময় শোওয়া থেকে বিরত থাকবেন। বাজার ও দোকানপাটে যাওয়া পরিহার করবেন। প্রত্যেক কাজ তার নির্দিষ্ট সময়ে ভালো দেখায়। মসজিদের আমল শেষ হলে সুযোগ পাওয়া যাবে, তখন আপনারা শুয়ে বিশ্রাম নেবেন, বাজারে যাবেন কিংবা ব্যক্তিগত অন্য কোনো কাজ থাকলে তা সম্পন্ন করে নেবেন। এই অনুমতি আপনাদের জন্য রয়েছে। তবে এরূপ হতে পারবে না যে, এদিকে বয়ান হচ্ছে, অন্যদিকে তখন আপনারা বাজারে বসে বিরানি খাচ্ছেন। সময়ের কাজ সময়ে করবেন। যেহেতু আপনারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, কাজেই উক্ত মাহফিলের নূর ও বরকত আপনাদের ভাগ্যে অবশ্যই নসিব হবে।

আল্লাহ তা'আলা কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করেন না

নিয়মনীতি মেনে চলবেন তো ইনশাআল্লাহ রিক্তহস্তে ফিরবেন না। আজকের অবস্থা নোট করে নিন। তারপর দু'আ শেষে যখন এখান থেকে বিদায় নেবেন, তখনকার অবস্থা অবলোকন করুন, দেখবেন আপনাদের অন্তর সাক্ষ দেবে, পর্বতসম গুনাহের বোঝা এখানে রেখে নেকির নূর অন্তরে ধারণ করে প্রত্যাবর্তন করছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কারও শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করেন না। বরং পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন–

إِنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না।'[১৪৭]

কবুলিয়াত (কবুল হওয়া) বড় নেয়ামত

তাহাজ্জুদ নামাযের পর কয়েকটি দু'আ অবশ্যই করবেন। একটি দু'আ তো করবেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের আমলগুলো কবুল করে নিন, আমাদের এখানে আগমনকে কবুল করে নিন! এই কবুল অনেক বড় নেয়ামত।

জনৈক ব্যক্তির একটি হাবশি গোলাম ছিল। গোলামটিকে তিনি খুব মহব্বত করতেন। এজন্য গোলামটির মূল নাম তো ছিল আবীদ। কিন্তু তিনি তার নাম রেখেছিলেন ইউসুফ। এরই নাম মহব্বত। গোলাম হলো হাবশি কৃষ্ণ আর মনিব তার নাম রেখেছেন ইউসুফ। এ সম্পর্কে জনৈক কবি একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন:–

قبولیت اسکو کہتے ہیں اور مقبولی ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا لقب ہے یوسف ثانی

'একেই বলে কবুলিয়াত এবং কবুল এভাবেই হয়,
কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের উপাধি হলো দ্বিতীয় ইউসুফ।'

মনিব কৃষ্ণাঙ্গ গোলামকে দ্বিতীয় ইউসুফ বলতেন। তো ভাই! মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপনের পর মানুষ কৃষ্ণাঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাও যদি আমাদের কবুল করে নেন, তাহলে গুনাহের কারণে আমাদের মধ্যে যে কৃষ্ণতা গাঢ় আকার ধারণ করেছে, তা মুছে যাবে এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে আমরাও ইউসুফ হয়ে যাব। যদিও নিজেদের কৃত অপকর্মের কারণে আমাদের কৃষ্ণতা ছেয়ে আছে, ভেতরেও কালো আর কালো, চেহারাতেও কৃতকর্মের কালো ছাপ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কবুল করে নেন, তাহলে অবশ্যই-অবশ্যই সকল কৃষ্ণতা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে আমরা ইউসুফ হয়ে যাব।

---

১৪৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫

কবুলিয়াতের জন্য দু'আ করবেন

আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দু'আ করা চাই। দু'আ করবেন, ইয়া আল্লাহ! আমাদের এমন বানিয়ে দিন, যেন আমরা আপনার কাছে পছন্দের পাত্র হয়ে যাই। আল্লাহু আকবার! তাহাজ্জুদের সময় উঠে যখন কেঁদে-কেঁদে এই দু'আ করবেন, তখন দেখবেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত কীভাবে বেষ্টন করে নেয়।

میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر
اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے
عاصی کی صدا پہ جو مانگنے والا ہو
ہاتھ اپنی حقیقت کے, آگے میرے پھیلائے
جو رزق کا طالب ہو, میں رزق اسے دوں گا
جو طالب جنت ہو, جنت کی طلب لائے
جس جس کو گناہوں سے, بخشش کی تمنا ہو
وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گبرائے
وہ مائل توبہ ہو, میں مائل بخشش ہوں
میں رحم سے بخشوں گا, وہ شرم سے پچھتائے
یہ سن کر ہوئے جاری, آنکھوں سے میرے آنسو
قسمت ہے محبت مین رونا جسے آجائے
آقائے گدا پرور, سائل ہوں تیرے در کا
میں اور تو کیا مانگوں, تو ہی مجھے مل جائے

'আমি নূরের ঊষাকালে যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হই,
আল্লাহর রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত পাই।
(আল্লাহ বলেন) গুনাহগারের স্বরে যারা প্রার্থনাকারী,
তার স্বীয় হাত আমার সামনে প্রসারিত করো।

যে রিযিকের প্রত্যাশী, আমি তাকে রিযিক দান করব
যে জান্নাতের প্রত্যাশী, জান্নাতের আবেদন নিয়ে আসো!
যারা তাদের গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী,
তারা নিজেদের গুনাহের আধিক্যে বিচলিত হবে না,
তারা তাওবামুখী হলে আমি ক্ষমা করে দেব।
আমি স্বীয় অনুকম্পায় ক্ষমা করব, তারা লজ্জায় অনুতপ্ত হবে।
এতদশ্রবণে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে প্রবাহ হলো অশ্রুধারা
সৌভাগ্য তার মহব্বতে ক্রন্দন আসে যার,
ভিখারির মনিব, প্রতিপালক! ভিখারি আমি তোমার দরজার
আমি আর কী প্রার্থনা করব, আপনিই আমার হয়ে যান!'

হায়, এমন যদি হয়! এই দিনগুলোতে আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের কবুল করে নেন এবং তাঁর সম্পর্ক আমাদের নসিব করেন! সুতরাং মনে-মনে এই নিয়ত করে নিন যে, আয় আল্লাহ! আমরা এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো, যেন আমাদের আত্মশুদ্ধি হয়ে যায়, আমরা নেককার হয়ে যাই। হে মহান আল্লাহ! আপনার নেককার বান্দাদের মজলিসে এসেছি যেন আপনি আমাকেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কুরআন মজীদের আয়াত আমাদের এই নিয়তের বর্ণনা করছে এভাবে, যা সাহাবায়ে কেরামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তাঁরা দু'আ করতেন–

وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ

'আমরা কামনা করছি আমাদের প্রভু যেন আমাদের সৎকর্মপরায়ণশীল লোকদের দলভুক্ত করে নেন।'[১৪৮]

আমরাও এরূপ মনোবাসনা পোষণ করি। আল্লাহর সমীপে নিবেদন করি, হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, নিজেরা তো নেককার হতে পারিনি, আপনার নেককার বান্দাদের মজলিসে এসে বসেছি। অন্তরের বাসনা হলো, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরও নেককারদের দলভুক্ত করে নিন। আমরা তাঁদের দলভুক্ত হয়েই বাঁচতে চাই, তাঁদের মধ্যে থেকেই মৃত্যু বরণ করতে চাই এবং কেয়ামতের দিন তাঁদের দলভুক্ত হয়েই পুনরুত্থিত হতে চাই। হে মহান প্রভু! আমাদের এই দু'আ কবুল করুন এবং আমাদেরকে নেককারদের মধ্যে গণ্য করে নিন।

---

১৪৮. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৩

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ

لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

'আমি নেককারদের মহব্বত করি। কিন্তু আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা নেককার হওয়ার তাওফীক দান করবেন।'

আমি আশাবাদী, আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই উপস্থিতিকে কবুল করে নিশ্চয়ই আমাদের নেককারদের দলভুক্ত করে নেবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সংশোধন করে দিন!

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

নেক কাজ ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলাফল

'আমলের মধ্যে শক্তি-ক্রিয়া রয়েছে। এটি আল্লাহর ওয়াদা। যেমন– বস্তুজগতের ক্রিয়া রয়েছে। আমরা দেখে থাকি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে মানুষ মারা যায়। এজন্য বিদ্যুতের খোলা তার কেউ স্পর্শ করে না। বিষ পান করলে মানুষের মৃত্যু অবধারিত। সকলেই বিষাক্ত বস্তু-সামগ্রি থেকে দূরে থাকে। এমনিভাবে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নেক কাজ করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ আসবে আর গুনাহ করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব-গজব আসবে, তাহলে কোনো ব্যক্তিই গুনাহের কাজে অগ্রসর হবে না; বরং সকলেই নিজেদের সমস্ত জীবন সৎকাজে ব্যয় করবে।'

নেক কাজ ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ফলাফল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

মানুষের কামনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً

'যে কেউ নেক কাজ করবে পুরুষ হোক বা নারী, এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, আমি অবশ্যই-অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'

উক্ত আয়াতে ঈমান ও নেক কাজের সাথে পবিত্র জীবন লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পবিত্র জীবন কামনা করে। মানুষের সেই কাঙ্ক্ষিত পবিত্র জীবন পাওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সৎকর্ম কর, জীবনকে সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত কর, তাহলে বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের পবিত্র জীবন দান করবেন।

আমলের ক্রিয়া

আল্লাহ আমলের মধ্যে শক্তি রেখেছেন, ক্রিয়া রেখেছেন। প্রত্যেক আমলেরই কিছু ফলাফল এবং ক্রিয়া আছে, যা মানুষ লাভ করে থাকে।

নামায ও সফলতা

তাই তো যারা খুশুখুজুর সাথে যথাযথভাবে নামায আদায় করে, তাদের জন্য সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○

'নিশ্চয়ই সেসব মুমিন সফলকাম, যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।'[১৪৯]

আয়াতে قَدْ اَفْلَحَ বলা হয়েছে, যার অর্থ হলো, ফালাহ (সফলতা) লাভ করেছে। আর ফালাহ এমন সফলতাকে বলা হয়, যার পরে আর কোনো ব্যর্থতা নেই। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এমন মান-মর্যাদা লাভ, যার পরে আর লাঞ্ছনা-বঞ্চণা নেই। এই নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা খুশুখুজুর সাথে ভালোভাবে নামায আদাকারীদের প্রদান করেন।

যিকির ও অন্তরের প্রশান্তি লাভ

যিকির করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তর প্রশান্তি লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ○

'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'[১৫০]

نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

'দুনিয়া দ্বারা হয় না, ধনদৌলত দ্বারা হয় না, পরিবার-পরিজন দ্বারা হয় না; অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় আল্লাহর যিকির করার দ্বারা।'

সুতরাং আল্লাহর যিকির ও স্মরণ দ্বারা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আসে, স্থিরতা আসে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন।

রোযা ও তাকওয়া

রোযা রাখলে মানুষের ভাগ্যে তাকওয়া নসিব হয়। আর তাকওয়া লাভ হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য বরকত ও প্রাচুর্যের দরজাসমূহ

---

১৪৯. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২
১৫০. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাই তো রোযা ফরজ করার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।'[১৫১]

অপর দিকে তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ○

'যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের ওপর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[১৫২]

প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবাসনা হচ্ছে বরকত লাভ করা। সুস্থতায় বরকত, সময়ের মধ্যে বরকত, রিযিকে বরকত, সন্তানসন্ততিতে বরকত, দীনদারিতের বরকত, কাজে বরকত এভাবে সব কিছুতে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত প্রত্যাশা করি। আমরা যদি তাকওয়াপূর্ণ জীবন ধারণ করি, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন, তাহলে আমি তোমাদের ওপর সমস্ত বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেব।

হজ ও ক্ষমা

হজ করলে মানুষের জন্য ক্ষমা ও রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততার ওয়াদা রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ

'তোমরা বারবার হজ এবং ওমরা করো। কেননা, বারবার হজ ও ওমরা করার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দারিদ্র্য ও গুনাহ থেকে মুক্তি দান করেন। তো এর মাধ্যমে মানুষ ক্ষমাও পেল এবং তার রিযিকও বৃদ্ধি পেল।

---

১৫১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩

১৫২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

আমলী শক্তির বিশ্বাস

আমলের মধ্যে শক্তি-ক্রিয়া রয়েছে। এটি আল্লাহর ওয়াদা। যেমন– বস্তুজগতের ক্রিয়া রয়েছে। আমরা দেখে থাকি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে মানুষ মারা যায়। এজন্য বিদ্যুতের খোলা তার কেউ স্পর্শ করে না। বিষ পান করলে মানুষের মৃত্যু অবধারিত। সকলেই বিষাক্ত বস্তু-সামগ্রি থেকে দূরে থাকে। এমনিভাবে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, নেক কাজ করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ আসবে আর গুনাহ করলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব-গজব আসবে, তাহলে কোনো ব্যক্তিই গুনাহের কাজে অগ্রসর হবে না; বরং সকলেই নিজেদের সমস্ত জীবন সৎকাজে ব্যয় করবে।

সঠিক আমল এবং বিকৃত আমলের ফল

দুই ব্যক্তি একই কাজ করেন। একজনের কাজ সঠিক, তিনি কৃতকার্য হলেন। অপরজনের কাজ বিকৃত, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হলো। একটু চিন্তা করুন। ভালোভাবে নামায আদায়ের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○

'নিশ্চয়ই সেসব মুমিন সফলকাম, যারা তাদের নামাযে বিনয়ী-নম্র।'[১৫৩]

সুতরাং যারা সফলকাম, তারা জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের নামায বিকৃত করে, তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سٰهُوْنَ ○

'ধ্বংস সেসব নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন।'[১৫৪]

একই নামায; সঠিকভাবে আদায়কারীগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হলো। আর নামায সম্পর্কে উদাসীন ও বিনষ্টকারীদের জন্য জাহান্নামের কথা বলে দেওয়া হলো।

এমনিভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ।

---

১৫৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২
১৫৪. সূরা মাউন : আয়াত ১, ২

যারা কুরআনে কারীমের হাফেয, তাদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হবে–

اِقْرَأْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا

'কুরআন পড়ো এবং প্রতি আয়াত পড়ে জান্নাতি বালাখানার এক একটি ওপর তলায় উঠো; তারতীলের সাথে পড়ো যেভাবে তুমি দুনিয়াতে পড়তে! তো হাফেযে কুরআন জান্নাতে গেল কুরআনে কারীমের উসিলায়। এবার জান্নাতে তাকে ফেরেশতাগণও সালাম দিচ্ছে, অন্য জান্নাতিরাও সালাম দিচ্ছে। পরস্পর একে ওপরের ওপর শান্তি বর্ষণের দু'আ করছে। পক্ষান্তরে যারা এই কুরআন মাজীদকেই উল্টা-পাল্টা করে পড়ল, তাদের ব্যাপারে হাদীছ শরীফে ধমকি এসেছে–

رُبَّ قَارِئٍ قَرَءَ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

'অনেক কুরআন পাঠক কুরআন পড়ে; অথচ কুরআন তাকে অভিসম্পাত করে।'

সুতরাং একই আমল, সঠিকভাবে পালন করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হচ্ছে আর গড়বড় করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব-গজব আসছে। মানুষকে যখন আমল করতেই হবে, তাহলে কেন সঠিকভাবে করবে না? কেন উৎকৃষ্টমানের করতে চেষ্টা করবে না?

আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার ফল

সাইয়িদুনা হযরত সুলাইমান (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা এমন বাদশাহি দান করলে, যা না পূর্ববর্তী কেউ পেয়েছে, না পরবর্তী কেউ পাবে। মানুষের বাদশাহ, জিনদের বাদশাহ, পশু-পাখির বাদশাহ, বাতাসের বাদশাহ, জল ও স্থলের সকল সৃষ্টজীবের বাদশাহ। তার ফরমান সব কিছুর ওপর চলত, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন বাদশাহি এবং রজত্বই দান করেছিলেন। কিন্তু তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি আমার যে নৈকট্য লাভ করেছেন এবং কবুলিয়াত পেয়েছেন, সবই তাঁর নেক আমলের উসিলায় হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শানে বলেন, نِعْمَ الْعَبْدُ 'সে আমার কতই-না ভালো বান্দা ছিল!' اِنَّهُ اَوَّابٌ 'সে আমার শরণপন্ন ছিল'। শ্রেষ্ঠ বান্দা হওয়ার যে মুকুট আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাথায় পরালেন, এর মূল 'আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া' বর্ণনা করলেন।

অপরদিকে লক্ষ্য করুন, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ওপর পরীক্ষা এসে গেল। সমস্ত ধনসম্পদ বিলীন হয়ে গেল, বাগবাগিচা হারিয়ে গেল। স্ত্রী, সন্ত

ানাদি সকলেই ইন্তিকাল করল। তিনি নিজেও কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এত পরীক্ষা! কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শানে ইরশাদ করেন–

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

'নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি'।

কত উঁচু পর্যায়ের কথা!

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

'নিশ্চয়ই আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে আমার কতই-না শ্রেষ্ঠ বান্দা ছিল। কেননা, সে ছিল আমার শরণাপন্ন।'[১৫৫]

অতএব বোঝা গেল, একজন দুনিয়ার বাদশাহদের বাদশাহ, তারপরও আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছেন। এমনিভাবে বাহ্যত অভাব-অনটন, দারিদ্র, রোগ-শোক ইত্যাদিতে জর্জরিত; কিন্তু আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার কারণে 'কতই-না শ্রেষ্ঠ বান্দা' উপাধি লাভে ধন্য হয়েছেন। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয় আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে। এখানে দুনিয়ার ধনসম্পদের কোনো ভূমিকা নেই। একজন কুঁড়েঘরে বসেও আল্লাহর অলি হতে পারেন। আবার আরেকজন সিংহাসনে বসেও আল্লাহর অলি হতে পারেন।

যথাযথ আমল করার ওপর দুটি সুসংবাদ

পার্থিব জগত একটি বাহ্যিক এবং বস্তুগত বিষয়। এই পথে পার্থিব জগতের কোনো মূল্য নেই। যারা সঠিক পদ্ধতিতে যথাযথভাবে আমল করেন, তাদের জন্য দুটি নেয়ামত, দুটি সুসংবাদ রয়েছে। প্রথম সুসংবাদটি হলো, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً.

'অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'

দ্বিতীয় সুসংবাদ দেন–

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

১৫৫. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৪৪

'অবশ্যই আমি তারা যে আমল করে, তার সর্বোত্তম বিনিময় তাদেরকে প্রদান করব।'[১৫৬]

এভাবে যথাযথ আমলের বিনিময়ে দুটি নেয়ামত অর্জিত হবে। ইহজগতে পবিত্র জীবন, পরজগতে বড় পুরস্কার এবং যত বড় পুরস্কার তত বড় মর্যাদা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ○

'প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুপাতে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।'[১৫৭]

সুতরাং পার্থিব জগতে পবিত্র জীবন লাভ হলো এবং পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের মর্যাদা নসিব হবে।

আমল বিনষ্ট করার ওপর দুটি আযাব

বিপরীতে আমল বিনষ্টকারীদের ওপর দুনিয়াতেই দুটি শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

প্রথম শাস্তি : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ○

'আর যেব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন।'[১৫৮]

সংকীর্ণ জীবনের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার উপার্জন কম হবে, অর্থ-সম্পদ থাকবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলাকে তাকে অস্থির জীবন দান করবেন। সে এমন রিযিক পাবে, যার ওপর তাকে সর্বদা অস্থির থাকতে হবে।

আপনারা দেখবেন, বড়-বড় কোম্পানির মালিকগণ রাতে ঘুমাতে পারেন না। চিন্তা থাকে কোম্পানির শেয়ার ছাড়তে হবে; জানা নেই সব শেয়ার বিক্রি হয় কিনা? টেনশন থাকে, আমি কন্টেইনার পাঠিয়েছিলাম; আটকা পড়েছে। আরও কত শত চিন্তা আর পেরেশানি সবসময় লেগেই থাকে। ফলে তারা ঘুমাতে পারেন না। সুতরাং কোটি-কোটি টাকার মালিকের সংকীর্ণ জীবনের উদ্দেশ্য হলো, তার রিযিকের মধ্যে এমন সংকীর্ণতা থাকবে যে, সে

---

১৫৬. সূরা নাহল : আয়াত ৯৭

১৫৭. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৯

১৫৮. সূরা তাহা : আয়াত ১২৪

সর্বদা অস্থির থাকবে। সম্পদের দিক থেকে কখনও প্রশান্তি পাবে না। কখনও ওদিকে সম্পদ বিনষ্ট হবে, কখনও আরেক দিকে প্রতারিত হয়ে সম্পদ হারাবে। এভাবে কেবল পেরেশানি আর পেরেশানিতেই থাকবে। স্মৃতিগতভাবে তারা সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। নামাযেও তাদের সম্পদের প্রতিই খেয়াল থাকে। নিশ্চিন্তমনা কখনওই থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন ব্যস্ততার মধ্যে ফেলে রাখেন যে, নিজ পরিবারের লোকদের সাথে কখনওই তাদের একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ হয়ে ওঠে না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অস্থির রিযিক দান করেন।

দ্বিতীয় আযাব :

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

'আর কেয়ামতের দিন আমি তাদের অন্ধ করে পুনরুত্থিত করব।'[১৫৯]

ইয়া আল্লাহ! এ কেমন শাস্তি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন, শরীয়তের মূলনীতি হলো, যেমন কাজ তেমন প্রতিদান। যেমন করবে তেমন ভোগ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুনিয়াতে সে আমার শিক্ষা থেকে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম থেকে স্বীয় চক্ষু বন্ধ করে নিয়েছে, অন্যমুখী হয়েছে, অন্ধ সেজে রয়েছে। যেহেতু দুনিয়াতে সে অন্ধত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে, তাই কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।

এবার বলুন! যথাযথভাবে আমল করার ওপর কী পরিমাণ মঙ্গল লাভ হচ্ছে। পক্ষান্তরে আমল গড়বড় করার ওপর কী পরিমাণ ক্ষতি ভাগ্যে জুটছে?

নিজের ওপর পরিশ্রম করার প্রয়োজনীয়তা

যে-কেউ নিজেকে মূল্যবান বানাতে আগ্রহী, তাকে নিজের ওপর মেহনত করা চাই। বিধিবদ্ধ রীতি হলো, যে-বস্তুর ওপর মেহনত করা হয়, সেই বস্তু মূল্যবান হয়ে যায়। কাঠের ওপর মেহনত করলে কাঠ ফার্নিচার হয়ে অনেক দামে বিক্রি হয়। লোকজন পাথরের ওপর পরিশ্রম করে। এতে পাথর পালিশ হয়ে বের হয় এবং চড়া মূল্যে বিক্রি হয়। লোহার মধ্যে পরিশ্রম করার পর লোহা বাতাসে উড়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ পরিশ্রম করে লোহার মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ করে। তারপর সেই জাহাজ কত দামি হয়ে যায়! হে লোকসকল! এভাবে যদি আপনারা নিজেদের পরিশ্রম নিজেদের ওপর করেন,

---

১৫৯. সূরা তাহা : আয়াত ১২৪

তাহলে কি আল্লাহর দৃষ্টিতে মূল্যবান হবেন না? লোহা যদি বাতাসে উড়তে পারে, তাহলে মানুষ রূহানিভাবে উড়তে পারবে না? সুতরাং নিজেকেই মেহনতের ক্ষেত্র বানিয়ে নিন!

অন্যের ব্যাপারে সুধারণা, নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া

একটি মূল্যবান মূলনীতি হলো, মানুষকে নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল আর অপরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতে হবে। বর্তমানে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে আছি। অন্যদের নিয়ে আমরা চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। তার মধ্যে এই আছে, অমুকের মধ্যে এই আছে। আর নিজের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে আছি যে, আমি তো পরকালে সুখ-স্বাচ্ছন্দেই থাকব।

সাধারণ মানুষ কেয়মাত দিবসের ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করে যে, কেয়ামত কায়েম হবে, মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে, হিসাব-নিকাশ চলতে থাকবে, বড় দাঁড়িপাল্লা হবে, যার ওপর পুণ্য ও গুনাহ ওজন হতে থাকবে। একদল মানুষ জান্নাতে যেতে থাকবে, অপর একদল জাহান্নামে যেতে থাকবে। আর আমি দেওয়ালে বসে তামাশা দেখতে থাকব। নিজের ব্যাপারে সে এই ভাবনা ভাবে। এই চিন্তা করে না, হয়তো আমি জান্নাতি কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হব অথবা আমি জাহান্নামি কাফেলার মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।

কেয়ামত দিবসকে আল্লাহ তা'আলা يوم التغابن তথা লাভ-লোকসান প্রকাশিত হওয়ার দিন বলেছেন। ইরশাদ করেন–

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

'যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন সমবেত হওয়ার দিনে, সেটাই লাভ-লোকসানের (প্রকাশিত হওয়ার) দিন।'[১৬০]

হে মানবজাতি! সেটি তোমাদের জন্য জয়-পরাজয়, লাভ-লস প্রকাশের দিন হবে। হয়তো পার্থিব জীবনের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে জয়ী ও লাভবান হবে অথবা ব্যর্থ হয়ে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাস্তবতা যখন এমনই, তখন আমরা কি এভাবে বিষয়টি চিন্তা করি?

নিয়ম হলো, নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া আর অপরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। যদি কেউ চিন্তাভাবনা নিজের ব্যাপারে করে আর অন্যদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে, তাহলে সে সফলকাম।

---

১৬০. সূরা তাগাবুন : আয়াত ৯

সৎ ও অসৎ ব্যক্তিদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য

পার্থিব জগতে বাহ্যিকভাবে সৎ লোকদের ওপরও বিভিন্ন দুরবস্থা আসে, অসৎ লোকদের ওপরও আসে। বাহ্যত সেটা একই রকম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বস্তুত তাদের অবস্থার মধ্যে আকাশ-জমিন পার্থক্য থাকে। যেমন সৎ আর অসৎ ব্যক্তিকে দৃশ্যত একই রকম দেখায়। দৈহিকভাবে কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পার্থক্য রয়েছে। একজন ঈমানহীন, আরেকজন ঈমানে ভরপুর অন্তরের অধিকারী। এর দৃষ্টান্ত এমন যেমন একটি চিকন বাঁশ দেখতে অবিকল ইক্ষুর মতো দেখায়। বাহ্যত কোনো পার্থক্য দৃষ্টিতে পড়ে না। কিন্তু বাঁশের ভেতরে থাকে শূন্য এবং শুকনা পক্ষান্তরে ইক্ষু থাকে ভেতরে থেকে মিষ্ট রসে পরিপূর্ণ। তো বাহ্যিকভাবে এক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন-ভিন্ন।

এমনিভাবে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি অসৎ ব্যক্তিদের ওপরও আসে এবং পরীক্ষার পরিস্থিতি সৎ মুমিনদের ওপরও আসে। বাহ্যিক রূপ একই থাকে। কিন্তু মূলত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি বুঝুন।

প্রথম পার্থক্য : অসৎ ব্যক্তিদের আল্লাহ তা'আলা শুরুতে নেয়ামত দান করেন। তারপর তারা সেসব নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাকড়াও করেন। পক্ষান্তরে সৎ কর্মপরায়ণশীল লোকদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য পরে আসে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا.

'এমনকি যখন রাসূলও নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা ধারণা করে বসল, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল।'[১৬১]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা নেককার লোকদের শুরুতে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন আর পরিশেষে তাঁর নেয়ামত ও সাহায্য দিয়ে তাদের ধন্য করে থাকেন। বিপরীতে অসৎ লোকদের শুরুতে নেয়ামত দিয়ে থাকেন আর পরিশেষে তাদের পাকড়াও করেন।

দ্বিতীয় পার্থক্য : বিপদাপদ ভালো লোকদের ওপরও আসে, মন্দ লোকদের ওপরও আসে। কিন্তু মন্দ লোকদের বিপদ হয় এমন যেমন কেউ চাকু দ্বারা পাকস্থলিতে আঘাত করল এবং অধিক রক্তক্ষরণের কারণে লোকটি

---

১৬১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০

মারা গেল। তার শরীরে চাকু চালানো হলো, রক্তক্ষরণ হলো। ফলাফল হলো সে মৃত্যু বরণ করল। অপর দিকে ভালো লোকদের ওপর যে-বিপদাপদ আসে, তা এমন যেমন শরীরে টিউমার ছিল, ডাক্তার চাকু চালিয়ে অপারেশন করলেন। সাময়িক কষ্ট হলো। কিন্তু এর মাধ্যমে রোগ থেকে সে মুক্তি পেল। এখানেও চাকু চালানো হলো, রক্তক্ষরণও হলো। কিন্তু এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগ থেকে সুস্থতা দান করলেন। বাহ্যিক রূপ একই রকম; কিন্তু ফলাফলে অনেক পার্থক্য।

অসৎ লোকেরাও অনেক নেয়ামত পেয়ে থাকে। কিন্তু এটা এমন যেমন ইঁদুর ধরার জন্য শুটকির টুকরা পিঞ্জরাতে লটকিয়ে দেওয়া হয়। ইঁদুর সেটা দেখে খুশিতে চক্কর দিতে থাকে যে, একটা মজাদার খাবার পাওয়া গেল। সে জানে না, এই শুটকি খেলেই তাকে ধরে ফেলা হবে এবং একেবারে মেরেই ফেলা হবে। অসৎ লোকেরাও এ-জাতীয় নেয়ামত পেল। আর সেই নেয়ামতই তাদের মৃত্যুর কারণ হলো। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের যে নেয়ামত দান করেন, তার দৃষ্টান্ত এমন যেমন তোতা পাখিকে কলা খেতে দেওয়া হয়। যেসব তোতা পাখি কথা বলতে পারে, সেগুলো কখনও সালাম করে, কখনও আল্লাহ আল্লাহ বলে। লোকজন এগুলোতে খুব শখ করে পালে। অনেক সেবা-যত্ন করে এবং কলা, মিষ্টি ইত্যাদি দামি খাবার খাওয়ায়। বিপরীতে এই যে ইঁদুর শুটকি, রুটি ইত্যাদি খাবার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে পায়; কিন্তু এই খাবারই তার জন্য মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে। বাহ্যিক রূপ দুটিরই এক। কিন্তু একটির জন্য মৃত্যুর কারণ আর অপরটির জন্য জীবন ও সুস্থতার উপকরণ।

দরজা খোলা আর বরকত খুলে দেওয়া

ছাত্রদের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয়। অসৎ ও অবাধ্য লোকদের আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত দিয়ে থাকেন, তিনি এর নাম দিয়েছেন, 'দরজা খোলা'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ

'তারা যখন ভুলে গেল তাদের যেসব উপদেশ করা হয়েছে, তখন আমি তাদের ওপর সকল বস্তুর দরজা খুলে দিলাম।'[১৬২]

---

১৬২. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪

যাতে তারা বিলাসিতা-সামগ্রীর মালিক হয়ে ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হয় এবং আমার গ্রেপ্তারির মধ্যে ভালোভাবে এসে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তারা আমার থেকে চরমভাবে বিমুখ হলো–

اَخَذْنَاهُم بَغْتَةً.

'হঠাৎ আমি তাদের পাকড়াও করলাম।'[১৬৩]

এটি ছিল দরজা খোলা। আর অনুগত বান্দা যারা সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

'নিঃসন্দেহে আমি তাদের ওপর খুলে দিয়েছি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বরকতসমূহ।'[১৬৪]

সুতরাং তাদের জন্য বরকত খুলে দেওয়া হয়।

মুমিন ও ফাসেক উভয়ের ওপর পরীক্ষা

লক্ষ্য করুন, ঈমানদারদেরও বিপদাপদ আসে। তবে আল্লাহ তা'আলা একে পরীক্ষা বলে ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন– 'আমি পরীক্ষা করি।' আমরা দুই টাকার ঘড়া ক্রয় করলেও ঠুকে দেখি কাঁচা না পাকা। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও জান্নাতের বিনিময়ে বান্দাকে কবুল করেন; তাই তিনিও পরীক্ষা করেন কাঁচা না পাকা। অবশ্য এই পরীক্ষা মুমিনের ওপর একভাবে আসে, ফাসেক ও অবাধ্য লোকদের ওপর আরেকভাবে আসে। ফাসেকের ওপর যখন পরীক্ষা আসে, তখন তা আল্লাহ তা'আলার আযাব হয়ে আসে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'অবশ্যই আমি তাদের বড় শাস্তির পূর্বে ছোট শাস্তি ভোগ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১৬৫]

এভাবে ফাসেক ও পাপাচারদের ওপর আসা বিপদাপদকে আল্লাহ তা'আলা আযাব বলে ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে মুমিনের ওপর আসা বিপদাপদকে তিনি পরীক্ষা বলেছেন।

---

১৬৩. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪
১৬৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬
১৬৫. সূরা সাজদা : আয়াত ২১

ঘোষণা করেছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা ও ধনসম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা আর আপনি সবরকারীদের সুসংবাদ দিয়ে দিন।'[১৬৬]

কখনও জানের ক্ষতি হবে, কখনও মালের ক্ষতি হবে। এসব অবস্থায় যারা সবরের সাথে থাকবে তাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মু'আমালা ব্যতিক্রম। তাই আমাদের উচিত, নিজেদের আমল সুন্দর করে নেওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া।

ইবাদাতে অবহেলার ফল

যে বা যারা ইবাদাতে অবহেলা করে, শয়তান তাদের ওপর চেপে বসে। দুনিয়ার রীতি হলো, যখন কেউ নিজ শত্রুকে পরাস্ত করে, তখন তার সর্বপ্রথম কাজ হয় শত্রুর কাছে থাকা ধ্বংসাত্মক বস্তু ছিনিয়ে নেওয়া। সেনাবাহিনী যখন শত্রুকে পরাস্ত করে বন্দি করতে চায়, তখন শত্রুকে বলে থাকে Hands up অর্থাৎ হাত ওপরে উঠাও। উদ্দেশ্য থাকে, যদি তার হাতে ক্ষতিকর কোনো কিছু থাকে, তাহলে তা হাত থেকে পড়ে যাবে এবং সে আর হামলা করতে পারবে না। শয়তানও তাই করে। সে যখন মানুষকে পরাস্ত করে ফেলে, তখন সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র যা মানুষের কাছে আছে সেটা তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

'শয়তান তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে।'[১৬৭]

সুতরাং শয়তানের প্রথম কাজ হচ্ছে, সে প্রথম মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়। কেননা, সে জানে, বান্দা যদি আল্লাহর স্মরণে

---

১৬৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

১৬৭. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১৯

লিপ্ত থাকে, তাহলে তার ওপর আমার আক্রমণ কাজে আসবে না। অতএব, শয়তানের আক্রমণ থেকে মুমিনকে বাঁচতে হবে। দেখুন, শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-একটি বিষয় আমাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

বিসমিল্লাহর বরকতে শয়তানি ক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ

পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলে, তাহলে শয়তান তার পানাহারে শরীক হয়ে যায়। দেখুন, শয়তান কোন-কোন রাস্তায় ক্রিয়া করতে পারে সেগুলো রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। কাজেই শয়তানি ক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে পানাহারের শুরুতে দু'আ পড়া, বিসমিল্লাহ বলা কতই-না জরুরি। পানাহারে যদি শয়তানি ক্রিয়া প্রবেশ করে, তাহলে সুস্পষ্ট যে, এ পানাহার থেকে মানুষ যে শক্তি পাবে, সেটা তাকে গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। এ থেকে বাঁচার উপায় হলো শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা; তাহলে শয়তান তাতে শরীক হতে পারবে না।

একটি ঘটনা তো এমনও বর্ণিত আছে যে, জনৈক সাহাবী খানা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যান। মাঝখানে স্মরণ হলে সাথে-সাথে বিসমিল্লাহ পড়ে নেন। এ-সময় রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি-মুচকি হাসতে থাকেন। কোনো একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, শয়তান তার সাথে খাচ্ছিল। সে যখন বিসমিল্লাহ বলল, তখন শয়তান এতক্ষণ যাকিছু পানাহার করেছিল, সব বের করে দিল এবং এখান থেকে চলে গেল। সুতরাং আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা কতই-না জরুরি!

বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করা

হাদীছ শরীফে এসেছে, যেব্যক্তি ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে, রাতে সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। কাজটি কত সহজ, কিন্তু গুরুত্ব কত বেশি! যখনই কেউ ঘরের দরজা বন্ধ করবে, বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করা চাই। বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা

শয়তানকে ঘরে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করলেন। শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারল না। অধিকাংশ গুনাহ রাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু যখন ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারেনি, তখন একটা লাভ তো হলো, রাতের গুনাহ থেকে বাঁচলেন। দ্বিতীয় লাভ হলো, তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে ওঠা সহজ হয়ে গেল। এটি সম্ভব হলো শয়তান ঘরে না থাকায়। আর যে ঘরে রাতে শয়তান প্রবেশ করে, সেই ঘরের লোকদের শয়তান শরীরে হাত বুলিয়ে আরাম দিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখে। কানে এসে পেশাব করে দেয়।

হাদীছ শরীফের ভাবার্থ এমন, যেব্যক্তি ফজরের নামাযের জন্য ওঠে না, বস্তুত শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়। যার ফলে আযানের আওয়াজ তার কানে পৌঁছে না এবং সময়মতো চোখও খোলে না। তো ভাই! শয়তান প্রতিহত করার কত উত্তম পন্থা এটি যে, সুন্নাত তরিকায় বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করলে সেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

বিসমিল্লাহ বলে টয়লেটে যাওয়া

আরও দেখুন, হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে, মাসনূন দু'আ পড়ে, শয়তান তার সাথে টয়লেটে প্রবেশ করে না। আর যদি পড়তে ভুলে যায় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়ে, তাহলে তার সাথে-সাথে শয়তানও টয়লেটে প্রবেশ করবে। তারপর তার গোপনাঙ্গ নিয়ে খেলবে। এতে সেই ব্যক্তির মধ্যে যৌনচাহিদা সৃষ্টি হয়ে যাবে। দেখুন, শয়তানের আক্রমণ থেকে কীভাবে বাঁচা যায় সেই পদ্ধতি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-এক করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শরীর থেকে কাপড় খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ যখন প্রয়োজনে দেহ থেকে কাপড় খুলবে, তখন বিসমিল্লাহ পড়ে নেবে। এই বিসমিল্লাহ পড়ার বদৌলতে না জিন তাকে দেখতে পায়, না শয়তান তাকে দেখতে পায়। কতই-না ছোট একটি আমল। কিন্তু কতজন মানুষ পরিধেয় কাপড় খোলার সময় বিসমিল্লাহ বলে? অনেকেই ভুলে যায়। আবার অনেকে তো এ-ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন থাকে। মহিলারা গোসলের সময় বিসমিল্লাহ না বললে তাদের জিনও দেখে, শয়তানও দেখে। তারপর কেন কেঁদে বেড়ায় যে আমাদের ওপর দুষ্ট

জ্বিনের আছর পড়েছে? ভাই! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ছোট এবং খুবই সংক্ষিপ্ত একটি আমল শিক্ষা দিয়েছেন। এর এত উপকারিতা যে, উক্ত আমল করলে মানুষের শরীরে না জিনের দৃষ্টি পড়ে, না শয়তানের দৃষ্টি পড়ে। আর আমরা এই আমলটি ভুলেই যাই।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী মিলনের বেলায় পরিধেয় কাপড় খোলার সময় যদি তারা বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তাদের মিলনকাজে শরীক হয়। ফল কী হয়? সন্তান আল্লাহ তা'আলারও অবাধ্য হয়, মাতাপিতারও অবাধ্য হয়। কথা একেবারেই সংক্ষিপ্ত। আমলটি খুবই ছোট। কিন্তু ক্রিয়া দেখুন; কোথা পর্যন্ত যাচ্ছে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় একটি দু'আ পড়তে বলেছেন। দু'আটি হলো–

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ عَمَّا رَزَقْتَنَا.

আল্লাহু আকবার! মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় যদি এই দু'আ পড়া হয় আর উক্ত মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা গর্ভের সন্তানকে শয়তানের ক্রিয়া ও প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখেন। আজ যাকেই দেখবেন, বলবে, সন্তান আমাদের মান্য করে না, সন্তান অবাধ্য। ভাই! সন্তান অবাধ্য হয়েছে, আমরাও তো সুন্নাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিনি। আমরাও তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত আমল বর্জন করেছিলাম। আমাদেরই ফলানো ফসল এখন নিজেদের চোখের সামনে এসে পড়েছে। যখনই মানুষ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পরিত্যাগ করেছে, তখনই তার কাছে শয়তান এসে গেছে। আল্লাহ বলেন–

فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

'শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।'

উদাসীনতার জীবন যাপন করতে-করতে এমন একটা সময়ও এসে যায়, যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে তার ওপর চাপিয়ে দেন। তাকে শয়তানের অধীন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِينَ

'আর আমি তাদের জন্য সহচর নিযুক্ত করে দিলাম। তারা তাদের পূর্বাপর কৃতকর্মসমূহকে তাদের সামনে সুশোভিত করে উপস্থাপন করল এবং তাদের ব্যাপারেও শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেল, যা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল। নিঃস্বন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।'[১৬৮]

বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করুন

এখন থেকে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করে নিন। এর ফলে অনেক জায়গায় শয়তানের প্রভাব ও ক্রিয়া থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন।

সন্তানদের শৈশবকালেই বিসমিল্লাহ্ শিক্ষা দিয়ে সকল ভালো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলাকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করানো চাই। দরজা খোলার সময় বিসমিল্লাহ্, গাড়িতে বসার সময় বিসমিল্লাহ্, খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ এভাবে প্রতিটি ভালো কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস হয়ে যায়, দেখবেন, ছোট একটি আমল, কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে কত ভালো ফল অর্জিত হয়।

সুতরাং বোঝা গেল, আমরা যদি নিজেদের জীবনে সফলকাম হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে সৎকর্ম করতে হবে। তাহলে আমরা শয়তানের প্রভাব ও ক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারব। অন্যথায় আমরা দুনিয়াতেও মুক্তি পাব না, পরকালেও মুক্তি পাব না।

হাশরের দিন আমল কাজে আসবে

কেয়ামতের দিন দুনিয়াতে ভিন্ন-ভিন্ন আমল থেকে বঞ্চিত হওয়ার আযাব ভিন্ন-ভিন্ন হবে। তাফসীরে ইবনে কাছীরের মধ্যে একটি হাদীছ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নযোগে জাহান্নামের অবস্থা দেখেন এবং জাগ্রত হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, আমি জাহান্নামে একদল লোককে শাস্তি পেতে দেখেছি।

ভালোভাবে উজু করা কাজে আসবে

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করা হলো। কবরের আযাব তার দিকে অগ্রসর হলো তাকে আযাবে গ্রাস করার জন্য। তখন দুনিয়ায় তার

---

১৬৮. সূরা হা-মীম আস-সাজদা : আয়াত ২৫

ভালোভাবে উজু করা কবরের এই আযাব থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে কাজে এল। সুতরাং বোঝা গেল, যেব্যক্তি ভালোভাবে উজু করবে, অর্থাৎ প্রথমে ভালোভাবে ইস্তিঞ্জা করবে, সুন্নাত মোতাবেক মাটির ঢিলা ব্যবহার করবে, না থাকলে টয়লেট পেপার ব্যবহার করবে, তারপর পানি ব্যবহার করবে এবং ইস্তিঞ্জার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে, তারপর গুরুত্বসহকারে উজু করবে, কাপড়ে পানি পড়তে দেবে না, সুন্নাত মোতাবেক প্রতিটি অঙ্গ মলে-মলে ধুবে, মাসনূন দু'আসমূহ পড়বে, এভাবে আত্মতৃপ্তির সাথে উজু করাকে অভ্যাসে পরিণত করবে। ফলাফল কী বের হবে? এই ভালোভাবে উজু করার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

বর্তমানে মহিলারা মেহেদি কম ব্যবহার করে। নখপালিশের প্রতি বেশি ধাবিত হয়ে গেছে। জেনারেল শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের তো মাশাআল্লাহ নখ বড় করারও অভ্যাস রয়েছে। নখ যত লম্বা হয়, তাতে ময়লাও তত বেশি জমে। আর ময়লার জায়গায় পানি পৌঁছে না। সুতরাং উজু-গোসল কীভাবে হবে? দেখুন, ছোট-ছোট বিষয়; গোসল করে; কিন্তু চুল ভালোভাবে খোলে না কিংবা চুলগুলো ভালোভাবে ভিজায় না। আবার অনেকে তো গোসলের ফরজই জানে না। কেউ জিজ্ঞেস করল, বিয়ে হয়েছে, গোসলের ফরজ জানেন? জবাবে বলল, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হলো, গোসলের ফরজ কী-কী? জবাব দিল, সাবান, তেল ও তোয়ালে এই তিন বস্তু হলো গোসলের ফরজ। মাশাআল্লাহ! এম. এ. পাশ অথচ গোসলের ফরজের ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।

একবার একটি মেয়ে আমাদের জামেয়ায় এল। এসে বলল, আমার মা আমার বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন। তাই আমি গোসলের ফরজ জানতে এসেছি। আমার ঘরের লোকজন জিজ্ঞেস করল, আপনার বয়স মনে হচ্ছে বাইশ-তেইশ বছর। নামায তো অনেক পূর্ব থেকে ফরজ হয়েছে। আপনি এ যাবত কীভাবে গোসল করে আসছেন? মেয়েটি বলল, কী বোঝাতে চেয়েছেন? তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মাসিক যে স্রাব আসে, তা বন্ধ হওয়ার পর তো গোসল করতে হয়, সেই গোসল কীভাবে করে আসছেন? জবাব দিল, সেটা তো আমি পানি ঢেলে শরীর পরিষ্কার করি এতটুকুই যথেষ্ট। মেয়েটির জীবনের বাইশ-তেইশটি বছর গত হয়ে গেল, অথচ গোসলের ব্যাপারে তার কোনো খবরই ছিল না। সে মনে করছিল সম্ভবত বিয়ের পরই গোসলের প্রয়োজন পড়ে।

সুতরাং পাক-পবিত্রতার মাসআলা-মাসায়েলও শিক্ষা করুন। এর ফল কী হবে? আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের মজলিসে বসার সৌভাগ্য দান করবেন।

যিকির কাজে আসবে

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমি দেখলাম, একব্যক্তির কাছে শয়তান ভিড়েছে তাকে হামলা করতে। কিন্তু লোকটি আল্লাহর যিকির শুরু করে দিল। সাথে-সাথে শয়তানের মুখ ছাই বর্ণের হয়ে গেল এবং তাকে ছেড়ে ফিরে গেল। সুতরাং যিকির করলে শয়তান মানুষকে কাবু করতে পারে না। আর কাবু করতে না পারার কারণে যিকিরকারীর অন্তরে সে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। তো আমল খুবই ছোট, আল্লাহর যিকির করা আর উপকারিতা কত বড় যে, শয়তান থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।

নামায কাজে আসবে

তারপর রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– আমি আযাবের ফেরেশ্‌তাকে দেখলাম, একটি লোকের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ-সময় তার নামায তাকে উপকার করল এবং অগ্রসরমান আযাবের ফেরেশ্‌তাকে ফিরিয়ে দিল। সুতরাং যেব্যক্তি উত্তমভাবে নামায আদায় করবে, নামাযের মধ্যে ধীরস্থিরতা ও খুশুখুজু অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত নামাযের উসিলায় তাকে আযাবের ফেরেশ্‌তা থেকে রক্ষা করবেন। খুশু বলা হয়, অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব জাগ্রত রাখা, আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্বকে অন্তরে পোষণ করে নামায পড়া। খুজু বলা হয়, নামাযের যাবতীয় রুকন ও আমল শান্তশিষ্টভাবে আদায় করা।

রোযা কাজে আসবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বলেন, আমি কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে খুবই পিপাসিত অবস্থায় দেখলাম। এমন পিপাসিত যে সে সহ্য করতে পারছে না। প্রাণ ওষ্ঠাগত। এহেন দুরবস্থায় রোযা তার উপকারে এল এবং রোযার বদৌলতে হাউজে কাওছার থেকে সে পানীয় ভর্তি পানপাত্র পেয়ে গেল।

হজ ও ওমরা কাজে আসবে

রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন– আমি দেখলাম, কেয়ামতের দিন একব্যক্তি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তার চারপাশে অন্ধকার আর অন্ধকার। ঘোর অন্ধকারের কারণে সে কোনদিকে যাবে রাস্তা পাচ্ছে না। সীমাহীন উৎকণ্ঠায় পড়েছে সে। এ মসিবতের সময় তার হজ ও ওমরা হঠাৎ চারপাশ আলোকিত করে দিল। সেই আলোতে সে রাস্তা পেয়ে গেল। এভাবে হজ ও ওমরার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন সঠিক রাস্তা দেখাবেন।

আত্মীয়তা বজায় রাখা কাজে আসবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, আমি দেখলাম, কেয়ামতের দিন একব্যক্তি খুবই পেরেশান অবস্থায় দণ্ডায়মান। তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ নেই। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে একাকি দাঁড়ানো। এ অবস্থায় আমি দেখলাম, দুনিয়াতে সে যে আত্মীয়তা রক্ষা করে চলত, সেই আমল তার কাছে এল এবং তার ভয়ভীতি দূর করে দিল।

আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ করা, ঈমানদারদের সাথে সদাচরণ করা। এই আমল কেয়ামতের দিন ভয়ভীতি ও একাকিত্ব থেকে মুক্তির উসিলা হবে।

দান-সদকা কাজে আসবে

তারপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি জাহান্নামের প্রান্তসীমায় উপনীত। জাহান্নাম থেকে আগুনের লাভা উঠছে এবং তার চেহারা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। এতে চেহারা ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম, এই কঠিন মুহূর্তে তার দান-সদকা জাহান্নাম ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করল। কাজেই আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করা চাই। দীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করা চাই। এটা জরুরি নয় যে, প্রতেক্যকে লাখ-লাখ টাকা খরচ করতে হবে। কখনও-কখনও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা এক টাকাও পরকালে মুক্তির মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। স্বল্প হলেও সহীহ নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন। এই দান-সদকার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের লেলিহান আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহর ভয় কাজে আসবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর আরও বলেন, আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি জাহান্নামের এত কিনারায় দাঁড়ানো যে, জাহান্নামে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। এহেন মুহূর্তে দুনিয়াতে তার অন্তরে থাকা আল্লাহর ভয় অর্থাৎ সে যে আল্লাহর ভয়ে গুনাহের কাজ পরিহার করে চলত, সেই আমল সামনে এসে তাকে জাহান্নামে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, আমি দেখলাম, এক ব্যক্তিকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তার গুনাহ বেশি ছিল। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছিল। আল্লাহর ভয়ে সেই অশ্রু ঝরার আমল এ-সময় উপস্থিত হলো এবং ডুবন্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে যেভাবে উদ্ধার করা হয়, সেভাবে জাহান্নামে ডুবন্ত এই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনল।

দরূদ শরীফ কাজে আসবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন– আমি একব্যক্তিকে পুলসিরাতের ওপর দেখতে পেলাম। লোকটির পদস্খলন হচ্ছে। বারবার সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে আর পিছল খাচ্ছে। সে ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে, না জানি নিচে পড়ে যাই। এমন কঠিন মুহূর্তে আমার ওপর পাঠ করা দরূদের আমল তার কাছে এল এবং তাকে বাতাসের গতিতে জাহান্নামের ওপরকার পুলসিরাত অতিক্রম করিয়ে দিল। দেখুন, দরূদ পড়া কত উপকারী এবং কত জরুরি!

কালেমা কাজে আসবে

তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখলাম, একব্যক্তি জান্নাতের দরজায় পৌঁছেছে। কিন্তু দরজা বন্ধ। ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। সে খুবই চিন্তিত। এ অবস্থায় কালেমা পড়ার আমল উপস্থিত হলো এবং জান্নাতের দরজা খোলার ব্যবস্থা করে দিল।

উত্তম চরিত্র কাজে আসবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বলেন, একব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে আল্লাহ ও সেই ব্যক্তির মাঝে একটা পর্দা ছিল। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন–

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, না তাদের পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[১৬৯]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাতও করছেন না, বরং আল্লাহ এবং তার মাঝে একটি অন্তরায় রয়েছে। এ অবস্থায় লোকটি যখন খুবই অস্থির, তখন তার উত্তম চরিত্র এগিয়ে এল এবং মধ্যবর্তী অন্তরায়টি সরিয়ে দিল। তারপর লোকটি আল্লাহর দিদার লাভ করল।

বোঝা গেল, সফলতা অর্জিত হলে, আমলের বদৌলতেই হবে। আমল ব্যতীত কোনো মানুষ সফল ও কৃতকার্য হতে পারবে না।

ঈমানে মুফাস্‌সাল একটি ওয়াদা, একটি অঙ্গীকার

আমরা যে ঈমান এনেছি, তাতে আমরা আল্লাহর সামনে একটি ওয়াদা করেছি, একটি অঙ্গীকার করেছি। ঈমানে মুফাস্‌সালের মধ্যে যদি চিন্তা করেন, তাহলে উপলব্ধি হবে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় ওয়াদা ও অঙ্গীকার করেছি। মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন, আমরা আল্লাহর সাথে কী ওয়াদা করেছি?

আল্লাহর ওপর ঈমানের হাকীকত

সর্বপ্রথম আমরা বলেছি, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ অর্থাৎ– আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি, হে আল্লাহ! প্রকৃত কর্তা আপনার সত্তা। এই বিশ্বজগত উপকরণের মাধ্যমে চলে আর সকল উপকরণের ব্যবস্থাপক আপনি। দুনিয়াতে যা কিছু হয়, আপনার ইশারাতেই হয়। আমরা বস্তু ও উপকরণের আশাবাদীও নই, আমাদের এসবের প্রয়োজনও নেই। আমাদের চাওয়া-পাওয়া হলো আপনার সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের উপকরণ ব্যতিরেকেই সব কিছু করতে পারেন। পক্ষান্তরে কোনো উপকরণই কোনো কিছু করতে পারে না, আল্লাহর

---

১৬৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৭

ইশারা ও তাওফীক ছাড়া। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে এ বিষয়টিই আত্মস্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে দুটি মু'জিযা দান করলেন। উভয় মু'জিযার উদ্দেশ্য এক।

প্রথম মু'জিযার উদ্দেশ্য

প্রথম মু'জিযা কী? প্রথম মু'জিযা হলো, হযরত মূসা (আ.) স্বীয় হাতের লাঠি মাটিতে ফেললেন, সাথে-সাথে সেটি সাপ হয়ে গেল। তারপর তিনি যখন সাপটা ধরলেন আবার লাঠি হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা এখানে একটি কথা বুঝিয়ে দিলেন যে, হে মূসা! আপনি তো বলেছিলেন, এই লাঠি আমার অনেক কাজে আসে। বলেছিলেন,

اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَاٰرِبُ اُخْرَى.

'আমি এর ওপর টেক লাগাই এবং এর মাধ্যমে ছাগলপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এর মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে।'[১৭০]

সুতরাং আপনি যে বস্তুকে উপকারী মনে করছেন, যখন আমার নির্দেশে সেটি মাটিতে ফেললেন, তখন সেটি এমন ক্ষতিকর এক বস্তুতে পরিণত হলো, যা থেকে আপনি পলায়ন করতে লাগলেন। তারপর যে বস্তুকে আপনি ক্ষতিকর মনে করেছিলেন, তা থেকে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন, আমার নির্দেশে যখন আপনি তাতে আবার হাত লাগালেন, তখন আমি পুনরায় সেটিকে উপকারী বস্তুতে পরিণত করে দিলাম। প্রমাণিত হলো, উপকারিতা এবং ক্ষতি কোনো বস্তুর নিজস্ব গুণ বা শক্তি নয়। বরং এর সম্পর্ক আমার নির্দেশের সাথে।

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে দুধকে বান্দার জন্য সুস্থতার মাধ্যম বানিয়ে দেন। এর মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যবান হয়। আবার আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে দুধ পান থেকে Food poisoning (বিষক্রিয়া) হয়ে যায় এবং মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুধই জীবন ধারণেরও উপকরণ হিসেবে কাজ করে, আবার মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। এর মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর ক্রিয়া কে দিল? আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।

মুমিনের দৃষ্টি সবসময় আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আশা-প্রত্যাশা সব আল্লাহর কাছে করে। মানুষ থেকে কিছুই আশা করে না। আমাদের কি

---

১৭০. সূরা তাহা : আয়াত ১৮

আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে? না। আমরা ভেবে থাকি, কারখানা আমাদের লালনপালন করছে, অফিস আমাদের চালাচ্ছে, ব্যবসা আমাদের চালাচ্ছে, খেতখামার আমাদের পালছে।

আমরা আসবাবের প্রতি মনোনিবেশ করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তোমাদের অন্য কেউ লালনপালন করছে না, বরং একমাত্র আমি তোমাদের লালনপালন করছি। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের মনোনিবেশ নেই। মানুষের মনোনিবেশ যদি আল্লাহর প্রতি থাকে, তাহলে তারা হারাম উপার্জনের দিকে হাত প্রসারিত করবে কেন? তাদের তো নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে, আমার প্রভু যখন আমাকে দেবেনই, তাহলে অবশ্যই তিনি বৈধ উপায়েই দেবেন। কাজেই তারা কাউকে ধোঁকা দেবে না, কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেবে না, কখনও ঘুস নেবে না, আমানতে খেয়ানত করবে না। তারা সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, তাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকবে যে, আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা, তিনি অবশ্যই অবশ্যই আমাদের রিযিক দেবেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিলেন।

দ্বিতীয় মু'জিযার উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে দ্বিতীয় মু'জিযা দিয়েছিলেন يَدٌ بَيْضَاءُ অর্থাৎ– হাত ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়া। উক্ত মু'জিযাতেও একটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে বললেন, আপনি আপনার হাত বগলে নিয়ে যান। তারপর সেই হাত সেখান থেকে ধবধবে আলোকিত হয়ে বের হলো। হযরত মূসা (আ.) নিজের হাত বগলে নেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তা আলোকিত করে দেওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা বোঝাচ্ছেন, হে আমার প্রিয় মূসা! কখনও আমি অবয়ব পরিবর্তন করে দিই। যেমন– লাঠির অবয়বকে আমি সাপের অবয়বে পরিবর্তন করে দিলাম। তারপর আবার সাপের অবয়বকে লাঠির অবয়বে পরিবর্তন করে দিলাম। এমনিভাবে আমি যখন ইচ্ছে করি, তখন বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন করে দিই। এই যে আপনার হাত; একে আলোকিত করে কী লাভ? কিন্তু আমার হুকুমে আপনি যখন নিজ হাত বগলে নিলেন, তারপর বের করলেন, তখন সেটি আলোকিত হয়ে গেল। এভাবে যখন ইচ্ছে আমি বস্তুর বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন করে দিই।

রিযিক আল্লাহর হাতে

মোটকথা, আল্লাহর তা'আলা সম্পর্কে মুমিনের ঈমান এমন সুদৃঢ় হবে যে, আমার কাছে যা কিছু আসবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসবে। আচ্ছা! আল্লাহ তা'আলা থেকে পাওয়ার ব্যাপারে যার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে, সে কি যাবে কবরের কাছে প্রার্থনা করতে? সে কি চাওয়ার জন্য মাজারে যাবে? সে কি কবিরাজদের পেছনে পড়বে এবং এরূপ বলবে, মনে হচ্ছে, কেউ আমার রিযিক বেঁধে রেখেছে? কেমন কুফ্‌রি কথা! মনে হচ্ছে, যেন এসব লোক ছোট-ছোট প্রভু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলে থাকে, কবিরাজ আমার রিযিক বেঁধে ফেলেছে, কবিরাজের কী ক্ষমতা আছে? এসব কবিরাজের অবস্থা কী আর রিযিক বন্ধ করার কাজ কোথায়? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।'[১৭১]

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

'যত বস্তুসামগ্রী আছে, আমার কাছে সকল কিছুর ভান্ডার রয়েছে। আমি সেই ভান্ডার থেকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে অবতীর্ণ করি।'[১৭২]

সুতরাং রিযিক তো আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

'আমি তাদের মাঝে পার্থিব জগতে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি।'[১৭৩]

আর আমরা কী মনে করি? মনে হচ্ছে, কেউ বিয়ে বাঁধ দিয়েছে, কেউ ব্যবসা বাঁধ দিয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ শিরকের কাছাকাছি কথা। এরূপ চিন্তা কখনও না করা চাই। না কেউ বাঁধ দিতে পারে, না কেউ খুলতে পারে। এই ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আমাদের মহান প্রতিপালকের। সুতরাং মূর্খ লোকদের পেছনে যাওয়া কেন? তাবিজের পেছনে পড়ার প্রয়োজন কী? শুধুই শুধুই ঈমান বিনষ্ট করা। আর কিছু নয়। আমলের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই

---

১৭১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ২২

১৭২. সূরা হিজর : আয়াত ২১

১৭৩. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩২

আর বলে আমাকে আমার শত্রুপক্ষ বড় পেরেশান করে ফেলেছে। আমি বলছি, আপনাদের শত্রুপক্ষ পেরেশান করেনি, পেরেশান করেছে আপনাদের দুষ্টু আত্মা। এদিকে ধ্যান আসে না যে, আমাদের খবিশ আত্মাই আমাদের পেরেশান করে রেখেছে।

কামনা-বাসনা কেবল আল্লাহর কাছে

সুতরাং আমরা যে اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম) বললাম, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল আশা-প্রত্যাশা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দিলাম। আমাদের যা অর্জিত হবে, কার পক্ষ থেকে হবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। এবার চিন্তা করুন, আজ আশা-ভরসা কোথায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে?

بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے؟

'মূর্তির ওপর তোমার আশা-ভরসা, আল্লাহর ওপর নিরাশা
আচ্ছা, বলো তো তুমি আমাকে; কাফেরি আর কী হবে?'

আমরা যখন বললাম اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ অর্থাৎ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি, তখন যেন আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, হে মহামহিম প্রভু! এখন থেকে আমরা সকল কিছু এবং যাবতীয় কাজের প্রকৃত কর্তা আপনাকে মনে করব। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (যা ইচ্ছে তা-ই করতে সক্ষম) আপনার বৈশিষ্ট্য। যা হচ্ছে আপনার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আমরা আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। এভাবে যারা সব কিছুতে আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হবে, পেরেশানি অবস্থায় তার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে।

শিশুর দৃষ্টান্ত

আমাদের থেকে তো শিশুরাই অনেক ভালো। আমি শিশুদের দেখেছি, মা অনেক সময় ধমকি দেয়; তবুও তারা মায়ের পেছন-পেছনই চলে। মা বলে থাকেন, আমি বড় ব্যস্ত, আমার অনেক কাজ, আমাকে কাজ করতে দাও! ডিস্টার্ব করো না! তবুও শিশু মায়ের পিছু লেগেই থাকে। কখনও-কখনও থাপ্পর মারেন; তারপরও তারা মায়ের পিছু নেয়। আমি দেখেছি, শিশু থাপ্পর খেয়েও মায়ের বুকের সাথেই নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছে। হায়! আমরাও যদি

দুনিয়াতে সকল বিপদাপদে মহান প্রভুর পদতলে এভাবে নিজেদের মাথা অবনত করতাম! আমরাও যদি আল্লাহর দ্বারে এসে পড়ে থাকতাম আর বলতাম, মাওলা! আপনার দ্বার আমি ছাড়ব না। কিন্তু আফসোস, এমনটি হচ্ছে না। বরং উল্টো হচ্ছে। আমাদের থেকে নামাযই কাজা হয়ে যায়। নামাযে মসজিদে আসা হয় না। বলা হয়ে থাকে, ব্যবসায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে, সমস্যা মিটে গেলেই আসব। বাহ্! ব্যবসায় সমস্যা দেখা দিয়েছে, এ কারণে প্রথম যে দরজা বর্জন করেছে, সেটা আল্লাহর দরজা। নিজ ঘরের দরজা তো ত্যাগ করেনি। সেখানে প্রতিদিন যাচ্ছে। শ্বশুরালয়ের দরজাও ত্যাগ করেনি। ত্যাগ করেছে কার দরজা? আল্লাহর দরজা।

চাওয়া অন্যের কাছে, অভিযোগ আল্লাহর কাছে!

মানুষের অবস্থা বড়ই অদ্ভুত। চাওয়ার জন্য হাত পাতে মানুষের কাছে। তারপর যখন মানুষ থেকে কিছু পাওয়া যায় না, তখন মহান প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় যে কাজ হলো না। ভাই! আল্লাহর কাছে দুহাত প্রসারিত করুন। তারপর দেখুন, আমরা যদি উপকরণ ও বস্তুর ওপর এক ছটাক পরিশ্রম করি, তাহলে আল্লাহ থেকে মঞ্জুর করানোর জন্য এক মন পরিশ্রম করা জরুরি। আর বিশ্বজগতের এই বিষয়াদি দিনে পারবর্তন হয় না, পরিবর্তিত হয় রাতে। রাতে আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলনের পর তিনি এর মধ্যে পরিবর্তন করেন। তখন তিনি তাকদিরের ফায়সালা করেন।

ফেরেশ্তাদের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য

ঈমানে মুফাস্সালের মধ্যে তারপর আমরা বলেছি, وَمَلٰٓئِكَتِهٖ (এবং আমি ঈমান আনলাম তাঁর ফেরেশ্তাগণের প্রতি)। উদ্দেশ্য কী ছিল? উদ্দেশ্য ছিল এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুমিনের সাথে ইহজগতের বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা থাক বা না থাক, কিন্তু মুমিন ঈমান ও আমলের ওপর মজবুতির সাথে অবিচল থাকবে আর আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা অবশ্যই তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সাহায্য না কর, তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাই তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাহায্যকারী এবং জিবরাঈলও তাঁর বন্ধু ও সহযোগী। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তা প্রেরণ করে ঈমানদারদের সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং মুমিনমাত্রই এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আমাকে আমার শরীয়তের বিধিবিধানের ওপর দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকতে হবে; তাহলে দুনিয়াবি

ব্যবস্থাপনা অনুকূলে থাক বা প্রতিকূলে, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে (রাযি.) যে বিজয় দান করেছেন, এই অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন এমতবস্থায় যে, তখন তোমরা ছিলে দুর্বল।'[১৭৪]

فضائے بدر پیدا کر! فرشتے تیری نصرت کو

اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

'বদরের পরিবেশ সৃষ্টি করো; ফেরেশ্‌তা তোমার সাহায্যে
এখনও নামতে পারে দলে দলে।'

এখনও ফেরেশ্‌তা অবতরণ করতে পারে যদি আমরা ঈমান আনার পর নেক কাজের ওপর অবিচল হয়ে যাই।

কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য

তারপর ঈমানে মুফাস্‌সালে আমরা বলেছি وَكُتُبِهٖ (এবং ঈমান আনলাম আপনার কিতাবসমূহের ওপর)। এর উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ! আপনার যাবতীয় ইল্‌মের ওপরও আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অর্থাৎ আপনি কুরআনে কারীমে যা-যা বলেছেন সব আমরা মেনে নিয়েছি। আপনি যে বলেছেন, এই-এই কাজ করো, তাতে মঙ্গল ও সফলতা, এই এই কাজ করো না, এগুলোতে অমঙ্গল আর লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সব আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বিশ্বাস করে নিয়েছি, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার সকল বিধিবিধানের ওপর আমাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়।

রাসূলগণের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য

ঈমানে মুফাস্‌সালে তারপর আমরা বলেছি وَرُسُلِهٖ (এবং ঈমান আনলাম তাঁর রাসূলগণের ওপর)। কী উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নেওয়া যে, যদি আমরা রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৭৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩

ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের যথাযথ অনুকরণ করি, তাহলে আমাদের জীবন সফল ও সার্থক হবে আর যদি বিরুদ্ধাচারণ করি, তাহলে জীবন ব্যর্থ হবে।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল।'[১৭৫]

সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মর্যাদা অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, সুন্নাতের অনুসরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে।

কেয়ামত দিবসের ওপর ঈমানের উদ্দেশ্য

ঈমানে মুফাস্সালে তারপর আমরা বলেছি وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (এবং ঈমান আনলাম কেয়ামত দিবসের প্রতি)। কী উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হলো, আমাদের কেয়ামত দেবসের ওপরও বিশ্বাস আছে যে, নেক কাজের বিনিময়ে সেদিন ইজ্জত-সম্মান লাভ হবে, আর মন্দ কাজের বিনিময়ে সেদিন লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা ভাগ্যে জুটবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

'সেদিন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা নবীকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাদের লজ্জিত করবেন না।'[১৭৬]

সুতরাং যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অপমান-অপদস্থ করবেন না। আমরা তো দুজন মানুষের সামনে অপমান সৈহ্য করতে পারি না। স্বামী যদি স্ত্রীকে দুজন মানুষের সামনে ধমক দেয় কিংবা একজনের সামনেও ধমক দেয়, তাহলে কেঁদেকেটে দিন পার করে দেয়। সহ্য হয় না যে, মানুষের সামনে আমাকে ধমক দিয়েছে। তো ভাই! কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে আমাদের আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে, তখন কী অবস্থা হবে?

---

১৭৫. সূরা নিসা : আয়াত ৮০

১৭৬. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

তাই তো জনৈক ব্যক্তি বলেছেন–

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
روز محشر عذر ہائے من پذیر
گر تو می بینی حسابم نہ گیرے
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر

'হে আল্লাহ! আপনি উভয় জগত অপেক্ষা ধনী, আমি ফকির,
কেয়ামতের দিন আমার অপারগতাসমূহ কবুল করে নিয়েন।
আপনি যদি মনে করেন আমার হিসাব নেওয়া অতি জরুরি,
তাহলে নবীজির দৃষ্টির আড়াল করে আমার হিসাব নিয়েন।'

যাতে তাঁর সামনে আমাকে অপানিত না হতে হয়। কেয়ামতের দিন ইজ্জত আর লাঞ্ছনা কী কারণে আসবে এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

তাকদিরের ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য

তারপর আমরা বলেছি–

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

'ঈমান আনলাম ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর।'

কী উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করছি যে, ভালো অবস্থাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। মন্দ অবস্থাও পরীক্ষা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সুতরাং যত ভালো অবস্থাই আসুক না কেন গর্ব করা যাবে না। আবার যত মন্দ অবস্থাই সামনে আসুক ঘাবড়ানো যাবে না। আল্লাহর সত্তার প্রতি এরূপ মজবুত ঈমান রাখতে হবে।

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য

তারপর আমরা বলেছি وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ (এবং ঈমান আনলাম মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি) কী উদ্দেশ্য? যখন কেয়ামতপরবর্তী জীবনের ওপর বিশ্বাস থাকবে, তখন মানুষ পরবর্তী জীবনের জন্যও প্রস্তুতি নেবে। মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুতি নেবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, এই দুনিয়ার

ঘরই সব, তাহলে সারা দিন এর পেছনেই লেগে থাকবে। পরকালীন জীবনের বিশ্বাস থাকলে পরকালের জন্যও আমল করবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে ঘর দান করেন।

আজ ঈমান বানানো জরুরি

ঈমান আনয়নের জন্য যে-কালেমা পড়া হয়, তাতে এসব যাবতীয় বিষয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে অর্জন করতে হয়। আর এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মানুষ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত লাভ করে। সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের ওপর পরিশ্রম করেছেন। তারা বলেন–

تَعَلَّمْنَا الإِيْمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ.

'আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছি তারপর কুরআন শিক্ষা করেছি।'

অর্থাৎ– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সর্বপ্রথম ঈমান শিক্ষা দিয়েছেন, তারপর কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে যেহেতু তাদের ঈমান মজবুত হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুনিয়াতেই সীমাহীন ইজ্জত-সম্মান দান করেছিলেন।

ভূপৃষ্ঠে ঈমানদারদের হুকুম কার্যকর হয়

যখন আল্লাহ তা'আলার ওপর মুমিনের ঈমান মজবুত হয়, বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয়, তখন সেই মুমিন ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার খলীফা হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন, সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত একজন খলীফা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন মর্যাদা দান করেন যে, ভূপৃষ্ঠে তাঁর নির্দেশ কার্যকর হতো। দেখুন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুল আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি এই চারটি পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট। এই সবগুলো পদার্থের ওপর হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর হুকুম কার্যকর হতো।

একবার ভূমিতে কম্পন সৃষ্টি হলো। হযরত ওমর (রাযি.) ভূমিতে পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বললেন, হে ভূমি! তোর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে কেন? ওমর কি তোর ওপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেনি? একথা শোনার পর ভূমির কম্পন বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং ভূমিতে তার হুকুম কার্যকর হলো। একবার জুমার খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন–

يَا سَارِيَةَ الجَبَلَ

অর্থাৎ– বহুদূরে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর প্রতি ইথারে বার্তা পাঠালেন, 'হে মুসলিম বাহিনী! পর্বত নিরাপদ রাখো!'

সাথে-সাথে বায়ু এই বার্তা পৌঁছে দিল। এভাবে বায়ু তার নির্দেশ মেনে চলল।

নীলনদে পানি প্রবাহিত হচ্ছে না। তিনি নীল নদকে লক্ষ্য করে চিঠি লিখলেন, হে নীল! যদি তোর ইচ্ছায় পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে প্রবাহিত হবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রবাহিত হয়, তাহলে আমীরুল মুমিনীন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তুমি প্রবাহিত হও! নীলনদে চিঠি নিক্ষেপের সাথে-সাথে তাতে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। আজও পর্যন্ত সেই নীল নদ প্রবহমান।

পবিত্র মদীনায় এক প্রান্ত থেকে আগুন বের হয়, যাকে 'প্রাচ্যের বিড়াল' বলা হয়। ক্রমান্বয়ে সেই আগুন বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) দিহইয়া কালবি (রাযি.)কে বললেন, যান; সেই আগুনকে ধাক্কা দিয়ে ফিরত পাঠিয়ে দিন। দিহইয়া কালবি (রাযি.) দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। তারপর আগুনের কাছে গিয়ে চাদরখানা আগুনের ওপর চাবুকের মতো ব্যবহার করলেন যেমনভাবে মানুষ কোনো জানোয়ারকে নিজ জায়গায় ফেরত পাঠাতে চাবুক মেরে থাকে। তিনি চাদরের মাধ্যমে আগুনের ওপর চাবুক মারতে থাকেন এবং পেছনে ফেরত পাঠাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় আগুনের সূত্রপাত, আগুন সেখানে ফিরে গেল।

সুতরাং দেখুন, ঈমান মজবুত করার বদৌলতে বাতাসের ওপর হুকুম চলে, পানির ওপর হুকুম চলে, ভূপৃষ্ঠে হুকুম চলে, আগুনের ওপর হুকুম চলে। প্রকৃত বাদশাহি তো এটাই। তাই তো জনৈক কবি বলেন–

ہم فقیروں سے دوستی کرلو
گُر سکھائیں گے بادشاہی کا

'আমরা ফকিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিই
বাদশাহির ফর্মুলা তারা শিক্ষা দেবেন।'

মানুষ যখন আল্লাহমুখী হয় এবং নেক আমল করে, তখন আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রতার মধ্যে তাকে বাদশাহির রং দান করেন।

তাই তো বর্ণিত আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সামনে পড়ল নদী। নদীর ওপারে

শত্রুবাহিনী। আল্লাহর কুদরত দেখুন, তিনি বাহিনীসহ সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকালেন এবং ঘোড়া পানির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। চলতে-চলতে সকলেই নদী অতিক্রম করে ফেললেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা! নদী অতিক্রম করে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) সকলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, কারও কোনো বস্তু নদীতে পড়ে যায়নি তো? এক সাহাবী বললেন, আমার কাঠের একটা পেয়ালা ছিল, সেটি নদীতে পড়ে গেছে। তিনি নদীকে নির্দেশ দিলেন, পেয়ালা ফেরত দাও! সাথে-সাথে পানির একটি তরঙ্গ এসে পেয়ালাটা তীরে রেখে গেল।

لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا

حکم دیتا تھا دریا کو، رستہ چوڑ دیتا تھا

'যখন নারায়ে তাকবীর লাগাত, তখন খায়বার খণ্ডবিখণ্ড করে দিত,
নির্দেশ দিত নদীকে, নদী রাস্তা করে দিত।'

অতএব, ঈমান মজবুত করার পর আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুনিয়াতেও এরূপ সফলতা দান করেন।

অন্য উম্মতের ওপর উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব

এখানে ছাত্রদের জন্য কতিপয় ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষণীয়।

ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল নদী অতিক্রম করেছিল। তারপর সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নদী অতিক্রম করেছিলেন। দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য দেখুন। অন্তরের কানে শুনুন। মনোযোগ সহকারে শুনুন। হযরত মূসা (আ.) যখন নীলনদের তীরে পৌঁছলেন, তখন পেছনে ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হচ্ছে, যার বিবরণ আল্লাহ কুরআনে কারীমে এভাবে দিয়েছেন–

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

'তারপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথিরা বলতে লাগল, আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম।'[১৭৭]

এ-সময় হযরত মূসা (আ.) বললেন–

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

---

১৭৭. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬১

'কস্মিনকালেও নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন, তিনি অচীরেই আমাকে মুক্তির পথ দেখাবেন।'[১৭৮]

এখানে হযরত মূসা مَعِيَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলেছেন 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে আছেন।' অর্থাৎ– শুধু নিজের কথা বলেছেন। বোঝা গেল, নবীর সাথে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নদীতে বারোটি রাস্তা তৈরি করে দিলেন। বারোটি রাস্তা দিয়ে বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র নদী অতিক্রম করল।

অপর দিকে উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ দেখুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় ছাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসন্ধানকারী কাফেরদের একটি দল তাঁকে সন্ধান করতে-করতে সেই গুহার মুখে পৌঁছে গেল। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) তাদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা সামান্য মাথা নিচু করলেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ফেলবে। না-জানি তারা মাথা নিচু করে দেখে ফেলে এবং রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়! মায়ের যেমন সন্তানের প্রতি মহব্বত বেশি থাকে, ফলে সন্তানের ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এরও রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ছিল অত্যধিক, তাই পেরেশানিও তাঁর বেশি ছিল। হযরত রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) খুবই উদ্বিগ্ন, তখন কুরআনে কারীমের আয়াতের মধ্যে বলে দেওয়া হলো–

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

'আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'[১৭৯]

এখানে হযরত আবুবকর সিদ্দীকও (রাযি.)কে আল্লাহ তা'আলার সহচরত্বে শামিল করা হয়েছে। এই বড় সাহচর্য শুধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং তাঁর উম্মতের সিদ্দীকদেরও সাথেও রয়েছে। তাই তো مَعَنَا (আমাদের সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই হলো একটি বিষয়।

---

১৭৮. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬২

১৭৯. সূরা তাওবা : আয়াত ৪০

দ্বিতীয়টি দেখুন, হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্ন দেখলেন। পিতাকে স্বপ্নের বিবরণ দিলেন, 'আমি এগারোটি নক্ষত্র দেখেছি। কুরআনে কারীমে ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

'স্মরণ করুন সেই সময়টি যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলল, হে পিতা! নিশ্চয়ই আমি দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য; সেগুলোকে আমি দেখেছি তারা আমাকে সেজদা করছে।'[১৮০]

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝে গেলেন এবং নিজ আদরের সন্তান ইউসুফকে বললেন–

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

'অনুরূপভাবে তোমার প্রভু তোমাকে বিশেষভাবে মনোনীত করবেন।'[১৮১]

এখানে ভবিষ্যত কালের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'মনোনীত করবেন'। দেখুন, বক্তাও আল্লাহর নবী, যার শানে বলেছেন, তিনিও ভবিষ্যৎ নবী। কিন্তু ভবিষ্যৎকালীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদির ব্যাপারে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বর্তমানকালীন শব্দও ব্যবহার করেননি। ব্যবহার করেছেন অতীতকালীন শব্দ। ইরশাদ করেছেন–

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

'তিনি (প্রভু) তোমাদের বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।'[১৮২]

এখানে অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের বিশেষভাবে মনোনীত করে নিয়েছেন'। আল্লাহু আকবার! এই উম্মতকে তিনি কত মর্যাদা তিনি দান করলেন!

তৃতীয় নম্বরে দেখুন। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ঘোড়ায় চড়ে নদী অতিক্রম করেছেন এবং হযরত মূসা

---

১৮০. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪

১৮১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৬

১৮২. সূরা হজ্জ : আয়াত ৭৮

(আ.)-এর সম্প্রদায়ও নৌকা, জাহাজ এবং সেতু ছাড়া নদী অতিক্রম করেছেন। দুই ঘটনার মাঝে পার্থক্য দেখুন। লক্ষ্য করুন, মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সাথে তখনকার নবী স্বয়ং মূসা (আ.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে নদী অতিক্রম করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের ঘটনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান নেই; শুধু সাহাবাদের জামাত। এখানে এমন হয়নি যে, নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে নদী পাড়ি দিয়েছেন। যেমনটি মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে.। সাহাবায়ে কৈরাম নবীর সঙ্গ ছাড়াই নদী পাড়ি দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তাদের ঘোড়াগুলোও নিয়ে গেছেন।

আরও পার্থক্য দেখুন। সাইয়্যিদুনা হযরত মূসা (আ.)কে তাঁর রূহানি শক্তি তূর পর্বতে নিয়ে গেল, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

'মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে তূর পর্বতে এল।'[১৮৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর সাথে তার কথোপকথনের ঘটনা বর্ণনায় বলেছেন, মূসা (আ.) নিজে ঘটনাস্থলে এসেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে আকদাস হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

'পরম পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন।'[১৮৪]

হযরত মূসা (আ.)-এর বেলায় বলা হয়েছে, 'সে এসেছে'। আর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় বলা হয়েছে, 'সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে'। এরূপই তো হয়ে থাকে– না! কারও সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে, দেখা হলে বলা হয়ে থাকে, 'আমার বাসায় সাক্ষাতের জন্য আসবেন'। অন্যদিকে বাল্যকালের প্রিয় সহপাঠী বন্ধুর সাথে দেখা হলে বন্ধুর হাত ধরে বলা হয়, বাসায় চলো বন্ধু! বাসায় একসাথে আহার করব। একজনের ক্ষেত্রে বাসায় আসার কথা বলা হয়। আরেকজনকে

---

১৮৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩

১৮৪. সূরা ইসরা : আয়াত ১

হাত ধরে বাসায় নিয়ে আসা হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে পাঠিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

আরও দেখুন, হযরত মূসা (আ.) দু'আ করেন–

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

'হে আমার প্রভু! আমার অন্তর খুলে প্রশস্ত করে দিন!'[১৮৫]

পক্ষান্তরে হযরত রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কী হলো? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

'আমি কি আপনার অন্তর খুলে প্রশস্ত করে দেইনি?'[১৮৬]

আরও দেখুন, হযরত মূসা (আ.) স্বীয় ভাই হারূনকে রেখে তূর পর্বতে যান। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর কথা মান্য করেনি। এতে তিনি ভীত হয়ে পড়েন, না জানি আমাকে দোষারোপ করা হয়। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বত থেকে ফিরে অবস্থা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং কঠোরতা প্রদর্শন করেন। এমনকি হযরত হারূন (আ.)কে একথা পর্যন্ত বলতে হলো–

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي.

'হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরবেন না!'[১৮৭]

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে দুনিয়াতে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজির মনোনীত করলেন। আর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) দীনে মুহাম্মাদীর ওপর এত অবিচল ছিলেন, যা বর্ণনাতীত। দেখুন, রোমের বাদশাহ হেরাক্‌ল দুই লাখ সৈনিকের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছিল। তাদের মোকাবেলা করার জন্য রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটি বাহিনী গঠন করেন। সেই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন হযরত উসামাকে (রাযি.)কে। রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বাহিনী পাঠিয়েও দিয়েছিলেন।

---

১৮৫. সূরা তাহা : আয়াত ২৫

১৮৬. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ১

১৮৭. সূরা তাহা : আয়াত ৯৪

কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় বাহিনী কিছুদূর গিয়ে যাত্রা বিরতি দেয়। তারপর রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তি কাল করলে সেই বাহিনী ফিরে আসে।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) খলীফা মনোনীত হন। এ অবস্থায় হযরত উসামা (রাযি.)-এর বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি কঠিন বিষয় ছিল। যেহেতু দুশমন দুই লাখ সৈনিকের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম বড়ই উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ভাবছিলেন, হয়তো বাহিনী এখনই প্রেরণ না করা হোক। যদি প্রেরণ করা হয়, তাহলে বড় অভিজ্ঞ কোনো সাহাবীকে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করা হোক। হযরত উসামা (রাযি.) অল্প বয়স্ক যুবক। তাই সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে এই পরামর্শ দিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) এগিয়ে এসে বললেন, আবুবকর! আপনি যদি বাহিনী প্রেরণ করেন, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আগত দুশমন মদীনার মহিলাদের না আবার নিয়ে যায়! হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) ওমর (রাযি.)-এর বুকে হাত রেখে বললেন–

الْجَبَّارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِخْوَارٌ فِي الْإِسْلَامِ

'অন্ধকার যুগে এত বীর বাহাদুর ছিলেন, ইসলামে এসে আপনি এত দুর্বল হয়ে গেলেন!'

তারপর বললেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব? দীনের মধ্যে ত্রুটি এসে যাবে, আর আমি আবুবকর জীবিত থাকব! এটা কীভাবে সম্ভব, যাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, আমি তার স্থলে আরেকজনকে নিযুক্ত করব!

আরও বললেন, 'ওমর! যদি আমাকে একাও যেতে হয়, তবুও আমি যাব এবং আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করব।' এ-ও বললেন, 'আমার যদি নিশ্চিত বিশ্বাসও হয় যে, জঙ্গল থেকে হিংস্র জানোয়ার এসে মদীনার মহিলাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তাদের লাশ ক্ষতবিক্ষত করবে, আমি তা-ও মেনে নেব; কিন্তু এই বাহিনী আমি আল্লাহর রাস্তায় অবশ্যই পাঠাব। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর অবিচলতায় হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, যেন একজন নবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অবিচল থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) প্রিয় রাসূলে আরাবীর সান্নিধ্যে থাকার হক আদায় করে গেলেন।

দেখুন, যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নির্দেশ হলো, আপনি আপনার স্বজাতি নিয়ে দুশমনের মোকাবেলায় অমুক দেশে প্রবেশ করুন; বিজয় আসবে, তখন বনী ইসরাঈলের সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বসে পড়ল এবং বলতে লাগল–

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

'আপনি আর আপনার প্রভু যান এবং আপনারা দুজনই যুদ্ধ করুন; আমরা এখানে উপবিষ্ঠ আছি।'[১৮৮]

পক্ষান্তরে রাসূলে আকদাস হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে বদর ময়দানে দাঁড়িয়ে যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সামনে অস্ত্রসজ্জিত বিশাল বাহিনী। বলুন, আমরা কী করব? হযরত সা'দ (রাযি.) দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা আপনার গোলাম; আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দেব ইনশাআল্লাহ। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো নই, যারা তাদের নবীকে বলেছিল, আপনি আর আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসলাম। আমরা কোনো অবস্থতেই আপনার সঙ্গ ছাড়ব না। আমরা তো আপনার জন্য জান বিসর্জনকারী।

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলে আরাবীকে কেমন মজবুত ঈমান ও অবিচলতার অধিকারী জামাত দান করেছিলেন। যেমন– ছাত্রের কামালাত দ্বারা ওস্তাদের পরিচয় লাভ করা যায়, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের কামালাত দ্বারা রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সামনে ভেসে ওঠে।

নিজের ওপর মেহনত করা জরুরি

সুতরাং আমরা যদি উত্তম জীবন যাপন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে নিজেদের ওপর পরিশ্রম করতে হবে। আর এই পরিশ্রম আমরা কীভাবে করতে পারি? এজন্য আমাদের দীনী সকল আমল যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। আজকের যে সমাবেশ, এর সারনির্যাস ও সারকথা হলো, আমরা ঈমান এনেছি এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈমানের দাবি অনুযায়ী

---

১৮৮. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৪

আমল এখনও বাকি। সেই আমলের মধ্যে আমরা পরিশ্রম করব এবং নিজেদের জীবনকে নেক আমল দ্বারা সুসজ্জিত করব। মানুষ যেমনভাবে হারানো বস্তু অনুসন্ধান করে, আমরা দীনি আমলগুলোকে সেভাবে অনুসন্ধান করব এবং যথাযথভাবে পালন করব।

তিনটি কথা লোহার বেড়া

আমাদের আকাবিরীনে কেরাম বলেছেন, তিনটি কথা লোহার গ্রিল। (লোহার গ্রিল যেমন মজবুত, তেমন মজবুত)। একটু মনোযোগের সাথে শুনুন!

১.

مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ الدُّنْيَا

'যেব্যক্তি পরজগতের জন্য আমল করে, তার ইহজগতের সকল কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হয়ে যান।'

আল্লাহ তা'আলা দায়িত্ব নিয়ে নেন। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো, আমি আল্লাহ তোমাদের ইহকালের সকল কাজে পৃষ্ঠপোষক আছি।

২.

مَنْ أَصْلَحَ سَرِيْرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانِيَّتَهُ

'যেব্যক্তি নিজের অভ্যন্তর পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহ তা'আলা তার বাহ্যিক পরিশুদ্ধ করে দেন।'

অর্থাৎ– যেব্যক্তি নিজের গোপন বিষয়াদি সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার বাহ্যিক বিষয়গুলোকেও সংশোধন করে দেন।

৩.

مَنْ أَصْلَحَ فِيْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

'যেব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক ভালো রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো করে দেন।'

অর্থাৎ– যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের সুসম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা মানবসহ সকল সৃষ্টজীবের অন্তরে তার মহব্বত ঢেলে দেন। তার ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো করে দেন। সুতরাং বোঝা

গেল, মেহনত তো আমাদের নিজের ওপর করা চাই। আমরা যদি মেহনত করে নিজেদের অভ্যন্তর সংশোধন করে নেই, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক সংশোধন করে দেবেন। আমরা যদি মেহনত করে, নিজের ও আল্লাহর মাঝে মহব্বতের সুসম্পর্ক স্থাপন করে নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্য মানুষের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন। আমরা যদি নিজেদের পরকালের জন্য মেহনত করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়াবি সকল কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে দেবেন।

অতএব, আমাদের মেহনতের ময়দান কোনটি হলো? আমাদের প্রত্যেকের নিজ সত্তা। কিন্তু আজ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অন্য মানুষের প্রতি। তাদের দোষত্রুটি খুঁজে ফিরি এবং বলে ফিরি। হায় আফসোস! অন্যদের ওপর পড়া দৃষ্টি বন্ধ হয়ে এই দৃষ্টি যদি নিজেদের ওপর পড়ত, যদি আমরা নিজেদের মধ্যে কী-কী দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে আছে তা খুঁজে ফিরতাম! এই গরদান নত করা বড়ই কঠিন হয়ে গেছে। গরদান নত হতে চায় না। তাই চোখ কেবল অন্যদের দেখে। নিজের ওপর চোখের দৃষ্টি পড়ে না।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাসমূহের প্রতি বিশ্বাস

সারনির্যাস এই বের হলো যে, বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া; এটা মানুষের অভিজ্ঞতা। অপরদিকে আমলের মধ্যকার ক্রিয়া, এটি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। ভাই! নিজ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা আল্লাহর ওয়াদার ওপর অধিক ভরসা থাকা চাই। আমরা যদি নিজ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুতে হাত লাগানো থেকে বিরত থাকি, বিষ পান পরিহার করে চলি, বরং এগুলো ক্ষতিকর বলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা গুনাহ করলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেতে হবে', তার ওপর ভিত্তি করে আমরা কেনো গুনাহ পরিহার করছি না? সুতরাং আমাদের জন্য জরুরি হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা। এই যে মানুষ গুনাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন।

নেওয়ার মানসিকতা

আজ সমগ্র বিশ্ব সফর করে দেখুন। বর্তমানে মানুষের মধ্যে শুধু নেওয়ার মানসিকতা কাজ করছে। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিতে চায় আর পেতে চায়। যে কারও থেকে নিতে আর পেতে আগ্রহী। তাই তো মানুষ মিথ্যা বলে, সুদ

খায়, ঘুস খায়, প্রতারণা করে, আমানতে খেয়ানত করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, মাপে কম-বেশি করে। আর এসবই নেওয়া ও পাওয়ার মানসিকতার প্রমাণ।

দেওয়ার মানসিকতা

আর ইসলামি শরীয়তকে দেখুন, মুমিনকে বলছে, তুমি দেওয়ার মানসিকতা বানাও। ইয়া আল্লাহ! দেওয়ার মানসিকতা! হ্যাঁ, বলা হচ্ছে, তোমরা মুমিন হলে নেওয়ার মানসিকতা রাখবে না, দেওয়ার মানসিকতা রাখবে। কীভাবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ.

'তোমরা নামায আদায় করো, যাকাত দাও আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।'[১৮৯]

এরূপ কুরআনে কারীমের অনেক আয়াতে নামায পড়ার নির্দেশের সাথে-সাথে যাকাত দেওয়ারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের সম্পদে ফকির-মিসকিনদের হক রয়েছে–

وَالَّذِينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'আর যাদের সম্পদে নিদিষ্ট অধিকার এবং অংশ রয়েছে বঞ্চিত ও ভিক্ষুকদের জন্য।'[১৯০]

আল্লাহ তা'আলা যাকাত দিতে বললেন। আচ্ছা যাকাত দেওয়া হলো। তারপর তিনি বললেন, জমিতে ফসল ফলাও, ওশর তথা ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দান করো! আচ্ছা ওশরও দেওয়া হলো। তারপর বললেন, আল্লাহর রাস্তায় নফল সদকাও দাও। নফল দান-খয়রাতও করো। আচ্ছা, সদকাও করা হলো। এবার বলছেন, অন্যকে হাদিয়া-উপঢৌকনও দাও।

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া আদান-প্রদান করো; তাহলে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।'

---

১৮৯. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৩

১৯০. সূরা মা'আরিজ : আয়াত ২৪, ২৫

এভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম মুমিনদের দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

আয় আল্লাহ! আপনি মুমিনকে বলছেন, দাও দাও! ঠিক আছে দেবে, কিন্তু নেবে কোথা থেকে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাগণ! কথা বোঝো। আমার সামনে হাত প্রসারিত করো, আমি তোমাদের থলে ভরে দেব। তারপর তোমরা মানুষের মাঝে বণ্টন করবে। তোমরা আমার কাছে চাইবে, আমার প্রিয় হয়ে যাবে। তারপর তোমরা মানুষকে দেবে, তাদের কাছেও প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। সম্মানজনক জীবন যাপনের পদ্ধতি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা আমি আল্লাহ থেকে নাও, আল্লাহর সৃষ্টজীবকে দাও। তাই ইসলাম মানুষের মাঝে দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করে।

সুতরাং আমরা নিজ জীবনের সকল গুনাহ বেছে-বেছে শেষ করি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আয় আল্লাহ! যত গুনাহ আমরা করেছি, সকল গুনাহ আপনি ক্ষমা করে দিন, মাফ করে দিন!

খাঁটি তাওবার কারিশ্‌মা

প্রত্যেক মানুষের প্রতিটি গুনাহের ওপর কেয়ামতের দিন চারটি সাক্ষী দাঁড়াবে।

১. কেরামান কাতিবীন ফেরেশ্‌তাগণ।

২. নিজ-নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

৩. জমিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

'সেদিন জমিন তার সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে এ নির্দেশ দেবেন।'[১৯১]

৪. নিজ-নিজ আমলনামা।

কিন্তু মানুষ যখন খাঁটি তাওবা করে নেয়, তখন আর কোনো সাক্ষীই থাকে না।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللهُ حَفَظَه ذُنُوْبَه وَأَنْسَى ذٰلِكَ جَوَارِحَه وَمَعَالِمَه مِنَ الْأَرْضِ.

---

১৯১. সূরা যিলযাল : আয়াত ৪, ৫

'বান্দা যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা কেরামান কাতিবীন ফেরেশ্‌তাগণকে তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ ভুলিয়ে দেন, জমিনের যে অংশে গুনাহ করেছে, তাকেও তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন।'

حَتّٰى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدًا مِّنَ اللهِ بِذَنْبٍ.

'এমনকি সে আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মুলাকাত করে যে, তার বিপক্ষে গুনাহের কোনো সাক্ষী নেই।'

ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয়

এখানে ছাত্রদের জন্য দুটি ইল্‌মি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। দুনিয়ার আদালতে যদি কারও নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং তদন্তকারী তদন্তে নিশ্চিত হয় যে, মামলা মিথ্যা, তাহলে আদালত রায় দেবে, আমরা সসম্মানে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিলাম। যদি আদালতকে বলা হয়, রেকর্ড থেকে মামলাটি মুছে দিন, তাহলে আদালত বলবে, না, রেকর্ড মোছা যাবে না। রেকর্ড সংরক্ষণ করা আইনত জরুরি। তাই সারা জীবন এই রেকর্ড থেকেই যাবে যে, মামলা হয়েছিল। অথচ, মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও আদালত রেকর্ড মুছে দিতে সম্মত নয়। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলার মু'আমালা দেখুন। এক ব্যক্তি গুরুতর অপরাধী। বড়-বড় গুনাহ করেছে। আল্লাহর দরবারে 'রহম করার' আপীল করল, খাঁটি তাওবা করল এবং বিনীত নিবেদন করল, আমার প্রভু! আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত আমার তাওবা কবুল করুন! আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমগ্র জগতের মহান প্রতিপালক, আমি শুধু তাকে সসম্মানে মুক্তিই প্রদান করি না, আমি তার রেকর্ডও আমলনামা থেকে মুছে দিই।

আমলনামা থেকে এই রেকর্ড মুছে দেওয়ার পেছনে হেকমত কী? মনোযোগের সাথে শুনুন।

প্রথম কথা হলো, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মুমিন তার আমলনামা অন্যকে পড়তে দেবে, বলবে আমার আমলনামা দেখো। এ-মর্মে কুরআনে কারীমে ঘোষণা হয়েছে–

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ (١٩) اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠)

'যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা অন্যদের বলবে, আমার আমলনামা দেখো এবং পড়ো! আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিলাম, অবশ্যই আমি হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হব।'[১৯২]

নিকটতম লোকদের নিজ-নিজ আমলনামা দেখাবে। সুতরাং যদি গুনাহের রেকর্ড আমলনামা থেকে না মোছে, তাতে শুধু মাফের দাগ দেওয়া হয়, তাহলে যারা আমলনামা দেখবে, তারা তার গুনাহ সম্পর্কে জেনে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি যে-গুনাহ করেছ, আমি যদি আমলনামায় তাতে মাফের নিদর্শন লাগিয়ে দেই, দাগ দিয়ে দেই, তবে তো যারা তোমার আমলনামা দেখবে, তারা তোমার গুনাহ সম্পর্কে জেনে যাবে আর বলবে, মিয়া! গুনাহ তো অনেক করে বসেছিলে, অবশ্য মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমার বান্দা ক্ষমা প্রার্থনার পর এটাও তার জন্য লজ্জাজনক। আমি তোমাকে এই লজ্জা থেকেও পরিত্রাণ দিচ্ছি। আমি তোমার আমলনামা থেকে সকল গুনাহ সমূলে মুছে দিচ্ছি। কেউ কখনও জানবে না, তুমি কোনো গুনাহ করেছিলে কি-না।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে দেওয়ার কাজটি তিনি কীভাবে করেন এ-ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে أَنْسَىٰ اللهُ حَفَظَهُ (তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন)। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং গুনাহ ভুলিয়ে দেওয়া এবং মুছে দেওয়ার কাজটি করেন। ভাই! এই কাজ তো তিনি ফেরেশ্‌তাগণ দ্বারাও করাতে পারতেন। দুনিয়ার বিচারপতিদের বিচারসংক্রান্ত কোনো কাজ সামনে এলে, তারা পেশকারদের দিয়ে তা করান। তারা শুধু আদেশ দেন, ভাই অমুক কাজ করো; তারপর পেশকাররাই সব করে। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাগণকে বলছেন না, অমুক কাজটি করো। তিনি বলছেন, আমি মিটিয়ে দিই, আমি ভুলিয়ে দিই। তোমাদের গুনাহ মাফ করা এবং তা মুছে ও ভুলিয়ে দেওয়ার কাজ আমি নিজে এজন্য করি যে, যদি ফেরেশ্‌তা দ্বারা এই কাজ করাই, তাহলে ভবিষ্যতে ফেরেশ্‌তাগণ তোমাদের আমলনামা হাতে নিয়ে বুঝে যেত প্রকৃত ঘটনা কী। তারা অনুগ্রহ প্রকাশ করত, আমরা তোমাদের গুনাহ মুছে দিয়েছি। না হলে, তোমাদের আমলনামায় গুনাহ ছিল। তখন তোমরা ফেরেশ্‌তাদের অনুগ্রহের খোঁটার শিকার হতে হতো অথবা তাদের তিরস্কার শুনতে হতো। তাই তোমাদের গুনাহ ফেরেশ্‌তাগণকে ভুলিয়ে দেওয়া এবং আমলনামা থেকে মুছে দেওয়ার

---

১৯২. সূরা আল-হাক্কা : আয়াত ১৯, ২০

কাজটি আমি নিজে করে থাকি। তোমরা আমার সাথে বন্ধুপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করো; তাহলে তোমাদেরকে ফেরেশ্‌তাগণের তিরস্কারও শুনতে হবে না, তাদের অনুগ্রহের খোঁটারও শিকার হতে হবে না। এত পরম দয়ালু আমাদের মনিব! আল্লাহু আকবার কাবীরা!

তাওবার সর্বব্যাপী দু'আ

এজন্য আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন, যখন কোনো বান্দা গুনাহ থেকে তাওবা করবে, তখন আমার কাছে এই দু'আ করবে–

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا.

'আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন!'[১৯৩]

وَاعْفُ عَنَّا অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহের চিহ্ন মিটিয়ে দিন, আমার মন্দ কাজগুলোকে ঢেকে দিন, যাতে করে কেয়মতের দিন আমাকে অপমানিত না হতে হয়।

وَاغْفِرْ لَنَا এবং ভালো আমলগুলোকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিন। সতুরাং وَاعْفُ عَنَّا দ্বারা গুনাহ মিটিয়ে দিন, وَاغْفِرْ لَنَا দ্বারা নেক আমলগুলোকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিন। তারপর একটি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। বলেছেন, তোমরা বলো وَارْحَمْنَا (আয় আল্লাহ! আমাদের ওপর অনুগ্রহও করুন।)। এই وَارْحَمْنَا কেন নিয়ে এলেন? এজন্য যে, পিতা ছেলের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে ছেলেকে খরচ দেওয়া বন্ধ করে দেন। এমনকি ছেলের সাথে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। কিন্তু ছেলে যদি পিতার পা ধরে ফেলে, তাহলে তিনি তার প্রতি খুশি হয়ে তাকে মাফও করে দেন, খরচও চালু করে দেন, বরং ক্ষমা চাওয়ায় পকেটখরচ বৃদ্ধি করে দেন। পিতা যদি এমনটি করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক তিনি তো অবশ্যই এর চেয়ে বেশি করবেন। তাই তিনি শিক্ষা দিলেন, তোমরা বলো, ইয়া আল্লাহ! পিতাকে খুশি করলে পকেটখরচ চালু হয়ে যায়, এখন আমরা প্রভুকে খুশি করলাম; আপনিও আমাদের পকেটখরচ চালু করে দিন।

কোন পকেট খরচ? وَارْحَمْنَا ওয়ালা পকেটখরচ।

---

১৯৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬

চারটি পুরস্কার

মুফাস্সিরীরে কেরাম লিখেছেন وَارْحَمْنَا (হে প্রভু আমাদের দয়া করুন) এর অধীনে চারটি পুরস্কার পাওয়া যায়।

প্রথম পুরস্কার : প্রথম পুরস্কার হলো ইবাদাতের তাওফীক, যা গুনাহের কারণে হারিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাওবা করার পর ইবাদাতের তাওফীক দ্বিতীয়বার দান করেন। গুনাহ করার কারণে ইবাদাত করার তাওফীক বা শক্তি হারিয়ে যায়। নামায পড়া কঠিন হয়ে যায়। তেলাওয়াত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তাহাজ্জুদ তো সীমাহীন কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। গুনাহ করার পর সেই যে তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা বলেন, এখন তুমি সংশোধন করেছ, আমার বন্ধু হয়েছ; কাজেই আবার আমি তোমাকে ইবাদাতের তাওফীক দিচ্ছি।

দ্বিতীয় পুরস্কার : আল্লাহ তা'আলা বলেন– গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকার কারণে তোমার রিযিকের মধ্যে অস্থিরতা আর টালমাটাল ছিল। তাওবা করার পর এখন আমি তোমাকে সুস্থির ও প্রশান্তির রিযিক দিচ্ছি, প্রশস্ত রিযিক দিচ্ছি। প্রশান্তির রিযিক গ্রহণ করো এবং তা ভোগ করে নেক আমল করো। আল্লাহর রাস্তায় যাও এবং প্রাণভরে আমার ঘর দেখে নাও। এজন্যই এখন তুমি খরচ পেয়ে গেছ। খরচ পাওয়ার পর এখন হজ ও ওমরা করো, আমার প্রিয় রাসূলে আরাবীর রওজা মুবারকে হাজিরা দাও এবং নামায পড়ো।

তৃতীয় পুরস্কার : তৃতীয় পুরস্কার হলো, গুনাহ যত বেশিই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা সব ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা হিসাব ছাড়া গুনাহ মাফ করেন। হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করান। ইয়া আল্লাহ! হিসাব ছাড়া কীভাবে হবে? বিষয়টি বুঝুন। আমি একবার হজের সফরে বিমানবন্দরে দেখলাম, কাস্টমকর্মীরা প্রত্যেকের আসবাবপত্র চেক করে নিশানা লাগিয়ে দিচ্ছে। যখন আমি সাথিদের নিয়ে গেলাম, তখন আমাদের নিঃস্ব অবস্থার ওপর তাদের দয়ার উদ্রেক হলো। আসবাব ট্রলির ওপর ছিল। ট্রলিতে রেখেই নিশানা লাগিয়ে দিল। ওজন করল না। বলল, যান। ভাই! জান্নাতে আমরা হিসাব ছাড়া এভাবেই যাব। যদি দুনিয়াবাসী ওজন না করেও পারমিট দিয়ে নিশানা লাগিয়ে দিতে পারে, আল্লাহ তা'আলাও কেয়ামতের দিন হিসাব ছাড়াই নিশানা লাগিয়ে বলবেন, যাও; হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করো।

চতুর্থ পুরস্কার : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশকে অতি সহজ করে দেবেন। জান্নাতে প্রবেশ কীভাবে সহজ হবে? হাদীছ শরীফে অত্যন্ত বিস্ময়কর আলোচনা এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডাকবেন। তার চারপাশে রহমতের একটি পর্দা টেনে দেবেন। তারপর তার জীবনের বড়-বড় সকল গুনাহ্ গণনা করাবেন। এই গুনাহ্, সেই গুনাহ্। তুমি অমুক করেছ? তমুক করেছ? লোকটি বলবে, হ্যাঁ করেছি। এটাও করেছ তুমি? হ্যাঁ, করেছি। সেটাও করেছ তুমি? হ্যাঁ করেছি। অমুকটি তুমি করছিলে? হ্যাঁ, করছিলাম। এভাবে গণনায় তার এত বেশি গুনাহ্ ধরা পড়বে যে, লোকটি মনে-মনে চিন্তা করবে, আজ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা! তুমি গুনাহ্ তো করেছ, কিন্তু সাথে-সাথে তুমি আমার কাছে দু'আ করতে, ভালো হওয়ার চেষ্টাও করতে, আমি তোমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে তোমার সমস্ত গুনাহ্কে নেকিতে পরিবর্তন করে দিলাম। তারপর রহমতের যে-পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছিল, সেটি সরে যাবে। সমস্ত মানুষ দেখবে, এই লোকটির আমলনামায় কোনো গুনাহ্ নেই। তারা চিন্তা করবে, লোকটি হয়তো কোনো নবী কিংবা সিদ্দীক, যিনি জীবনে কখনও কোনো গুনাহের কাজ করেননি। আল্লাহ্ তা'আলা এত বড় গুনাহগারকেও এমন উচ্চ আসনে আসীন করবেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

সুতরাং وَارْحَمْنَا এর অধীনে আল্লাহ্ তা'আলা এসব বড়-বড় নেয়ামত দান করবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সবশেষে বলতে বলেছেন اَنْتَ مَوْلٰنَا (আপনিই আমাদের মনিব, আপনিই আমাদের বন্ধু)।

হ্যাঁ,

اَنْتَ مَوْلٰنَا, اَنْتَ سَيِّدُنَا, وَمَالِكُنَا وَمُتَوَلِّي الْاُمُوْرِ.

সত্যিকারার্থে আপনিই আমাদের মনিব, আপনি আমাদের সরদার, আপনি আমাদের মালিক এবং সকল বিষয়ের যিম্মাদার।

দেখুন, এক দু'আ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার ওপর কত কিছু সহজ করে দিলেন, কত রহম ও করম বর্ষণ করলেন!

মাস্টার পিস কীভাবে হয়?

সুতরাং আমাদের উচিত নিজেদের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা, নিজেদের আমল পরিশুদ্ধ করা। আমরা যখন পরিশুদ্ধ হব, আল্লাহ্ আমাদের দীন

প্রসারের মাধ্যম বানাবেন। যেদিক যাব অমুসলিম লোকজন অবয়ব দেখে কালেমা পড়ে মুসলমান হতে বাধ্য হবে। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমেরি (রহ.) একবার বাঙলা মুলুক সফর করেছিলেন। তার সেই সফরে সাত লাখ অমুসলিম কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল, সত্তর লাখ গুনাহগার তাঁর হাতে তাওবার বাই'আত গ্রহণ করেছিল। যেমন– কোনো কারিগর একটি বস্তুর মাস্টার পিস তথা মডেল কপি প্রস্তুত করে দেয়। মানুষকে সেটা দেখিয়ে কেমন হয়েছে এই মর্মে তাদের মতামত নিয়ে থাকে। তারপর এর অবিকল হাজার-হাজার, লাখ-লাখ পিস তৈরি করা হয়। ঠিক যেন তেমনি যেব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা মাস্টার পিসের মর্যাদা দিয়ে তাকে সমগ্র দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেন। বিশ্বের সকল মানুষকে দেখিয়ে বলেন, দেখো, তোমরাও তো আজকের এই যুগে এমন হতে পারবে? তারপর আল্লাহ তা'আলার সেই ব্যক্তির জন্য সকল রাস্তা খুলে দেন।

স্মরণ রাখবেন, বর্তমান এই সময়ে যারা দীনের ওপর চলবে, দীনের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখবে, তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। কেননা, বর্তমানে দীন এতিম হয়ে গেছে। মনে রাখবেন, হযরত হালীমা সা'দিয়া (রাযি.) মক্কার এতিম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন বিধায় যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘর রহমত দ্বারা ভরে দিয়েছিলেন, তেমিনভাবে আমরা যদি এই দীনকে বুকে জড়িয়ে নিই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঘরবাড়ি এবং মাদরাসাসমূহকেও রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন। মানুষের অন্তরে আমাদের প্রতি এমন মহব্বত ঢেলে দেবেন যে, ভবিষ্যতে মানুষ আমাদের কবরে গড়াগড়ি খেয়ে কান্নাকাটি করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবন পরিশুদ্ধকারী মেহনত করার তাওফীক দান করুন। ঈমানদারদের কাছে নিজের কৃত গুনাহের জন্য লজ্জা ও অনুতাপের ক্রন্দন একটি বড় নেয়ামত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'মুমিনের চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে যে অশ্রু ঝরে, সেই অশ্রু তার জন্য সমগ্র বিশ্ব এবং তাতে যা কিছু আছে সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর স্মরণে কান্নাকাটি করার সৌভাগ্য দান করুন, কেয়ামত দিবসের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করুন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

দুনিয়ার স্বরূপ

'খেল-তামাশা ঘন্টা দুই ঘন্টার বিষয়। দুনিয়ার জীবনও এমনই। মানুষ যখন বিদায় নিতে থাকে, তখন তার অনুভূত হয়, আমি দুনিয়াতে সকালের সামান্য সময় কিংবা বিকালের সামান্য সময় অবস্থান করেছি। জাহান্নামি কেয়ামতের দিন বলবে, 'আমরা দুনিয়াতে খুবই সামান্য সময় অবস্থান করেছি।' আমরা যদি নিজেদের অতীত জীবন কল্পনা করে দেখি, তাহলে জীবনের গত হওয়া পঞ্চাশটি বছর একটি স্বপ্নের মতো মনে হয়। মনে হয় যেন শৈশব-কৈশোর এই গতকালের কথা।'

দুনিয়ার স্বরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ○

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

পরকালীন সফরের মুসাফির

দুনিয়া আমলের স্থান আর পরকাল প্রতিদানের স্থান। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, পরকাল চিরস্থায়ী। দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানির জায়গা, পরকাল আনন্দ উপভোগের জায়গা। আমরা সকলেই এখানে মুসাফির। আমরা সুখে থাকি কিংবা দুঃখে থাকি, সুস্থ থাকি কিংবা অসুস্থ থাকি, ব্যস্ত থাকি বা অবসর থাকি, আমাদের অনুভূতি হোক না হোক, আমাদের সফর সর্বাবস্থায় চলমান। প্রতিদিন আমরা গন্তব্যের নিকটতর হচ্ছি।

দুনিয়া পরীক্ষার হল

সাথে-সাথে দুনিয়া পরীক্ষার কেন্দ্রও বটে। এখানে প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা কাউকে অঢেল ধনসম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন, করছেন। কাউকে সুস্থতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করেছেন, করছেন। কাউকে রুগ্ন অবস্থায় রেখে পরীক্ষা করেছেন এবং করছেন। পরীক্ষায় তারাই কৃতকার্য, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম-আহকামকে প্রাধান্য দেয় এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সুন্নাতসমূহের ওপর আমল করে। আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায় এমন জাল এবং ফাঁদ সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ তাতে ফেঁসে যাচ্ছে। বড়-বড় জ্ঞানীরা প্রতারিত হচ্ছে। বলা হয়, খুবই

উচ্চশিক্ষিত; কিন্তু নামায পড়ার সুযোগ নেই। বলা হয়, অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু আল্লাহর ঘরের দরজা তার স্মরণ নেই। এ-জাতীয় দুনিয়াদার জ্ঞানী লোকজন মূলত নির্বোধ। তাই তো আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলেছেন–

ذٰلِكَ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

'এসব লোক সেই জাতি, যারা কোনো জ্ঞানই রাখে না।'

তাদের হাকীকত বুঝে আসে না যে, দুনিয়ার মূলতত্ত্ব কী? মানুষ সাময়িক ভোগ-বিলাসিতা এবং বাহবাহর পেছনে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে তাদের দৃষ্টি সরে যায়।

দুই প্রকার গুনাহ

গুনাহ দুই প্রকার। কিছু গুনাহ 'জাহ'-এর সাথে সম্পৃক্ত। 'জাহ' পদ-পদবি, অবস্থান ও ইজ্জত-সম্মানকে বলা হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির অভিলাষ, আমাকে বড় আলেম মনে করা হোক, বড় চৌধুরী এবং নেতা মনে করা হোক, সকল কাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে করা হোক। যেসব গুণাগুণ আমার মধ্যে আছে, অন্য কারও মধ্যে এগুলো নেই। আর কিছু গুনাহ 'বাহ' অর্থাৎ কামভাবের সাথে সম্পৃক্ত।

এই দুই প্রকার গুনাহের মধ্যে 'জাহ'-এর সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ অধিক ক্ষতিকর। সাধারণত যেসব মানুষ 'বাহ'- এর গোনাহে লিপ্ত হয়, তার অন্তরে অনুশোচনা আসে। এই অনুশোচনা কোনো এক সময় ক্ষমা লাভের মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু 'জাহ'-এর গুনাহ এমন যে, মানুষ এটাকে গুনাহই মনে করে না। প্রত্যেকে নিজেকে সঠিক মনে করে। অহঙ্কারের মতো গুনাহসমূহ মানুষ থেকে বের করা খুবই কঠিন।

অহঙ্কার এটম গুনাহ

অহঙ্কার আর গর্ব এত ভয়ানক গুনাহ যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার মধ্যে 'যার্‌রা' (অণু) পরিমাণও গর্ব-অহঙ্কার আছে।'

ইংরেজিতে এটম (Atom), আরবিতে 'যার্‌রা'। তাই গর্ব-অহঙ্কারের গুনাহ এটম গুনাহ। এটম বোমার ধ্বংসকাণ্ড যে-পরিমাণ বিস্তৃত, জীবনে

গর্ব-অহঙ্কারের ক্ষতিও তেমন বিস্তৃত। এই গুনাহ মানুষের ভেতর থেকে অনেক বিলম্বে বের হয়। হাদীছ শরীফে মানুষকে ধ্বংসকারী কাজসমূহের মধ্যে নিজের ওপর অহমিকা করাকেও গণ্য করা হয়েছে। নেক কাজের সাথে আত্মাভিমান, গর্ববোধ ও অহমিকা পাশাপাশি চলতে থাকে। মানুষ এক দিকে পরহেযগারির জীবন যাপন করে, যিকির-ফিকির এবং আমলে ব্যস্ত জীবন কাটায়; কিন্তু অপর দিকে অন্য কাউকে তার সমপর্যায়ের মনে করে না। মানুষের দৃষ্টিতে নিজেকে নীচু করা খুব সহজ। কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে নীচু করা খুবই কঠিন। মানুষ তখনই আল্লাহর অলি বা বন্ধু হয়, যখন সে নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে নীচু করে। সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

'আয় আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট বানিয়ে দাও আর অন্যদের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দাও!'

আজকাল কয়েকটি সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক হয়ে গেলেই নিজের নেকির ওপর দর্প শুরু হয়ে যায়। এই এজতেমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আত্মম্ভরিতা, গর্ব-দর্প ও অহমিকার মূর্তি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া, নিজে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া।

নফসকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য

নফসকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কোনো জীবিত প্রাণীকে গলা চেপে ধরে মেরে ফেলা। বরং এর উদ্দেশ্য হলো নিজের ভেতরকার লিপ্সাকে বশীভূত করা। যখন নফসকে মনচাহী কাজ এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখা যাবে, তখন অন্তর এমনি-এমনি দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

দুনিয়ার জীবন একটা খেল-তামাশা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ○

'দুনিয়ার এই জীবন খেলাধুলা এবং তামাশা ছাড়া কিছু নয়।'[১৯৪]

---

১৯৪. সূরা আনকাবূত : আয়াত ৪৬

দুনিয়ার জীবনকে খেলাধুলা এবং তামাশার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। এর মূল কারণ হলো, দুনিয়ার জীবন আর খেলাধুলা আর তামাশার মাঝে অনেক মিল রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

'খেল-তামাশা ঘন্টা দুই ঘন্টার বিষয়। দুনিয়ার জীবনও এমনই। মানুষ যখন বিদায় নিতে থাকে, তখন তার অনুভূত হয়, আমি দুনিয়াতে সকালের সামান্য সময় কিংবা বিকালের সামান্য সময় অবস্থান করেছি। জাহান্নামি কেয়ামতের দিন বলবে, 'আমরা দুনিয়াতে খুবই সামান্য সময় অবস্থান করেছি।' আমরা যদি নিজেদের অতীত জীবন কল্পনা করে দেখি, তাহলে জীবনের গত হওয়া পঞ্চাশটি বছর একটি স্বপ্নের মতো মনে হয়। মনে হয় যেন শৈশব-কৈশোর এই গতকালের কথা।'

সাইয়্যিদুনা হযরত নূহ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি দুনিয়ার জীবনকে কেমন পেয়েছেন? হযরত নূহ (আ.) অন্তত এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার এমন উপলব্ধি হলো যে, একটি ঘরের দুটি দরজা। এক দরজা দিয়ে আমি প্রবেশ করলাম, অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম।

অধিকাংশ সময় দেখা যায়, যারা খেলাধুলায় মত্ত থাকে, তারা পরবর্তী কালে নিজেদের সময় বিনষ্ট হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়। তারা আফসোস করে, হায়, অর্থকড়িও গেল, সময়ও গেল! এমনিভাবে দুনিয়াদার লোকজন মৃত্যুর সময় নিজের যাপিত জীবনের ওপর অনুশোচনা ও আফসোস করে থাকে। বলে, আমি আমার পূর্ণ জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছি।

অনেক খেল-তামাশা তো ড্রামার মতো। স্ক্রীনে ছায়ার মতো আসে আর যায়। দুনিয়ার এই জীবনও ছায়ার মতো। মানুষের উচিত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে তার পেছনে ছুটাছুটি না করা, নিজেদের পরকাল সুন্দর করার ফিকির করা।

দুনিয়াটা কী?

যখন দুনিয়াবিমুখ হওয়ার কথা বলা হয়, তখন অনেক বন্ধু দুনিয়ার হাকীকত বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, দুনিয়াবিমুখ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো সবকিছু ত্যাগ করা এবং ইবাদাতের জন্য পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বসা। কখনও নয়। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

چیست دنیا از خدا غافل بدن

'আল্লাহবিমুখ হওয়া এবং আল্লাহ থেকে উদাসীন হওয়ার নাম হলো দুনিয়া।'

আল্লাহ তা'আলা থেকে বেখবর হওয়ার নাম দুনিয়া। কাম-কাজ করা, ধনসম্পদ হওয়া, স্ত্রী-সন্তান হওয়া এগুলোর নাম দুনিয়া নয়। তাই তো এমন নবী-রাসূলও (আ.) গত হয়েছেন, যাঁরা সে যুগের নবীও ছিলেন আবার তখনকার বাদশাহও ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দীনের বাদশাহিও দান করেছিলেন এবং দুনিয়ার বাদশাহিও দান করেছিলেন। এটা সম্ভব যে, একব্যক্তি দেখতে কোটিপতি; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে সে নিঃস্বদের মধ্যে গণ্য। আবার এ-ও সম্ভব যে, একব্যক্তি দেখতে গরিব-নিঃস্ব, কিন্তু আল্লাহর দরবারে ফেরাউন-কারুনের মতো ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। এ তো মনের ওপর সীমাবদ্ধ যে, মনের মধ্যে কী ভরে আছে।

দুনিয়া অন্বেষণকারীরা কুকুর

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

الدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُوْهَا كِلَابٌ.

'দুনিয়া একটি মরদেহ আর এর অন্বেষণকারীরা কুকুর।'

হয়তোবা শব্দটি কারও কাছে কঠিন এবং কষ্টকর মনে হবে। কেননা, দুনিয়ার মহব্বত আমাদের অন্তরে এখনও বিদ্যমান আছে। আর যে-বস্তুর প্রতি মহব্বত থাকে, তার বদনাম করা হলে, খারাপ লাগে। কিন্তু হাদীছ শরীফে এই শব্দই এসেছে।

কুকুরের সাথে সাদৃশ্য দেওয়ার হেতু

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া অন্বেষণকারীকে কুকুরের সাথে সাদৃশ্য দিলেন কেন? ওলামায়ে কেরাম এর অনেক সূক্ষ্ম হেতু বর্ণনা করেছেন। কুকুরও মড়া খায়, কাকও মড়া খায়। কিন্তু দুনিয়া প্রত্যাশীদের সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে কুকুরের সাথে। এর মধ্যে মূল পার্থক্য বুঝুন।

১. কাকের অভ্যাস হলো, যখন তার চোখে কোনো মৃতদেহ পড়ে, তখন খুব হইচই করে এবং অন্যদেরও ডাকে। তারপর সবাই মিলে খায়। কিন্তু কুকুরের নীতি হলো, কোনো মরদেহ পেলে চুপচাপ খেয়ে একাকি সব সাবাড় করতে চায়। অন্য কোনো কুকুরকে তাতে শরীক হতে দিতে চায় না। ঠিক

তদ্রূপ দুনিয়াপ্রত্যাশী লোকজনও। তারাও চায় দুনিয়া সব একাই ভোগ করবে। দুনিয়াবি কোনো ভোগ্যবস্তু তাদের হাতে এলে অন্য কাউকে না জানিয়ে কুকুরের মতো একাই সব সাবাড় করতে চায়।

২. কাক স্বজাতির মরদেহ খায় না। কিন্তু কুকুর অন্য মরদেহ যেমন খায়, স্বজাতি কুকুরের মরদেহও খায়। দুনিয়াপিপাসু লোকজনও এমনই। তারা স্বজাতি অন্য লোকদের সম্পদ আত্মসাতের প্রচেষ্টায় থাকে।

৩. কাক যদিও দিনের বেলা মরদেহের কাছে থাকে, রাতে মরদেহ ছেড়ে নিজ-নিজ বাসায় চলে যায়। কিন্তু কুকুর এর ব্যতিক্রম। কুকুর দিনে মৃতদেহ খায় এবং রাতে সেটা পাহারা দেয়। দিনেও মৃতদেহের কাছে, রাতেও মৃতদেহের কাছে। দুনিয়া পিপাসুদের অবস্থাও তাই। সারা দিন দুনিয়া পাওয়ার পেছনে ব্যস্ত থাকে। আর সারা রাত দুনিয়া পাওয়ার প্ল্যান করে। সারা দিন তারা থাকে দোকানের ভেতরে, আর সারা রাত দোকান থাকে তার ভেতরে। দিন-রাত এ চিন্তায়ই লেগে থাকে।

৪. দেখবেন, কাক গোশ্ত খায়, হাড় খায় না; ফেলে রাখে। কিন্তু কুকুর গোশ্তও খায়, হাড়ও খায়। তেমনি দুনিয়াদাররাও। তারা যার থেকে লাভ নেয়, তার থেকে শুধু নিজের মালই ফেরত নেয় না, বরং চক্রবৃদ্ধিহারে সুদও নিয়ে থাকে।

সুতরাং বোঝা গেল, দুনিয়াদারদের সাদৃশ্য কাকের তুলনায় কুকুরের সাথে বেশি। অতএব, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সত্য বলেছেন। বাস্তবেই দুনিয়াদারদের মধ্যে সেসব বিষয় রয়েছে, যেসব বিষয় আছে কুকুরের মধ্যে।

পরকাল ইহকালের ওপর অগ্রগণ্য

ইহকালকে পরকালের ওপর প্রাধান্য দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে মারাত্মক গুনাহ। এই বার্তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও দেওয়া হয়েছে, সর্বশেষ কিতাবেও দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খুলে-খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (١٧) اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰى.

'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ পরকাল তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।'[১৯৫]

---

১৯৫. সূরা আ'লা : আয়াত ১৬-১৮

আল্লাহ তা'আলা বলছেন, এই বার্তা আমি কেবল সর্বশেষ কিতাবে দিচ্ছি না, বরং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও প্রদান করেছি। এটি এমন একটি বার্তা, যা মানবজাতি তার সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি পেয়ে আসছে।

ইহজগতের ওপর পরজগতকে অগ্রগণ্য রাখো। যদি ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী ইহজগত স্বর্ণও হতো আর চিরস্থায়ী পরজগত মূল্যহীন মাটির পাত্রও হতো, তারপরও জ্ঞানের দাবি ছিল, পরজগতকে ইহজগতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। কিন্তু বিষয়টি যখন সম্পূর্ণ বিপরীত, ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী ইহজগত হলো মূল্যহীন মাটির পাত্রের মতো আর চিরস্থায়ী পরজগত হলো স্বর্ণের মতো; এ অবস্থায় আমরা কীভাবে পরজগতকে ভুলে যাই এবং পরজগতের ওপর ইহজগতকে প্রাধান্য দিয়ে ইহজগতের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পেছনে লেগে থাকি?

দুনিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য

দুনিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য হলো দীনকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। যেব্যক্তি দীনকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করল, সে যেন দুনিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করল। এই দুনিয়া পরীক্ষালয়। সর্বদিকে জাল আর ফাঁদ। এত ফাঁদ যে, বিপদগামীদের ওপর মানুষের আশ্চর্যবোধ হয় না। আশ্চর্যবোধ হয় তাদের ওপর, যারা এতসব ফাঁদ থেকে ঈমান নিরাপদ নিয়ে বিদায় নেন। তাদের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সাথে বলা হয়, কত বড় ব্যক্তিত্ব!

জনৈক বযুর্গ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিনা পরিশ্রমে ও বিনা কষ্টে দুনিয়া দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। তারপরও আমরা দুনিয়া অর্জনের পেছনে কত পরিশ্রম আর কত কষ্টই-না করি। পক্ষান্তরে যেখানে পরকাল অর্জনকে পরিশ্রম ও কষ্টের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন, সেখানে আমরা পরকাল অর্জনের জন্য কোনো পরিশ্রমই কখনও করি না।

লালসার বন্ধু

স্মরণ রাখবেন, এই বিশ্বজগতে সকলেই লালসার বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তা'আলা। তারপর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূলে আরাবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালিত করে অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম। এছাড়া সকলের মধ্যেই লোভ-লালসা কাজ

করে। আর লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্যই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। বাকি ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজনকে তো নিজদেহের গোশ্ত ভুনা করে খাওয়ালেও তারা সন্তুষ্ট হবে না।

দুনিয়ার স্বরূপ

মানুষের সর্বাপেক্ষা দামি ও উন্নত পোশাক হলো রেশমের পোশাক, যা এক প্রকার কীটের মল। আর মানুষের সর্বোৎকৃষ্ঠ পানীয় মধু, যা মৌমাছির থুতু থেকে জমে । মৌমাছির থুতু মধু হয়, কীটের মল থেকে রেশম হয়। এই রেশম আর মধু সর্বোৎকৃষ্ঠ পোশাক এবং সর্বোত্তম পানীয়। এটিই দুনিয়ার স্বরূপ, যার পেছনে পড়ে মানুষ নিজের পরম দয়ালু মালিক ও প্রভুকে অসুন্তুষ্ট করছে। কত বড় ক্ষতি! যেব্যক্তি পরম করুণাময় মহান প্রভুকে রাজি খুশি করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও ইজ্জত-সম্মান দান করেন এবং পরকালেও সীমাহীন মর্যাদা দান করবেন, যা দুনিয়ার পেছনে ছোটা লোকদেরকে দেবেন না।

ফকিরির স্বাদ বাদশাহিতে নেই

ইসলামে এমন স্বাদ আছে, যা বাদশাহিতে নেই। তাই তো এমন হয়েছে যে, বাদশাহ বাদশাহি ত্যাগ করে জায়নামায গুছিয়ে ফকিরি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ হয়নি যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন কোনো ফকির জায়নামায ত্যাগ করে বাদশাহি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ফকিরিতে যে স্বাদ আর মজা বিদ্যমান আছে, সেই মজা দুনিয়ার কোনো বাদশাহিতে নেই।

আল্লাহওয়ালাদের খাদেম

যারা দুনিয়ার বাদশাহ হয়, সাধারণ মানুষ তাদের খাদেম হয়। আর বাদশাহগণ আল্লাহওয়ালাদের খাদেম হয়ে থাকে।

সমরকন্দে বাদশাহ তৈমুরের কবর দেখার সুযোগ হয়েছে। ওপরে লেখা রয়েছে 'আমীরে আলম' (দুনিয়ার বাদশাহ)। তাকে তৎকালে বিশ্বজয়ী বলা হতো। আমি দেখেছি, যে জায়গাটিতে তার কবর এর বরাবর ওপরে আরও একটি কবর আছে। আমি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কবরটি কার? লোকজন জবাব দিল, বাদশাহর শাইখের। বাদশাহ ওসিয়ত করেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমাকে এমনভাবে দাফন করবে, যাতে আমার মাথা আমার শাইখের পায়ের একেবারে সন্নিকটে হয়। তিনি ছিলেন বিশ্বজয়ী।

হযরত খাজা মুহাম্মাদ মাসুম (রহ.) সেরহিন্দ শরীফে যেখানে শায়িত আছেন, সেখানে গেলে দেখবেন, একটি প্রশস্ত রাস্তা চলছে। পথে একটি কবরের কারণে রাস্তাটি দুভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কবরের পর আবার মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধম সেখানকার আসনে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, একটি রাস্তা এত সুন্দরভাবে যাচ্ছিল, এই কবরের কারণে সেটি দুই ভাগ হয়ে গেল। তো রাস্তা পরে হয়েছে, নাকি কবর পরে হয়েছে? লোকটি জবাব দিল, কবর পরে হয়েছে। আমি বললাম, এত সুন্দর একটি রাস্তা দুই ভাগে ভাগ করার কী প্রয়োজন ছিল? লোকটি বলল, মূল বিষয় হচ্ছে, উক্ত কবরে সমাহিত ব্যক্তি আফগানিস্তানের বাদশাহ ছিলেন। হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার শাইখের কবরে যে রাস্তা গেছে, সেই রাস্তার ওপর আমাকে দাফন করবে। আল্লাহু আকবার!

আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব

দুনিয়াদারদের খাদেম হয় সাধারণ মানুষ। আল্লাহওয়ালাদের খাদেম হয় সমসাময়িক বাদশাহ। বাদশাহদের শান ও মর্যাদা সাময়িক হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালাদের শান ও মর্যাদা হয় স্থায়ী। বাদশাহদের রাজত্ব মানুষের শরীরের ওপর চলে, আল্লাহওয়ালাদের রাজত্ব চলে মানুষের অন্তরে।

একবার এক ইংরেজ আজমির এসেছিলেন। এখান থেকে স্বদেশ ফিরে নিজ প্রতিক্রিয়া বলতে গিয়ে বলেন, আমি জীবিত লোকদেরকে তো রাজত্ব করতে অনেক দেখেছি। বিস্ময়কার বিষয় হলো, আমি যে-দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি কবর দেখেছি, সেই কবরে শায়িত ব্যক্তি লোকজনের অন্তরের ওপর রাজত্ব করে চলছেন।

উত্তম সবর ও উত্তম বর্জন

মানুষ দুনিয়ার বিষয়াবলি অতি দ্রুত আয়ত্ত করে নেয়। এক উত্তম সবরের সাথে, আরেক উত্তম বর্জনের সাথে। উত্তম সবর বলা হয়, যা কিছু হবে সব করবে, অভিযোগ করবে না। কেউ ধোঁকা দিলে তার সম্পর্কে কোনো নালিশ না করা। একটা হচ্ছে মোকাবেলা করা, শত্রুতা করা, ঝগড়া বৃদ্ধি করা। মুমিন বান্দা দুনিয়ার জন্য কখনও বিবাদে জড়ায় না। কারও থেকে কোনো কষ্ট পেলে উত্তম সবর অবলম্বন করে থাকে। সবরের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দেবেন। আর অনেক বড় কিছু ঘটলে, উত্তম বর্জন

অবলম্বন করে থাকে। উত্তম বর্জনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, বর্জনও যদি হয়, তাহলে ন্যায়ানুগভাবে হবে। বর্তমানে তো সম্পর্কও থাকে, সাথে-সাথে শত্রুতাও চলতে থাকে। বন্ধুর লেবাসে একে অপরের শত্রুতা চলতে থাকে। অনুমান করা যায় না, বন্ধু কে এবং শত্রু কে?

পার্থিব জগতে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। সুখ-সমৃদ্ধিও পরীক্ষা, দুঃখ-কষ্টও পরীক্ষা। তবে আল্লাহ তা'আলার চাওয়া হলো, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় মানুষ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক। আর দুঃখ ও বিপদাপদে সবর করে আমার নেক বান্দাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাক। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীও জান্নাতি, সবরকারীও জান্নাতি।

দুনিয়ার সাংঘর্ষিক দুই বস্তুর সমষ্টি

এই দুনিয়ায় মানুষকে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বরং দুনিয়া তো বস্তুত দুটি সাংঘর্ষিক বস্তুর সমষ্টি। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যেকোনো বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। উদাহরণত, যদি দিন না হতো, তাহলে রাতের মূল্য থাকত না। অন্ধকার না থাকলে আলোর মর্যাদা থাকত না। রোদ না থাকলে, ছায়ার কদর হতো না। অসুস্থতা না হলে সুস্থতার মূল্যায়ন হতো না। মৃত্যু না এলে জীবনের মূল্য থাকত না। এমনিভাবে হক-বাতিলও একটি অপরটির বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে হকের দিকে আহ্বান করেন আর শয়তান মানবাজাতিকে বাতিলের দিকে আহ্বান করে। এবার দেখার বিষয় হলো, মানুষ কার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন যাপন করছে? শয়তানি মনোপ্রবৃত্তির পেছনে ছুটে জীবন যাপন করছে, নাকি শয়তানি মনোপ্রবৃত্তি দমন করে স্বীয় মালিকের আনুগত্যে জীবন যাপন করছে? হক ও বাতিলের এই সংগ্রাম গোপনীয়ভাবে মৃত্যু অবধি চলতে থাকবে।

মৃত্যুর সময় সীমাহীন কঠিন সময়

শয়তান মৃত্যুর সময় তার সর্বশক্তি ব্যয় করে। তাই মৃত্যুর সময়টি মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়। কেননা, শয়তান মানুষের হুঁশ-জ্ঞান থাকাবস্থায় যেখানে পটিয়ে ফেলে, সেখানে মৃত্যুর সময় যখন হুঁশ-জ্ঞান পূর্ণ থাকে না, তখন তো পটানো তার জন্য খুবই সহজ। এ কঠিন মুহূর্তে যদি আল্লাহ তা'আলার মদদ ও নুসরত সহায়ক হয়, তাহলেই কেবল মানুষের পক্ষে শয়তানের থাবা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নতুবা সম্ভব নয়।

হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি

কেয়ামতের কাছাকাছি সময় আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিও দেখাবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন এবং দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হক ও বাতিলের সুস্পষ্ট মোকাবেলা। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে বড়ই সাদৃশ্য দেখতে পাব। যেমন–

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। তাকে মানুষের অবয়ব দান করলেন। স্বভাব ও মানসিকতা দিলেন ফেরেশতার। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে সৃষ্টি করেছেন। তার আকৃতি বানালেন মানুষের, স্বভাব ও মানসিকতা দিলেন শয়তানের।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে আকাশে উঠিয়ে সসম্মানে রেখেছেন। কেয়ামতের কাছাকাছি সময় সিরিয়ার একটি মসজিদের মিনারের ওপর তাঁকে অবতরণ করাবেন। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে সৃষ্টি করে একটি দ্বীপে আটকে রেখেছেন। হাদীছ শরীফে দাজ্জালের ক্ষেত্রে يَخْرُجُ (বের হবে) এবং يَظْهَرُ (আত্মপ্রকাশ করবে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.) ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবি করেন। পক্ষান্তরে দাজ্জাল যখন প্রকাশ পাবে, তখন সে খোদায়িত্ব দাবি করবে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)কে মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করেছেন। দাজ্জালকেও আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করার সাময়িক ক্ষমতা দেওয়া হবে। সেও মৃতকে ক্ষণিকের জন্য জীবিত করবে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বার্তা সমগ্র বিশ্বে পৌঁছবে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন না, যতক্ষণ-না সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর ওপর ঈমান আনবে। দাজ্জালের ফেতনাও পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। হক ও বাতিলের এই সংগ্রামে পরিশেষে হযরত ঈসা (আ.) বিজয়ী হবেন। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

মানুষের মধ্যে হক-বাতিলের গোপন যুদ্ধ

গোপনে এই যুদ্ধ আমাদের মধ্যেও হচ্ছে। পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষের অন্তরে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করেছেন। সেই ফেরেশ্‌তা অন্তরে কল্যাণের স্পৃহা ঢেলে দেয়। এক হাদীছে বর্ণিত আছে, শয়তান বনী আদমের অন্তরে আসন পেতে বসে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোর

দিকে আহ্বান করতে থাকেন। শয়তান তাকে মন্দের দিকে আহ্বান করতে থাকে। এবার দেখার বিষয় হলো, তার ওপর ভালো প্রবল হয়েছে, নাকি মন্দ প্রবল হয়েছে। যদি ভালো প্রবল হয়, তাহলে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত এসে যায়।

মাটির সাথে হৃদ্যতা

স্মরণ রাখবেন, মৃত্যুর পর মাটিতে যেতে হবে। তাই জীবিত থাকতেই মাটির সাথে হৃদ্যতা হয়ে যাক। নিজেই নিজের ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে দিন। যারা নিজেকে মাটির মতো করে নেয়, তাদের মিসকিন ও নিঃস্ব বলা হয়। এই মিসকিন লোকজন আল্লাহর খুবই পছন্দের পাত্র। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আমরা রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলে একে অপরের পেছনে জড়সড় হয়ে বসে যেতাম, যেন কাপড়ের ফাড়া অংশে শরীরের অনাবৃত অংশটুকুতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি পড়ে না যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁদের মর্যাদা এত বেশি ছিল যে, অনেক সময় তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে গিয়ে গরিব মুহাজিরদের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ইয়া আল্লাহ! তাঁদের বরকতে আমাদের দু'আ কবুল করে নাও!

ধনীদের ওপর গরিবদের শ্রেষ্ঠত্ব

যেব্যক্তি দুনিয়াতে স্বল্প সম্পদের ওপর আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির প্রতি অল্প আমলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একবার গরিবদের একটি মজলিসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্বোধন করে বললেন–

হে গরিব সম্প্রদায়! তোমাদের ভাগ্যে এমন তিনটি বস্তু জুটেছে, যা দুনিয়াতে ধনীরা পায়নি। তোমাদের আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে এমন নেয়ামত দান করবেন, যা দুনিয়াতে রাজা-বাদশাহরা পায়নি।

১. আমার উম্মতের গরিব-মিসকিনদের কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর সেখানকারর এক দিন, দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা গরিব-মিসকিনদের তাসবীহ পাঠের ওপর এমন প্রতিদান দেবেন, যা ধনীরা সম্পদ খরচ করেও পাবে না।

৩. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে গরিব-মিসকিনদের এত উচুঁ মর্যাদা দান করবেন যে, জান্নাতে তাদের বালাখানাগুলো ধনীরা এমনভাবে দেখবে, যেমনভাবে দুনিয়াতে আকাশের তারকারাজি দেখা হয়।

গরিবদের সাথে বন্ধুত্বের উপকারিতা

হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, গরিবদের সাথে বন্ধুত্ব করো। কেননা, কেয়ামতের দিন তাদের বলা হবে, তোমরাও জান্নাতে প্রবেশ করো এবং যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব ছিল তাদেরকেও সাথে নিয়ে যাও।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এক গরিব ব্যক্তিকে বলবেন, জান্নাতে চলে যাও! লোকটি দাঁড়িয়ে থাকবে। ফেরেশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি তো জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে গেছেন; তারপরও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তখন লোকটি বলবে, আমার লজ্জা লাগছে, আমি জান্নাতে চলে যাব আর যেসব লোক আমাকে পানাহার করিয়েছে, তারা এখনও পেছনে। তার কথাটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ভালো লাগবে এবং তিনি নির্দেশ দেবেন, যত মানুষ তোমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখেছে, তাদেরও নিয়ে যাও।

শীতল শ্বাস শত বছর ইবাদাতের সমান

আবু সুলাইমান দুর্রানি (রহ.) নামে একজন বড় বুযুর্গ গত হয়েছেন। তিনি বলতেন, একজন মানুষ খুবই গরিব। তার একটা বৈধ মনোবাসনা আছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়। কেননা, তার কাছে উপকরণ নেই। যেমন– এক গরিব ব্যক্তির সন্তানাদি অনেক। রোজগার কম। সে তার বৈধ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে না। এ-কারণে সে ঠান্ডা শ্বাস নিয়ে থাকে। তো আবু সুলাইমান দুর্রানি (রহ.) বলেন, বৈধ মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ার ওপর গরিবের ঠান্ডা শ্বাস নেওয়া মানুষের একশো বছর ইবাদাতের সমান। আল্লাহ তা'আলা তাকে ঠান্ডা শ্বাস নেওয়ার ওপর এত বিনিময় প্রদান করেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ

'বিপদাপদে আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করা সর্বোত্তম ইবাদাত।'

আপনারা দেখে থাকবেন, অধিকাংশ মানুষ আলোচনার সময় বলে থাকে, হযরত! অনেক দু'আ করি; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না, হয়রানি-

পেরেশানি দূর হয় না। আপনারা এই হাদীছটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যেব্যক্তি বিপদাপদে পড়ে আল্লাহর কাছে বিপদ দূর করার দু'আ করতে থাকে এবং আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করতে থাকে, তাকে এই অপেক্ষার ওপর এমন প্রতিদান দেওয়া হয়, যা ইবাদাতকারীদের ইবাদাতের ওপর দেওয়া হয় না। দুনিয়ার বিবেচনায় যদি অবস্থা ভালো না থাকে, তাহলে এ-ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং সবরের সাথে চলতে থাকুন। অন্তরওয়ালা তাকে বলা হয়, যার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকে, যার অন্তর আল্লাহর মহব্বতে পুলকিত হয়।

কাজেই কোনো গরিবকে এবং গুনাহগারকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। হতে পারে, এই গরিব ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহব্বত আছে এবং সে আল্লাহর কাছে আপনি-আমি অপেক্ষা অনেক প্রিয়। এমনিভাবে হতে পারে, এই গোনাহগার ব্যক্তি এমন তাওবা করেছে কিংবা করে নেবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

এক গুনাহগার আর এক ইবাদাতগুজার ব্যক্তির পরিণতি

হযরত ঈসা (আ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে তিনি এক গুনাহগারের দেখা পান। লোকটি নিজের গুনাহের ওপর অনেক লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল। হযরত ঈসা (আ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অভিলাষ কী? লোকটি জবাব দিল, অনেক গুনাহ করেছি; আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিন এ-ই আমার অভিলাষ। আর কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন ইবাদাতগুজারের সাথে সাক্ষাৎ হয়। হযতর ঈসা (আ.) ইবাদাতগুজার লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা কী?

লোকটি সেই গুনাহগারের দিকে ইশারা করে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা হলো, আল্লাহ তা'আলা যেন ওই গুনাহগারের সাথে আমার হাশর না করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ওহী নাযিল করলেন, 'হে আমার নবী! আপনি এই দুজনকে বলে দিন, আমি তাদের উভয়ের মনোবাসনা কবুল করে নিয়েছি। যে গুনাহগার আমার কাছে করুণা প্রত্যাশা করছিল, আমি তার গুনাসমূহকে নেকিতে পরিণত করে তার ওপর জান্নাত অবধারিত করে দিলাম। আর ইবাদাতগুজার লোকটি প্রত্যাশা করেছিল, তাকে যেন ওই গুনাহগার লোকটির সাথে হাশর না করানো হয়; সুতরাং সে যেহেতু এখন জান্নাতি তাই আমি এই ইবাদাতগারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ

করব। অতএব, নিজের ইবাদাতের ওপর আমাদের দর্প ও গর্ব না করা চাই। গুনাহগারের প্রতি ঘৃণা নয়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা চাই।

গরীবের উহ্-আহ্কে ভয় করো

ধনীদের ভয় করো না। গরিবদের উহ্-আহ্কে ভয় করো! কেননা, ধনীরা ছুটে গেলে দুনিয়ার শাসকের দ্বারে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো গরিব যদি কষ্ট পেয়ে আহ্ শব্দ বের করে ফেলে, তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার দ্বারে করাঘাত করবে। আল্লাহ তা'আলা বড়ই গুণগ্রাহী।

একবার মক্কার কুরাইশদের নেতৃবৃন্দ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামনা ছিল, এই লোকগুলো যদি দীনের মধ্যে এসে যায়, তাহলে আরও অনেক লোক দীন ইসলাম কবুল করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাদের উপদেশ দিতে শুরু করেন। তিনি যখন তাদের উপদেশ দান করছিলেন, তখন এক অন্ধ সাহাবী তাঁর দরবারে এসে তাকেও নসীহত করতে আবেদন করলেন। এ-সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন, ইনি তো আমাদেরই লোক; তাকে পরেও নসীহত করা যাবে। আর কুরাইশের নেতৃবৃন্দ এখন এসে বসেছে, তাদের নসীহত করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। এই সুযোগ পরে আর না-ও আসতে পারে। এই অবস্থায় অন্ধ সাহাবী আবারও আবেদন করতে চেষ্টা করলে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে কিছুটা কষ্ট অনুভূত হয়। চেহারা মুবারকে রাগের কিছুটা নিদর্শন প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে সেটা পছন্দ হয়নি। সাথে-সাথে তিনি এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কতগুলো আয়াত নাযিল করলেন। বন্ধুসুলভ সম্বোধনে স্বীয় বন্ধু সম্পর্কে ইরশাদ করলেন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى (١) اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى (٣) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى (٤) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى (٥) فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى (٦) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى (٨) وَهُوَ يَخْشٰى (٩) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (١٠)

'তিনি মুখ মলিন করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এসেছে। আপনি কি জানেন, হয়তো সে সংশোধিত হতো অথবা নসীহত গ্রহণ করত, ফলে নসহীত তাকে উপকৃত করত? পক্ষান্তরে যে

বেপরোয়া ভাব দেখায়, আপনি তার ভাবনায় পড়েন। অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার ওপর কোনো দোষারোপ নেই আর যে আপনার কাছে দৌড়ে ছুটে এসেছে এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন।'[১৯৬]

আয়াতগুলোতে অন্ধ সাহাবীর কয়েকটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর যেলোকটি দৌড়ে-দৌড়ে আপনার কাছে এসেছে। দ্রুত গতিতে চলে এসেছে। দেখুন, আগ্রহ থাকলে এমনই হয়। এমন ব্যক্তি ভালো মাহফিলে যায় এবং দ্রুতগতিতে যায়। তো আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন, আগ্রহ নিয়ে লোকটি কীভাবে এসেছে? বলেছেন–

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ

দ্রুতবেগে ছুটে এসেছে।

একটা গুণ তো হলো, তার মধ্যে এমন আগ্রহ যে, তিনি দ্রুতবেগে ছুটে এসেছেন। দ্বিতীয় গুণ হলো–

وَهُوَ يَخْشَىٰ

সে ভয় করে।

অন্তরে তার ভয় ছিল। আল্লাহ তা'আলার কাছে এরূপ মানুষের মর্যাদা অনেক। তাই তো আল্লাহ তা'আলা সেই অন্ধ সাহাবীকে এমন মর্যাদা দান করলেন যে, অনেক বর্ণনায় আছে, পরবর্তী কালে যখনই তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসতেন, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বসার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন। সুতরাং কুরাইশের সরদাররা আপন জায়গায় মিসকিন-নিঃস্ব। আর অন্ধ সাহাবী আপন জায়গায় কত সম্মানিত! আল্লাহ তা'আলার কাছে মাপার যন্ত্র আছে। আর সেটা হলো অন্তরে আল্লাহর ভয়, মহব্বত ও সত্যের তলব। অন্তরে এগুলো থাকলে বাহ্যিক অবস্থা যতই নিঃস্ব হোক না কেন, তাতে আল্লাহর দরবারে মানুষের স্তরে কোনো পার্থক্য হয় না।

বড় ও ভারী বোঝাওয়ালা মানুষ

আজ পরিমাপের যন্ত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে। যার কাছে অঢেল সম্পদ থাকে, তাকে বলা হয়, বড় লোক। তার ঘরবাড়ি বড়। বলা হয়, অমুক স্থানে

---

১৯৬. সূরা আবাসা : আয়াত ১-১০

বড় লোকেরা থাকে। তাদের অন্তরে দুনিয়ার বড়ত্ব। দুনিয়াদাররা তাদের বড় লোক বলে। বাস্তবে তারা বড় লোক নয়, বরং বড় বোঝাওয়ালা লোক। বেচারাদের অনুভূতি নেই, হিসাব-নিকাশ প্রদানে কত সময় লাগবে।

মালদার, নাকি মালের পাহারাদার

কিছু লোককে দেখেছি, তারা মালদার হয়েছে। আবার কিছু লোককে দেখেছি, তারা মালের পাহারাদার হয়েছে। মালদার কে? মালদার তারা, আল্লাহ তা'আলা যাদের অঢেল সম্পদ দান করেন এবং তারা দুই হাতে সেই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। তারাই প্রকৃত মালদার, যারা পরকালের জন্য সম্পদ ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যারা মাল পুঞ্জিভূত করে এবং মালের বৃদ্ধিতে খুশি হয়, তারা প্রকৃত মালদার নয়। এরা মূলত মালের পাহারাদার। মাল পুঞ্জিভূত করে মরে যাবে, বিলাসিতা করবে সন্তানরা। অথচ কেয়ামতের দিন মালের হিসাব তাকেই দিতে হবে।

সম্মানিত কে?

আমরা কারও ব্যক্তিত্বে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং নেকি দেখলে তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ.

'নিঃস্বন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী ও পরহেযগার।'[১৯৭]

হাদীছ শরীফে এসেছে, 'যেব্যক্তি কোনো ধনী ব্যক্তিকে তার সম্পদের খাতিরে ইজ্জত করবে, তার ঈমানের এক তৃতীয়াংশ বিনষ্ট হয়ে গেল।' আমাদের দৃষ্টিতে ইজ্জত-সম্মান হবে শরীয়ত পালনের, নেক কাজের। যার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকবে, আমাদের দৃষ্টিতে তারা সম্মানিত।

আল্লাহ তা'আলা ইখলাস দেখেন

আমরা যত আমলই করি, তা ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য পর্যাপ্ত নয়। ইখলাসের ঘাটতি সেগুলোকে অপর্যাপ্ত বানিয়ে দিচ্ছে। যদি ইখলাসের ঘাটতি না থাকে, তাহলে আমরা যে-পরিমাণ আমল করছি, তা ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু ইখলাস থাকে না, লৌকিকতা এসে যায়, কপটতা এসে যায়, তাই

---

১৯৭. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩

বড়-বড় আমল এবং পরিমাণেও অনেক আমল করা সত্ত্বেও আমরা সেগুলোর উপকারিতা পাচ্ছি না। আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইখলাস দেখা হয়। ইখলাসের সাথে দু-রাকাত নামাযে এত ছাওয়াব এবং এত পুরস্কার রয়েছে, যা ইখলাসহীন এবং উদাসীনতার সাথে পড়া হাজার রাকাত নামাযে পাওয়া যাবে না। তাই তো হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, মুত্তাকী মুখলিস ব্যক্তির দুই রাকাত নামাযে আল্লাহ তা'আলা এত বিনিময় প্রদান করেন, যা অমুত্তাকী ব্যক্তির হাজার রাকাত নামাযেও দেন না। সুতরাং যদি ইখলাসে কমতি থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে আমল কবুল হবে না।

ইখলাসের ঘাটতিতে প্রতিদানে ঘাটতি

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) একদা সূরা ত্বহা তেলাওয়াত করতে-করতে ঘুমিয়ে যান। রাতে স্বপ্নে সোনালি অক্ষরে লেখা একটি কুরআন শরীফ দেখতে পান। তখন স্বপ্নেও তিনি সূরা ত্বহা তেলাওয়াত করেন এবং অত্যন্ত খুশি হন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সূরা ত্বহা তেলাওয়াতের এত ছাওয়াব লেখা হয়েছে। যখন তিনি খুব আগ্রহসহকারে দেখছিলেন, তখন এক পৃষ্ঠায় দেখেন, তাতে কিছু আয়াতের জায়গা শূন্য। স্বপ্নেই তিনি হয়রান হয়ে পড়েন যে, এই জায়গাটা শূন্য কেন? চিন্তা করতে থাকেন, চিন্তা করতে থাকেন; কিন্তু এর রহস্য উদঘাটন সম্ভব হচ্ছে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করলেন। স্বপ্নেই তাঁর মনে পড়ল, তেলাওয়াতের সময় যখন এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছিলেন, তখন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর কাছ দিয়ে গমন করেন। এতে তাঁর খেয়াল হলো যে, লোকটি হয়তো আমার তেলাওয়াত শুনে খুশি হয়েছেন। এতটুকু খেয়াল সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলোর তেলাওয়াতের ছাওয়াব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলেন। বোঝা গেল, ইখলাসের ঘাটতি আমলের ছাওয়াব এবং প্রতিদান কমিয়ে দেয়।

আমল ওজনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলার মূলনীতি হচ্ছে, আমলের মধ্যে যত বেশি ইখলাস থাকবে, ছাওয়াব ও প্রতিদান তত বেশি হবে। আজ বৈজ্ঞানিক জগত। কিছু বিষয় বিজ্ঞানের কারণে বোঝা সহজ হয়। ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ বোখারি শরীফে সর্বশেষ যে হাদীছটি এনেছেন, সেই হাদীছ শরীফে আমল ওজন করা বা মাপার আলোচনা করা হয়েছে। তাই খতমে

বোখারি অনুষ্ঠানসমূহে দরসদানকারী বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরাম আমল ওজন করা বা মাপার ওপর বিস্তারিত আলোচনায় প্রমাণ করেন যে, কেয়ামতের দিন জিন ও মানবজাতির আমল তুলাদণ্ডে উঠিয়ে ওজন করা হবে। পরিমাপ করা হবে, নেক কাজ বেশি, নাকি মন্দ কাজ বেশি। পূর্ব যুগে প্রশ্ন উত্থাপন করা হতো, আমল কীভাবে তুলাদণ্ডে উঠানো হবে? আমলও কী পরিমাপ করা সম্ভব? কিন্তু বর্তমান যুগে দেখুন, থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রাও মাপা যায়, ঠান্ডাও মাপা যায়। বাতাসে বিদ্যমান আদ্রতাও পরিমাপ করা যায়। প্রত্যেক বস্তু পরিমাপের তুলাদণ্ড আবিষ্কার হয়েছে। কাজেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এখন সহজেই বোঝা সম্ভব, আমল পরিমাপ করা সম্ভব।

বৈজ্ঞানিক থিওরি হলো, পরিমাপের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আছে। একটি হচ্ছে পরিমাণ আরেকটি হচ্ছে আকর্ষণ, যাকে ভার বলা হয়ে থাকে। থিওরিতে পরিমাণকে m আর আকর্ষণ-ভারকে g বলে ব্যক্ত করা হয়। যেকোনো বস্তুর ক্ষেত্রে তার পরিমাণ এবং জায়গার আকর্ষণকে গুণ করলে সেই বস্তুর পরিমাপ হয়ে যাবে। তার ওজন বের হয়ে আসবে। তাই যদি কোনো ব্যক্তি ভূমিতে থাকে, তাহলে ভূমির আকর্ষণ অনুপাতে তার ওজন হবে। একই ব্যক্তি যদি চাঁদে চলে যায়, তাহলে চাঁদে আকর্ষণ কম থাকায় তার ওজন সেখানে ভূমির তুলনায় কম হবে। সেই ব্যক্তি যদি মঙ্গলগ্রহে চলে যায়, তাহলে সেখানকার আকর্ষণশক্তি বেশি বিধায় সেখানে তার ওজন অনেক বেশি হবে।

দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি একই, কিন্তু জায়গার পরিবর্তনে আকর্ষণশক্তির তারতম্যের দরুন ওজন কম-বেশি হয়ে যায়। এমনকি সেই ব্যক্তি যদি মহাশূন্যে চলে যায়, যেখানে আকর্ষণই নেই, তাহলে সেই একই দেহ হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো ওজনই থাকবে না। এজন্যই যারা মহাশূন্যে যায়, তারা তুলার গুটির মতো উড়ে বেড়ায়। তাদের ওজনই থাকে না। অথচ বাস্তবে তাদের দেহের ওজন আছে। কিন্তু স্থানের আকর্ষণ নেই বিধায় ওজন ধরা পড়ছে না। সুতরাং বিজ্ঞানের এই থিওরি থেকে আমল পরিমাপেরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কেয়ামতের দিন যেসব মানুষের মধ্যে ঈমানের আকর্ষণ থাকবে, তার আমল ভারী হবে, ওজনি হবে। আর যাদের মধ্যে ঈমানের আকর্ষণ থাকবে না, তারা পহাড়সম ভালো কাজ করলেও আল্লাহর দরবারে সেগুলোর কোনো

ওজনই থাকবে না। এজন্যই কেয়ামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

'আমি কেয়ামতের দিন তাদের (কাফের) আমলের ওজন করব না।'[১৯৮]

এরূপ বলেননি যে, কেয়ামতের দিন তাদের আমলসমূহ উপস্থাপন করব না। উপস্থাপন তো করবেন, কেউ সহমর্মিতার আমল করেছে, কেউ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সেবার আমল করেছে, গরিব-মিসকিনদের সাহায্যের আমল করেছে এগুলো সবই ভালো কাজ, সবই কেয়ামতের দিন উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু এগুলোতে কোনো ওজন থাকবে না বিধায় তুলাদণ্ডে উঠানো বৃথা। কারণ, তাদের ভালো কাজগুলোতে ঈমানের আকর্ষণ নেই। যেহেতু তাদের ভালো আমলে g (আকর্ষণ বা ভার) জিরো, তাই m (পরিমাণ) সমগ্র বিশ্বের চেয়েও যদি বেশি হয়ে যায়, তবুও ওজন জিরোই থাকবে। সুবহানাল্লাহ! দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কেমন বিস্ময়কর কথা বলে দিয়েছেন যে, 'আমি কাফেরদের আমলের ওজনই করব না।'

বোঝা গেল, ঈমান ও ইখলাস আকর্ষণ শক্তির মতো। এই আকর্ষণশক্তিকে (Gravitaional force) আমরা যত বেশি বৃদ্ধি করব ছাওয়াব ও প্রতিদান আমরা তত বেশি পাব। পক্ষান্তরে ঈমান ও ইখলাস যদি কম থাকে, তাহলে আমলের প্রতিদানও সে পরিমাণ কমে যাবে।

এজতেমার মূল উদ্দেশ্য

আমাদের উক্ত এজতেমার মূল উদ্দেশ্য নিজেদের ইখলাস বৃদ্ধি করা। এজতেমায় উপস্থিত সকলেই নিজ-নিজ জীবন ও আমল দেখুন, আমার প্রতিটি কাজ কি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, নাকি দুনিয়ার বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হচ্ছে। এটা একটা পেরেশানি ও চিন্তা, যা আপনারা অন্তরে ধারণ করে এখানে এসেছেন। সুতরাং সকলের প্রতি নিবেদন, এজতেমায় অবস্থানকালে দুনিয়াবি আলাপ-আলোচনা পরিহার করবেন। এই যে দুনিয়াবি বিষয়, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে এত অপছন্দনীয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

---

১৯৮. সূরা কাহফ : আয়াত ১০৫

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ

'দুনিয়া হলো অভিশপ্ত।'

আল্লাহ তা'আলা যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে অদ্যাবধি এর প্রতি সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে একবারও দৃষ্টিপাত করেননি। আপনারা এই এজতেমায় এসেও যদি দুনিয়ারই আলোচনা করেন, তাহলে এত কষ্ট করে, এত অর্থ ব্যয় করে, মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে এসে কী লাভ? আপনারা যেখানে বসা থাকবেন, শয়তান চেষ্টা করবে সেখানে দুনিয়াবি আলোচনা করাতে। শয়তান কাউকে এদিকের কথা শোনাবে, কাউকে ওদিকের কথা শোনাবে। এভাবে দুনিয়াবি আলোচনায় লিপ্ত করতে চেষ্টা করবে। আমরা তো এখানে দুনিয়াবি আলোচনা করতে আসিনি।

এজতেমায় কীভাবে সময় কাটাবেন

এই যে দুদিন সময়, এই দুদিন অন্তরকে আল্লাহর দিকে ধাবিত রাখুন। উকূফে কালবী (আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন) ও রাবেতা কালবীতে (জিকরে ফিকিরে) সময়টা ব্যয় করবেন। দিন-রাত এই একই চিন্তা, একই ধ্যানে লেগে থাকবেন যেমন ইতিকাফকারী ইতিকাফে বসে মনে করে, এ-সময়টুকু আমি আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি। কাজেই এতে অন্য কিছু করা যাবে না। তেমনিভাবে আপনারাও এ-কটা দিন আল্লাহমুখী হয়ে থাকুন। খানা খেতে যাবেন, তখনও আল্লাহর প্রতি ধ্যান-খেয়াল রাখুন। খানা খাচ্ছেন তখনও, আল্লাহর প্রতি ধ্যান রাখুন। আপনারা যখন আল্লাহর ধ্যানে সময় কাটাবেন, তখন দেখবেন এই কদিনে এত উপকার হবে যে, আপনারাই অনুভব করবেন, আমার ভেতরে থেকে দুনিয়ার চাহিদা কমে গেছে, আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার চাহিদা বেড়ে গেছে। আপনারা আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন। শয়তান চেষ্টা করবে, আপনাদের দুনিয়াবি বিষয়ে জড়াতে। আপনারা কোনো অবস্থাতেই তাতে জড়াবেন না। কেউ যদি দুনিয়াবি কথা শুরু করে দেয়, তাহলে তাকে নিষেধ করবেন।

যুন্নূন মিসরি (রহ.) বলেন–

اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَا فِيْهَا صَوْمٌ

'দুনিয়া মাত্র একটা দিন আর এই এক দিন আমরা রোযা রেখেছি।'

ওপরন্তু আজকের দিনটি বড়ই মূল্যবান দিন। আজকের দিবাগত রাত ১৫ শা'বানের রাত হবে। এই রাতে আগামী পূর্ণ বছরের বাজেট তৈরি করা হয়। আকাশসমূহে এই রাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এজতেমার সময়টুকুকে গনিমত মনে করুন। আল্লাহর স্মরণে কাজে লাগান। হতে পারে, এই এজতেমা আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে যাবে।

নির্বাচিত লোকদের সমাবেশ

এজতেমায় জানি না, কত দূরদূরান্ত থেকে বন্ধুগণ তাশরীফ এনেছেন। এই মাহফিলের দু'আ আমাদের ভাগ্যে আরও একবার নসিব হয়ে গেল। সাধারণ মুহূর্তগুলোতে যদিও আমাদের দু'আগুলো কবুল হওয়ার উপযুক্ত নয়; কিন্তু এই মাহফিলে অনেক মানুষ এসেছেন, যারা মুখলিস, আমরা গুনাহগার হলেও এখানে অনেক নেককার মানুষও আছেন, হতে পারে তাদের বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দু'আগুলোও কবুল করে নেবেন।

আলহামদু লিল্লাহ! বন্ধুরা পত্র লিখেছেন। পত্রমারফত জানতে পারি, তারা এত ভালো আমল ও অজিফা করে থাকেন।

এ-মাহফিলে এমন ব্যক্তিও আছেন, যিনি হাজারবার কালেমার যিকির করেন।

এমনও আছেন, যিনি প্রত্যহ সাত হাজারবার কালেমার যিকির করেন।

এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি দৈনিক দশ হাজারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর অজিফা পড়েন।

এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি প্রত্যহ এক পারা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন।

এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি দৈনিক এক মনযিল কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করেন।

এমনও ব্যক্তি আছেন, যিনি প্রতিদিন পনেরো পারা তেলাওয়াত করেন।

কিছু লোক এমনও আছেন, যাদের নিয়মিত আমল হলো দৈনিক এক খতম কুরআন তেলাওয়াত, যা তিনি নিজে জানেন এবং তার শাইখ জানেন।

এখানে যারা এসেছেন, তারা এমন নয় যে, এমনি-এমনি উঠে এসে পড়েছেন। বরং আলহামদু লিল্লাহ! এটি নির্বাচিত লোকদের সমাবেশ। যারা এখানে এসেছেন, তাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত। এমন

ব্যক্তিও এখানে আছেন, যিনি স্বপ্নে একবার নয় দুবার নয়– দুই ডজনবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এমনও একজন বুযুর্গ আছেন, যার জীবনে সত্তরবারের অধিক রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ হয়েছে। আমার এমনও একজন বন্ধু আছেন, এজতেমায় এখনও সাক্ষাৎ হয়নি, জানা নেই তিনি এসেছেন কিনা তিনি নিজ হালতের বর্ণনায় লিখেছেন, 'আমার জীবনের কোনো সপ্তাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার ছাড়া যায় না। উক্ত এজতেমায় এমন ব্যক্তিও আছেন, যার জীবনে এগারো বছরের মধ্যে একদিনও তাহাজ্জুদ নামায কাজা হয়নি। সকলেই তো এক রকম নয়। পাঁচ আঙুল সমান নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই এজতেমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এখন আমাদেরকে এর উপকারিতা ভোগ করতে হবে। এই কথাগুলো ব্যাপাকভাবে বলা যায় না। তারপরও এখানে বললাম আপনাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য, যাতে আপনাদের উপলব্ধি হয়, কেমন মজলিসে আপনারা সময় ব্যয় করছেন।

নিজের সময়কে মূলবান বানান

আমরাও এ-সময়টাকে মূল্যবান বানাই। মাতৃগর্ভ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কেউ আসে না। দুনিয়াতেই নিজেকে নিজে বানাতে হবে। আমরা এরূপ মনে করি যে, এই তিনটা দিন আমরা নিজেদের তৈরি করার মধ্যে ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। যদি আমাদের আমলের মধ্যে দুর্বলতা থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমলের মধ্যে মজবুতি দান করেন। আমরা যদি নিজ ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে দুর্বল ও অপারগ মনে করি, তাহলে তাহাজ্জুদের সময় উঠে নিজ প্রভুর সামনে ফরিয়াদ করুন। এভাবে আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সময়টা কাজে লাগান, তাহলে পরম কারুণাময় মহান প্রভুর রহমত বর্ষিত হবে এবং দু'আ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

চিরশত্রু থেকে সাবধান!

আমরা দুই শত্রুর বেষ্টনিতে আছি। একটা ভেতরের শত্রু, একটা বাইরের শত্র। আমাদের ভেতরগত শত্রু আমাদের নফস, আমাদের ব্যক্তিত্ব। বহিরাগত শত্রু শয়তান। এই শয়তান আমাদের চিরশত্রু। অভিশপ্ত শয়তান আমাদের দেখতে পায়, আমরা এই চিরশত্রুকে দেখতে পাই না। সে এমন

শত্রু, আমরা খানাপিনা ও অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই আর সে আমাদের পেছনে সুযোগের সন্ধানে থাকে। কেননা, তার এ-ধরনের কোনো জরুরত নেই। আমাদের ঘুমাতে হয়, তার ঘুমও নেই। সে সারাক্ষণ আমাদের ফাঁসানোর জন্য চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। কতিপয় বন্ধুকে দেখেছি, যখন শোওয়ার সময় হয়, তখন কথাবার্তা বলতে থাকে। আর কথাবার্তায় যেহেতু রাতের একটা সময় সজাগ কেটে যায়, তাই সকালে যখন দরস হয়, তখন মুরাকাবার আদলে তাদের নিদ্রা আসতে থাকে। নিজ-নিজ একক আমলগুলো করুন, একাকি কুরআন তেলাওয়াত করুন। তাসবীহসমূহ পাঠ করুন। নিজের সকল আমল পূর্ণ করুন। তারপর এর বরকত দেখুন। দু'আ রইল, আল্লাহ তা'আলা এখানে আমাদের সকলের সমবেত হওয়াকে কবুল করুন এবং আমরা দুর্বল নিঃস্বদের অসম্পূর্ণ নেক আমলগুলোকে কবুল করুন এবং আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাকওয়ার ফলাফল

'এই অধম যদি বোঝানোর লক্ষ্যে সরল ভাষায় মুত্তাকীর সংজ্ঞা দেয়, তাহলে এর সংজ্ঞা হবে, যেব্যক্তি জেনেবুঝে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ বর্জন করে এবং এমন সতর্কতামূলক জীবন যাপন করে, যেন কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো কেউ না থাকে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। সুতরাং যেব্যক্তি এমন সতর্ক জীবন যাপন করবে যে,

সে আল্লাহ তা'আলার হকসমূহও পূর্ণ করবে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহ পূর্ণ করবে,মাতাপিতার হকসমূহও আদায় করবে, স্ত্রী-সন্তানাদির হকসমূহও আদায় করবে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহও পূর্ণ করবে, বন্ধু-বান্ধবের হকসমূহও আদায় করবে, তাকে মুত্তাকী ও পরহেজগার বলা হবে।'

তাকওয়ার ফলাফল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ○

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ.

সন্দেহজনক বস্তু বর্জনের নির্দেশ

শরীয়তের ওপর সতর্কতার সাথে আমল করার অপর নাম তাকওয়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

'হালালও সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট, হারামও সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। এই দুয়ের মাঝখানে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে।'

অর্থাৎ– হালাল ও হারামের মাঝখানে এমন অনেক বস্তুও আছে, যা মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসব সন্দেহজনক বস্তুকেও বর্জন করে চলে সে-ই মুত্তাকী বা পরহেজগার।

বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালকের কঠোর নির্দেশ!

তাকওয়া ঈমানদারদের জন্য খুবই জরুরি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ○

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবকেও এই নির্দেশ করেছি, তোমাদেরও নির্দেশ করছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো!'[১৯৯]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে নিজের নির্দেশ শোনাচ্ছেন। বলছেন, 'আমি পূর্ববর্তী আহলে কিতাবকেও নির্দেশ করেছি এবং তোমাদেরও নির্দেশ করছি যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে তাকওয়া অবলম্বন করো!' অর্থাৎ– এটি এমন একটি নির্দেশ, যা পূর্ববর্তী উম্মতকেও করা হয়েছে, এই উম্মতকেও করা হয়েছে। নির্দেশটির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

তাছাড়া ওসিয়ত বলা হয় অন্তিম বাণীকে, যা মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্তে প্রদান করে থাকে। সাধারণভাবে তো নসীহত বা উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্ত জীবনের সকল নসীহত-উপদেশের সারনির্যাসকে 'ওসিয়ত' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা এখানে তাকওয়ার জন্য 'ওসিয়ত' শব্দ বলেছেন। এ থেকেও তাকওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তাকওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অলি হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

'মনে রেখো, আল্লাহর অলিদের না কোনো ভয় আছে, না তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে।'[২০০]

خوف বাইরের শত্রুর ভয়কে বলা হয়। আর حزن ভেতরগত চিন্তা, পেরেশানি ও দুঃখকে বলা হয়। এই দুটি বস্তু আওলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে থাকে না। আওলিয়ায়ে কেরাম কারা? আল্লাহ সামনে বলে দিয়েছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

'যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।'[২০১]

অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

اِنْ اَوْلِيَاؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ ○

'আল্লাহর অলি ও বন্ধু কেবল মুত্তাকীরা।'[২০২]

---

১৯৯. সূরা নিসা : আয়াত ১৩১
২০০. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬২
২০১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৩
২০২. আনফাল : আয়াত ৩৪

কোনো বদকার আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু হতে পারে না।

আল্লাহর বন্ধুত্বের স্তর

বেলায়াত তথা আল্লাহর বন্ধুত্বের দুটি স্তর রয়েছে।

১. সাধারণ বেলায়াত।

২. বিশেষ বেলায়াত।

যেব্যক্তি কালেমা পড়ে মুসলমান হলো, সে সাধারণ বেলায়াতের স্তর লাভ করল। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ○

'যারা ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহ্ তাদের অলি বা বন্ধু।'[২০৩]

বিশেষ বেলায়াত লাভের জন্য তাকওয়া আবশ্যক। যেব্যক্তি মুত্তাকী হবে, তার বিশেষ বেলায়াত অর্জিত হবে। অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য তার নসিব হবে।

তাকওয়া বড়দের দৃষ্টিতে

এ-পর্যায়ে তাকওয়ার হাকীকত উদঘাটন করা জরুরি। উদাহরণত বেগানা মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। ঈমানদারদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নত রাখো!'। তাই বেগানা মহিলাদের চেহারা দেখা হারাম। কিন্তু বোরকা পরিহিতা বেগানা মহিলার ওপর কারও দৃষ্টি পড়ে গেলে শরীয়ত বলছে, সে হারাম কাজ করেনি। তথাপি বেগানা মহিলাদের পোশাকের ওপরও দৃষ্টিপাত না করা হলো তাকওয়া। অর্থাৎ– মহিলার দৈহিক উচ্চতা ও গঠন-আকৃতি সম্পর্কেও কোনো ধারণা যেন অন্তরে না আসে এবং তার পোশাকের রং নীল না হলুদ ইত্যাদি জানার আগ্রহও অন্তরে স্থান না পায়।

হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) একবার হযরত ইবনে কা'বকে (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন ... তাকওয়া কাকে বলে? ইবনে কা'ব (রাযি.) জানতে চাইলেন, আপনি কি কখনও কাঁটাদার রাস্তা দিয়ে চলেছেন? ওমর ফারূক (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ। ইবনে কা'ব (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাস্তা কীভাবে অতিক্রম করেছেন? ওমর ফারূক (রাযি.) বললেন, কাঁটা থেকে দূরত্ব

---

২০৩. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৭

বজায় রেখে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এমন সতর্কতার সাথে সেই রাস্তা অতিক্রম করেছি, যেন আমার কাপড়ে বা শরীরে কোথাও কাঁটার আঁচড় না লাগে। এবার ইবনে কা'ব (রাযি.) বলেন, এরই নাম তাকওয়া যে, মানুষ এমন সতকর্তামূলক জীবন যাপন করবে, যেন তার আঁচল কোনো গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যায়।

যুন্নূন মিসরি (রহ.)কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হযরত! মুত্তাকী কে? জবাবে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি মুত্তাকী, যার অন্তরের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আকৃতি দান করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলে তন্মধ্যে কোনো কামনা-বাসনা এমন থাকবে না, যার ফলে তাকে লজ্জিত হতে হবে। উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, প্রকাশ্যে গুনাহ করা তো দূরের কথা, তার অন্তরেও এমন কোনো বাসনা থাকবে না, যা প্রকাশিত হলে তাকে লজ্জিত হতে হবে।

আমাদের ওলামা ও সুলাহাদের ইমাম খাজা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) বলতেন, হিন্দুস্তান ভাগের সময় হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর অনেক এমন শাগরেদ ছিলেন, যারা তাঁর কাছে দাওরায়ে হাদীছ পড়েছিলেন। হিন্দুস্তান ভাগের পর তারা হযরত মাদানিকে (রহ.) পত্র লিখলেন, হযরত! ইতোপূর্বে যখন কোনো মাসআলায় কারও শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হতো, তখন আমরা আপনার শরণাপন্ন হতাম। এখন দেশ বিভক্ত হয়েছে, যার ফলে আপনার দরবারে আসা-যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা কী করব? এ মর্মে আপনি আমাদের নির্দেশনা প্রদান করুন।

জবাবে হযরত মাদানি (রহ.) তিনজন হযরতের নাম প্রকাশ করে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য শাগরেদদের বলে দিলেন। সেই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.)। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাদানি (রহ.) শাগরেদদের বললেন, 'তিনি একজন মুত্তাকী ও সুন্নাতের অনুসারী বুযুর্গ। তোমরা যদি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখো, তাহলে অন্য কোনো মুরুব্বীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) এমনই একজন খাঁটি বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর খলীফাদের নামের তালিকায় অন্তত দুশো নাম রয়েছে। তাঁদের সকলের নামের সাথে মুহতামিম, নাযিম, মুফতী, হাফেয ও কারী প্রভৃতি উপাধি থেকে কোনো-না-কোনো উপাধি অবশ্যই যুক্ত ছিল। এরূপ মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আলেমদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর কাছে একজন জিজ্ঞাসা করল, হযরত! তাকওয়া কী? হযরত জবাব দিলেন, যেসব বস্তু অবলম্বন করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়, সেগুলো বর্জন করাকে তাকওয়া বলা হয়। সুতরাং বোঝা গেল, তাকওয়া কিছু করার নাম নয়, বরং না করার নাম। সালেকগণ (তরীকতের প্রাথমিক ব্যক্তিবর্গ) বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। তাকওয়া এই নয় যে, দুই রাকাত নফল পড়ে নিলাম অথবা সকালে উঠে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অজিফা আদায় করে নিলাম। বরং কিছু কাজ পরিহার করার নাম তাকওয়া। কোন ধরনের কাজ? যে কাজ কর্তাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে ঠেলে দেয় এসব কাজ পরিহার করা। হারাম কাজও না করা এবং যেসব কাজে হারামের সন্দেহ আছে সেগুলোও না করা। এজন্যই এর অপর নাম পড়েছে পরহেযগারি। যারা তা অবলম্বন করেন, তাদের বলা হয় পরহেজগার তথা বর্জনকারী।

'এই অধম যদি বোঝানোর লক্ষ্যে সরল ভাষায় মুত্তাকীর সংজ্ঞা দেয়, তাহলে এর সংজ্ঞা হবে, যেব্যক্তি জেনেবুঝে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ বর্জন করে এবং এমন সতর্কতামূলক জীবন যাপন করে, যেন কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো কেউ না থাকে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়। সুতরাং যেব্যক্তি এমন সতর্ক জীবন যাপন করবে যে,

সে আল্লাহ তা'আলার হকসমূহও পূর্ণ করবে,

আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকসমূহ পূর্ণ করবে, মাতাপিতার হকসমূহও আদায় করবে, স্ত্রী-সন্তানাদির হকসমূহও আদায় করবে, প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহও পূর্ণ করবে, বন্ধু-বান্ধবের হকসমূহও আদায় করবে, তাকে মুত্তাকী ও পরহেজগার বলা হবে।'

এবার আমরা নিজের বিচার নিজে করতে পারি যে আমরা আমাদের অন্তরে কোন স্তরের তাকওয়া ধারণ করে আছি? এমন তো হয়নি যে, অন্য সকলেই আমাদের আসামির কাঠগড়ায় উপস্থিতকারী?

কুরআনের দৃষ্টিতে তাকওয়া

কুরআন বোঝেন এমন ব্যক্তিগণ জানেন যে, তাতে জায়গায়-জায়গায় তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এত তাকিদ ও গুরুত্বারোপ সম্ভবত অন্য কোনো নির্দেশের ব্যাপারে কমই করা হয়েছে যত তাকীদ ও গুরুত্বারোপ তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশের ব্যাপারে করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ مُلٰقُوهُ○

'এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারী।'[২০৪]

বরং এক-এক আয়াতে দুই-দুবার করেও তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা এমন যেমন আমরা এক শ্বাসে কোনো কথা দুবার বলি। একবার বলে দিলেও চলে। তারপরও যদি একই কথা এক শ্বাসে দুবার বলা হয়, তাহলে এর দ্বারা সেই কথাটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এক-এক আয়াতে দুই-দুবার করে এর নির্দেশ দিয়েছেন। মনের কানে শুনুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেক্যের চিন্তা করা উচিত, আগামীকালের (কেয়ামতের দিন) জন্য সে কী সামান পাঠিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করো!'[২০৫]

উক্ত একই আয়াতে দুবার اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় করো) শব্দ এসেছে। হতে পারে, কেউ বলে বসবে, ঘটনাক্রমে একস্থানে এমনটি হয়েছে। না, তার সে কথা যথার্থ হবে না। কেননা, সূরা নিসার মধ্যেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ○

'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর এতদুভয় থেকে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো!'[২০৬]

---

২০৪ সূরা বাকারা : আয়াত ২২৩

২০৫. সূরা হাশর : আয়াত ১৮

২০৬. সূরা নিসা : আয়াত ১

এবার বলুন, আমরা কেয়ামতের দিন কী জবাব দেব? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এক-এক আয়াতে আমি দুই-দুবার اِتَّقُوْا (আল্লাহকে ভয় করো) নির্দেশ প্রদান করেছি, আর তোমরা এর উদ্দেশ্যই বুঝতে পারলে না? আরবি ভাষার গ্রামারের দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্রদের জন্য এটা তেমন কঠিন কোনো শব্দ নয়, যা বুঝে আসার মতো নয়। এটি আমর তথা নির্দেশসূচক শব্দ, যা সকল ছাত্রই বোঝে। আমরা এর ওপর কেন আমল করি না? নফস আমল করতে দেয় না বলে।

বরং এক আয়াতে তো তিনবার তাকওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوْا ○

'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের ওপর তাতে কোনো গুনাহ নেই, যা তারা পূর্বে পানাহার করেছে যদি তারা ভবিষ্যতে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তারপর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং সৎ কর্মপরায়ণশীল হয়।'[২০৭]

হায়! আমরা যদি এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতাম এবং তাকওয়া অবলম্বনের পাকাপোক্ত সংকল্প করে নিতাম!

তাকওয়ার উপকারিতা ও ফলাফল

আসুন, আমরা কুরআনে কারীমের আলোকে অবলোকন করি তাকওয়ার উপকারিতা ও ফলাফল কী?

১. যাবতীয় গুনাহ মাফ : যেব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, সে আল্লাহ তা'আলার এত প্রিয় হয়ে যায় যে, তিনি তার গুনাহসমূহ অতি দ্রুত মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ ○

'যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে) আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।'[২০৮]

---

২০৭. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯৩

২০৮. সূরা তালাক : আয়াত ৫

সুবহানাল্লাহ! কত বড় পুরস্কার! প্রকৃত মানুষ হওয়ার সুযোগ! যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়েও যায়, আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুত মাফ করে দেন। এর দৃষ্টান্ত মনে করুন এরূপ, ছোট শিশু মাকে খুব ভালোবাসে। মা ছাড়া সে কোথাও যায় না। কেউ তাকে উঠিয়ে নিতে চাইলে সে মায়ের দিকে দ্রুত চলে যায়। কিছুক্ষণ মায়ের চেহারা দেখতে না পেলে কাঁদতে শুরু করে। মা তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে মাকে জড়িয়ে থাকে। মাতাও বোঝেন, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। মায়ের অন্তর এই ভেবে প্রশান্তি পায় যে, সন্তান আমার আমাকে খুব মহব্বত করে।

এ অবস্থায় (ধরে নিন) যদি সেই ছোট শিশু কখনও তার মায়ের চেহারায় থাপ্পর মারে, তাহলে এই থাপ্পর মারা যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এর ওপর মা তাকে শাস্তি প্রদান করেন না। বরং মা সন্তানের হাত ধরে তাতে চুমু খায়। মা মনে করেন, সে অজ্ঞ, অবুঝ। তিনি সন্তানের থাপ্পর মারাকে তার অবুঝপনা মনে করে সঙ্গে-সঙ্গে মাফ করে দেন। কেননা, মা এ-ও জানেন যে, সন্তান আমাকে মহব্বত করে। এমনিভাবে মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে এত ভালোবাসেন যে, যদি (ধরে নেয়া যাক) তিনি কখনও গুনাহ করেও ফেলেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবুঝ মনে করে সঙ্গে-সঙ্গে মাফ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এই বান্দা এমন এক বান্দা, যার অতীত জীবন বলছে, সে সতর্কতাকতামূলক জীবন যাপন করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এখন তার থেকে গুনাহ হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাকে মাফ করে দিচ্ছি।

স্বামীর কাছে স্ত্রী যদি প্রিয়া হয়, তাহলে তার ছোটখাট ভুলত্রুটি কানেই নেয় না। মা বলতে চায়, তোমার স্ত্রীর মধ্যে এই সমস্যা আছে। বোন বলতে চায়, তোমার স্ত্রী এই ভুল করেছে। স্বামী তাদের কথা শোনেই না। অথচ বাস্তবেই স্ত্রী ভুল করে, স্বামীও তা জানে। কিন্তু সে এড়িয়ে যায়। এমনিভাবে মুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এত প্রিয় হয় যে, যদি কখনও সে ভুল করেও বসে তাহলে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ মাফ করে দেন। যেমনভাবে বড় দেশ ছোট দেশের ঋণ মাফ করে দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও মুত্তাকীর গুনাহের ঋণ মাফ করে মাথা থেকে বোঝা অপসারণ করে দেন।

২. প্রতিদান বৃদ্ধি করা : তাকওয়ার একটা উপকারিতা এ-ও যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে অনেক বেশি প্রতিদান প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ○

'আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন।'[২০৯]

অন্য শব্দে এরূপ মনে করুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির আমলের রেট বাড়িয়ে দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ–

দেখুন, সিজনে টমেটো সাধারণত প্রতি কিলো দুই চার রুপিতে বিক্রি হয়। কিন্তু কখনও বছরে এমনও সময় আসে, যখন প্রতি কিলো টমেটো একশো রুপিতে বিক্রি হয়। টমেটো তো একই; কিন্তু মূল্য বেড়ে যায়। সুতরাং এরূপই মনে করুন যে, মুত্তাকী যে আমল করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অমৌসুমি সবজির রেট লাগিয়ে দেন।

একটি কাপড় যেখানে প্রতি গজ দশ রুপিতে পাওয়া যায়, সেখানে আরেক কাপড় প্রতি গজ পাঁচশত রুপিতেও পাওয়া যায় না। এটাও কাপড়, সেটাও কাপড়। দুটি দ্বারাই শরীর আবৃত করা হয়। কিন্তু গুণগত মানের পার্থক্য। আজকাল মানুষ বেশি মূল্য দিয়ে উন্নতমানের সামগ্রী ক্রয় করে। বলে থাকে, অর্থের চিন্তা করো না! আমার মানসম্মত বস্তু চাই। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও মুত্তাকী বান্দার ইখলাসপূর্ণ সতর্কতামূলক আমলকে বেশি রেট দিয়ে কবুল করে নেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, 'মুত্তাকী বান্দার দুই রাকাত নামায অমুত্তাকী বান্দার এক হাজার রাকাত অপেক্ষা উত্তম।'

এক মন মাটিও এক মনই হয়। এক মন লোহাও এক মনই হয়। এক মন স্বর্ণও এক মনই হয়। কিন্তু সবগুলোর মূল্য এক সমান নয়। মাটির মূল্য অপেক্ষা লোহার মূল্য বেশি। লোহার মূল্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য বেশি। বদকার, সাধারণ মানুষ আর মুত্তাকী সকলেই একই নামায আদায় করে। কিন্তু যে বদকার, আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত তাদের ওপর মাটির দর প্রয়োগ করবেন। যারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, তাদের ওপর লোহার দর প্রয়োগ করবেন। আর যারা মুত্তাকী-পরহেজগার, তাদের ওপর স্বর্ণের দর প্রয়োগ করবেন।

আপনি যদি কোনো ব্যবসায়ীকে বলেন, আপনার পণ্য বাইরে রপ্তানি করুন, সেখানে মূল্য বেশি হবে, তাহলে সে যথাসম্ভব চেষ্টা করে তার পণ্য

---

২০৯. সূরা তালাক : আয়াত ৫

সামগ্রী বাইরে রপ্তানি করবে। তার জানা আছে, এখানে তার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য বাইরে রপ্তানি করলে হয়তো যথোপযুক্ত মূল্য বা দ্বিগুণ রেট পাওয়া যাবে। যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী বেশি বা দ্বিগুণ লাভ করতে সচেষ্ট হয়, তেমনিভাবে মুমিন বান্দার আমলের ওপরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে রেট দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদেরও উচিত, আমরা যেন আমাদের আমল রপ্তানি মার্কেটের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করি, যাতে করে দ্বিগুণ বা তদপেক্ষা অধিক রেট পাওয়া যায়।

মোটাকথা, মানুষ অফিসে আট ঘন্টা ডিউটি করে। কেউ তিন হাজার টাকা বেতন পায়, কেউ পায় ত্রিশ হাজার। ব্যবসায়ীরা হতে পারে সকলেই এক লাখ নিয়ে বাজারে আসে, সময়ও একই রকম ব্যয় করে। কিন্তু সকলের লাভ সমান হয় না। মুত্তাকী বান্দাও আল্লাহ তা'আলার এত প্রিয় যে, সেও সাধারণ মানুষের মতোই আমল করে, কিন্তু তার তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা তার আমলের প্রতিদান অনেক বৃদ্ধি করে দেন।

৩. ফুরকান (হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার নেয়ামত) প্রদান : তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে একটি বিশেষ নূর দান করেন। সেই নূরকে 'নূরে ফেরাসাত' (বিচক্ষণতার নূর) বলা হয়। কুরআনে কারীমে তাকে 'ফুরকান' বলা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ○

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ফুরকান (বিশেষ নূর তথা বিচক্ষণতা) দান করবেন।'[২১০]

ফুরকান একটি নূর, যার মাধ্যমে মানুষ খাঁদ-নিখাঁদ, ভেজাল-নির্ভেজাল তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা তাকে হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যবিধানকারী নেয়ামত দান করেন। তিনি ভালো ও মন্দ তাৎক্ষণিক পার্থক্য করতে পারেন। এই নেয়ামত আল্লাহওয়ালাদের কাছে থাকে। তাই তো বলা হয়েছে–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ

'তোমরা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো। কেননা, সে আল্লাহ নূর দ্বারা অবলোকন করে।'

---

২১০. সূরা আনফাল : আয়াত ২৯

মুমিনের অন্তদৃষ্টি বড় বিস্ময়কর নেয়ামত। এই উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরাম অনেকেই এই নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন। এর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

ভূমিষ্টের পূর্বে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ

সাইয়িদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে ডেকে বললেন, আমার এই সম্পদ তোমার দুই ভাই এবং দুই বোনের মাঝে বণ্টন করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) আরজ করলেন, সেটা কীভাবে? আমার তো বোন একজন? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, তোমার মাতা সন্তানসম্ভাবা এবং আমার অন্তদৃষ্টি আমাকে বলছে, এখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে কন্যাসন্তান দান করবেন। পরবর্তী কালে তা-ই হয়েছে। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রী কন্যাসন্তান প্রসব করেছেন এবং তাঁর কথা একশো ভাগ সত্য বলে প্রতিফলিত হয়। এটি হলো অন্তদৃষ্টি, যা আল্লাহ তা'আলা অন্তরে ঢেলে দেন।

স্বপ্ন না শুনেই তাবির

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে একটি চমৎকার ঘটনা লিখা আছে। একবার হযরত আলী (রাযি.) স্বপ্নে হযরত রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পান। দেখেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িয়েছেন। তিনিও পেছনে নামায পড়েছেন। নামায শেষে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীদের প্রতি মুখ করে বসে গেলেন। ইতোমধ্যে একমহিলা এল এবং খেজুরভর্তি একটি থালা তাঁর সামনে পেশ করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থালা থেকে দুটি খেজুর নিলেন এবং হযরত আলীকে (রাযি.) খেতে দিলেন। তিনি খেজুরদুটি খেয়ে অত্যন্ত স্বাদ পেলেন। এ-সময় তাঁর চোখ খুলে গেল। স্বপ্নটা তাঁর কাছে খুব ভালো লেগেছে। এক তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার হয়েছে। দুই. তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। তিন. তাঁর মোবারক হাত থেকে খেজুর খেয়েছেন।

হযরত আলী (রাযি.) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তখন হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর খেলাফত কাল। হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) মসজিদে এলেন এবং নামায পড়ালেন। আল্লাহ তা'আলার শান

দেখুন। হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) নামাযে সেই সূরাদুটি পড়লেন, যে দুই সূরা হযরত আলী (রাযি.)-এর স্বপ্নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছিলেন। হযরত আলী (রাযি.) অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তারপর হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে গেলেন। ঘটনাক্রমে একমহিলা খেজুরভর্তি একটি থালা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর কাছে পাঠালেন। হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) থালা থেকে দুটি খেজুর উঠালেন এবং হযরত আলীকে (রাযি.) খেতে দিলেন। খেজুর দুটি খাওয়ার পর হযরত আলী (রাযি.)-এর মন খুবই প্রফুল্ল হলো। খেজুর খেয়ে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আরও দিন! হযরত ওমর (রাযি.) মুচকি হেসে বললেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি স্বপ্নে আপনাকে আরও দিতেন, তাহলে আমিও আপনাকে আরও দিতাম।

এটি অন্তর্দৃষ্টির নূর, যা তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষ অর্জন করে থাকে। এই নেয়ামত যে-কারও ভাগ্যে জোটে না। আপনারা চিন্তা করলে দেখবেন, এই নেয়ামত বর্তমানে মানুষের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে।

কুদৃষ্টির তাৎক্ষণিক জ্ঞান

একবার সাইয়িদুনা হযরত ওছমান (রাযি.) বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হলেন। পথে কোথাও বেগানা মহিলার ওপর লোকটির দৃষ্টি পড়ে গিয়েছিল। হযরত ওছমান (রাযি.) তাকে দেখামাত্র বললেন, 'লোকদের কী হলো, আমাদের মজলিসে নির্ভয়ে চলে আসে; অথচ তাদের চোখ থেকে ব্যাভিচারী টপকাতে থাকে।'

লোকটি হযরত ওছমান (রাযি.)-এর কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন, কী ব্যাপার, এখনও কি ওহী নাযিল হয়? জবাবে তিনি বললেন, না, এটি ওহী নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর, যা মুমিনকে দান করা হয়।

মুমিনের নিরীক্ষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির মর্ম

জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) মসজিদে বসা। ইতিমধ্যে জুব্বা পরিহিত, মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল। লোকটির চেহারা দেখতে বাহ্যত নূরানি, সুঠাম দেহের অধিকারী। সব মিলিয়ে খুবই সুদর্শন। সে এসে বলল, হযরত! আমাকে একটি হাদীছের মর্ম বুঝিয়ে দিন! জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন হাদীছ?

লোকটি বলল–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّه يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ.

'তোমরা মুমিনের দিব্যজ্ঞানকে ভয় করো। কেননা, সে আল্লাহর নূর দ্বারা প্রত্যক্ষ করে।'

হযরত তার চেহারার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'হে খৃষ্টানের বাচ্চা! এই হাদীছের মর্ম হলো, তুমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও! এতদশ্রবণে তার শরীর ঘেমে গেল। সে বলল, বাস্তবেই আমি খৃষ্টান। আপনার কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য হলো, আমি প্রথমে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করব, তারপর আপনাকে মানুষের মাঝে অপদস্ত করব যে, আপনি এত বড় শাইখ হয়ে গেছেন; কিন্তু আমি মুমিন কি-না এতটুকুই আপনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু আপনি যে আমার পরিচয় আঁচ করে ফেলেছেন, এ থেকে সহজেই অনুমিত হয়, এটি এক বিরাট নেয়ামত, যা মুত্তাকী মুমিনের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। সুতরাং এখনই আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছি। আল্লাহু আকবার!

তোমাদের ঘরে সুদ কীভাবে!

হযরত খাজা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) খুব সতর্কতা অবলম্বনকারী বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর জীবনে অনেক উঁচু পর্যায়ের তাকওয়া ছিল। কেউ তাঁকে সন্দেহজনক কিছু খেতে দিলে তিনি তা গ্রহণই করতেন না। জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার আমি হযরতের জন্য সন্দেহজনক অর্থ দ্বারা প্রচুর পরিমাণ খাবার তৈরি করলাম। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ পাতিল। এর বাইরে সম্পূর্ণ হালাল অর্থ দ্বারা শুধু ডাল রান্না করলাম। হযরত দস্তরখানে বসে শুধু ডাল দ্বারা রুটি খেয়ে উঠে গেলেন। অন্যান্য খাবারের দিকে হাতই প্রসারিত করেননি।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর বড় ছেলে হযরত মাওলানা আবদুর রহমান কাসেমি (রহ.) নিজে আমাকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন যে, হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) তাবলীগি সফরে ছিলেন। এ-সময় হযরত খাজা আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) সেই এলাকায় কোনো প্রোগ্রামে আগমন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে আচানক চাকওয়াল চলে এলেন। হযরত যখন হঠাৎ তাশরীফ আনলেন, তখন আমি আনন্দিতও হলাম এবং চিন্তিতও হলাম। আমি ঘরে এসে মাকে বললাম, হযরত (রহ.) তাশরীফ এনেছেন, তাঁর জন্য খাবারের আয়োজন করুন। আমি হযরতকে বসালাম, পানি পান করালাম।

দস্তরখানে খাবার পরিবেশনের পর হযরত দস্তরখানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করার পর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের ঘরে সুদ কীভাবে প্রবেশ করল?' আমি সঙ্গে-সঙ্গে আম্মাজানের কাছে ফিরে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আম্মাজান! হযরত তো খাবারের দিকে হাতই প্রসারিত করছেন না, বরং রাগান্বিত হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের ঘরে সুদ প্রবেশ করল কীভাবে?

আম্মাজান মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, উহ্ হু! ভুল আমারই হয়েছে। আমার অমুক প্রতিবেশী মহিলা দীর্ঘ দিন যাবৎ আমাকে বলছিল, সামনে যখনই আপনাদের পীর সাহেব আসবেন, তখন আমি খাবার প্রস্তুত করে খাওয়াব। আমার খেয়ালই হলো না যে, হযরত সন্দেহজনক খাবার খান না। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, সেই মহিলার স্বামীর উপার্জন তো হালাল, কিন্তু তিনি তার অর্থ সুদি একাউন্টে রেখেছিলেন। তাই তাও হারাম হয়ে গেছে।

চল্লিশ দিনে নেসবত (সম্পর্ক) স্থাপন

আউলিয়ায়ে কেরামের ইমাম হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি (রহ.)-এর অন্তর্দৃষ্টির কথা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি বলতেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমার কাছে থাকেন এবং আমি যা-যা খেতে বলি তা খান, তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার রহমতে আশাবাদী যে, এই চল্লিশ দিনের মধ্যে আপনার সিনাকে আল্লাহর সম্পর্কের নূর দ্বারা উদ্ভাসিত করে দেওয়া হবে।

আঙুর থেকে মৃতের দুর্গন্ধ

হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.)-এর কাছে একবার কোনো মুরীদ কিছু আঙুর হাদিয়া নিয়ে এল। হযরত কয়েকটি আঙুর নিয়ে মুখে দিতে গিয়েও না দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, এগুলো থেকে আমার কাছে মৃতের দুর্গন্ধ আসছে। মুরীদ বলল, হযরত! বাজার থেকে এনেছি। কিন্তু হযরত সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। হযরত (রহ.)-এর এই আমলের কারণে মুরীদের ভেতর অনুসন্ধানের স্পৃহা জন্মাল এবং সে অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। সে দোকানদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এই আঙুর আপনি কোথা থেকে এনেছেন? দোকানদার জবাব দিল, এক গ্রাম্য ব্যক্তির আঙুরের বাগান আছে। সে নিয়ে আসে; আমি তার থেকে ক্রয় করে রাখি। মুরিদ বলল, আমাকে তার ঠিকানাটা দিন। দোকানি ঠিকানা দিয়ে দিল। মুরিদ তার

ঠিকানায় গিয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারল, আঙুরওয়ালা একটি পুরাতন কবরস্তান সমান করে তাতে আঙুরের বাগান করেছে।

এটি গায়েবের ইল্‌ম নয়

প্রিয় সালেকগণ! এটা গায়েবের কোনো ইল্‌ম নয়। স্মৃতিকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার রাখবেন। কেউ যেন এমন না বলে যে, এটি তো গায়েবের ইল্‌ম হয়ে গেল। বরং এটি অন্তর্দৃষ্টির একটি নূর। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের সঠিক জ্ঞান দান করা হয়, তাঁদের অন্তরে উদয় করে দেওয়া হয়, যার বদৌলতে তারা সেসব সামগ্রী ব্যবহার ও ভোগ করা থেকে বিরত থাকেন। একে ফেরাসাতের নূর, ফুরকান, হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী শক্তি এবং মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিও বলা যেতে পারে।

আপনারা দেখে থাকবেন, কোনো ব্যক্তি ত্রিশ-চল্লিশ বছর থানায় দারোগার চাকরি করার পর তার সামনে দিয়ে পাঁচজন লোক গমন করলে তিনি তাদের দেখেই বলে দেন, এদের মধ্যে অমুক নেশাখোর। অথচ তার জানা নেই, সে নেশা করে কি-না? কিন্তু অনুসন্ধানের পর প্রতীয়মান হয়, সত্যিই সে নেশা করে। তিনি কীভাবে তা বুঝতে সক্ষম হন? তার অভিজ্ঞতা থাকে। সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি পরিচয় পেয়ে যান। আমরা পারি না; কিন্তু দারোগা পারে। এমনিভাবে ফেরাসাতের এই নূরও অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তাঁর মুত্তাকী বান্দাদেরও এ-জাতীয় বিষয় বুঝিয়ে দেন।

৪. সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি : তাকওয়ার উসিলায় মানুষ সংকীর্ণতা থেকে পরিত্রাণের ফলও অর্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাদের জন্য সংকীর্ণ অবস্থা থেকে বের হওয়ার রাস্তা করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○

'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।'[২১১]

হিংসুকদের মোকাবেলায় খোদায়ি সাহায্য

কতিপয় হিংসুক ইমাম আযম হযরত আবুহানীফা (রহ.)-এর ওপর অপবাদ লাগানোর অপচেষ্টা চালায়। হিংসুক তো দুনিয়াতে থাকেই। স্মরণ

---

২১১. সূরা তালাক : আয়াত ২

রাখবেন, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা যেখানে যত বেশি থাকবে, সেখানে হিংসুকের সংখ্যাও তত বেশি থাকবে। যেহেতু ইমাম আবুহানীফা (রহ.) ফিক্‌হের জগতে অনেক উঁচু মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন, তাই আপনারা তাঁর তুলনায় অন্যান্য ইমামগণের হিংসুক তত দেখবেন না। যারা বলে, আমরা কারও তাকলীদ করি না, তারা অন্য কোনো ইমামের ওপর অপবাদ লাগাবে না। আপনারা কখনও তাদের জবানে ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নাম শুনতে পাবেন না। তাদের সকল অভিযোগ পরিশেষে ইমাম আযম হযরত আবুহানীফা (রহ.)-এর হয়ে থাকে। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। এজন্য তাঁর হিংসুকও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন–

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

'আর (আশ্রয় চাই) হিংসুকের অকল্যাণ থেকে, যখন সে হিংসা করে।'[২১২]

হিংসুকেরা ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর ওপর এভাবে অপবাদ আরোপের অপচেষ্টা চালায় যে, তারা এক নষ্টা মহিলাকে অর্থ দেওয়ার প্রলোভন দেয় এবং বলে, তুমি এই নুমানটাকে (ইমাম আযম) যেকোনো উপায়ে তোমার ঘরে ডেকে আনো! আমরা তোমাকে এত অর্থ দেব। মহিলা পূর্ণ বিষয়টি বুঝতে পারেনি। সে বলল, ঠিক আছে, এটা তো তেমন বড় কোনো কাজ নয়। আমি কোনো বাহানা করে তাকে ডেকে নিয়ে আসব।

হযরত ইমাম আযম (রহ.) ঈশার নামায পড়ে ঘরে ফিরছিলেন। পথে সেই মহিলা নিজের ঘরে বসে অপেক্ষায় ছিল। ইমাম আযম (রহ.) যখনই তার ঘরবরাবর এলেন, তখন সে ঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে এল এবং বলল, আমার স্বামী অন্তিম মুহূর্তে আছে। সে কোনো ওসিয়ত করতে চাচ্ছে, আপনি মেহেরবানি করে তার ওসিয়ত শুনে লিখে দিয়ে যান। হঠাৎ এ-ধরনের পরিস্থিতি সামনে এলে মানুষ তাকে সত্য মনে করে। সুতরাং তিনি মহিলার কথা সত্য মনে করে তার ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, হিংসুকের দল পূর্ব থেকে সেখানে উপস্থিত। তারা ইমাম আযম আবুহানীফাকেও ধরে ফেলল, মহিলাকেও ধরে

---

২১২. সূরা ফালাক : আয়াত ৫

ফেলল এবং বলতে লাগল, দেখো; এত বড় আলেম হয়েছে আবার রাতে অপরিচিতা মহিলার ঘরে প্রবেশ করেছে! হিংসুকের দল তখনকার শাসকের কাছে বিষয়টি নালিশ আকারে উপস্থাপন করে দিল। শাসক বলল, দুজনকেই জেলে বন্দি করে রাখো; আমি সকালে বিষয়টি সমাধান করব। তারপর দুজনকে একটি রুমে বন্দি করা হলো।

হযরত ইমাম আযম (রহ.) উজু অবস্থায় ছিলেন। তাই সেখানেই তিনি কাপড় বিছিয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি নফল পড়তে থাকলেন। মহিলার মনে চিন্তা জাগল, আমি একজন মহিলা, যুবতিও বটে। অন্ধকারও আছে এবং নির্জনতাও আছে। তারপরও এই লোক এত সৎ যে, আমার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই করছে না! সুতরাং তার অনুভূতি হলো, এত নেককার ব্যক্তির সাথে এই ব্যবহার করা হয়েছে! পরিশেষে সে অনুতপ্ত হয়ে প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) যখন সালাম ফেরালেন, তখন মহিলা বলল, আমি আপনার সামনে এই সাজানো নাটকের প্রকৃত রহস্য প্রকাশ করতে চাই। বললেন, বলো! মহিলা বলতে লাগল, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আমাকে এভাবে প্রলোভন দিয়েছে। আমি তাদের প্রলোভনে পড়ে এই ভুল করে ফেলেছি। এখন আমার অনুভূতি হচ্ছে, আমি মারাত্মক গুনাহ করে বসেছি। তাই আমি আপনার কাছে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

হযরত বললেন, ব্যাপার যদি এ-ই হয়, তাহলে আমি তোমাকে একটি কৌশল বলছি; তুমি তা মেনে চলো। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, কী কৌশল? হযরত বললেন, জেলের পাহারাদারের কাছে যাও এবং তাকে বলো, আমাকে আচানক বন্দি করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার ঘরে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আপনি আমার সাথে আমার ঘরে চলুন, আমি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে আবার আপনার সাথে ফিরে আসব। আশা করি, সে তোমার ওপর আস্থা রাখবে। তারপর পাহারাদারকে নিয়ে আমার ঘরে চলে যাবে। আমার স্ত্রীকে পূর্ণ ঘটনা খুলে বলবে। তোমার বোরকাটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দেবে এবং তাকে বলবে, সেটি পরে এই পাহারাদারের সাথে আমার কাছে চলে আসতে।

মহিলা তা-ই করল এবং কিছুক্ষণ পর ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর স্ত্রী তার রুমে পৌঁছে গেলেন।

পরদিন শাসক দরবারে বসলেন। দরবারে হিংসুকদের বিরাট এক দল উপস্থিত। তারা বলছে, আজ দেখব, এই বিপদ থেকে সে কীভাবে বের হয়?

শাসক দরবার শুরু করে বললেন, 'নুমান! আপনি এত বড় একজন আলেম, মানুষ আপনাকে ইল্‌মের পাহাড় মনে করে! আর আপনার এই কাজ রাতের বেলা বেগানা মহিলার সাথে!'

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, না, আমি তো বেগানা মহিলার সাথে ছিলাম না। শাসক বললেন, এই তো তোমার সাথে একজন বেগানা মহিলা। ইমাম সাহেব বললেন, এই মহিলা আমার বেগানা নয়। আপনি আমার শ্বশুরকে ডেকে এনে এই মহিলার পরিচয় প্রকাশ করতে বলুন। তাঁর শ্বশুরকে ডাকা হলো। শ্বশুর এসে মহিলাকে দেখে বললেন, এ তো আমার মেয়ে। এতদিন পূর্বে ইমাম সাহেবের কাছে তাকে বিয়ে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে হিংসুক এবং শত্রুদের এমন চক্রান্ত থেকেও বের করে আনেন, যেখান থেকে মুক্তি মানুষের কল্পনাতীত।

প্রতিকূল অবস্থায় মুক্তির পথ

সামাজিক জীবন যাপনে মানুষকে অগণিত সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন– মেয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কখনও এমন হয় যে, বিয়ের কোনো প্রার্থী আসে না। তখন পিতামাতা দিন-রাত যে-অস্থিরতার মধ্যে কাটে, তা অন্য কাউকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। যে-পরিবারে পিতামাতার একমাত্র যুবক ছেলে লেখাপড়া শেষ করেছে দুই তিন বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। সেই ছেলে যখন সন্ধ্যাবেলা শূন্যহাতে ঘরে ফেরে, একমাত্র মা-ই বলতে পারে, তখন তার অন্তরের ওপর কী তুফান বয়ে যায়। অনেক সময় নতুন ব্যবসা শুরু করা ব্যক্তির মূলধন অন্য লোকেরা আত্মসাৎ করে বসে। তারা পাওনা দিতেই চায় না। এবার কী আর করা। এমন অবস্থায় শয়তান সেই ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা দেয় এবং তার অন্তরে এরূপ চিন্তা ঢেলে দেয় যে, কেউ কিছু করেছে। তারপর কবিরাজদের পেছনে ছুটে বেড়ায় আর বলে, কেউ আমার ব্যবসায় বাঁধ দিয়েছে। হে আল্লাহর বান্দা! কেউ ব্যবসা বাঁধতে পারে না। রিযিকের ব্যাপার তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ○

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার রিযিক প্রশস্ত করে দিন, আর যাকে ইচ্ছে তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন।'[২১৩]

---

২১৩. সূরা রা'দ : আয়াত ২৭

আমাদের এসব সমস্যার সমাধান নিহীত আছে একটা জায়গায়। আর আমরা ছুটছি অন্য জায়গায়। শুরুতে পেরেশানি কম থাকে। পরবর্তী কালে কবিরাজ অসহনীয় পেরেশানিতে নিক্ষেপ করে। মানুষ যখন দেখে, দরজা বন্ধ; চতুর্দিকে মজবুত দেওয়াল, এহেন অবস্থায় কী করবে কিছুই তার বুঝে আসে না, বরং চিন্তাশক্তি লোপ পায়; এমন অবস্থাকে বলা হয় সংকীর্ণ ও সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা।

কুরআনে কারীমের এক আয়াত ঘোষণা করছে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাদের জন্য এরূপ রুদ্ধদ্বার অবস্থায়ও দরজা বের করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির দ্বার ব্যবস্থা করে দেন।'[২১৪]

مَخْرَج (দ্বার)কে ইংরেজিতে Exit বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে কঠিনতর অবস্থায়ও বের হওয়ার পথ দেখিয়ে দেন। বর্তমানে অনেক বড়-বড় এ্যাপার্টমেন্ট হচ্ছে। যদি কোনো কারণে এসবের ভেতরে আলো বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বিশেষ ব্যবস্থায় কিছু আলো জ্বলে ওঠে এবং পথনির্দেশ করে, বের হওয়ার রাস্তা এদিকে। এই রাস্তাকে এগজিট ডোর (বহিরাগমন পথ) বলা হয়। ঠিক এরূপই মনে করুন। কোনো মুত্তাকী বান্দা যদি কখনও কোনো কারণে প্রতিকূল অবস্থার পেরেশানি এবং বিপদে পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এগজিটের আলো জ্বালিয়ে বের হওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর যাবতীয় কাজ সহজতর করে দেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কার্যাবলি সহজ করে দেন।'[২১৫]

সুতরাং আপনারা দেখে থাকবেন, মুত্তাকী ব্যক্তিদের কাজ এমনি-এমনি সম্পন্ন হয়ে যায়। মনে হয়, যেন বড় কোনো শক্তি তাদের কার্যাবলি নিজ থেকে সুসম্পন্ন করে দিচ্ছে। তাদের কাজে আল্লাহর সাহায্য শামিল থাকে।

---

২১৪. সূরা তালাক : আয়াত ২

২১৫. সূরা তালাক : আয়াত ৪

৫. পর্যাপ্ত রিযিক : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে হিসাব ছাড়া পর্যাপ্ত রিযিক দান করেন। তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা তার ধারণা ও কল্পনার বাইরে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দার জন্য ইরশাদ করেন–

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা সে চিন্তাও করে না।'[২১৬]

নোটে ভরা সুটক্যাস

হযরত খাজা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) খানেওয়ালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শহরের সর্বাপেক্ষা বড় মসজিদ সেটি। লোকজন মসজিদটির নাম করণ করেছেন 'চাঁদাহীন মসজিদ'। কেননা, হযরত (রহ.) উক্ত মসজিদ নির্মাণে কোনো চাঁদা করেননি। মসজিদটি খুবই আলীশান।

শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান শুনিয়েছেন (কিতাবেও লিখিত আছে) যে, হযরত (রহ.) একবার নির্মাণ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতে পাচ্ছিলেন না। তিনি মিস্ত্রী এবং শ্রমিকদের সাথে এই চুক্তি করে রেখেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেবেন, তখন আমি আপনাদের দেব। যখন আমার কাছে অর্থ থাকবে না, তখন আপনারাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন, আমিও প্রার্থনা করব। লোকজন এ-চুক্তির ভিত্তিতেই কাজ করছিল। ঈদুল ফিতর আসন্ন। অথচ শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন বাকি। হযরত (রহ.) এ অবস্থায় চিন্তা করতে লাগলেন, গত কমাস না হয় বেতন বকেয়া থাকলেও তাদের তেমন সমস্যা হয়নি, কিন্তু এখন ঈদ ঘনিয়ে আসছে। ঈদে স্ত্রী-সন্তানদের অনেক চাহিদা রয়েছে। এবার তো তাদের বেতন পরিশোধ করা চাই! আমার কাছে যদি অর্থ থাকত, তাহলে আমি তাদের বেতন পরিশোধ করে দিতাম। এই ভেবে তিনি দু-রাকাত নামায পড়তেন এবং নামাযান্তে দু'আ করতেন। তারপর আবার দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং দু'আ করতেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সাক্ষাৎ শেষে বিদায় বেলা তিনি বলেন, হযরত! আমি এই সুটক্যাসটা

---

২১৬. সূরা তালাক : আয়াত ৩

আপনাকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য এনেছি। হযরত (রহ.) বললেন, ঠিক আছে! আপনি এই ছেলের হাতে দিয়ে দেন, সে তা বাসায় পৌঁছিয়ে দেবে। লোকটি তা-ই করল। ছেলে যখন সুটক্যাস নিয়ে বাসায় গেল, তখন শ্রদ্ধেয়া মা অন্য মহিলাদের নিয়ে আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলেন।

ছেলে বলল, হযরতজি এই সুটক্যাসটা পাঠিয়েছেন। আম্মাজান বললেন, আচ্ছা এখানে রেখে দাও! ছেলে তা-ই করল। তিন দিন পর হযরত (রহ.) একবার বাসায় প্রবেশ করেন। তখন আম্মাজান বললেন, আপনি একটি সুটক্যাস পাঠিয়েছিলেন; সেটি কারও আমানত নাকি আপনার? হযরত (রহ.) বললেন, সুটক্যাসটি জনৈক ব্যক্তি হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছিল। তারপর আমি সেটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান বললেন, এর ভেতরে কী আছে একটু দেখুন তো। তারপর তিনি নিজেই সেটি উঠালে খুব ভারী মনে হলো। ফলে তিনি বললেন, এটা কি লোহার তৈরী? হযরত (রহ.) বললেন, সুটক্যাস তো লোহার তৈরী হয় না। আম্মাজান বললেন, তাহলে এতে কী আছে? হযরত (রহ.) বললেন, খুলে দেখে নাও। আম্মাজান বলেন, আমরা সুটক্যাসটি খুলে হতভম্ব হয়ে যাই, দেখি পূর্ণ সুটক্যাস হাজার-হাজার রুপির নোটে ভরা। সুবহানাল্লাহ! দাতাও যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, তিনি খোঁটা দেননি, তেমনি গ্রহীতাও ছিলেন অমুখাপেক্ষী!

ইঁদুরের মাধ্যমে রিযিকের ব্যবস্থা

এক সাহাবী টয়লেট করার জন্য মাঠে যান। টয়লেট করা অবস্থায় তিনি দেখতে পান, তাঁর সন্নিকটে ইঁদুরের গর্ত থেকে এক ইঁদুর মুখে একটা দিনার নিয়ে বের হয়েছে এবং দিনারটা বাইরে রেখে দিয়েছে। তারপর আবার গর্তে ঢুকেছে এবং আরও একটা দিনার নিয়ে বের হয়েছে। এভাবে ইঁদুর একই কাজ বারবার করতে থাকে। টয়লেট শেষ করে সাহাবী দেখলেন, এ পর্যন্ত ষোলোটা দিনার বের করেছে। তিনি দিনারগুলো উঠিয়ে নিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসনীয় একটি অভ্যাস ছিল, যখনই তাঁদের সামনে নতুন কিছু ঘটত, তাঁরা সে সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতেন। সেই সাহাবী দিনারগুলো নিয়ে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ঘটনা ঘটেছে। বলুন, আমি এই দিনারগুলো কী করব? রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, এগুলো মূলত তোমার রিযিক। আল্লাহ তা'আলা এগুলো তোমার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এখন তুমি এগুলো ভোগ করো।

যখনই আমি উক্ত ঘটনা পড়ি, তখনই আমি এই ভেবে হতবাক হয়ে যাই যে, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কেমন ছিল! তাঁরা ইঁদুরের মাধ্যমে রিযিক পেতেন। আর বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, পূর্ণ মাস যা উপার্জন করা হয়, সব বিভিন্ন বিল পরিশোধে শেষ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল ইত্যাদি বিল পরিশোধে সমস্ত বেতন চলে যায়।

মাতাপিতার খেদমতের পুরস্কার

এক যুবক স্বীয় মাতাপিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের খুব খেদমত করেছে। তাঁরা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর সে স্বপ্নে দেখে, এক লোক তাকে বলছে, তুমি তোমার মাতাপিতার অনেক খেদমত করেছ। এখন তুমি পুরস্কার পাবে। অমুক পাথরের নিচে একশত দিনার পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে দিনারগুলো উঠিয়ে নাও। যুবক অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। জিজ্ঞাসা করল, তাতে বরকত হবে কি? লোকটি জবাব দিল, না, বরকত হবে না। যুবক বলল, তাহলে আমি সেগুলো নেব না। সকালে ঘুম থেকে জেগে যুবক যখন তার স্ত্রীকে স্বপ্নের বিবরণ শোনাল, তখন স্ত্রী বলল, ঠিক আছে, আপনি সেগুলো নেবেন না। তবে সেখানে গিয়ে দেখুন তো; বাস্তবিকই দিনার পড়ে আছে কিনা? যুবক বলল, যেহেতু দিনারগুলো আমি নেব না, তাই সেখানে গিয়ে দেখবও না।

দ্বিতীয় রাতে স্বপ্নে তাকে আবার বলা হলো, অমুক স্থানে দশটা দিনার পড়ে আছে; উঠিয়ে নাও! যুবক একই প্রশ্ন করল, সেগুলোতে বরকত হবে কি? উত্তর এলো, বরকত হবে না। প্রতিউত্তরে যুবক বলল, এই দশ দিনারও আমি নেব না। যুবক দশ দিনারের কথা তার স্ত্রীকে বললে স্ত্রী বলল, প্রথমে তো একশো দিনার ছিল, তা আপনি বর্জন করেছেন। এখন দশ দিনার রয়ে গেল, এগুলো তো উঠিয়ে নেবেন! সে জবাব দিল, যেহেতু এগুলোতে বরকত নেই, তাই আমি এগুলো নেব না।

তৃতীয় রাত যুবক আবার একই স্বপ্ন দেখল। তাকে বলা হলো, তুমি তোমার মাতাপিতার খেদমত করে তাঁদের সন্তুষ্ট করেছিলে। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে একটি দিনার দিচ্ছি। সে প্রশ্ন করল, তাতে বরকত হবে কি? উত্তর এল, হ্যাঁ, হবে। যুবক ঘুম থেকে জেগে সেই পাথরের কাছে গেল এবং

পাথরটি উঠিয়ে নিচে একটি দিনার পেয়ে সেটি উঠিয়ে নিল। বাড়ি ফেরার সময় তার অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত। সে চিন্তা করল, এই দিনার দিয়ে একটি মাছ কিনে নিয়ে যাব, মাছটি ভুনা করে খাব। তারপর সে একটি মাছ কিনে বাসায় নিয়ে এল। তার স্ত্রী মাছটি কাটলে মাছের পেটে বহু মূল্যবান একটি হীরা পেল। হীরাটি সে এত চড়া মূল্যে বিক্রি করল যে, তার সারা জীবনের চলার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন–

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'তাকে তিনি (আল্লাহ) এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন, যা সে কল্পনাও করে না।'[২১৭]

৬. আল্লাহর সঙ্গ লাভ : তাকওয়ার আরও একটি উপকারিতা হলো, তাকওয়া অবলম্বনকারী বান্দা আল্লাহর সঙ্গলাভে ধন্য হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

'এবং তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে আছেন।'[২১৮]

আজ লোকজন বলে থাকে, অমুক মন্ত্রী আমার সাথে আছেন, অমুক এমপি আমার পক্ষে আছেন। মন্ত্রী, এমপি তাদের সাথে থাকা তাদের বড় নিরাপত্তা। তারা মনে করে, আমি বড় শক্তিশালী। সেখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যাদের সাথে আছেন, তারা কত নিরাপদ এবং কত শক্তিশালী! আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ হলেন মুত্তাকীরা। মুত্তাকীরা আল্লাহর এত প্রিয় যে, তাদের আল্লাহর সঙ্গ নসিব হয়ে যায়।

৬. আল্লাহর মহব্বত লাভ : মুত্তাকী বান্দাদের আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করেন। যেমন অনেক মানুষকে সৌন্দর্যের কারণে ভালো লাগে। অনেককে মেধাবী হওয়ার কারণে ভালো লাগে। অনেককে দীনদারির কারণে ভালো লাগে। তেমনিভাবে তাকওয়া এমন একটি গুণ, যার কারণে মুমিন বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে প্রিয় হয়ে যায়। এরূপ বান্দাদের আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করেন।

---

২১৭. সূরা তালাক : আয়াত ৩

২১৮. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৪

তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

'আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুত্তাকীদের মহব্বত করেন।'[২১৯]

৮. অবস্থার উন্নতি সাধন : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাদের সার্বিক অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নত করে দেন। লোকজন এসে বলে, হযরত! অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কোনো অজিফা বলেন দিন। মানুষ নিজ মনের কথা ব্যক্ত করে থাকে পীর সাহেবের কাছে অথবা ডাক্তারের কাছে। পীর সাহেবের মাধ্যমের আত্মার ব্যাধির চিকিৎসা করায় আর ডাক্তারের মাধ্যমে দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসা করায়। পীর সাহেবের কাছে এসে তারা অন্তর খুলে দেয় এবং বলে, এমন কোনো অজিফা বলে দিন, যাতে ঘরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। আপনাদের আমি একটি তদবির বলে দিচ্ছি। অবস্থার উন্নতি সাধনের এটি একটি কুরআনি তদবির। তদবিরটি হচ্ছে, তাকওয়া অবলম্বন করুন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থার উন্নতি করে দেবেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (٧١)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য সঠিক কথা বলো! তিনি তোমাদের সকল কর্ম সংশোধন ও উন্নত করে দেবেন।'[২২০]

মুফাস্সিরীনে কেরাম লিখেছেন, উক্ত আয়াতে কর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের অবস্থা।

৯. শত্রু থেকে সুরক্ষা : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে তার সকল শত্রু থেকে নিরাপদ রাখেন। দেখুন, মানুষের অনেক শত্রু থাকে। তন্মধ্যে কিছু আছে প্রকাশ্য শত্রু আর কিছু আছে গোপন শত্রু। গোপন অনেক শত্রুকেই আমরা জানি না। কতিপয় মানুষের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ কাজ করে। হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা বন্ধুর রূপে শত্রুতা করে থাকে। তারা নিজেদের আপন হিসেবে প্রকাশ করে অন্যদের চেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করে থাকে। তারা মূলত মানুষের আকৃতিতে শয়তান। আমরা তাদের অভিজাত ও ভালো মনে করি। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা, সে সম্পর্কে

---

২১৯. সূরা তাওবা : আয়াত ৪

২২০. সূরা আহযাব : আয়াত ৭০, ৭১

আমাদের কী জ্ঞান আছে? আমরা নিশ্চিতভাবে কিছুই জানি না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল শত্রু সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاءِكُمْ

'আর আল্লাহ তোমাদের সকল শত্রু সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত।'[২২১]

যারা মনে করে, খালা আমার বিরুদ্ধে কোনো আমল করেছে। ফুপির মেয়েকে বিয়ে করিনি; তাই ফুপি কবিরাজের মাধ্যমে আমার ব্যবসায় বাঁধ দিয়েছে, কেননা, কবিরাজের কাছে তাদের যাওয়া-আসা আছে। এগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা, যা মস্তিষ্কে ঢেলে দেয়। কেউ বলে, আমার স্ত্রী আমাকে পেরেশান করে রেখেছে। কেউ বলে, আমার সন্তানাদি আমাকে পেরেশানিতে ডুবিয়ে রেখেছে। কেউ বলে, আমার প্রতিবেশীরা আমাকে পেরেশান করছে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! কেউ কাউকে পেরেশান করছে না। মূলত আমাদের নফস আমাদের পেরেশানিতে রেখেছে। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয়ের দ্বার খুলে যাবে। সুতরাং নিজেদের প্রকৃত শত্রু সম্পর্কে অবগত হতে হবে যে, আমাদের নফসই আমাদের আসল শত্রু।

আগেকার যুগে কৃষক গরু দিয়ে হাল চাষ করত। এক কৃষক খেতে হাল চাষ করছিল। হঠাৎ সে ভেতরের গরুটাকে প্রহার করতে শুরু করল। কাছেই এক আল্লাহওয়ালা দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি কৃষককে জিজ্ঞাসা করলেন, এই নির্বাক প্রাণীটাকে এত প্রহার করছেন কেন? কৃষক উত্তর দিল, এটি পাড়া মার দিয়েছে। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাড়া মার দেওয়া' কাকে বলে? কৃষক বলল, যখন সে হাল চালাচ্ছিল, তখন ভেতরের দিককার গরুটা অলসতা করছিল। অলসতার কারণে মাটির এক চিলতে অংশ রেখে সামনে চলে গিয়েছিল। সেই অংশে হাল চলেনি। একেই 'পাড়া মার দেওয়া' বলে। যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন কৃষক বাইরের গরুটাকে কিছু বলে না; কেবল ভেতরেরটাকে মারে। আল্লাহওয়ালা লোকটি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভেতরের গরুটাকে কেন এত প্রহার করছেন? তখন সে জবাব দিল, এই ভেতরের গরুটার কারণেই তো পাড়া মার পড়েছে; তাই আমি এটিকে প্রহার করছি।

---

২২১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৫

নিরেট সত্য কথা। গুনাহের পাড়া সর্বদা ভেতরগত শত্রুর কারণেই হয়। আমাদের ভেতরকার নফস যখন গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্য যেখানে শয়তানি প্রতারণা ও চক্রান্তের আলোচনা হয়েছে, সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

'নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।'[২২২]

পক্ষান্তরে যেখানে মানুষের নফসের আলোচনা হয়েছে, সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই তোমাদের চক্রান্ত গুরুতর।'[২২৩]

শয়তানের চক্রান্তের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ضَعِيْفٌ (দুর্বল) বলে প্রয়োগ করেছেন আর নফসের চক্রান্তের বেলায় عَظِيْمٌ (বড়) শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রতীয়মান হলো, বস্তুত সকল বালা-মসিবত নফসের পক্ষ থেকে আপতিত হয়। সুতরাং আমাদের পেরেশানির মূল উৎস অন্য কোনো মানুষ নয়। বরং আমাদের নিজ-নিজ নফস। আমরা যদি আমাদের আমল শুধরে নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবকিছু শুধরে যাবতীয় পেরেশানিকে প্রফুল্লতায় পরিণত করে দেবেন। ফলে সকল শত্রু থেকে সুরক্ষা হবে। সেই শত্রু ঘরের হোক বা অফিসের। হ্যাঁ, শত্রু অফিসেও আছে, কলেজেও আছে। তারাও একজন অপরজনের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

এক জায়গায় আমি দেখেছি, একটি খোলা পাত্রে অনেকগুলো পোকা জীবিত পড়ে আছে। পোকাগুলোর অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। আমি সেখানকার এক লোককে বললাম, পোকাগুলো তো পাত্র থেকে বের হয়ে লোকজনকে কষ্ট দেবে। লোকটি জবাব দিল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। বললাম, কেন? লোকটি বলল, পোকাগুলোর অভ্যাস হলো, খোলা পাত্রে এগুলোকে রাখার পর যখন কোনো পোকা ওপরে উড়ে বের হতে চায়, তখন অন্য সব পোকা মিলে সেটির পা নিচ দিকে টেনে ধরে। ফলে ওপরে উড়তে পারে; কিন্তু বের হতে পারে না। হুবহু এরূপ আচরণ মানুষের মধ্যেও হয়। দেখা যায়, আল্লাহ

---

২২২. সূরা নিসা : আয়াত ৭৬

২২৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৮

তা'আলা কোনো ব্যক্তির ভাগ্য খুলে দেন। তিনি উন্নতি করে বংশের মধ্যে ওপরে উঠতে থাকেন। আর অন্য সকলে মিলে তার বদনাম করতে থাকে। তারা অবিকল সেই পোকাগুলোর মতো কাজ করে। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে কার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আমাদের কী জ্ঞান আছে? আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

'যদি তোমরা সবর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুপরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না।'[২২৪]

অর্থাৎ– তোমাদের শত্রুদের কোনো চক্রান্তই তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। সুতরাং এতদপেক্ষা বড় অজিফা আর কী হতে পারে? কী প্রয়োজন কবিরাজের পেছনে ছোটার? আসুন, কুরআন মজীদকে আকড়ে ধরি এবং নিজেদের অবস্থা শুধরে নেই। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম বলতেন–

তোমার হাতে থাকবে কুরআন আর জীবনে তুমি থাকবে পেরেশান?
তোমার হাতে কুরআন থাকবে আর দুনিয়াতে তুমি অকৃতকার্য হবে?
তোমার হাতে কুরআন থাকবে আর দুনিয়াতে তুমি গোলাম থাকবে?
গোলামি নফসের হোক, শয়তানের হোক কিংবা কোনো মানুষের হোক।
বলেন– না, না, না।
হে আমার আনুগত্যকারী লোকসকল!
তুমি পড়ো; তোমার প্রভু পরম করুণাময়।
তুমি কুরআন পড়ো।
তোমার প্রভু করবেন তোমার একরাম।
তোমার প্রভু তোমাকে ইজ্জত-সম্মান দেবেন, তোমার ভেতর-বাহির উজ্জ্বল করে দেবেন।

আল্লাহর বাহিনীর প্রহরা

হযরত খাজা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সিদ্দীকি (রহ.) একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দিল্লি থেকে আঠারো মাইল দূরে গাজিআবাদ

---

২২৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২০

এলাকায়। কয়েক একর জমিতে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত। এখনও মাদরাসাটি চালু আছে। সেই মাদরাসার নাযেম সাহেবের সাথে কোনো এক দেশে এই অধমের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ, সেই মাদরাসাটিও হযরতের জন্য সদকায়ে জারিয়া। উক্ত মাদরাসা সম্পর্কিত ঘটনা 'তাজাল্লিয়াত' কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

উক্ত মাদরাসার একজন ওস্তাদ শিখদের এক বস্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। এক শিখ তাঁকে সম্বোধন করে বলল, মিয়াঁজি! (শিখরা মুসলমানদের মিয়াঁজি বলত আর মুসলমানরা তাদের সরদারজি বলত) সে বলল, মিয়াঁজি! আপনারা কি আপনাদের নিরাপত্তার জন্য কোনো বাহিনী ডেকে এনেছেন? তিনি বললেন, কেন? শিখ লোকটি বলল, আমাদের বস্তির শিখেরা তিনবার তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে মাদরাসার মুলমানদের লুটতরাজ এবং হামলা করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু যখনই আমরা মাদরাসার কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, মাদরাসার চতুর্দিকে সসস্ত্র বাহিনী পাহারা দিচ্ছে।

এই বাহিনী আল্লাহর বাহিনী, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুত্তাকী বান্দাদের শত্রুদের থেকে নিরাপদ রাখেন।

রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের চক্রান্ত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধেও তো শত্রুরা চক্রান্ত করেছিল। কী চক্রান্ত?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ

'বস্তুত তাদের চক্রান্ত এমন ছিল যে, তাতে পাহাড় টলে যেত।'[২২৫]

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন–

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

২২৫. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৪৬

'তাদের পূর্ববর্তীরাও চাক্রান্ত করেছিল। তারপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তে ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেন; ফলে ইমারতের ছাদ ওপর থেকে তাদের ওপর ধসে পড়ে এবং তাদের প্রতি এমন স্থান থেকে আযাব আসে, যা তারা ধারণাও করেনি।'[২২৬]

তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ওহে আমার প্রিয় নবী!

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী করা অথবা মেরে ফেলা অথবা দেশান্তর করার উদ্দেশ্যে। তারা তাদের চক্রান্ত করে আর আল্লাহ আপন কৌশল অবলম্বন করেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।'[২২৭]

শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করেই চলে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন–

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

'আর আল্লাহ কখনওই কাফেরদের মুমিনদের ওপর বিজয়ী করবেন না।'[২২৮]

দেখুন, উক্ত আয়াতে তাকিদের শব্দ (দৃঢ়তা বোঝায় এমন শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে। এ তো হলো আয়াতটির অনুবাদ। এবার আয়াতটি বোঝার জন্য এর মর্ম বুঝুন। যেমন– অনেকে বলে, তুমি তার শরীরে হাত দিয়ে দেখো; তোমাকে আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।

উল্লিখিত আয়াতেও হুবহু এই মর্মই পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে ঈমানদারগণ! এই কাফের সম্প্রদায় প্রথমে আমার সাথে মোকাবেলা করবে। তারপর যদি তারা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ– আমি স্বয়ং তাদের সাথে মোকাবেলা করব।

---

২২৬. সূরা নাহল : আয়াত ২৬
২২৭. সূরা আনফাল : আয়াত ৩০
২২৮. সূরা নিসা : আয়াত ১৪১

একবার তো কাফের সম্প্রদায় চূড়ান্ত কৌশল অবলম্বন করেছিল। মক্কারও সমস্ত লোকজনকে বের করে আনে, আশপাশের লোকদেরও নিয়ে আসে, রাস্তার লোকজনকেও সাথে নিয়ে নেয়। তাদের দল যেন মানবসমুদ্রে পরিণত হয়। এত বিপুলসংখ্যক জনবল নিয়ে তারা মুসলমানদের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ইহুদিরা যখন জানতে পারে, মক্কাবাসী সমুদ্রের স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে, তখন তারা মুসলমানদের কাছে এসে পরামর্শ দিতে শুরু করে–

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

'লোকজন তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য একত্রিত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।'[২২৯]

কিন্তু তাঁরা ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাঁদের শানে বলেছেন–

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

'এতে তাদের ঈমান এবং (আল্লাহ ও রাসূলের) আনুগত্যই কেবল বৃদ্ধি পেলো।'[২৩০]

কাফের সম্প্রদায় এসে মদীনা মুনাওয়ারা অবরোধ করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসি (রাযি.)-এর পরামর্শক্রমে পরিখা খনন করেন। কাফেরদের এত বিপুল সংখ্যক লোক মোকাবেলার জন্য এল যে, এই যুদ্ধের নামই হয়ে গেল 'গাযওয়ায়ে আহযাব' (অনেক দলের যুদ্ধ)। তারা তাদের সংখ্যাধিক্যে গর্বিত ছিল। এক মাস পর্যন্ত তারা মদীনা অবরুধ করে রাখে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে তাদের মাঝে পরস্পরে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কিছুসংখ্যক লোক প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেন। ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। তাঁবু উপড়ে ফেলল, আসবাবপত্র ওলটপালট করে দিল। অগত্যা তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

---

২২৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩

২৩০. সূরা আহযাব : আয়াত ২২

'এবং আল্লাহ কাফেরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনি।'[২৩১]

যেমন শিশুরা একে অপরকে বলে থাকে, তুমি তো হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিও পাওনি। একই মর্ম এই আয়াতের। আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের এমনই মদদ ও নুসরত করেন। কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন–

أَنَا أَتْقَكُمْ بِاللّٰهِ

'আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহভীরু।'

তারপর আল্লাহ তা'আলা তদীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় যাচ্ছিলেন আর বলছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি একক, তাঁর বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন।'

এভাবেই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত স্বীয় বান্দাকে মদদ ও নুসরত করেন এবং তাকে সর্বোচ্চ ইজ্জত-সম্মানের জীবন দান করেন।

গুনাহ দুর্বলতার প্রধান ফটক

আজ আমরা আমাদের শত্রুদের ভয় করি। অথচ আমাদের উচিৎ নিজেদের গুনাহ সম্পর্কে ভীত হওয়া। আমাদের এ সম্পর্কে ভীত হওয়া চাই যে, আমরা যদি গুনাহ করি, তাহলে দুর্বল হয়ে যাব। এরূপ মনে করুন, আল্লাহ তা'আলার রহমতের চাদর আমাদের ছেয়ে আছে। এক-একটা কবীরা গুনাহ সেই চাদরে একটা করে ছিদ্র সৃষ্টি করছে। সেই ছিদ্র দ্বারা বহু পেরেশানি ও বিপদাপদ আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে আমাদের সাথে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, যারা মুত্তাকী, তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের চাদর রয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তাদের হেফাজতকারী।

---

২৩১. সূরা আহযাব : আয়াত ২৫

তাই তো ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

'তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের (কাফের) ষড়যন্ত্র তোমাদের বিন্দুপরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।'[২৩২]

চড়ুই দ্বারা বাজ দমন

সংখ্যার স্বল্পতা আর আধিক্য মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার মদদ ও নুসরত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'কতবার এমন হয়েছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় স্বল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যকের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।'[২৩৩]

নিজ ভাষায় উক্ত আয়াতের মর্ম বর্ণনা করলে এরূপ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কতবার চড়ুইপাখি দ্বারা বাজপাখিকে পরাজিত করেছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা সাথে থাকেন, তখন চড়ুই দ্বারা বাজকে পরাভূত করে দেন।

উপকরণবিহীন বিজয় ও সফলতা

মানুষ বলে থাকে, আমাদের কাছে উপকরণ নেই। আমি আপনাদের বলছি, আল্লাহ তা'আলা উপকরণ ব্যতীত বিজয় দান করেন। একদল ইহুদি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অনেক মজবুত একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। একব্যক্তি আমাকে তখনকার ইহুদিদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের ঘর দেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। তখন তারা এত মজবুত ঘর নির্মাণ করত যে, এক মিটার প্রস্ত মজবুত পাথর দিয়ে দেওয়াল তৈরি করত। সেই ঘর দেখে আমি তাজ্জব হয়ে যাই। তারা এত সুদৃঢ় দুর্গ বানিয়েছিল যে, তারা মনে করত, এই দুর্গ কোনো জাতি বিজয় করতে পারবে না। মুসলমানদেরও ধারণা কিছুটা এরূপই ছিল যে, এই দুর্গ অজেয় কিংবা জয় করা সহজ নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই ইহুদিদের মুসলমানদের পদানত করার ইচ্ছে করেন।

---

২৩২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২০

২৩৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتٰهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

'তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদের প্রথম সমাবেশের সময় তাদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো আল্লাহ থেকে তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি তাদের প্রতি এমন দিক থেকে এল, যা তারা কল্পনাও করেনি। আর তিনি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন।'[২৩৪]

তাদের অন্তরে যখন ঈমানদারদের ত্রাস সৃষ্টি হলো, তখন তারা পরামর্শে বসে গেল। তারা বলতে লাগল, এই মুসলিম সম্প্রদায় যেদিক যাচ্ছে, সফলতা নিয়ে ফিরছে। এরূপ যেন না হয়ে যায় যে, তারা আমাদের ওপর হামলা করে বসে। তাই উত্তম হলো, আমরা নিজেরাই এখান থেকে কেটে পড়ি। তারপর উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী তারা তাদের মালামাল গোছাতে শুরু করে। তাদের সেই করুণ অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

'তারা তাদের বাড়িঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো!'[২৩৫]

যেন আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের সাহায্য করি, তখন নিরস্ত্র লোকদেরও আমি অজেয় দুর্গের বিজেতা বানিয়ে দিই। আজও যদি আমরা মুসলিম উম্মাহ সামষ্টিকভাবে তাকওয়া অবলম্বন করি, তাহলে বিশ্বের সকল অজেয় দুর্গ বা দেশ মুসলমানদের পদতলে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

২৩৪. সূরা হাশর : আয়াত ২

২৩৫. সূরা হাশর : আয়াত ২

একটা সর্প প্রতিষেধকের আকারে

জনৈক ব্যক্তি খুবই আল্লাহওয়ালা ছিলেন। অপর এক ব্যক্তি তার হিংসুক ছিল। হিংসুক চিন্তা করল, আমি এই আল্লাহওয়ালার ক্ষতি সাধন করব। এই ভেবে সে ওষুধের মধ্যে আফিম দিয়ে দিল। আল্লাহওয়ালা লোকটি যখন ওষুধ সেবনের পর তার মধ্যে আফিমের নেশা মাত্রাতিরক্তি ক্রিয়া করায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় হিংসকু লোকটি তাকে উঠিয়ে একটি বিরান এলাকায় রেখে এল। আল্লাহ তা'আলার শান দেখুন, সেখানে একটা সাপ ছিল। সাপটা আল্লাহওয়ালা লোকটিকে দংশন করল। এবার সাপের বিষ আর আফিমের ক্রিয়া দুটি মিলে যাওয়ায় একটি অপরটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিল। ফলে কোনোটিই আর তাকে কোনো ক্ষতি করল না। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বাড়ি চলে এলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মকবুল বান্দাদের শত্রুদের থেকে এভাবেই রক্ষা করেন।

পরকালীন সফলতা

তাকওয়ার আরও একটি উপকারিতা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাকে পরকালীন মুক্তি দান করেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'এই পরকালীন ঠিকানা, আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা জমীনে বড়ও হতে চায় না এবং অশান্তিও সৃষ্টি করতে চায় না। বস্তুত শুভ পরিণাম মুত্তাকী বান্দাদের জন্য।'[২৩৬]

শুনুন, মুত্তাকী পরকালে কীভাবে সফলকাম হবে? দোযখের ওপর একটি পুল আছে, যাকে পুলসিরাত বলা হয়। এর ওপর দিয়ে সবাইকে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

'এবং তোমাদের মধ্যে সকলকেই এর ওপর দিয়ে গমন করতে হবে।'[২৩৭]

---

২৩৬. সূরা কাসাস : আয়াত ৮৩

২৩৭. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১

كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

'এটা আপনার পালনকর্তার কাছে অনিবার্য বিষয়, যা সম্পন্ন হবেই।'[২৩৮]

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

'তারপর আমি সেসব লোককে নাজাত দেব, যারা মুত্তাকী হবে। আর জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় নিক্ষেপ করব।'[২৩৯]

অতএব, পুলসিরাত দিয়ে কারা সফলকাম হয়ে গমন করবে? যারা মুত্তাকী হবে, তারাই কেবল সফলতার সাথে পুলসিরাত অতিক্রম করবে।

১১. বরকতের দ্বার খুলে দেওয়া : মুত্তাকী বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। শুনুন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[২৪০]

মানুষ দুটি বস্তুর নাম। একটি দেহ, অপরটি আত্মা। দেহ মাটি দ্বারা তৈরী এবং এর অধিকাংশ জরুরত মাটির মধ্যে নিহিত রেখেছেন। যেমন–

পানি মাটি থেকে নির্গত হয়।

আমাদের পোশাকের উপাদান মাটি থেকে নির্গত হয়।

আমাদের আহার্য ফসল মাটি থেকে উৎপন্ন হয়।

আমাদের আহার্য ফল-ফলাদিও মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়।

যেসব উপকরণ দ্বারা আমাদের ঘর নির্মিত হয়, সেগুলোর খনিও মাটিতে। এভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা মাটিতে রেখে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বস্তু রূহ। এই রূহ নির্দেশজগত থেকে আসা একটি বস্তু। সেই নির্দেশজগতের বস্তুর খাদ্য ওপর থেকে আসা নূর ও জ্যোতি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

---

২৩৮. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১

২৩৯. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭২

২৪০. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

'আমি তাদের জন্য আসমান এবং জমীনের বরকতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিই।'

আল্লাহ তা'আলা জমিন থেকে সেসব বরকত প্রদান করেন, যা তোমাদের দৈহিক আহার্য হয়ে থাকে। আর আকাশ থেকে সেই নূর ও জ্যোতি নাযিল করেন, যা তোমাদের আত্মিক খাদ্য হয়।

বরকত হারিয়ে যাওয়া

চিন্তা করলে বুঝে আসবে–

বর্তমানে রিযিকের কমতি নেই। কমতি রয়েছে বরকতের। পরিবারের সকল সদস্য রোজগার করছে; তারপরও প্রয়োজন মিটছে না।

চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছে; কিন্তু আরোগ্য লাভ হচ্ছে না। মানুষ তো হাজার-হাজার নয়, বরং লাখ-লাখ টাকা চিকিৎসার পেছনে ব্যয় করছে; তথাপি সুস্থতা ফিরে পাচ্ছে না। বরকত বিদায় নিয়েছে। এখন তো আঠারো বছরের যুবক পর্যন্ত বলে, হযরত! জানি না, আমার কী হয়েছে। বসা আছি, উঠতে যাচ্ছি তখন চোখে ঝাপসা ও অন্ধকার দেখি। বাইশ বছরের যুবক বলে, হযরত! আমার মেরুদণ্ডে ব্যথা অনুভূত হয়। এটা কেমন যৌবন? যদি বাইশ বছর বয়সেই মেরুদণ্ডে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, তাহলে বার্ধক্যে কী অবস্থা হবে?

সময় আছে, সময়ে বরকত নেই। দিনের শুরুতে বলা হয়, এটা করব, ওটা করব; কিন্তু দিন শেষে সন্ধ্যা বেলা দেখা যায় কাজের কাজ কিছুই হয় না।

তীক্ষ্ণ মেধা আছে, বরকত নেই। যা মুখস্থ করা হয়, তা খুবই সামান্য সময় স্মরণ থাকে, তারপর ভুলে যায়। ছাত্ররা এসে বলে, হযরত! সবক মনে থাকে না। ভাই! এই স্মরণ না থাকা বরকত না থাকার দলিল। যখন সব কিছু থেকে বরকত উঠে গেছে, তখন আমরা বলতে পারি, বরকত নেই। এই বরকত না থাকার কারণ মানুষের ত্রুটি ও অবহেলা।

জনৈক বুযুর্গকে তাঁর ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনি খুব বেশি-বেশি শুনিয়ে থাকেন যে, বরকত হয়, বরকত হয়। তো কখনও কোনো বস্তুতে বাস্তবে বরকত হওয়া আমাকে দেখাবেন, যাতে আমি বুঝতে পারি, এ হলো বরকত। বুযুর্গ ছেলেকে নিয়ে বিদ্যুতের মিটারের কাছে গেলেন এবং বললেন,

বৎস! এই যে দেখো! তোমার বয়স এখন ত্রিশ বছর হয়েছে। আর আমি এই মিটার তোমার জন্মের আগে লাগিয়েছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে একে কখনও মেরামত করার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ক্ষতি না হওয়াও রিযিকের বরকতের মধ্যে শামিল।

জীবনে বরকত কয়েকভাবে হতে পারে। এক তো এভাবে যে, মানুষের হায়াত দীর্ঘ হয়ে যাবে। আরেক পদ্ধতি হচ্ছে, নির্দিষ্ট হায়াতে আল্লাহ তা'আলা এমন সুস্থতা দান করবেন যে, তাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না। সুতরাং আপনারা কী পরিমাণ লোককে এমন দেখেছেন যে, তারা সুস্বাস্থের সাথে জীবন যাপন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন? পক্ষান্তরে আপনারা অনেক লোককে দেখে থাকবেন, তারা বার্ধক্যে কত দুরবস্থায় পতিত হয়েছে।

১২. কবুল করে নেওয়া : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দার আমল কবুল করে নেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।'[২৪১]

উক্ত আয়াত থেকে এই ইশারা পাওয়া যায় যে, মুত্তাকী বান্দাগণই কেবল আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ফিকহে হানাফীর কবুলিয়াত ও এর রহস্য

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইমামে আযম হযরত আবুহানীফা (রহ.)কে ব্যাপক কবুলিয়াত দান করেছেন। বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকজন বর্তমানে ফিকহে হানাফীর অনুসারী।

পাকিস্তানে ফিকহে হানাফী।

আফগানিস্তানে ফিকহে হানাফী।

হিন্দুস্তানে ফিকহে হানাফী।

উজবেকিস্তানে ফিকহে হানাফী।

তাজিকিস্তানে ফিকহে হানাফী।

কাজাখস্তানে ফিকহে হানাফী।

---

২৪১. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

তাতারিস্তানে ফিকহে হানাফী।

বুশকিরিস্তানে ফিকহে হানাফী।

মস্কো লেনিনগ্রাড পর্যন্ত সকল অঞ্চলে ফিকহে হানাফী।

এ থেকে একটু সামনে চলুন।

বসনিয়ায় ফিকহে হানাফী।

আরও সমানে চলুন।

তুরস্কে ফিকহে হানাফী।

সিরিয়ায় ফিকহে হানাফী।

ইরাকের সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ফিকহে হানাফী। তাছাড়া

বাংলাদেশে ফিকহে হানাফী।

চিনের মুসলমানদের সকল অঞ্চলে ফিকহে হানাফী।

আল্লাহু আকবার!

বিশ্বের কত বিস্তৃত এলাকায় ফিকহে হানাফী অনুসারীদের বসবাস। আমি একটি মজার কথা বলছি। কোনো এক বিমানবন্দরে সুদানের এক জজের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি সেখানকার প্রধান বিচারপতি। তাঁর সাথে আমার অনেক কথোপকথন হয়। একপর্যায়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দেশে কোন ফিক্‌হের ওপর আমল হয়? তিনি উত্তর দেন, 'আমলের দিক থেকে তো আমরা মালেকি, কিন্তু আমাদের আদালতে ফিকহে হানাফী চালু আছে।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই পার্থক্য কেন?... উত্তরে তিনি বললেন, 'আদালত সম্পর্কিত বিষয়াদিতে ফিকহে হানাফী যতটুকু পূর্ণাঙ্গ, ততটুকু পূর্ণাঙ্গতা অন্য কোনো ফিকহে নেই'।

মাশা আল্লাহ!

ফিকহে মালেকীর ওপর আমলকারীগণও তাদের আদালতে ফিকহে হানাফীর অনুসরণ করেন। এটি ব্যাপক কবুলিয়াত, যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)কে দান করেছেন। মানুষ ধারণা করছিল, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলেই ফিকহে হানাফী এত প্রসারতা লাভ করেছে। না, কিছুতেই এমনটি নয়। এর দলিল হলো, খলীফা হারূনুর রশীদের যুগে চিনের প্রাচীর অনুসন্ধান অনেক গুরুত্ব পায়। তিনি তখন চিনের প্রাচীর সম্পর্কে তথ্য

সংগ্রহের জন্য ওলামায়ে কেরামের একটি দল চিন প্রেরণ করেন। সেখানে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) কখনওই যাননি। প্রতিনিধিদলের লোকজন বলেন, আমরা এমন এলাকাতেও সফর করেছি, যেখানে আমাদের দেশের কোনো লোক কখনও পৌঁছেনি। সেখানকার লোকজনও ফিকহে হানাফীর অনুসারী। আল্লাহু আকবার! এটি আল্লাহর কবুলিয়াত ছাড়া কিছু নয়।

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর এই কবুলিয়াতের রহস্য তাঁর তাকওয়ার মধ্যে লুকায়িত।

তিনজন মহান ব্যক্তির সাথে আমার আন্তরিক বিশেষ মহব্বত রয়েছে। আমার অন্তরে সকল সাহাবার মহব্বত বিদ্যমান । তবে সাইয়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর প্রতি আমার মধ্যে এক বিরল মহব্বত রয়েছে।

সকল ইমামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান আমার অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান আছে। তবে ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর সাথে আমার দুর্লভ মহব্বত রয়েছে।

ওলামায়ে দেওবন্দ সকল আকাবিরীনে কেরামের মহব্বত আমার অন্তরে বিদ্যমান আছে। তবে হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর সাথে আমার কিছুটা বিরল মহব্বত রয়েছে।

আমার অন্তরে থাকা তাদের এই বিশেষ মহব্বত নিয়ে একবার আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করি। তখন আমার মধ্যে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, সম্ভবত তাঁদের সকলের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া ছিল। আর তাঁদের জীবনের সেই তাকওয়াই অধমের অন্তরকে এত প্রভাবিত করেছে।

'সুতরাং আজকে যদি আমি এরূপ কসম খাই যে, আমার পিতা অপেক্ষা এই তিন মহান ব্যক্তির মহব্বত আমার অন্তরে বেশি, তাহলে আমি কসম ভঙ্গকারী হব না।'

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর তাকওয়া ছিল দৃষ্টান্তহীন। তিনি খুবই পরহেযগার ছিলেন। এই উম্মতকে ব্যবসা হয়তো হযরত আবুবকর (রাযি.) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা হযরত আবুহানীফা (রহ.) । ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর তাকওয়ার একটি নমুনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ইমাম সাহেবের কাপড়ের দোকান ছিল। একবার যোহরের পর দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, নুমান সাহেব! কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আপনি দেখছেন না আকাশ মেঘাচ্ছান্ন? লোকটি

বলল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তো কী হয়েছে, আপনি দোকান বন্ধ করে দিলেন কেন? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, আমার দোকান কাপড়ের। আকাশে যখন মেঘ জমে, তখন পূর্ণ আলো থাকে না। যার ফলে গ্রাহক কাপড়ের কোয়ালিটি ভালোভাবে বুঝতে পারে না। সুতরাং কোনো গ্রাহক যেন কম মূল্যের কাপড় বেশি মূল্যের মনে করে ক্রয় করে না ফেলে সেজন্য আমি দোকান বন্ধ করে দিয়েছি।

আল্লাহু আকবার!

গ্রাহক এতটুকু ভুল করে বসবেন, তাও তিনি পছন্দ করতেন না।

বোখারি শরীফ সর্বতোভাবে কবুল হওয়ার রহস্য

ইমাম বোখারি (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা যে-কবুলিয়াত দান করেছেন, তা তাঁর তাকওয়ার বদৌলতেই। নতুবা হাদীছের কিতাবসমূহের মধ্যে আরও অনেক কিতাব এমন আছে, যেগুলোর অবস্থান হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনায় অনেক ঊর্ধ্বে। তথাপি আল্লাহ তা'আলা সহীহ বোখারি শরীফকে যে কবুলিয়াত দান করেছেন, তা অন্য কোনো কিতাবকে দেননি। তাই তো আজ সমগ্র বিশ্ব বলছে, সহীহ বোখারি কুরআন মাজীদের পরে সর্বপেক্ষা সহীহ তথা বিশুদ্ধ কিতাব।

দাঁতভাঙা জবাব

একবার এক গাইরে মুকাল্লিদ ব্যক্তি (যে কোনো ইমাম মানে না) আমার কাছে এল। এসে আমাকে বলল, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ; আপনি কেন হানাফি হলেন? আমি বললাম, কেন হব না? সে বলল, আমরা তো কিতাবাদিতে পড়েছি, ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) শুধু সতেরোটি হাদীছ জানতেন। আমি বললাম, আচ্ছা! ইতোপূর্বে তো আমি ছিলাম মজবুত হানাফি। আর এখন একথা শুনে আমি হয়ে গেলাম অধিক মজবুত হানাফি। লোকটি বলল, কেন? আমি বললাম, আপনি মিথ্যারোপ করতে পারবেন না। ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) জীবদ্দশায় ছাত্রদের মাধ্যমে ছয় লাখ মাসআলার উত্তর লিখিয়েছেন। আমি এমন ব্যক্তিকে কেন আমার ইমাম বানাব না, যিনি মাত্র সতেরোটি হাদীছ থেকে ছয় লাখ মাসআলার উত্তর বের করেছেন?

তারপর সে কথার মোড় পরিবর্তন করে ফেলল। বলল, আপনাকে একটি কথা বলছি। আমি বললাম, বলুন। সে বলল, আপনি আবার কুফায় চলে না

যান যেন। আমি নিরুত্তরকারী জবাব দিতে গিয়ে বললাম, জি; আপনি কথা বলুন; কিন্তু আপনি বোখারায় চলে না যান যেন। আমরা যদি কুফায় চলে যাই, তোমরাও তো বোখারায় চলে যাও।

কুরআনের খেদমতের পুরস্কার

ইমামুল উলামা ওয়াস্ সুলাহা মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরি (রহ.) শিখ পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি ঈমান আনেন এবং দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হয়ে যান। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে দাওরায়ে হাদীছের কিতাব পড়েন। সেখানে তার আত্মীয় ও বংশীয় কোনো লোক ছিল না। তারপরও আল্লাহর কোনো এক মকবুল বান্দা তার কাছে নিজের কন্যা বিয়ে দেন। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাহ্যিক অবস্থাও উন্নত করে দেন।

হযরত বলতেন, আমার একটা সময় এমনও ছিল, যখন বিয়ের পরে ঘরে রুটিও থাকত না। আর আজ আমি এমন সময় অতিবাহিত করছি, যখন তায়েফ থেকে আমার জন্য ফল আসে আর সারগুধার কুলিয়ার বংশ, যারা বড় জমিদার, তাদের স্ত্রী-কন্যারা বরকতের জন্য আমার ঘর ঝাড় দেয়।

আমি আমার হযরত (রহ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আহমাদ আলী লাহোরি (রহ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফাদের মধ্যে কোনো একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! পরকালে আপনার সাথে কী মুআমালা করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে আমাকে উপস্থিত করা হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আহমাদ আলী! তুমি আমাকে এত ভয় করতে কেন? হযরত (রহ.)-এর মধ্যে আল্লাহর ভয় সর্বদা প্রবল থাকত। তিনি বেশি-বেশি কান্নাকাটি করতেন, তাঁর দুচোখ বেয়ে অধিকাংশ সময় অশ্রু ঝরত।

যেমন অবস্থা ছিল সাইয়্যিদুনা হযরত ওমর ফারূক (রাযি.)-এর। তাঁর চক্ষু থেকেও এত বেশি অশ্রু ঝরত যে, গণ্ডদেশে অশ্রু গড়িয়ে পড়ার দরুন সেখানে দাগ পড়ে গিয়েছিল। হযরত লাহোরি (রহ.)-এরও হুবহু এরূপ অবস্থাই ছিল। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আহমাদ আলী! তুমি আমাকে এত ভয় করতে কেন? তখন আমি আরও বেশি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তখন বলেছিলাম–

مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ

'হিসাব-নিকাশে যাকে জবাবদিহিতা করা হবে, তাকে অবশ্যই আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।'

এ কারণে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলার রহমত আমার প্রতি ধাবিত হলো এবং তিনি বললেন, আহমাদ আলী! তুমি আরও ভয় পাচ্ছ! আজ তো তোমার আনন্দিত হওয়ার সময়। তুমি এত উত্তম জীবন কাটিয়েছ এবং কুরআনে কারীমের এত খেদমত করেছ যে, আমি তোমাকেও ক্ষমা করে দিলাম এবং যে কবরস্তানে তোমাকে দাফন করা হয়েছে, সেখানে সমাহিত সকল গোনাহগারকেও আমি ক্ষমা করে দিলাম।

প্রিয় হওয়ার মাধ্যম

মুত্তাকী বান্দা আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের কাছেও প্রিয়, আল্লাহর বান্দাদের কাছেও প্রিয়। আলেম-জাহেল, বড়-ছোট সকলের কাছেই মুত্তাকী ব্যক্তি অনেক প্রিয়। যে-ই তাকে দেখে অন্তরে তাঁর প্রতি মহব্বত জাগে। লোকজন তাঁর সেবা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত ওয়াক্ফ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনটি হয় কী কারণে? তাকওয়ার কারণে।

হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে–

يَتَقَرَّبُ عَبْدِيْ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ

'আমার বান্দাগণ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে, এমনকি আমি তাকে মহব্বত করতে থাকি।'

তারপর সামনে আরও বলেন, আমি যখন তাকে মহব্বত করতে থাকি, তখন জিরাঈলকে ডেকে বলি, জিবারাঈল! আমি অমুক বান্দাকে মহব্বত করি। তখন জিবরাঈল আকাশে ফেরেশতাদের মাঝে ঘোষণা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন। এ ঘোষণা শুনে সমস্ত ফেরেশতা সেই বান্দাকে মহব্বত করতে শুরু করে। তারপর জিবরাঈল আমীন জমীনে অবতরণ করে এবং ঘোষণা করে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তা'আলা অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন। এই ঘোষণা কোনো মানুষের কান শুনতে পায় না; তবে অন্তর শুনতে পায়। তারপর ভূপৃষ্ঠে তাকে গ্রহণযোগ্য ও সকলের প্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়। হাদীছ শরীফে এ-কথাটি এ-শব্দে বিবৃত হয়েছে

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْاَرْضِ

তারপর সে যদি জঙ্গলেও গিয়ে বসে, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তার জন্য মঙ্গল বানিয়ে দেন। এত সবকিছু তাকওয়ার উসিলায় মানুষ অর্জন করে।

সর্বোত্তম ঘটনা ও তার রহস্য

যেখানে মুত্তাকী লোকদের আপন বলতে কেউ থাকে না, সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আপন হয়ে যান। যখন হযরত ইউসুফ (আ.)কে কূপে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তাঁর ভাইয়েরা কী কাণ্ড করল? তারা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে চলে গেল এবং অদূরে অবস্থান করতে লাগল। বণিকদল যখন কূপ থেকে তাঁকে উঠাল, তখন ভাইয়েরা তাঁকে পলাতক গোলাম বলে বণিক দলের কাছে বিক্রি করে দিল। মূল্য কী ধার্য হলো? আল্লাহ বলেন–

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

'এবং তারা তাকে বিক্রি করে দিল স্বল্প মূলে, কয়েকটা দেরহামের বিনিময়ে।'[২৪২]

হায় আমার মনিব! দেখুন, ছোট শিশুদের চেহারায় এমনিতেই নিষ্কলুষতার ছাপ থাকে। অপর দিকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্য ছিল তুলনাহীন। তারপরও তাঁর মূল্য কত ধার্য হলো? গোটাকয়েক খোটা দেরহাম। এখান থেকে একটি সূক্ষ্ম বিষয় পাওয়া যায়। যেসব যুবক নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করে বেড়ায়, তারা গোটাকয়েক মুদ্রার পেছনে তাদের জীবন বরবাদ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)কে মিশর রাষ্ট্রপতির ঘরে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানেও আরেক তামাশার কাণ্ড ঘটল। আযীযে মেসেরের স্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সেই ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

'সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সে তাঁর থেকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে ফুঁসলাতে লাগল।'[২৪৩]

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বুঝুন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এ কথাটি আরও সংক্ষিপ্ত করে বলতে পারতেন। বলতে পারতেন, মিশর

---

২৪২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২০
২৪৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

রাষ্ট্রপতির স্ত্রী তাঁকে এরূপ বলেছে। আর তাহলে পনেরো শব্দের স্থানে পাঁচ শব্দে কথা শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা করেননি। অথচ কুরআনে কারীমে আল্লাহর কালামকে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে সাজানো হয়েছে, যেন সমুদ্রকে পানির সামান্য পাত্রে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্থানে বিষয়টি ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার পরিবর্তে দীর্ঘ করাকে পছন্দ করা হয়েছে। কেন? এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এমন কথা বলতে পছন্দ করেন না, যার মধ্যে কারও গীবত হয়ে যায়। কেননা, তিনি গীবতকে খুবই অপছন্দ করেন। তাই মুমিনের ওপর গীবত হারাম করে দিয়েছেন। তাই তিনি মিশর রাষ্ট্রপতির স্ত্রী নাম উল্লেখ না করে বলেছেন, ' সে যে-মহিলার ঘরে থাকত'। বোঝা গেল, আমরাও যদি কারও সম্পর্কে আলোচনা করি, তাহলে মন্দ আলোচনায় নাম উল্লেখ না করে তাদের ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে গীবত না হয়ে যায়।

এবার দেখুন। ইউসুফ (আ.) গোলাম ছিলেন। মনিবা কাজের জন্য তাঁকে নিজের রুমে ডেকে আনে। তারপর দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়।

الْأَبْوَاب (দরজাসমূহ)-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনে কেরামের অনেকে বলেন, রুমের ভেতরে রুম ছিল এবং প্রত্যেক রুমে দরজা ছিলে। এভাবে অনেকগুলো রুমের অভ্যন্তরে অবস্থিত রুমে তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়। আবার অনেকে বলেন, একই রুমের একাধিক দরজা ছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, জানালাগুলোকেও দরজা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মোটকথা, দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর মনিবা তার মন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং তাঁকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বলল।

هَيْتَ لَكَ

' তুমি আমার কাছে এসো।'[২৪৪]

তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন–

مَعَاذَ اللهِ

'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই।'[২৪৫]

مَعَاذَ اللهِ (মা'আযাল্লাহ) এই বাক্যটি মুখস্থ করে নিন। যখনই আপনাদের সামনে গুনাহের ক্ষেত্র চলে আসবে, তখন যদি এই দুটি শব্দ মুখে উচ্চারণ

---

২৪৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩
২৪৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)কে রক্ষা করেছিলেন, দেখবেন, তিনি আপনাদেরও রক্ষা করবেন। শব্দদুটি মুখস্থ করে নিন। যখনই এ-ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, বলবেন, مَعَاذَاللهِ। এভাবে বান্দা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে চলে যায়।

তারপর কী হলো? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ

নিঃসন্দেহে সেই মহিলা তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে-ও মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতে পেত।'[২৪৬]

এখানে এসে একদল লোক সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। মানুষ অন্যকে নিজের ওপর ভিত্তি করে বিচার করে। আমাদের অবস্থা তো হলো, কোথাও থেকে গুনাহের আহ্বান এলে আমরা গুনাহ করতে প্রস্তুত হয়ে যাই। সাথে-সাথে তাতে লিপ্ত হয়ে যাই। তাই উল্লিখিত ঘটনায় একদল লোক মনে করে, ইউসুফ (আ.)ও আসক্ত হয়েছিলেন। কখনও না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, সে-ও আসক্ত হয়ে পড়ত যদি-না সে তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন দেখত। অর্থাৎ তিনি আসক্ত হননি। বরং আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন–

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

'নিশ্চয়ই তিনি আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।'[২৪৭]

আরও দলিল নিন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ

'এমনটি হয়েছে যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা দূরে সরিয়ে দিই।'[২৪৮]

উক্ত আয়াতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। سُوْءٌ ও فَحْشَاءٌ। মুফাস্‌সিরীনে কেরাম লিখেছেন, سُوْءٌ শব্দ স্ত্রী ভিন্ন অন্য মহিলাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা,

---

২৪৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৪
২৪৭. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৪
২৪৮. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৪

তার সাথে গলাগলি করা, চুমো খাওয়া ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। মোটকথা, চুমো খাওয়া এবং স্পর্শ করার অর্থে سُوْء শব্দ ব্যবহার হয়। আর ব্যভিচার বোঝানোর জন্য فَحْشَاء শব্দ ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দই আয়াতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ.) এই মন্দ ইচ্ছা করেননি তাতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

এর আরও একটি দলিল শুনুন। হযরত ইউসুফ (আ.) গুনাহের নাম শুনেই সাথে-সাথে দরজার দিকে ছুটে যান। এটি মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি। তিনি যদি সেখানেই দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন এবং তাঁর জামা ছিঁড়ে যেত, তাহলে কোন দিকে ছিড়ত? সামনের দিকে। আর তখন তাঁর ওপর দোষা চাপত। এটি মুমিনের ধিশক্তি যে, তিনি দরজার দিকে ছুটে পালালেন। তারপর মহিলা তাঁকে পেছন থেকে ধরল। ফলে জামা পেছন দিকে ছিঁড়ল। তারপর আল্লাহ তা'আলা কোলের শিশুর মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়ালেন। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী বান্দাদের প্রতি এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। মুত্তাকী বান্দার ওপর যখন এ-জাতীয় অপবাদ আসে, তখন তিনি নিষ্পাপ শিশু, যারা কুদরতের অমোঘ শৃঙ্খলার কারণে কথা বলতে পারে না, আল্লাহ তা'আলা সেই শিশুদের মুত্তাকী বান্দাদের খাতিরে অমোঘ শৃঙ্খলা পরিবর্তন করে বাকশক্তি দান করেন এবং শিশুরা মুত্তাকীদের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

তারপর হযরত ইউসুফ (আ.)কে জেলখানায় যেতে হলো। পরবর্তী কালে আল্লাহ তা'আলা জেলখানা থেকে মুক্ত করে তাঁকে মিশরের সিংহাসনও দান করেন। তারপর দুর্ভিক্ষ এল। তাঁর ভাইয়েরা খাদ্য নেওয়ার জন্য মিশরের খাদ্যমন্ত্রীর (ইউসুফ আ.) কাছে এল। তিনি তাদের খাদ্য দিয়ে দিলেন। সাথে-সাথে বলে দেওয়া হলো, পরে আবার এলে ভাই বিনইয়ামিনকে সাথে নিয়ে এসো। এও বলে দেওয়া হলো, নতুবা কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না। তারপর বিনইয়ামিনকে সাথে নিয়েই তারা আবার খাদ্য নিতে এল। এবার তিনি আপন ভাই বিনইয়ামিনকে কৌশলে নিজের কাছে রেখে অন্যদের খাদ্য দিয়ে বিদায় দিলেন।

এই বৃত্তান্ত কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। যে সূরার মধ্যে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, সেই সূরার নাম 'সূরা ইউসুফ'। আর এই সূরাকে 'আহসানুল কাসাস' বলা হয়। এর কারণ হলো, হযরত ইউসুফ (আ.) এমন একটা সময় অতিবাহিত করেছেন, যখন তাঁর কোনো আশ্রয় ছিল না। তাঁর কোনো

আপনজন কাছে ছিল না। এমনিতেই পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তাঁর সৎ ভাইয়েরা তাঁকে পিতা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর যার গোলাম হয়েছিলেন, সেই মহিলাই তাঁকে জেলে পাঠাল। সেই অবস্থায় তাঁর তো আপনজন বলতে কেউ ছিল না। সকল আশ্রয় ভেঙে গেল। মানুষ যখন দুনিয়াতে সব দিক থেকে নিরাশ্রয় হয়, তখন তার প্রভু তার আশ্রয়স্থল হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, 'হে রাসূল! আপনি স্মরণ করুন, আপনার ভাই ইউসুফ-এর সাথে কীরূপ আচরণ করা হয়েছিল। আপনিও নিজেকে আশ্রয়হীন মনে করছেন। শুনে রাখুন, আমি যেমন তখন আপনার ভাই ইউসুফের আশ্রয় হয়েছিলাম, তেমনি আপনার আশ্রয়ও আমি হব। আর আল্লাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আশ্রয়স্থল হলেন, তখন তাঁকে মিশরের সিংহাসনও দান করলেন। বর্তমানে সিংহাসন পেতে হলে সকল ক্ষেত্রে আধিক্য থাকা জরুরি। অধিক জনসমর্থন চাই, অনেক আত্মীয়-স্বজন চাই, অনেক গোত্র চাই, অনেক সুনাম ও প্রসিদ্ধি চাই। তবেই ছোট মেম্বরি হাতে আসে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)কে মিশরের সিংহাসন দান করেন। তখন তাঁর সৎ ভাইয়েরা মিশর এল এবং বলল–

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

'হে আযীযে মেসের! আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্যাভাব স্পর্শ করেছে। আর আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব, আপনি আমাদের পূর্ণ বরাদ্ধ দিন এবং আমাদের ওপর সদকা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সদকাকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'[২৪৬]

ভাইয়েরা এসে ভিক্ষা চাইল। ভিক্ষুক কী বলে? আল্লাহর ওয়াস্তে দিন! তারাও তা-ই করল। বলল–

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا

'আমাদেরকে সদকা করুন।'

ভাইয়েরা এসে যখন ভিক্ষা চাইল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন–

---

২৪৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ

'তোমাদের জানা আছে কি, ইউসুফের সাথে তোমরা কেমন আচরণ করেছিলে?'[২৫০]

এদ্‌শ্রবণে তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং বলল–

ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ

'তবে কি তুমিই ইউসুফ?'[২৫১]

তিনি বললেন–

اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَا اَخِيْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

'আমি ইউসুফ আর এ হলো আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যেব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ এমন নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।'[২৫২]

সুতরাং যেকোনো ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো তাকওয়ার জীবন যাপন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আরশে বসাবেন। আর যারা তাঁর ভাইদের মতো গুনাহের জীবন যাপন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ভিক্ষুক বানিয়ে রাস্তায় দাঁড় করাবেন। প্রতীয়মান হলো, আল্লাহ তা'আলার মদদ ও নুসরত তখন আসে, যখন মানুষ নিজেকে আশ্রয়হীন মনে করে।

বর্তমানে উম্মত আশ্রয়হীন; কিন্তু ...

আজকে সেই সময় বিরাজমান, যখন উম্মাতে মুহাম্মাদী নিজেদের আশ্রয়হীন অনুভব করছে। পূর্বেও এরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا

'অবশেষে যখন রাসূলরা নিরাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁরা এমন ধারণা করতে শুরু করল যে, তাদের বুঝি মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছল।'[২৫৩]

---

২৫০. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯
২৫১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯১
২৫২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
২৫৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০

অনেকবার আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন করেন, যখন চতুর্দিকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিতে পড়ে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

حَتّٰى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

'এমনকি দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে যায়।'[২৫৪]

আর মানুষের ধারণা কী হয়? আল্লাহ বলেন–

وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ

'আর তারা ধারণা করে, আল্লাহ ব্যতীত তাঁর থেকে মুক্তির বিকল্প কোনো আশ্রয় নেই।'[২৫৫]

এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছার পর আল্লাহর মদদ ও নুসরত আসে।

আমাদেরও অদম্য মনোবল ও সাহসিকতা নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নিজ-নিজ জীবন থেকে সকল গুনাহ ১০০% দূর করে আপন প্রভুর সাথে সন্ধি করতে হবে। তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করতে হবে। তারপরই কেবল আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মদদ আসবে এবং আমাদের পাল্লা সমগ্র বিশ্বে ভারী হয়ে যাবে।

আজকে এরূপ জীবন ধারণ খুবই জরুরি। সংবাপত্রের জরুরত নেই। বর্তমান যুগে তো জুমা পড়াতে হলে বলা হয়, দু-তিনটি পত্রিকা নিয়ে আসবেন। এটা তো পত্রিকার জুমা পড়া হচ্ছে। এর দ্বারা কি জাতির সংশোধন হচ্ছে? মিম্বারে রাসূলে বসে পত্রিকার জুমা! অমুক এটা করেছে, তমুক ওটা করেছে। বোঝানো হচ্ছে, আমরা বড় সংশোধন করছি। বলে থাকে, আমরা কাউকে ভয় করি না। অথচ, প্রকৃত অবস্থা হলো, মসজিদের সভাপতিকে ভয় করে কখনও বের করে দেয় কি-না?

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমাদের হযরত (রহ.) বলতেন, ইমামতকে নিন্দার পাত্র বানাবেন না। আমরা যখন তাকওয়া বর্জন করি, তখন আমরা ইমামতকে নিন্দার পাত্র বানিয়ে বসি। এজন্য আজকে আমরা আন্তরিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে, ভবিষ্যতে পরিপূর্ণরূপে শরীয়ত পালন করব এবং তাকওয়ার জীবন যাপন করব।

---

২৫৪. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

২৫৫. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

সতর্কতা অবলম্বন তো এটাও; কিন্তু

সাধারণত আমরা পার্থিব বিষয়াদিতে অনেক সতর্ক। উদাহরণত–

বিমানবন্দরে আটটা বাজে যেতে হলে স্ত্রীকে বলা হয়, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে হবে। আটটা বাজে গেলেই চলবে। তবে সতর্কতামূলক আমরা পৌনে আটটা বাজে পৌঁছে যাব।

ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ছয়টা বাজে পৌঁছা জরুরি। লোকজন বলে থাকে, ছয়টা বাজে যাওয়া জরুরি ছিল, কিন্তু আমি সতর্কতামূলক দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম।

আমন্ত্রিত মেহমানের পক্ষ থেকে মেহমানের সংখ্যা বলা হয় পনেরোজন। স্ত্রীকে বলা হয়, সতর্কতামূলক বিশজনের খাদ্য প্রস্তুত করা চাই।

অর্থাৎ– আমরা পার্থিব বিষয়াদিতে বড় সতর্ক। To be on the safe side শব্দগুলোকে যদি কুরআনি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাহলে একে তাকওয়া বলা হয় যে, মুত্তাকী বান্দা সর্বদা To be on the safe side সতর্ক জীবন যাপন করে। তিনি গুনাহের রিস্কই নেন না।

কতিপয় সূফীকে দেখেছি, তারা পানাহারে বড়ই তাকওয়া অবলম্বন করে। কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছুই মানে না। স্ত্রীকে ঘরে কষ্ট দেয়। স্ত্রীর সাথে কোনোভাবে বনিবনা হয় না। এর নাম তাকওয়া নয়। তাকওয়া হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সতর্ক জীবন যাপন করা। শুধু বাজারের খাদ্যসামগ্রী বর্জন করা দ্বারা মানুষ মুত্তাকী হয়ে যায় না। বরং তাকওয়ার দাবি হলো, লেনদেন, আচার-আচরণ তথা সর্বক্ষেত্রে মানুষ শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করবে। আসুন কুরআনে কারীমকে জিজ্ঞাসা করি, তাকওয়া কী? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَآتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوا وَالصّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'পুণ্য এই নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিমমুখী করবে। বরং পুণ্য হচ্ছে, মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি,

ফেরেশতাগণের প্রতি, নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর মহব্বতে সম্পদ দান করবে নিকটাত্মীয়কে, এতিম-মিসকিনদের, মুসাফিরদের, ভিক্ষুকদের এবং সম্পদ ব্যয় করবে দাসমুক্তিতে আর নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে, প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, দুঃখ-দারিদ্র্যে, বিপদ-আপদে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে সবরের সাথে দৃঢ়পদ থাকবে। তারাই সেসব লোক, যারা সত্যবাদী এবং তাঁরাই মুত্তাকী।'[২৫৬]

দেখেছেন? এরা হলেন মুত্তাকী বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরও তাকওয়াপূর্ণ জীবন নসিব করুন।

দুনিয়ার চেকপোস্টে লুকায়িত একটি শিক্ষা

আমরা একদল লোক একবার মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এহরাম বেঁধে মক্কা মুকার্‌রমা যাচ্ছিলাম। সেখানে কর্মরত আমাদের একজন বন্ধুও আমাদের সাথে ছিল। আমি প্রত্যক্ষ্য করলাম, যখন চেকপোস্ট নিকটবর্তী হতে লাগল, তখন ভয়ে তার চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে? জবাব দিল, হযরত! আমি কাগজ প্রস্তুত করতে ভুলে গেছি। এটি সেই কাগজ, যাকে ওমরার অনুমতিপত্র বলা হয়। আমি আপনার সাথে ওমরা করার চিন্তায় বিভোর ছিলাম। অনুমতিপত্র প্রস্তুত করার কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। এ অবস্থায়ই আমি এহরাম বেঁধে আপনার সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে গেলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে, চেকপোস্টের লোকজন আমাদের থামাবে এবং কাগজ দেখবে। তারা যদি থামায়, তাহলে আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ওমরা তো আমি পরেও করতে পারব। কিন্তু আমি আপনার সাথি হয়ে শিখে-শিখে ওমরা করতে চাচ্ছি। চেকপোস্ট যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, তার চেহারা তত ফ্যাকাশে হতে লাগল। একেকবার একেক বর্ণ ধারণ করতে লাগল। ঘামে ভিজে একাকার হয়ে গেল। মনে-মনে কী যেন পড়তে লাগল। যাদের কাছে কাগজ ছিল, তারা তো সকলেই প্রফুল্ল ছিল। কিন্তু তার অবস্থা ছিল বিস্ময়কর। দূর থেকেই তার দৃষ্টি চেকপোস্টে নিবদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করছিল, সেখানে কোনো পুলিশ আছে কিনা। আল্লাহর শান দেখুন! সেখানে একজন নয়, দুজন পুলিশ দাঁড়ানো ছিল।

আমাদের গাড়ি চেকপোস্টে পৌঁছলে ড্রাইভার গতি কমিয়ে দিল। পুলিশ ইশারা করে বলল থামো। পুলিশ গাড়ি থামানোর ইশারা করার সাথে-সাথে

---

২৫৬. সূরা বাকারা : আয়াত ১৭৭

তার জবান থেকে 'উহ্' শব্দ উচ্চারিত হলো। সে ভাবল, আমাকে থামিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর কুদরত দেখুন! ড্রাইভার গাড়ি থামালে পুলিশ একেবারে কাছে এসে যখন ভেতরে দেখতে লাগল, তখন এই অধমের অসহায় চেহারা সামনে ছিল। পুলিশ দেখে বলতে লাগল, يَااللهُ অর্থাৎ– সামনে চলো। সামনে চলো। আমরাও বললাম الله اي الله। আমরা সেখান থেকে বের হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমি তখন বললাম, ভাই! আজকে আমার একটি বিষয় বুঝে এসেছে। সে বলল, হযরত! কী বিষয়? আমি বললাম, একদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ একজন-একজন করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'তোমরা আমার কাছে একা-একা উপস্থিত হবে যেমনভাবে আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছি।'[২৫৭]

কেয়ামত দিবসেও চেকপোস্ট বসানো থাকবে। হকদার লোকজনও অপেক্ষায় দাঁড়ানো থাকবে। আল্লাহর ফেরেশতারাও দণ্ডায়মান থাকবেন। একদল সৌভাগ্যবান লোকের কাছে নেককার হওয়ার সার্টিফিকেট থাকবে। তাঁদের সোজা চলে যেতে দেওয়া হবে। কোনো চেকপোস্টে তাদের থামানো হবে না। আর একদল লোক এমন থাকবে, যাদের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'তাদেরকে থামও! তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৫৮]

তখন আমাদের কী অবস্থা হবে? নির্দেশ হবে, তাকে থামাও! সে আমার দেওয়া রুটি খেত আর গোপনে-গোপনে আমারই নির্দেশ লঙ্ঘন করত। বলা হবে–

قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'ওদের থামাও! ওদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

---

২৫৭. সূরা আন'আম : আয়াত ৯৫

২৫৮. সূরা সাফফাত : আয়াত ২৪

সে দেখতে বড় সূফী, কিন্তু নিজের ঘরকে জাহান্নামে পরিণত করে রেখেছিল। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। না সন্তানদের আদর-স্নেহ করেছে, না স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পা করেছে।'

বলা হবে–

قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'তাকে থামাও, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।'

আমি তাকে কত নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছিলাম। সে পছন্দমতো পানাহার করত। কিন্তু তার কাছে প্রার্থনাকারী কোনো প্রার্থনা করলে তাকে ধমক দিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত।'

বলা হবে–

قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ

'তাকে থামাও! তাকে প্রশ্ন করা হবে।'

আজকে হিম্মত করুন এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাকওয়ার জীবন দান করুন, যাতে কেয়ামতের দিন চেকপোস্টে ধরা না পড়ি। যখন মুত্তাকী বান্দাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন তার সাথে কী আচরণ করা হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

'আর যারা আল্লাহকে ভয় করত, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[২৫৯]

তাদের জান্নাতের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হবে এবং বলা হবে, হে আমার মুত্তাকী বান্দারা! তোমরা অত্যন্ত সর্তকতার সাথে আমার শরীয়তের ওপর আমল করতে। সুতরাং তোমরা যাও; জান্নাতের দরজাসমূহ তোমাদের জন্য উন্মুক্ত। তোমরা দুনিয়াতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছ। সুতরাং এখন সোজা জান্নাতে চলে যাও। তারা জান্নাতে প্রবেশ করেই বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

---

২৫৯. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন।'[২৬০]

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত আমাদের সতর্কতার সাথে শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

[খুতুবাতে যুলফিকার চতুর্দশ খণ্ড সমাপ্ত]